সুকুমার সেন

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

"ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ ॥"

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড
(১৮৯১-১৯৪১)

সুকুমার সেন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫ (১৯৫৮)

(বর্ধমান সাহিত্য সভা)

ISBN 81-7215-950-1

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১২০.০০

এই শেষ খণ্ডটি মাকে দিলুম

প্রকাশকের নিবেদন

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের শেষ (পূর্বতন চতুর্থ) খণ্ড আনন্দ সংস্করণ পঞ্চম খণ্ড রূপে প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের আনন্দ সংস্করণ প্রস্তুত করিবার সময় গ্রন্থকার এই খণ্ডে আলোচিত কালসীমার বিস্তার করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কর্মব্যস্ততার জন্য পরিকল্পিত সংযোজন তিনি লিখিবার অবসর পান নাই। বর্তমান খণ্ডের প্রস্তুত আনন্দ সংস্করণে গ্রন্থকার কিছু অংশ সংশোধন, পরিবর্জন ও সংযোজন করিয়াছেন। এই খণ্ডে কয়েকটি পরিচ্ছেদ নূতনভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে এবং কয়েকটি নূতন অংশ যোগ করা হইয়াছে।

এই খণ্ডের পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ প্রস্তুত করিতে গ্রন্থকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন শ্রীশোভন বসু, শ্রীমহীদাস ভট্টাচার্য, শ্রীঅলোক রায়, দু-একটি তথ্য সরবরাহ করিয়া শ্রীভবতারণ দত্ত ও শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী ও শ্রীশঙ্খ ঘোষ। নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিতে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীমতী কৃষ্ণা সেন।

গ্রন্থকারের নির্দেশক্রমে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের যে অংশ ও বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই সম্পূর্ণ পত্রটি এই খণ্ডের শিরোভূষণ রূপে মুদ্রিত হইল।

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় হাত দিবার পঁচিশ বছর পরে আর প্রথম খণ্ড বাহির হইবার আঠারো বছর পরে আমাদের সাহিত্যের দেড় হাজার বছরের এই ধারাবাহিক ইতিহাসের চতুর্থ ও শেষ খণ্ড বাহির হইল। জের টানিয়াছি ১৯৪১ সাল অবধি। এই সালটিকে কাষ্ঠা ধরিবার কারণ দুইটি,—রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আবির্ভাব। ইতিহাসের সঙ্গে জার্নালিজমের একটা মৌলিক প্রভেদ আছে। ইতিহাসের দূরবীনে খুব কাছের জিনিসের স্বরূপ ধরা পড়ে না। জার্নালিজমের গোচরে কাছের জিনিসের মোটা রূপ ছাড়া কিছুই আসে না। আমি ইতিহাস লিখিতে যত্ন করিয়াছি তাই উপস্থিত কাল হইতে একটু দূরেই থামিয়াছি। জানি না আরো একটু দূরে থামিয়া গেলে ভালো হইত কিনা।

নিরপেক্ষ থাকিতে সর্বদা সতর্ক হইয়াছি। আশঙ্কা হইতেছে হয়ত সেই কারণেই উদাসীন তৃতীয় পক্ষ ছাড়া আর কেহ খুশি হইবে না। "তথ্যভারাক্রান্ত" "পাণ্ডিত্যকণ্টকিত" "সাহিত্যরসহীন" আমার রচনা "রসোত্তীর্ণ" অর্থাৎ সাহিত্য-রসলোলুপ পাঠক-সমালোচকের সুপাচ্য ও স্বাদু নয় জানি। তবে সেই সঙ্গে ইহাও জানি যে আমার বই বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় উৎসাহ ও আগ্রহ জাগাইয়াছে। চতুর্থ খণ্ড রচনা করিয়া কিছুকাল ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম ইতিমধ্যে সিদ্ধ-সাহিত্যবৈতালিক কেহ একাজে অগ্রসর হইবেন এবং আমার দায় ঘুচিবে। কিন্তু তাহা হইল না। ভরসা করিয়া অতঃপর বিংশ শতাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের নব ইতিহাস রচনায় বিঘ্ন অপগত হইবে।

আলোচ্য কালমধ্যে উল্লেখযোগ্য বই লিখিয়াছেন এমন সাহিত্যিকের নাম কিছু হয়ত বাদ পড়িয়াছে। সে উপেক্ষা নয়, সে আমার ত্রুটি। পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই অবহিত হইব। ইতিমধ্যে—ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ।

ছাত্র ও ছাত্রকল্প অনেকেই এই গ্রন্থকর্মে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাহার মধ্যে শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথ ঘোষালের এবং কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কসের কর্তৃপক্ষ ও কর্মিবর্গের উল্লেখ করিলে প্রত্যবায় হয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া আজ আমি নিজেকে দেবঋণ হইতে মুক্ত মনে করিতেছি।

২২.৯.৫৮ **শ্রীসুকুমার সেন**

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রস্তুত সংস্করণে কোন কোন আলোচনা বিস্তারিত হইল। ভ্রমপ্রমাদও যথাসম্ভব দূরীভূত হইল।

শ্রীমতী সুনন্দা দত্ত নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীসুকুমার সেন

বিষয়সূচী

চিত্রাবলী

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

কিছুকাল থেকে দৃষ্টি-
ক্ষীণতাবশত ছাপার বা লেখার অক্ষর পড়া
এটা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।
তবুও ডাক্তার সুকুমার সেনের রচিত বাংলা
সাহিত্যের ইতিহাসের মুদ্রিত যে অংশটুকু
আমার হাতে এসেছে ধীরে ধীরে তা আমি
পড়ে শেষ করেছি। শেষ পর্যন্ত
আমার ঔৎসুক্য জাগরূক ছিল। বাংলা
সাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ের এমন পরিপূর্ণ চিত্র
ইতিপূর্বে আমি পড়িনি। গ্রন্থকার
তাঁর বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত গ্রন্থ-
গুলি থেকে যে দীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করে দিয়েছেন
তাতে করে তাঁর গ্রন্থ এক সঙ্গে ইতিহাস এবং
সংকলনে সম্পূর্ণরূপ হয়েছে। সেই কারণে এই
গ্রন্থ ছাত্রদের প্রয়োজন সিদ্ধ করবে এবং সাহিত্যানুরাগীদের

পরিতৃপ্তি দেবে। এই গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস বাংলা দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্ণিত হওয়াতে রচনার মূল্যবৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থকারকে আমার সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাই।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলে রাখি। "অসাম্প্রদায়িক সাহিত্যে" কথাটা এক জায়গায় লেখা হয়েছে দিনেশচন্দ্র-আমার প্রতি অনেক গানে সুর বসিয়েছেন, — কথাটা সম্পূর্ণই অমূলক। এই মিথ্যা জনশ্রুতি ইতিপূর্বেও অন্যত্র [ছাপার অক্ষরে] দেখেছি। মুখে মুখে এ সংবাদ চালনা করেন।

অমিয় বলছিলেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গক্রমে তোমরা আমার যে সকল জন্মতথ্য বিবরণ জমিয়েছ তা প্রচুর এবং প্রকাশযোগ্য। এগুলি হাতের অক্ষরের অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠিত না থাকাই শ্রেয় মনে করি।

ইতি ৪।৫।৪০ তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পরিচ্ছেদ
"গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ"

১ উপক্রম

বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যে নবীনতার প্রবেশ রবীন্দ্র-সাধনার বজ্রসূচী-পথে, আর সে নবীনতার নবনবায়মান বিকাশ ও পরিণতি রবীন্দ্র-শিল্পের বিচিত্র বিসর্পণে। রবীন্দ্র-সাধনাকে মর্মগত এবং রবীন্দ্র-শিল্পকে আয়ত্ত করিবার যোগ্যতা ও সামর্থ্যের পরিমাণ-দ্বারাই বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকারদের কৃতিত্বের মান নির্ণয় করা যায়। যে-কোন সমৃদ্ধিমান সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যাইবে যে শক্তিশালী আদিকর্মিকের সিদ্ধিকে সাধ্য করিয়াই তবে নবকর্মিকের সাধনা-সাফল্য অগ্রসর হইয়াছে।—বাঙ্গালায় বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-ইতিহাসে এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে, কেননা প্রথমত, সাহিত্যকারদের সম্বন্ধে ভারতবাসী আমরা সাধারণত একটু বেশি মোহযুক্ত। দ্বিতীয়ত, আমাদের ঐতিহাসিক-দৃষ্টি ধাতুগত নয়, এবং তাহা সাহিত্যবিচারে স্বভাবতই খোলে না। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের মতো কোন একটি সর্বশক্তিমান্ কবি লেখক ও শিল্পী অন্য কোন ভাষায় আবির্ভূত হয় নাই।

ভরসা করি এখন এ-কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে বাঙ্গালায় আধুনিক সাহিত্যের বীজ রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই উপ্ত হইয়াছিল। এ-ঘটনা বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হইবার বছর কতক আগেকার। যেক্ষণে তরুণ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসাধনায় নিজের পথটি চিনিয়া লইতে পারিয়াছিলেন সেইক্ষণেই বাঙ্গালা সাহিত্যে "আধুনিকতার" বীজবপন। আজকালকার সাহিত্য-সংবাদপত্রীয় ভাষায় গতানুগতিকতার উল্লঙ্ঘনকে বলে "বিদ্রোহ"। রবীন্দ্রনাথ অনতিক্রান্ত যৌবনেই এই "বিদ্রোহ"-পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুধু-যে তাঁহার অশান্ত অন্তর এবং ক্ষুব্ধ আত্মজিজ্ঞাসা পদে পদে পথ দেখাইয়াছিল তাহাই নয়, পরিচিত পথে আগাইতে সঙ্কট দেখা দিয়াছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা বাড়িতেছিল কিন্তু তাহাদের চিত্তের প্রসার সে অনুপাতে তো ঘটে নাই-ই, উপরন্তু তাহাদের মানসিকতায় সঙ্কোচের এবং সেই হেতু দুর্বলতার পশ্চাদ্‌গামিতার লক্ষণ স্ফুট হইতেছিল। (এ সঙ্কোচের

কারণ অনেক। প্রথমত, উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত যাঁহারা তখন "এজু" অর্থাৎ "এজুকেটেড" নামে প্রায়ই উপহসিত হইতেন, তাঁহারা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ অতীতমুখী হইলেন। দ্বিতীয়ত, ছাপাখানার প্রসাদে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদের প্রচার, ও সংস্কৃত বিদ্যার তরলীকরণ, অল্পবিদ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সংখ্যাবাহুল্য এবং ধনীদের সহায়করূপে তাঁহাদের, অর্থাৎ শাস্ত্র-ব্যবসায়ীদের, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তৃতীয়ত, শিক্ষিতদের চাকরিপ্রত্যাশা। এইসব এবং আরও ছোটখাট কারণ মিলিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে শিক্ষিত সমাজে পশ্চাদ্‌গামিতার ঝোঁক টানিয়াছিল।) রবীন্দ্রনাথ এই ঝোঁক অর্থাৎ অগ্রসরণে সঙ্কুচিত মনোভাবের পরিপূর্ণ বিপদ আশঙ্কা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্যতম নেতা সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কিছুদিন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকজন শক্তিশালী অনুবর্তীর সঙ্গে প্রায় দশ বছর ধরিয়া মসীযুদ্ধ চালাইতে হইয়াছিল। এ বিবাদের মুখ্য হেতু প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যঘটিত নয়, তবে সাহিত্য উপলক্ষ্য করিয়াই যুদ্ধ জমিয়া উঠিয়াছিল এবং সে যুদ্ধের জয়পরাজয়ে সাহিত্যের গতি খানিকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন মফস্বলে—মেদিনীপুরে ও হুগলীতে। পরে চাকরিতে ঢুকিয়া কিছুদিন তিনি কলিকাতায় আইন পড়িয়াছিলেন। যে সংসারে তাঁহার জন্ম সে ছিল সদাচারনিষ্ঠ, বিষ্ণুভক্ত গৃহস্থ সংসার। কলিকাতায় হিন্দু কলেজে পড়িলে কি হইত বলিতে পারি না, তবে মেদিনীপুরে আর হুগলীতে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়িতে থাকিয়াই পড়িয়াছিলেন। সেই কারণে তাঁহার মানসিকতায় ভালো-মন্দ দুইদিক দিয়াই অ-কলিকাতা-সুলভ রক্ষণশীলতা জাগরূক ছিল। যে কারণেই হোক বঙ্গদর্শন-প্রকাশের ও বিষবৃক্ষ-রচনার পর হইতে সমাজ-চিন্তায় ও ধর্ম-ভাবনায় সংস্কারের অপেক্ষা রক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তিনি গুরুতর মনে করিতে থাকেন। এবং সেই সঙ্গে ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ ও ভাবাদর্শ তাঁহার কাছে ক্রমশ সঙ্কীর্ণ ও বিবর্ণ হইতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজীতে সুশিক্ষিত। সুতরাং ধরিতে পারি যে তাঁহার মন ইংরেজী সাহিত্যের রসে অভিষিক্ত ছিল। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার দীক্ষাও ইংরেজী-লব্ধ। কিন্তু তিনি ইংরেজীকে ইংরেজ হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবিতে পারেন নাই। এবং ইংরেজীর সম্পর্কে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা কমিয়া আসিতেছিল। একদা যে-বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে 'পত্র-সূচনা'য় (১৮৭২) লিখিয়াছিলেন

> আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারা যায় যে ইংরাজ হইতে এদেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত-রত্ন-প্রসূতি ইংরাজি ভাষার যত অনুশীলন হয় ততই ভাল।

বারো বছর পরে সেই-বঙ্কিমচন্দ্র নবজীবনে গোল্‌ডস্টুকারের রচনা হইতে হিন্দুসংস্কৃতির প্রশংসাসূচক একটু অংশ তুলিয়া দিয়া মন্তব্য করিলেন, "এমন অমৃতময়ী বাণী ম্লেচ্ছভাষায় আর কখনও আমার কানে যায় নাই।" তাহার দুই বছর পরে ভারতীতে ইংরেজী সাহিত্যকে তুচ্ছ করিবার জন্য লিখিলেন

> সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তুলনায়, অন্তত আকারে, ইউরোপীয় গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না। যেমন হস্তীর তুলনায় টেরিয়র,

সংস্কৃতের নজীর তুলিয়া ইউরোপের ইতিহাস-বোধ ভ্রান্ত ও বিজ্ঞান-চিন্তা অর্বাচীন বলিয়া উড়াইয়া দিবার বাসনা আমাদের দেশে কখনই অসুলভ ছিল না। উপরন্তু ইংরেজী-জানা বাঙ্গালীর মনে পরাধীনতার গ্লানিবোধ দিন দিন বাড়িতেছিল, এবং সেই নিপীড়িত ও হীন ভাবনা কর্ম-প্রচেষ্টার পথে নিষ্কাশিত না হইয়া অলস ভাবনার উচ্ছ্বাস-রন্ধ্রমুখে ধূমায়িত হইতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই রন্ধ্রমুখই প্রশস্ততর করিয়া দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের শেষের দিকে হিন্দুয়ানির প্রতি তাঁহার অনির্বিচার পক্ষপাতিত্ব ও অন্ধ পোষকতা সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে যে কি রকম শিক্ষা দিতেছিল তাহা তাঁহারই এক উপযুক্ত সহযোগী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কথায় বলি।

> বঙ্গদর্শন দেখাইয়াছেন যে, কোম্‌তের মহামনু—পুরাণের নারায়ণ। কারলাইলের অশ্রান্ত পরিশ্রমই—হিন্দুর প্রকৃত বৈরাগ্য।...দেখাইয়াছেন যে, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল একখানি গূঢ় সমাজতত্ত্বের গ্রন্থ। বঙ্গদর্শন বুঝাইয়াছেন যে, বাঙ্গালির আহার ভুষি, আমোদ বিভীষিকা। রামচন্দ্র বনে গেলে দশরথ বেহালা বাজান, কৌশল্যা নৃত্য করেন। অথচ সেই বাঙ্গালিরই সামান্য তাসের খেলায় নব-মনুসংহিতার বর্ণাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রম তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে।[১]

পাশ্চাত্য দর্শনের বেলায় যাই হোক, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তো এভাবে উড়াইয়া দেওয়া সহজ নয়। এবং বঙ্কিমচন্দ্রও ততদূর আগাইতে সাহস করেন নাই। সেই কাজে সাহসিক হইলেন তাঁহার কোন কোন শিষ্য এবং ভক্ত। এই গোঁড়ামির পোষকতায় শশধর তর্কচূড়ামণির[২] পক্ষপাতী শিখাধ্বজদের ইংরেজী বিদ্যা মুখর এবং ঈর্ষালু নিন্দুকদের লেখনী সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল।

যখন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পৌত্তলিকতার প্রতি অনুকূলতা দেখাইতে গিয়া ব্রাহ্মধর্মের প্রতি কটাক্ষপাত শুরু করিলেন তখন হইতেই তাঁহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধ আরম্ভ। রবি-শশীর এই আড়াআড়ির কিছু সাক্ষ্য ভারতী-তত্ত্ববোধিনীর ও প্রচার-নবজীবনের পৃষ্ঠায় মিলিবে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের মনান্তর অনায়াসে মিটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিম-শিষ্যদের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিরোধ সহজে মিটে নাই।

পরের মুখের বুলিতে ভরা ভিক্ষার ঝুলির ঔদ্ধত্য যুবক রবীন্দ্রনাথ সহজে ক্ষমা করিলেন না। তাঁহার অন্তরের জ্বালা কয়েকটি ব্যঙ্গ রচনায় ঝাঁজের হুল ফুটাইল। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। নিরপেক্ষ ও বিপক্ষ দুই দলই অল্পবিস্তর চটিয়া গেল।[৩]

সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙ্গালীর যোগ্যতম মানস-প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্যসাধনা ও শিল্পরচনা ছাড়িয়া দিয়া হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা রূপে মঞ্চাসন গ্রহণ করিলেন তাহার বেশ কিছুকাল আগেই জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্র-ভবনে ভারতীয় সংস্কৃতির নবজীবনের বন্দনায় পঞ্চপ্রদীপ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে পঞ্চপ্রদীপের স্নেহনিষেক ছিল নিখিলভারতীয়ত্বের জাগ্রত চেতনায়। যাহারা নবীন, ইংরেজী-শিক্ষিত সুতরাং কিছু অনাবিলদৃষ্টি, তাঁহারা অনেকেই ধর্মকথার ধাঁধায় পড়িয়া গোঁড়া না হোক্ অনেকটা প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের বশবর্তী হইতেছিলেন। তাঁহারা অনেকে পাশ্চাত্য-শিক্ষালব্ধ স্বাধীন-চিন্তা ও মননের উদ্যম ছাড়িয়া দিয়া হিংটিংছটের মন্ত্র আওড়াইতে বসিয়া গেলেন। ব্রাহ্ম-সমাজ ও ঠাকুর-বাড়ি নবীন নহেন, প্রবীণই। তাঁহারা বৈদিকদীক্ষা ও উপনিষদবাণী

আঁকড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালার সাহিত্য ও ভাষাকে সাগ্রহে পোষণ করিতেন অথচ ইংরেজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। ইঁহারাই ছিলেন সত্যকার নবীন। ইঁহারা ভারতবর্ষের সর্বজনীন ও সর্বকালিক আদর্শকে মনে রাখিয়া সর্ববিধ স্বাধীনতার জন্য হাত বাড়াইয়া পা চালাইয়াছিলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে পিছাইয়া-পড়িতে-চাওয়া হিন্দুসমাজ ও আগাইয়া-চলিতে-চাওয়া ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শঘটিত দ্বন্দ্বই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয় বছরে বাঙ্গালার (ও ভারতের) সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই দুই আদর্শের সমন্বয় স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তখনই। বালকে (১২৯২ সাল) প্রকাশিত এবং 'চিঠিপত্র' নামক পুস্তিকায় সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলি পড়িলে তাহা বুঝিতে পারি। চিঠিপত্রের ষষ্ঠীচরণ হইলেন অন্তরনবীন ভারতবর্ষ, নবীনকিশোর হইলেন অকালপ্রবীণ নব্য হিন্দু। এই নবীনপ্রবীণের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংঘাত দুই রকমে ঘটিয়াছিল। প্রথমত, আত্মতৃপ্ত অসহিষ্ণুতার ও হীনম্মন্য মূঢ়তার প্রতি অশান্ত ধিক্কারে। কড়ি-ও-কোমলের এবং মানসীর ব্যঙ্গ কবিতাগুলিতে এই মনোভাবের বাহ্য-প্রকাশ, আর মানসীর 'দুরন্ত আশা'য় (১৮৮৮) সে গভীর মনোবেদনার উষ্ণপ্রস্রবণ।

দাসাসুখে হাস্যমুখ,
    বিনীত জোড়কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে
    দোদুল কলেবর !
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি
ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি
    যেতেছ ফিরি ঘর।
ঘরেতে ব'সে গর্ব কর
    পূর্বপুরুষের,
আর্যতেজ-দর্পভরে
    পৃথ্বীথরহর !

দ্বিতীয়ত, পরিচিত তীর ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায়, জীবনসাধনার "সঞ্জাত"-এ আগ্রহে। মানসীর 'পরিত্যক্ত' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ মূল্যবান্। মুখ্যত বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়াই কবিতাটি লেখা (২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫)।

বন্ধু,
  মনে আছে সেই প্রথম বয়স,
    নূতন বঙ্গভাষা,
  তোমাদের মুখে জীবন লভিছে
    বাহিয়া নূতন আশা।

বাল্যকালে বঙ্গদর্শনের মাসিক সংখ্যাগুলির প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ কতটা-যে উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতেন সেকথা অনেককাল পরে তিনি জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন। এ কবিতায়ও সে ব্যাকুলতার ইঙ্গিত আছে।

প্রতিদিন যেন পূর্বগগনে
চাহি রহিতাম একা,—
কখন্ ফুটিবে তোমাদের ওই
লেখনী-অরুণ-লেখা।

সাহিত্যগুরুদের বাণীর দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

বন্ধু, এ দীন হয়েছে বাহির
তোমাদেরি কথা শুনে,
সেইদিন হতে কণ্টকপথে
চলিয়াছি দিন গুণে'।...
ধ্রুবতারা পানে রাখিয়া নয়ন
চলিয়াছি পথ ধরি',
সত্য বলিয়া জানিয়াছি যাহা
তাহাই পালন করি।

সেই সাহিত্যগুরুরা এখন মুখ ফিরাইয়া প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিতেছেন (—যেমন কন্‌সেন্‌ট বিলের প্রতিবাদ)। কিন্তু যাহা সত্যপথ বলিয়া উপলব্ধ হইয়াছে তাহা কাহারো মুখের কথায় পরিত্যাগ করা যায় না।

তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।
নিজের জীবন মিশিয়ে যাহারে
আপনি তুলিছ গড়ি
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে
ভাঙিছ কেমন করি।

সত্যপথযাত্রীর সরণি দুর্গম বন্ধুর বিজন, কিন্তু অপরিবর্তনীয়।

জীবনের স্বাদ পেয়েছি যখন,
চলেছি যখন কাজে,
কেমনে আবার করিব প্রবেশ
মৃত বরষের মাঝে।...
শত হৃদয়ের উৎসাহ মিলি
টানিয়া লবে না মোরে,
আপনার বলে চলিতে হইবে
আপনার পথ ক'রে।

প্রথম সংখ্যা প্রচারে (শ্রাবণ ১২৯১) বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্ম' নামে প্রবন্ধ লিখিলেন। তাহা লইয়াই বিরোধের আরম্ভ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটিতে নিরাকার উপাসনা উড়াইয়া দিয়া সাকার উপাসনাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের দিন পনের আগে প্রকাশিত

নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধটির উপক্রমণিকা 'ধর্ম-জিজ্ঞাসা' বাহির হইয়াছিল। তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের তৎকালীন ধর্মচিন্তার ধারাটি বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

গুরু। তুমি ধর্মের কিছু জান কি ?
শিষ্য। হিন্দুর ছেলে, কাজেই কিছু জানি।
গুরু। ম্লেচ্ছের ছাত্র, কাজেই কিছু জান না।
শিষ্য আপনি ব্রাহ্মণ, আপনিই না হয় এ বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন।
গুরু। আমি ব্রাহ্মণ, যুগে যুগে ধর্মব্যাখ্যাই পুরুষপরম্পরাগত আমার ব্যবসা। অতএব, আমার শাস্ত্রজ্ঞান অতি সামান্য হইলেও আমি তোমাকে যথাসাধ্য হিন্দুধর্মে উপদিষ্ট করিতে স্বীকৃত আছি ; তবে আজ বেলা অবসান হইয়াছে, সময়ান্তরে হইবে।

প্রচারে প্রকাশিত প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সিটি কলেজ হলে একটি প্রবন্ধ পড়েন। সেই ভাষণ অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতীতে বাহির হইল 'একটি পুরাতন কথা' নামে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব ও উক্তি রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। পরবর্তী কালেও কখনো তিনি এমন ভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন কিনা জানি না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন

> সাকার নিরাকার উপাসনা-ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছে, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছে না।...আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধাসহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করিতেন।[৪] অথচ কাহারও তাহা অদ্ভুত বলিয়াও বোধ হইল না। আমরা দুর্বল ; ধর্মের যে অসীম আদর্শ চরাচরে বিরাজ করিতেছে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি না, কিন্তু তাই বলিয়া আপনার কলঙ্ক লইয়া যদি সেই ধর্মের গাত্রে আরোপ করি, তা হইলে আমাদের দশা কি হইবে। ...কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না ; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।...কঠোর সত্যাচরণ করিয়া আমাদের এই বঙ্গসমাজের কি এতই অহিত হইতেছে যে, অসাধারণ প্রতিভা আসিঁয়া বাঙ্গালীর হৃদয় হইতেই সেই সত্যের মূল শিথিল করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন ? কিন্তু হায়, অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।

এই প্রবন্ধের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লিখিলেন 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দুধর্ম'। নিজের যুক্তির দুর্বলতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অসচেতন ছিলেন না, তাই রবীন্দ্রনাথকে কতকটা রেহাই দিয়া তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজকে প্রতিপক্ষ কল্পনা করিয়া সাফাই দিতে চেষ্টা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন

> রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎস্বভাব, এবং আমার বিশেষ প্রীতি. যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটি কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য। তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।...উপসংহারে, রবীন্দ্রবাবুকেও একটা কথা বলিবার আছে। সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভাণের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে।...এ জিনিষ এ দেশে বড় ছিল না,—এখন বিলাত হইতে ইংরেজির সঙ্গে বড় বেশী

পরিমাণে আমদানী হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য। ...সত্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া কেবল মৌখিক সত্যের প্রচার, আন্তরিক সত্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত অমনোযোগ, রবীন্দ্রবাবুর যত্নে এমনটা না ঘটে, এইটুকু সাবধান করিয়া দিতেছি। ঘটিয়াছে, এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু পথ বড় পিচ্ছিল, এজন্য এটুকু বলিলাম, মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহার কাছে অনেক ভরসা করি, এইজন্য বলিলাম।

পৌষ সংখ্যা ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ 'কৈফিয়ৎ' বাহির হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের পিঠ-চাপড়ানি তাঁহাকে শান্ত করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন

বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, 'লোকহিত' শব্দের অর্থ বুঝিতে আমি ভুল করিয়াছি। তিনি সংশোধন করিয়া দেন নাই, এইজন্য সেই ভুল আমার এখনও রহিয়া গিয়াছে। সলজ্জে স্বীকার করিতেছি, এখনও আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারি নাই। অন্য যাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারাও আমার অজ্ঞান দূর করিতে পারেন নাই।

"পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্" নীতি মানিয়া লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র এইখানেই ক্ষমা দিলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়া "বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া" ফেলিলেন। একথা জীবনস্মৃতি-পাঠকের অজানা নয়। বিরোধের সময়েও দুইজনের পারস্পরিক প্রীতি ও ভক্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।[৫]

ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল কথা লইয়া এই যে প্রবীণ-নবীনের বিরোধ ইহাতে জয়লাভ নবীনেরই হইয়াছিল—এই স্বীকৃতি প্রবীণ দলের অন্যতম দলপতি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লেখাতেও পাই। (অক্ষয়চন্দ্র 'নবজীবন' বাহির করিয়াছিলেন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন নব্য হিন্দু-তত্ত্বালোচনার দিকে ফিরাইবার জন্যই।[৬]) মাঘ সংখ্যা নবজীবনে অক্ষয়চন্দ্রের সরস প্রবন্ধ 'ভাই হাততালি' বাহির হইল। অক্ষয়চন্দ্র বলিতে চাহিলেন, হাততালি "স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্তের মাটি" করিয়াছিল, "বিদেশিনী দুঃখিনী বিদুষী" রমাবাইয়ের মাথা ঘুরাইয়া হৃদয় গলাইয়া আগুন জ্বালাইয়াছে। এখন তাহার লক্ষ্য দুইটি বড় শিকারের দিকে, সুরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখা, ধীরে ধীরে জ্বলিলে এই শিখা স্বীয় বর্ধমান আলোকে চারিদিক আলোকিত করিবে ;...সেই অমল, কোমল, কমল-শোভা-সমন্বিত মুখশ্রী,—সেই উজ্জ্বল, সলজ্জ ভাসা-ভাসা, ভ্রমর-বর-স্পন্দিত-পদ্মপলাশ-লোচন—সেই ঝামর চামর-নিন্দিত গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণী বিনায়িত চিকুর ঝল ঝল মুখমণ্ডল,—সেই রহস্যে আনন্দে মাখান, হাসিখুসীভরা অধর প্রান্ত—সেই সৎচিন্তার প্রসর ক্ষেত্র, সুন্দর, শুভ্র, পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট—ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে।

ভারতী-প্রচারের বিরোধ চুকিয়া গিয়া নূতন করিয়া দেখা দিল সঞ্জীবনী-বঙ্গবাসীর দ্বন্দ্ব। অল্প কিছুদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্বে শিখণ্ডীর ভূমিকা লইয়াছিলেন। বঙ্গবাসীর নেতাদের প্রতিক্রিয়াশীল চেষ্টাকে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি সঞ্জীবনীতে লিখিয়াছিলেন একটি কবিতা[৭]—"শ্রীমান্ দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু।"

নাই বটে গোতম অত্রি যে যার গেছে সরে,
হিঁদু দামু চামু এলেন কাগজ হাতে করে।
আহা দামু, আহা চামু।

২ বঙ্কিম চন্দ্রিকা

বেলা পড়িলে রৌদ্রের তাপ ঘুচিয়া যায় কিন্তু বালির তাত চট করিয়া মিলায় না। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষান্ত হইলেন, তাঁহার শক্তিমান্ সহচরগণ নিরস্ত হইলেন, কিন্তু পাইক-পেয়াদারা লড়াই জাগাইয়া রাখিতে যত্নবান্ থাকিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিত্যক্ত অস্ত্র লইয়া চন্দ্রনাথ বসু বঙ্গবাসীর ও নবজীবনের যুগ্ম রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা মহত্ত্ব ও ঔদার্য চন্দ্রনাথের ছিল না, তবুও বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন-অধিকার করিয়া বসিবার যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন দ্বিধা জাগে নাই। ইতিমধ্যে নব্য হিন্দুরা দলে ভারি হইয়াছে। চিন্তা ও যুক্তি না থাকুক চীৎকার ও শাস্ত্র আছে। সুতরাং চন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তর্কযুদ্ধ দুই একবার তাল ঠোকাতেই ফতে হয় নাই।[৮] নবজীবন উঠিয়া যাইবার কিছুকাল পরে 'সাহিত্য' বাহির হইলে (১২৯৭ সাল) চন্দ্রনাথ সাহিত্যে ভর করিলেন। সাহিত্যে রবীন্দ্র-বিরোধিতা চন্দ্রনাথ বসুর পরেও চলিতে থাকে। এই বিরোধের রেশ চুকিয়া যায় ১৩২০ সালে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ফলে।

সাহিত্যে রবীন্দ্র-বিরোধিতা যখন জাঁকিয়া উঠিতেছে তখনই রবীন্দ্রনাথের সাধনায় নবীন সাহিত্যযুগের সৃষ্টিপত্তন শুরু হইয়া গিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবন' কোন নবজীবনের সূচনা করে নাই। নবজীবনোদয়ের জন্য যে-সাধনার আবশ্যক ছিল তাহার আয়োজন করিলেন রবীন্দ্রনাথই। তাঁহার 'সাধনা'ই নবজীবনের সাধনা, অগ্রগতির সাধনা। এই মূলমন্ত্রটি সাধনার প্রত্যেক ষাণ্মাষিক খণ্ডের নামপত্রের উল্‌টা পিঠে ছাপা থাকিত।

আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে
বেঁচে, ম'রে কিবা ফল ভাই
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

এ সত্যবাণী তখন কাহারো মনের ভিতর দিয়া মরমে পশে নাই। পরেও ভালো করিয়া পশিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না—অবশ্য আগে চলার প্রকৃত অর্থে।

বঙ্গদর্শন বাহির করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীকে ডাক দিয়াছিলেন বাঙ্গালা সাহিত্যসেবার প্রশস্ত অঙ্গনে। সে আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন তাঁহারা যাঁহারা ইতিপূর্বেই ইংরেজী লেখায় অল্পবিস্তর হাত পাকাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চাহিয়াছিলেন ইঁহাদের দ্বারা গ্রহণযোগ্য বিদেশি বস্তু দেশি ভাষায় প্রকাশ করিতে অথবা দেশি বস্তু ইংরেজী-শিক্ষিতের গ্রহণযোগ্যরূপে উপস্থাপিত করিতে। "একটু আধটু দেখিয়া সুধরাইয়া" দিলেই যে সাহিত্য-রচনা হয় না তাহা বঙ্কিমচন্দ্র যে বুঝিতেন না এমন নহে, কিন্তু তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক শিক্ষাবিস্তার। অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্রে এডুকেশনের দৃষ্টিঘোর তাঁহারও সম্পূর্ণ কাটে নাই। এক দিকে "ম্লেচ্ছ" বিদেশি গ্রন্থাবলী, আর এক দিকে "পবিত্র" সংস্কৃত শাস্ত্র, মাঝখানে স্বদেশী "খাঁটি বাঙ্গালা" সাহিত্য (অর্থাৎ ভারতচন্দ্র-নিধুবাবু-ঈশ্বরগুপ্ত, বড়জোর না-পড়া কবিকঙ্কণ),—এই তিন মার্কামারা থাকের বাহিরে যে পঠনীয় কিছু থাকিতে পারে তাহা সমসাময়িক শিক্ষিত সাধারণের ধারণায় ছিল না। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে মাইকেল মধুসূদন দত্তও তাঁহার জীবৎকালে

বাঙ্গালী কবিরূপে "খাঁটি" ছাপ দূরে থাকুক "ভেজাল" ছাপেরও সর্বস্বীকৃতি লাভ করেন নাই। (বঙ্কিমচন্দ্রের "শ্রীমধুসূদন" উচ্ছ্বাস কবির মৃত্যুর পরেই বাহির হইয়াছিল,—এ কথা মনে রাখিতে হইবে।) মাইকেলের কাব্যের মতো বঙ্কিমের উপন্যাসও বহুকাল যাবৎ "ফেরঙ্গ" অর্থাৎ ভেজাল এবং দূষিত বলিয়া গণ্য ছিল। এখনও "শিক্ষিত" বাঙ্গালীর মধ্যে এমন ব্যক্তি আছেন যাঁহারা দাশরথি রায়ের পরবর্তী কোন বাঙ্গালী কবিকে "খাঁটি" বলিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু ইতিহাস-সরস্বতীর এমনি পরিহাস যে অতীত কালের "খাঁটি" বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া যাঁহারা হা-হুতাশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা কিন্তু "ভেজাল" সাহিত্যেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে গ্রহণ করিয়াছিলেন সমাজ-শাসনের ও নীতি-শিক্ষার অন্যতম উপায়রূপে, তাই তাঁহার রচনা উপদেশগূঢ়। রবীন্দ্রনাথ কখনো সাহিত্যকে সে ভাবে দেখেন নাই। তাঁহার কাছে সাহিত্যের কাজ জীবনমননের ফসল ফলানো। এইজন্য সাহিত্য সেই সাধনা-সাপেক্ষ যে সাধনা কলম-পেষার অভ্যাস নয়, যে সাধনা কর্মের চিন্তার ও আনন্দের—এক কথায় সর্বাঙ্গীণ জীবনের—সাধনা। উনবিংশ শতাব্দী যখন শেষ দশকে আসিয়া ঠেকিয়াছে তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোন কোন আত্মীয় ও পরিচিত তরুণ লেখকদের ডাক দিলেন এই সাধনার ক্ষেত্রে, এবং নিজে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন পশ্চাৎপন্থীদের সঙ্গে শেষ লড়াইয়ে। প্রতিপক্ষের নেতা তখন চন্দ্রনাথ বসু এবং তাঁহার আশ্রয়ভূমি 'সাহিত্য'। তিনি 'সাধনা' পত্রিকা বাহির করিলেন। তাহার বৎসরাধিক কাল আগেই 'সাহিত্য' পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। (মনে হয়, 'সাহিত্য' পত্রিকা বাহির করিবার উদ্যোগে সুরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। যে কোন কারণে হোক সে সহযোগিতা ঘটে নাই, এবং অল্প কয়েকমাস মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' বাহির করিয়াছিলেন। সাহিত্য ও সাধনার যোগাযোগ না ঘটিয়া সংঘর্ষ লাগিয়াছিল অনতিবিলম্বে। সে কথা পরে বলিতেছি।) সাধনায় রবীন্দ্রনাথ একা সব্যসাচী। প্রতিপক্ষের সহিত তর্কে রবীন্দ্রনাথ কখনও শাস্ত্রের আড়ালে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করেন নাই। সাংস্কৃতিক আলোচনায় এ চেষ্টা নূতন। শাস্ত্রের হস্তাবলম্বন ছাড়িয়া বুদ্ধিনির্ভরতার পথে বাঙ্গালা সাহিত্যচিন্তার এই প্রথম পা বাড়ানো।[১]

বঙ্কিমোত্তর বাঙ্গালা সাহিত্যধারার গঙ্গাবতরণ রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'য় (১২৯৮-১৩০২ সাল)। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন তরুণ-অতরুণ মননশীল লেখক-অলেখক কয়েক ব্যক্তি সাধনায় উৎসাহ পাইলেন। এবং সে সাধনায় অল্প যে কয়েকজন সিদ্ধিলাভ করিলেন তাঁহাদের দ্বারা সাহিত্যচিন্তা কিছু নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইল।

'সাধনা'র সাধনা যে সর্বাঙ্গীণ সাধনা তাহার পরিচয় সহজে পাওয়া যায় প্রকাশিত রচনাবলীর বিষয়ে,—গানের স্বরলিপি হইতে সাংখ্যদর্শন পর্যন্ত এবং ব্রজবুলি হইতে পলিটিক্স্ অবধি। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্য রচনা-সম্ভার। রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' তাঁহার নবীনত্বের, নবভাবনার প্রথম অর্থাৎ সাহিত্যের উদ্যোগ পর্ব। নবীন প্রবীণ নির্বিশেষে সব লেখকের রচনারই সেখানে সমান মর্যাদা। কোথাও লেখকের স্বাক্ষর নাই, সম্পাদকও (শেষ বছরে ছাড়া) নামে মাত্র।

'সাধনা'র সাধনা রবীন্দ্রনাথের ঘরের সাধনা, বাহিরের সঙ্গে ঘরের সুগভীর যোগের

সাধনা, বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের বোধন-কাণ্ড ॥

৩ সূর্যোদয় সম্ভাবনা

বাঙ্গালীর অন্তরের অন্তঃপুরে আত্মশক্তি সঞ্চয়ের যে আয়োজন চলিতেছিল তাহাতে সমিধ্ যোগাইল রবীন্দ্রনাথের সাধনা। কিন্তু নব্য গোঁড়ামি তাহাতে কিছু বাধা দিতে লাগিল। সে বাধা যদি বা শিথিল হইল, কিন্তু তাহার পিছু পিছু দেখা দিল পোলিটিক্যাল আন্দোলনের উচ্ছ্বাস, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভঙ্গের বেদনা এবং সেই উচ্ছ্বাস ও বেদনা অবলম্বন করিয়া নূতনতর ধর্মকথায় ঝোঁক। পায়ে জোর পাইবার পূর্বেই যেন শিশুকে দৌড়ের পাল্লায় নামিতে হইল। অনেক দিক দিয়া বাঙ্গালীর চিন্তায় ও কর্মে, শিক্ষায় ও সংগঠনে শিথিলতা—কোন কোন বিষয়ে অবনতি—দেখা দিল। এহেন বিপর্যয়ের দিনে রবীন্দ্রনাথ যথাসাধ্য হাল ধরিয়া রহিলেন। কিছুদিনের জন্য তাঁহার উপযুক্ত সহযোগীও দুই একজন মিলিল। মনে হইল শিক্ষিত বাঙ্গালী বুঝি ধীরে ধীরে যেন ধাতস্থ হইবে। এমন সময় নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মানচিত্রে ফুটাইয়া তুলিলেন। অন্য দিকে ক্ষতিও হইতে লাগিল। পোলিটিক্যাল আন্দোলন একের পর এক পদক্ষেপে জাতীয় চরিত্রের সংগঠন-দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিল, শেষে নন্‌কোঅপারেশনে পৌঁছিল। রবীন্দ্রনাথ একা কত ঠেকাইবেন। দেশে শিক্ষার "প্রগতি" অর্থাৎ সংখ্যায় প্রসার হইতে লাগিল। কিন্তু দেশের লোকের চিত্তের প্রকৃত শিক্ষা, তাহার কর্মিষ্ঠতা, হ্রাস পাইয়া চলিল। এই কারণে বাঙ্গালীর কাছে বৃহৎ সংসারের আমন্ত্রণ দিন দিন সংকীর্ণ হইয়া আসিল ॥

টীকা

১ নবজীবন 'সূচনা' (শ্রাবণ ১২৯১)।

২ তর্কচূড়ামণির বক্তব্য তাঁহার 'ধর্মব্যাখ্যা' (পাঁচ ভাগ), 'সাধন প্রদীপ' ও 'বেদবিষয় ইংরাজী মতের প্রতিবাদ' প্রভৃতি পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

৩ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'ভাই হাততালি' (নবজীবন, মাঘ ১২৯১) নরম প্রতিবাদ। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'মিঠেকড়া' (১২৯৭ সাল) নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ। মনে হয় এই নিতান্ত তুচ্ছ রচনাটিকেই উপলক্ষ্য করিয়া 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' (মানসীতে সঙ্কলিত) কবিতাটি লেখা। 'মিঠেকড়া' পুস্তিকাকারে বাহির হইলে দেবেন্দ্রনাথ সেন ছদ্মনামে 'কবিরাহু' শীর্ষক সনেট লিখিয়া (সাহিত্য, আষাঢ় ১২৯৮) জবাব দিয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য 'রাহুর দ্বেষ' (যাত্রী, রবীন্দ্র-সংখ্যা ১৩৬৪ সাল)।

৪ লোকহিতার্থে প্রয়োজনীয় হইলে কৃষ্ণোক্তি স্মরণ করিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে দোষ নাই,—এই নীতি বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে সমর্থন করিয়াছিলেন।

৫ বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "আমার সৌভাগ্যক্রমে, আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। শ্লাঘাস্বরূপ মনে করি,—এবং ভরসা করি, ভবিষ্যতেও মনে করিতে পারিব যে, আমি তাঁহার সুহৃজ্জন মধ্যে গণ্য হই। চারি মাস হইল, প্রচারের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্রবাবু অনুগ্রহপূর্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন।"

বঙ্কিম-রবীন্দ্র বিরোধ প্রসঙ্গে 'পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২) পৃ ৮১-৮৭ দ্রষ্টব্য।

৬ "নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি একটু একটু বুঝিতেছেন যে, ধর্মে উপেক্ষা করিলে আমরা কোন তত্ত্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতিই হইবে না।...নিয়মিতরূপে সাময়িক পত্রে এই বিষয়ে চর্চা করিয়া, আমরা আপনারাও

বুঝিব, এবং সাধারণকে বুঝাইব, এ আশা আমাদের হৃদয়ে আছে।" 'সূচনা,' নবজীবন প্রথম সংখ্যা।

৭ প্রথম সংস্করণ কড়ি-ও-কোমলের অন্তর্ভুক্ত, পরে বর্জিত।

৮ রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্য ব্যঙ্গরচনাগুলি মুখ্যত চন্দ্রনাথবাবু ও তাঁহার সহকর্মীদের উদ্দেশ করিয়াই লেখা। সহকর্মীদের দলপতি (বাহ্যত) ছিলেন 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

৯ তুলনীয় 'কর্মের উমেদার' (সাধনা, মাঘ ১২৯৮)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিংশ শতাব্দী : নূতন দৃষ্টি ও নবীন চিন্তা

১ ঠাকুর-বাড়ির নাবালকদের সাহিত্যচর্চা

নিতান্ত তরুণ বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসেবায় নবাগতদের অভ্যর্থনা-শঙ্খ বাজাইতেছিলেন। তখনও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠাই দৃঢ় হয় নাই। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে 'বালক' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন ১২৯২ সালে। জ্ঞানদানন্দিনী সম্পাদিকা ছিলেন নামে মাত্র। কার্যাধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রধান লেখক এবং সর্বেসর্বা। এক বৎসর স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে চলিয়া বালক ভারতীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়। স্বাধীন বালকের শেষ সংখ্যার সর্বশেষে 'কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন'-এ এই কথা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ বিদায় লইয়াছিলেন

> কার্য্যাধ্যক্ষের অপটুতাবশতঃ কিছুকাল হইতে বালক প্রকাশে ও বিতরণে অনিয়ম ঘটিয়াছে এবং উত্তরোত্তর অনিয়ম ঘটিবার সম্ভাবনা, এইজন্য পাঠকদিগের নিকটে মার্জনা প্রার্থনা করিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিতেছেন। বালক-কার্য্যাধ্যক্ষ সাহিত্য-ব্যবসায়ী, যথেষ্ট অবকাশ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক—তিনি কর্মিষ্ঠতা ও কার্যনিপুণতার জন্যও বিখ্যাত নহেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার হাতে অন্যান্য কাজের ভার আছে, ভরসা করি এই সকল বিবেচনা করিয়া বালকের গ্রাহকেরা প্রসন্ন মনে তাঁহাদের কার্য্যাধ্যক্ষকে বিদায় দিবেন।

ঠাকুর-বাড়ীর কোন কোন ছেলেমেয়ের রচনা বালকে এবং এক বছর পরে বালক ভারতীর ক্রোড়ে প্রবেশ করিলে ভারতী-ও-বালকে বাহির হইত।[১] পরে সাধারণত পাই এই কয়জনের পক্বতর রচনা—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর॥

২ ঠাকুর-বাড়ির আত্মীয়বান্ধব : আশুতোষ চৌধুরী

জাহাজে উঠিয়া মাত্র একদিনের পরিচয়ে আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪)[২] রবীন্দ্রনাথের স্থায়ী অন্তরঙ্গতা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় এম. এ. পাস করিয়া তিনি

কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল পড়েন এবং ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর সে অন্তরঙ্গতা নিকট-আত্মীয়তায় পরিণত হয়, আশুতোষ রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রতিভাদেবীকে[৩] বিবাহ করেন (শ্রাবণ ১২৯৩ সাল)। সে বয়সে আশুতোষ দেশি-বিদেশি সাহিত্যের রসিক ছিলেন, "ফরাসী কাব্য-সাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল।"[৪] সাহিত্যরসিক লেখক হিসাবে আশুতোষের পরিচয় বিবাহের বৎসরের মধ্যেই অবরুদ্ধ বলিতে পারি কেননা এই বছরের ভারতী-ও-বালকেই তাঁহার বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলি বাহির হইয়াছিল।[৫] রবীন্দ্রনাথ তখন কড়ি-ও-কোমলের কবিতা লিখিতেছেন। তাঁহার কোন কোন কবিতায় আশুতোষের রসানুভূতির রঙ লাগিয়া থাকা বিচিত্র নয়। কড়ি-ও-কোমল বইটিতে কবিতাগুলি আশুতোষের সাজানো। সে কাজে তাঁহার কৃতিত্ব কবি নিজেই জীবনস্মৃতিতে স্বীকার করিয়াছেন। তখনকার নূতন সাহিত্যের পোষকতায় আশুতোষের আবির্ভাব ক্ষণিক, তবুও উজ্জ্বল এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মূল্যবান্। 'কাব্যজগৎ' প্রবন্ধগুলি শেলি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কীট্‌স্ পো বার্নস প্রভৃতি ইংরেজ কবির এবং ফরাসী কবি আঁদ্রে সেনিয়ের সম্বন্ধে আলোচনা। অন্যান্য ইংরেজ ও ফরাসী কবিরও প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং বিদেশি সাহিত্যের তৌলন বিচার আছে। আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের সাহিত্যরসবোধ সম্বন্ধে আশুতোষ খুব খাঁটি কথা বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

> আমাদিগের মেজাজ খানিকটা আমীরি। চেষ্টা করিয়া আমরা সৌন্দর্য খুঁজিয়া লইতে পারি না; চট্‌পট যাহা ভাল লাগে তাহা ছাড়া আমাদিগের আর কিছুই ভাল লাগে না। মজলিসে সুর না বাঁধিয়া আমরা কোনরূপ যন্ত্র শুনিতে প্রস্তুত নহি। বাঁধা রাগ-রাগিণী ভিন্ন নূতন কিছুরই অবতারণার চেষ্টা আমাদিগের সহ্য হয় না। কবির পথ ধরিয়া নীরবে শিষ্য যেমন গুরুকে অনুসরণ করে সেইরূপ আমরা নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া নূতন সত্য, নূতন সৌন্দর্য, নূতন ভাব কবির মুখের দিকে চাহিয়া শিখিতে দেখিতে ভাবিতে পারি না। প্রেমভক্তিময় ধর্ম যখন বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল তখন বাঙ্গালী কবি ছিল, কবিতা লিখিতে পড়িতে গাহিতে জানিত। আলস্য কিংবা হেলায় কবিতা বোঝা যায় না।
>
> সুপ্রভাতে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে কণ্বের শিষ্য যেমন সূর্য চন্দ্রের যুগপৎ উদয় অবসান দেখিয়া আত্ম-দশান্তরের কথা ভাবিয়াছিলেন পবিত্র আশ্রমপদে থাকিয়াও সহজভাবে সরল ঋষিকুমার যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, স্বতই সকলেরই মনে সেই কথা কয়টি উদয় হয়—কিন্তু তাহার জন্য সুপ্রভাত আবশ্যক, কুমুদ্বতীর সংস্মরণীয় শোভার সহিত আকাশের পাণ্ডুর কেমন মিশিয়াছে তাহা দেখা আবশ্যক। তেমনি Shelley এবং Wordsworth-এর Skylark দেখিতে হইলে তোমার বাহিরে আইসা আবশ্যক, তোমাকে অন্তঃপুর ছাড়িতে হইবে। তুমি ত তাহা চাহ না, তুমি চাহ যে স্বভাব তোমার জন্য কাগজের মলাটে বদ্ধ হইয়া দপ্তরি মুটের হাতে নাজেহাল হইয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তোমার সেবা করিবে।[৬]

দ্বিতীয় প্রবন্ধে লেখক দেশি (সংস্কৃত) ও বিদেশি (প্রধানত ইংরেজী ও ফরাসী) কাব্যের ভাব ও দৃষ্টির তৌলন বিচার করিয়াছেন। ইংরেজীর সঙ্গে প্রভেদ দেখাইবার জন্য আশুতোষ ফরাসী হইতে একটি পুরানো গ্রাম্য-গীতি ও দুইটি আধুনিক কবিতা (একটি গোতিয়েরের, অপরটি উগোর) অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। শেষোক্ত অনুবাদটি উদ্ধৃত করিতেছি।

আমি ত গোলাপ প্রজাপতি তুই—
আজ হোক কাল হোক, মাটিতে মিশাব দুই।
ওখানে উড়িস কেন আয় কাছে আয়,
থাকিব দুজনে মিলি যেথা প্রাণ চায়।
চল যেথা প্রাণ যায়,
উড়িবি মলয় বায়,—
হোক না যে কোন স্থান
পেতে দিব মম প্রাণ।
হৃদয়ের শ্বাস,
বর্ণের বিকাশ,
প্রজাপতি হোক্
গোলাপ কোরক,
পাখা গুটাইয়া হৃদয় মেলিয়া দুজনে মিলিব দুই।
থাকিব মিলিয়া
হৃদয় ঢালিয়া—
আকাশের গায়,
ধূলার শয্যায়—
যথা হোক তথা,
সে পরের কথা,
প্রাণীর প্রধান ধর্ম, প্রাণীর প্রথম কর্ম, প্রাণের মিলন।

প্রবন্ধগুলিতে আশুতোষ যে উদ্যম দেখাইলেন তাহা এই উপক্রমণিকাতেই শেষ হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের ঠাট্টায়, তিনি অচিরে লয়ের (Law-এর) মধ্যে লীন হইয়া গেলেন॥

৩ রবীন্দ্রের আত্মসমর্থন

রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহসভার দ্বারদেশে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিকে মাল্যদান করিলেন। কিন্তু সে সংবর্ধনায় তাঁহার সহযোগীরা মনে মনে সায় দিতে পারেন নাই। তাঁহারা রবীন্দ্র-কাব্যকে ভদ্র ভাষায় হেঁয়ালি বা ধোঁয়াটে অথবা অভদ্র ভাষায় ন্যাকামি না বলিয়া "কাব্যি" বলিয়া নাক সিঁটকাইতে লাগিলেন। ইহার জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন 'কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট'।[১] বাঙ্গালায় নবীন কবিতার এই প্রথম আত্মসমর্থন। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন

> কাব্যে অনেক সময়ে দেখা যায় ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করিতে পারে না কেবল লক্ষ্য করিয়া *নির্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সে স্থলে সেই অনতিব্যক্ত ভাষাই একমাত্র ভাষা।* এইপ্রকার ভাষাকে কেহ বলেন "ধুঁয়া", কেহ বলেন ছায়া, কেহ বলেন ভাঙ্গাভাঙ্গা, এবং কিছুদিন হইল নবজীবনের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় কিঞ্চিৎ হাস্যরসাবতারণার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে "কাব্যি" নাম দিয়াছেন। ইহাতে কবি এবং নবজীবনের সম্পাদক কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। উভয়েরই অদৃষ্টের দোষ বলিতে হইবে।...
>
> প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, সম্পাদক এবং সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার যো

নাই। চিত্রেও যেমন কাব্যেও তেমনি, দূর অস্পষ্ট নিকট স্পষ্ট, বেগ অস্পষ্ট অচলতা স্পষ্ট, মিশ্রণ অস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। আগাগোড়া সমস্তই স্পষ্ট সমস্তই পরিষ্কার সে কেবল ব্যাকরণের নিয়মের মধ্যে থাকিতে পারে কিন্তু প্রকৃতিতেও নাই, কাব্যেও নাই।...

যাঁহারা মনোবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যেমন জগৎ আছে তেমনি অতিজগৎ আছে। সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে বিরাজ করিতেছে। মানব এই জগৎ এবং জগদতীত রাজ্যে বাস করে তাই তাহার সকল কথা জগতের সঙ্গে মেলে না। এইজন্য মানবের মুখ হইতে এমন অনেক কথা বাহির হয় যাহা আলোকে অন্ধকারে মিশ্রিত, যাহা বুঝা যায় না অথচ বুঝা যায়। যাহাকে ছায়ার মত অনুভব করি অথচ প্রত্যক্ষের অধিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই সর্বত্রব্যাপী অসীম অতিজগতের রহস্য-কাব্য যখন কোন কবি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, তখন তাঁহার ভাষা সহজে রহস্যময় হইয়া উঠে।

৪ 'হিতবাদী'র প্রকাশ

চিন্তাশীলতা ও মনীষার সমবায়ে দেশে মানসে ও কর্মে উন্নতির প্রচেষ্টারূপে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রভৃতি বন্ধুবর্গ মিলিয়া 'হিতবাদী' কাগজ বাহির করিয়াছিলেন (১২৯৮ সাল)। সমসাময়িক সাক্ষ্যে বলে

> অনেক লোক মিলিয়া একটা খবরের কাগজ বাহির করা হয়ত এই দেশে এই প্রথম হইল। কেবলমাত্র অনেক লোক নহে ; অনেক ভাল লোকে এই কাগজের স্বত্বের অংশীদার, উদ্যোগী, পোষক ও লেখক।

এই ভালো লোকদের একজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার উপর ছিল সাহিত্য-বিভাগের ভার। তিনি প্রত্যেক সংখ্যায়—যে কয় সপ্তাহ তিনি এই ভার বহন করিয়াছিলেন—একটি দুইটি করিয়া ছোটগল্প লিখিতেন।[৮] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয়তম ঘটনা। হিতবাদীতে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছায় নাই, এবং অসাধারণ পাঠকের কাছেও পাঠযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।[৯] তাই কর্তৃপক্ষ চাহিলেন গল্পকে হাল্কা ও কাহিনীসর্বস্ব করিতে। অতএব রবীন্দ্রনাথ হিতবাদী ছাড়িলেন। অনতিবিলম্বে সমবায়ও ভাঙ্গিয়া গেল। নূতন পরিচালকদের হাতে হিতবাদী নূতন পথে পরিচালিত হইল॥

৫ "সাহিত্য" পত্রিকা ও "সাধনা" পত্রিকা

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১২৯৭ সালে 'সাহিত্য' বাহির করিয়াছিলেন ক্ষুদ্র আকারে। ১২৯৮ সাল হইতে তাহা বৃহত্তর আকারে ও জাঁকালো ভাবে বাহির হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই যে 'সাহিত্যে'র আকৃতি প্রকৃতির শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এমন সন্দেহ মনে আসে। আরও মনে হয় যেন সে যোগাযোগ অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় (—রবীন্দ্রনাথ জমিদারির কাজে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে ?—) রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্রভাবে ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সাধনা বাহির করিয়াছিলেন।[১০] পত্রিকা দুইটির নাম যোগ করিলে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও রবীন্দ্রনাথের ভাবগত যোগাযোগের সন্ধান মিলিতে পারে। তবে সাধনা বাহির করা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সহিত 'সাহিত্যে'র সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই, তবে সে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল না।

সাধনা চার বছর চলিয়াছিল। শেষ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। শেষ সংখ্যায় (ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক যুক্ত) এই মর্মে বিজ্ঞাপন ছিল যে অতঃপর সাধনা ত্রৈমাসিক রূপে প্রকাশিত হইবে। সম্ভবত বৈষয়িক ও পারিবারিক কারণে এ কল্পনা কার্যে পরিণত হয় নাই॥

৬ লোকেন্দ্রনাথ পালিত

সাহিত্যের যে নূতনতর আদর্শের অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের সাধনা শুরু হইল তাহা লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে ব্যক্ত আছে। অনেককাল পরে প্রমথনাথ চৌধুরীকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যেমন 'সবুজ পত্র' বাহির করিয়াছিলেন তেমনি সাধনার অধিবাস হইয়াছিল লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে দিয়া। তবে আশুতোষের মতো লোকেন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের ফাঁদে ধরা দেন নাই। লোকেন্দ্রনাথ ইংরেজীতে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার একটি ইংরেজী কবিতা রবীন্দ্রনাথ "অনুবাদ" করিয়াছিলেন।[১১] লোকেন্দ্রনাথের দুই-একটি বাঙ্গালা কবিতাও মাসিকপত্রে বাহির হইয়াছিল।[১২] রবীন্দ্রনাথ ও লোকেন্দ্রনাথের মধ্যে যে সাহিত্যিক পত্রালাপ সাধনায় ছাপা হইয়াছিল তাহা কথ্যভাষায় লেখা। কথ্যভাষা ব্যবহারের ইঙ্গিত যে লোকেন্দ্রনাথের তরফ হইতেই আসিয়াছিল তাহা প্রথম পত্রেই (রবীন্দ্রনাথের 'আলোচনা'[১৩]) বোঝা যায়।

> লেখা সম্বন্ধে তুমি যে প্রস্তাব করেছ সে অতি উত্তম। মাসিকপত্রে লেখা অপেক্ষা বন্ধুকে পত্র লেখা অনেক সহজ। কারণ, আমাদের অধিকাংশ ভাবই বুনো হরিণের মত, অপরিচিত লোক দেখলেই দৌড় দেয়। আবার পোষা ভাব এবং পোষা হরিণের মধ্যে স্বাভাবিক বন্যশ্রী পাওয়া যায় না।

সাহিত্যচিন্তায় নূতন পথের ইঙ্গিত দিলেন রবীন্দ্রনাথ এই পত্রেই।

> কোন একটা বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে তার আগাগোড়া তর্ক নাই হল। তার মীমাংসাই বা নাই হল। কেবল দুজনের মনের আঘাত প্রতিঘাতে চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে বিবিধ ঢেউ তোলা—যাতে করে তাদের উপর নানা বর্ণের আলোছায়া খেল্‌তে পারে—এই হলেই বেশ হয়। সাহিত্যে এ রকম সুযোগ সর্বদা ঘটে না—সকলেই সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ মত প্রকাশ করতেই ব্যস্ত—এইজন্যে অধিকাংশ মাসিকপত্র মৃত মতের মিউজিয়াম্ বল্লেই হয়।

সাহিত্যের মূল ভাব বলিয়া রবীন্দ্রনাথ যাহা মনে করেন তাহাও এই পত্রপ্রবন্ধে ব্যক্ত কবিলেন।

> ...সত্যকে মানবের জীবনাংশের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিলে সেটা লাগে ভাল।...তা ছাড়া সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করা যাক্ যাতে লোকে অবিলম্বে জান্‌তে পারে যে, সেটা আমারই বিশেষ মন থেকে বিশেষভাবে দেখা দিচ্ছে। আমার ভাল লাগা মন্দ লাগা, আমার সন্দেহ এবং বিশ্বাস, আমার অতীত এবং বর্তমান তার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাক্, তা হলেই সত্যকে জড়পিণ্ডের মত দেখাবে না।
>
> আমার বোধ হয় সাহিত্যের মূল ভাবটাই তাই।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে লেখকের দিক হইতে ব্যাখ্যা করিতেছেন ভাবিয়া লোকেন্দ্রনাথ পাঠকের দিক হইতে প্রতিবাদ করিলেন পত্রোত্তরে ('সাহিত্যের সত্য'[১৪])

আমি বলি সাহিত্য পাঠকের আত্ম-উপলব্ধির একটা উপায়—লেখকের আত্মপ্রকাশ তাতে থাক্ বা নাই থাক্। ...সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিকাব্যে আমাদের নিজের নিজত্ব জেগে ওঠে—আমরা নিজের হৃদয়ের কথা শুনি, আর সেইজন্যেই ভাল লাগে। ...যেমন আত্মপ্রকাশ কবিতা গড়বার একটা প্রণালী মাত্র, সত্য সেইরকম সাহিত্য গড়বার উপাদান মাত্র। ...সত্যকে প্রকাশ করা সাহিত্যের কাজের মধ্যে নয় ; মিথ্যার দ্বারা যদি সাহিত্য তার কাজ ভাল করতে পারত তাহলে মিথ্যাকে উপাদান করতে অথবা মিথ্যা প্রকাশ করতে সাহিত্যের কোন আপত্তি থাকবার কথা নেই।

লোকেন্দ্রনাথ সত্যকে ধরিলেন ভাবুকের দৃষ্টিতে। তিনি লিখিলেন

বিজ্ঞানে আর সাহিত্যে প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা, আর সাহিত্যের উদ্দেশ্য হৃদয়ের আবেগ উদ্রেক করা।

মাসিকপত্রের আদর্শ কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে লোকেন্দ্রনাথ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন

আমাদের ম্যাগাজিনে সাহিত্য ভাবটা বেশি ফুটিয়ে তোলা দরকার, কেননা প্রথমতঃ আমাদের বলবার কথা কম আর দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে সাহিত্যচ্ছলে বিজ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক, যেমন ছেলেদের মিষ্টান্নের ভিতর ওষুধ পূরে খাওয়ান।

পত্রোত্তরে ('সাহিত্য'[১৫]) রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া বলিলেন

সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হচ্চে মানবজীবনের সম্পর্ক।

তাহার উত্তরে ('সাহিত্যের উপাদান'[১৬]) লোকেন্দ্রনাথ স্বীকার করিলেন যে রবীন্দ্রনাথ যাহাকে সাহিত্যের সত্য বলিতেছেন তাহা স্বতন্ত্র জিনিস, বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গে তাহা এক নয়। লেখকের আত্মপ্রকাশ-যে সাহিত্যের উপাদান তাহা লোকেন্দ্রনাথ একরকম মানিয়া লইলেন, তবে তাহা-যে প্রধান উপকরণ তাহা স্বীকার করিলেন না।

মানুষে যাই করুক না কেন তাতে তার নিজত্ব একটু থাকবেই। কিন্তু আর্টের মধ্যে সেইটেকেই যে সর্বময় প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক তা আমি মান্‌তে পারিনে।

জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন 'সাহিত্যের প্রাণ'[১৭]। তিনি বলিলেন

কিন্তু যতই আলোচনা করচি ততই অধিক অনুভব করচি যে, সমগ্র মানবের প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ।

বিতর্ক প্রায় এইখানেই থামিয়া গেল, যদিও আরও দুইটি পত্র বাহির হইয়াছিল,—লোকেন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ'[১৮] ও রবীন্দ্রনাথের 'মানব প্রকাশ'[১৯]।

লোকেন্দ্রনাথের আর একটি পত্রপ্রবন্ধ, 'বৈজ্ঞানিক প্রণালী', ১২৯৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা ভারতীতে ছাপা হইয়াছিল। প্রবন্ধটি 'সাহিত্যের সত্য'-এর ব্যাখ্যার মতো। লোকেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিরই সমর্থন করিয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালীর নয়। এইখানে দুই বন্ধুর মতের মিল হইল।

আমি কিন্তু বিজ্ঞানের এই বিশ্বজয়ী মূর্তি ধরা সম্বন্ধে আপত্তি দাখিল করতে চাই। বিজ্ঞানের সঙ্গে যুদ্ধ করবার মতন আমার সামর্থ্য নেই, কিন্তু বিজ্ঞান যে দু হাত বাড়িয়ে আমার যা কিছু সব কেড়ে নেবার চেষ্টায় আছে, তা আমি তাকে বিনা আপত্তিতে করতে দিতে পারিনে। তাই আমি বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সর্বোৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে সাহস করছি।

১২৯৯ সালের সাধনায় লোকেন্দ্রনাথের দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। ইহার ভাবা

পত্রপ্রবন্ধগুলির মতো একেবারে কথ্যছাঁদের নয়, কথ্যরীতি-আশ্রিত সাধুভাষা। প্রথম প্রবন্ধটিতে[২০] চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়তত্ত্ব' সম্বন্ধে আপত্তি আছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ[২১] সেকালের স্কুলের শিক্ষা-প্রণালীর সুচিন্তিত সমালোচনা। লেখক বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া সমর্থন করিয়াছেন এবং পরীক্ষার জন্য টেক্‌স্‌ট্‌-বুক ব্যবহার না করার প্রস্তাব করিয়াছেন।

> ভাষা শিখাইবার জন্য টেক্‌স্‌ট-বুক কেন ? আর শিখাইবার জন্য হইলেও পরীক্ষার জন্য কেন ? টেক্‌স্‌ট-বুকের পরীক্ষা করিলে ভাষাশিক্ষার দিকে মনোযোগ না হইয়া সেই টেক্‌স্‌ট্‌-বুকখানি মুখস্থ করিবার দিকে মনোযোগ হয়। ভাষাশিক্ষা না হইয়া খালি প্রতিশব্দ ও "নোট্‌" মুখস্থ হয়।

(কয়েক বছর পরে যে ইউনিভার্সিটি আইন বিধিবদ্ধ হইল তাহাতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী ও মাতৃভাষার বেলায় টেক্‌স্‌ট্‌ বুক রহিল না।)

লোকেন্দ্রনাথের বাঙ্গালা কবিতা-রচনার নিদর্শনরূপে তাঁহার অনূদিত (আংশিকভাবে) ওমর খয়্যামের 'রুবাইয়াৎ'-এর দুইটি স্তবক উদ্ধৃত করিলাম।[২২]

জীবনের প্রতিদিন কত শত শঙ্কা,
তার কাছে কোথা লাগে মরণের ডঙ্কা।
ঈশ্বর যে কটি দিন দিয়েছেন কর্জ
সহাস্যে শুধিব যবে পূর্ণ হবে সংখ্যা।

মূঢ় তোরা, ত্যজি' সুখ স্বর্গসুখ-আশে
থাকিস্‌ মুক্তির তরে অন্ধ-কারাবাসে।
সুদ পাবি বলে ফেলে রাখিস্‌ পাওনা,
ছাড়ি না নগদ আমি যাহা হাতে আসে।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় লোকেন্দ্রনাথের চিন্তার প্রভাব পঞ্চভূতের মধ্যে ধরা আছে, ক্ষণিকাতেও আছে। পঞ্চভূতের প্রধান ভূত ব্যোম লোকেন্দ্রনাথেরই প্রতিচ্ছায়া॥[২৩]

৭ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের হাতে-কলমে সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন তাঁহার চতুর্থ ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯)। 'বালক'-এ ইঁহার সসঙ্কোচ আবির্ভাব, 'ভারতী'তে ইঁহার সাধনা এবং 'সাধনা'য় ইঁহার সিদ্ধিনির্দেশ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে দ্বিজেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী পুরুষে বলেন্দ্রনাথ ছিলেন সবচেয়ে শক্তিসম্ভাবিত লেখক, কিন্তু তাঁহার শক্তিসম্ভাব্যতা পূর্ণপ্রস্ফুটনের আগেই মৃত্যু হওয়ায় উহ্য রহিয়া গিয়াছে। বালকের লেখক ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে স্নেহভাগী ও আস্থাভাজন ছিলেন বোধকরি বলেন্দ্রনাথ। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের রচনা ভালো করিয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের কাছে বলা বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্য অনেক লেখাতেই বলেন্দ্রনাথের ছায়া প্রতিভাত অথবা ব্যঞ্জিত। রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যারাও তাঁহার রচনায় এতখানি ছায়া ফেলিতে পারে নাই। খুল্লতাতের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রের খানিকটা সহধর্মিতাও

ছিল। বাল্যে ও কৈশোরে বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মতোই মুখচোরা গৃহকোণবাসী ও পাঠ্যভীরু ছিলেন। হয়ত একটু বেশিমাত্রায় লাজুক। তবে বলেন্দ্রনাথ ভৃত্যশাসিত কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন না, মাতৃলালিত একমাত্র সন্তান।

প্রথম যখন কাব্য পড়িতে আরম্ভ করি, আমার বয়স খুব বেশি নয়, একটি ছোট আল্‌মারী ছিল, দুইচারখানি বই, একলাটি এক ঘরে বসিয়া পড়িতাম, স্পষ্ট মনে নাই—চোখের সম্মুখে আবছায়ার মত তখনকার কতকগুলি চিত্র উদয় হয়।

বাঙ্গালীর ঘরের লাজুক ছেলে—স্বভাবতই একটু চুপচাপ, অপরিচিত মুখ দেখিলে দূর হইতে দৌড়িয়া পালাই, না হয় নতনেত্রে তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া যাই; কেহ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেমন যেন জড়সড় হইয়া পড়ি, উত্তর দিতে বিলম্ব হয়, মুখ লাল হইয়া উঠে। বিশেষতঃ পড়াশুনা সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে নাড়ী প্রায় ছাড়িয়া আসে।...

ঘরের বাহির বড় একটা হইতাম না—পথের ধারেই ঘর, খুব যে নিরিবিলি, তাহা নয়—তবুও চুপিচুপি একলাটি ঘরে বসিয়া অনেকটা বিজনতা অনুভব করিতাম। একটি মাত্র দ্বার খোলা রহিত, আর সব বন্ধ। সেই প্রায়-বন্ধ ঘরে বহু দিনের একটি জীর্ণ কেদারা হেলান দিয়া আমার প্রথম বয়সের যত সুখ দুঃখ কল্পনা কবিতা।

বাহিরে ফাঁকা আকাশ। মেঘের উপর মেঘ, রঙের উপর রঙ, বিচিত্র স্তরবিন্যস্ত। এক মেঘরাজ্যে আমার মন বিচরণ করিত। এবং মনের মধ্যে ইহারই একটি ছায়াচিত্র লইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতাম। কি ভাবিতাম কে জানে।[২৪]

একদিন গ্রীষ্মাবকাশে বালক বলেন্দ্রনাথ বিদেশি কবিতা পড়িয়া মনের মধ্যে খানিকটা আবেগ অনুভব করিয়াছিলেন। বোধকরি সাহিত্যবোধে তাঁহার এই প্রথম সত্যদীক্ষা। আগে হইতেই পারিবারিক রুচিবোধ ও শুচিপরিবেশ তাঁহার হৃদয়ে কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে। বিদেশি কবির বাণী বেসুরো বাজিল না বটে, তবে চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিল।

বিপ্লবের কবি বর্তমান দুঃখ দৈন্য অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া বর্তমান ভাঙ্গিয়া নূতন গঠন করিতে চাহেন, দুর্বল বাঙ্গালীহৃদয় তাঁহার সহিত সমবেদনা অনুভব করে এবং নিজের অক্ষম দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়া সেই বিপ্লবের বেদনাটুকু গোপনে হৃদয়ে পোষণ করে মাত্র।

কেবলি কল্পনার সুখ—তখনও চিন্তা করিবার বয়স হয় নাই। নূতন ভাব সহজেই হৃদয়ে স্থান পায়, নূতন স্বাধীনতায় অবিশ্বাস জন্মে না। অথচ অতীতের বহুদিনের বিস্মৃত শৈবাল-কুটীরে প্রাচীন বেদগান ও হোমধূমের মধ্যে নিরালায় বাস করিবার মনে মনে একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা।[২৪]

বলেন্দ্রনাথ গদ্য ও পদ্য দুইই রচনা করিয়াছিলেন। তবে পদ্যের সংখ্যা গদ্যের তুলনায় অনেক কম এবং তা বৈচিত্র্যহীন। বলেন্দ্রনাথের কবিতা গুণহীন নয়, কিন্তু তাঁহার লেখনীর গুণপনার স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ গদ্যপ্রবন্ধেই। এই কাজে তিনি রবীন্দ্রনাথের সুমহৎ হস্তাবলম্ব পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে বলেন্দ্রনাথ 'প্রদীপ' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি আরম্ভও করিয়াছিলেন, সমাপ্ত করিবার সময় আর পান নাই। এই অসমাপ্ত রচনাটি দেখিয়া শুধরাইয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ ছাপাইয়াছিলেন।[২৫] এই সঙ্গে সদ্যঃপরলোকগত ভ্রাতুষ্পুত্র-শিষ্যের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-কয়টি কথা লিখিয়াছিলেন তাহাতে দুইজনের ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত এবং বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের পরিচয় আছে।

> বলেন্দ্রনাথ কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহার বিষয়-প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন। প্রদীপের জন্য যে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার বিষয়টি আমার অগোচর ছিল না।...তাঁহার অসমাপ্ত লেখা ও সূচনাগুলির সাহায্য লইয়া যথাসম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় প্রবন্ধটি সংক্ষেপে সম্পূর্ণ করিয়া সেই সত্যসঙ্কল্প মহদাশয়কে 'প্রদীপ' সম্পাদকের নিকট হইতে ঋণমুক্ত করিলাম।

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিষয় বিচিত্র, বিজ্ঞান ছাড়া প্রায় সবই। তবে বেশির ভাগই চিত্র-কাব্য ও জীবন-ভাবনা। বাঙ্গালা ভাষায় আর্ট ক্রিটিসিজ্‌ম্ বলেন্দ্রনাথই রীতিমত শুরু করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের যেমন পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যেরও তেমনি কবিচিত্রশালিকা তাঁহার অধিকাংশ বিশিষ্ট প্রবন্ধের প্রসঙ্গ যোগাইছিল। ইংরেজী সাহিত্যের চরিত্র লইয়া একটিমাত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, 'রমলা'।[২৬] বলেন্দ্রনাথের ইস্কুলের শিক্ষা বেশির ভাগ হইয়াছিল সংস্কৃত কলেজে। তাই সংস্কৃত কাব্য তাঁহার বিশ্লেষণী দৃষ্টিকে প্রথম হইতেই টানিয়াছিল। বাড়িতে তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের নবীন আসর জাঁকিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের চিত্র-চরিত্র বিশ্লেষণের শুরুও তখন হইতে। তবে বলেন্দ্রনাথের স্বভাবগত টান ছিল পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যের দিকে। সেইজন্য তাঁহার সাহিত্য-প্রবন্ধাবলীর প্রথম রচনা 'কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী'[২৭] ছাড়া আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া আর কোন আলোচনা নাই।

বলেন্দ্রনাথ রূপের মুগ্ধ ভাবুক মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রধানত চিত্রচিন্তক। অনাবৃত স্পষ্ট স্পর্শগ্রাহ্য সৌন্দর্যবোধ স্বভাবতই তাঁহার সাহিত্য ও শিল্প-চিন্তাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছিল। এই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবিশ্লেষণে বলেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট প্রবন্ধাবলীর অসাধারণত্ব। 'রাধা' প্রবন্ধটি[২৮] এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে অঙ্কিত নারী-চরিত্রাবলীর মধ্যে সৌন্দর্যে গুণে গরিমায় প্রেমের গভীরতায় চরিত্রবিকাশে কোন দিক দিয়াই রাধাকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। অথচ সীতা-সাবিত্রীকে পিছনে ফেলিয়া রাধাই সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কেন তাহা বিচার করিয়া বলেন্দ্রনাথ বলিতেছেন

> রাধার দেহে যখন প্রথম যৌবন বিকাশ হইল, বৈষ্ণব কবি সে বয়ঃ-সন্ধির রূপমাধুরী একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। তাহার পর যখনই অবসর পাইয়াছেন, যৌবনসন্নদ্ধ অঙ্গসৌন্দর্য দেখিয়া লইতে তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই। রাধার প্রত্যেক অপাঙ্গদৃষ্টি, লঘু হাস্য, হৃদয়-বিকাশ তাঁহাদের নখদর্পণে। রাধার সহিত তাঁহাদের যখন তখন সাক্ষাৎ—স্নান সময়ে, বনপথে, নিভৃতে কুঞ্জমাঝে, গৃহে সখীসমাগমে। এবং যখন যে ভাবে দেখিয়াছেন, সেই ভাবেই তাঁহারা সুন্দরী রাধিকার চিত্র আঁকিয়াছেন। কখনও কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই।
>
> সেই জন্য বৈষ্ণব কবিদিগের চিত্র হইতে আমরা রাধার রূপ সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি।

বলেন্দ্রনাথের [illegible]চনায় কঠিন চিন্তার সঙ্গে প্রশান্ত ভাবুকতার সমন্বয় দেখা যায়। দেশের প্রতি অনুরাগ সুব্যক্ত, দেশের মূঢ়তার প্রতি বিরাগও গুপ্ত নয়। ভারতবর্ষের [illegible]র প্রতি বলেন্দ্রনাথের বিশেষ ঝোঁক ছিল। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হইতে তিনি আর্যসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলন ঘটাইতে উৎসুক হইয়াছিলেন। সাহিত্যে যেমন পলিটিক্সেও তেমনি খুল্লতাতের যোগ্য আত্মীয়, পরিপূরকও বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের অপর সাহিত্য-শিষ্য প্রায় সকলেই যথামতি এবং যথাসাধ্য গুরুর অনুকরণ করিতেন অথবা অনুসরণ করিতে প্রয়াসী ছিলেন। বলেন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই। তিনি গুরুর নির্দেশে
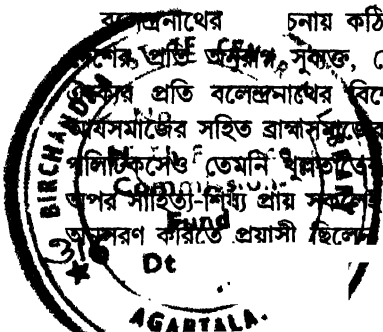
নিজে সাধনা করিয়াছিলেন। সে সাধনায় তাঁহার আপন দৃষ্টি—যুক্তিনিষ্ঠার দৃষ্টি—খুলিয়া গিয়াছিল। প্রবন্ধরচনায় রবীন্দ্রনাথ যুক্তিনিষ্ঠার বেষ্টনীমধ্যে নিজের ভাবনাকে আঁটিয়া রাখিতে পারিতেন না, কেননা তাঁহার ধাতই ছিল বাঁধনছাড়ার। সে ধাতে রুটিনমাফিক কাজ চলে না। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে যুক্তি অবশ্যই আছে, কিন্তু সে যুক্তি হৃদয়ের যুক্তি, জীবনের যুক্তি, বৃহৎ সত্যের যুক্তি—মস্তিষ্কের যুক্তি, মানদণ্ডের যুক্তি, বইয়ের পাতার যুক্তি নয়। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধরীতিতে মস্তিষ্কের যুক্তি আছে, আর সেই সঙ্গে আছে বিশ্বাসের দৃঢ়তা—যাহা তাঁহার গুরুদত্ত ধন॥

বলেন্দ্রনাথের তিনখানি মাত্র পুস্তিকা বাহির হইয়াছিল, 'চিত্র ও কাব্য' (১৩০১ সাল), 'মাধবিকা' (১৩০৩ সাল) ও 'শ্রাবণী' (১৩০৪ সাল)।[২৯] চিত্র-ও-কাব্য প্রবন্ধের বই, সাধনায় প্রকাশিত আটটি প্রবন্ধের সঙ্কলন, রবীন্দ্রনাথকে উপহৃত। ইহার মধ্যে পাঁচটি সাক্ষাৎভাবে সংস্কৃত সাহিত্যঘটিত। দুইটি প্রবন্ধ চিত্রসম্পর্কিত, একটি সাহিত্যবিষয়ক। বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা বুঝিবার পক্ষে চিত্র-ও-কাব্যে সঙ্কলিত 'জয়দেব' প্রবন্ধটি[৩০] বিশেষ সহায়তা করে। ইতিপূর্বে প্রমথনাথ চৌধুরী[৩১] এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ভাব-ভাষা-বস্তু-ছন্দ-শ্লীলতা সব দিক দিয়াই জয়দেবের প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা অস্বীকার করিয়া শুধু রাধা-কৃষ্ণলীলা-কাহিনী বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ মূল্য স্বীকার করিয়াছিলেন। বলেন্দ্রনাথও জয়দেবকে বড় কবি বলেন নাই, তাঁহার রচনার দোষ সবই বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে গীতগোবিন্দের যথার্থ গীতিমূল্যটুকু স্বীকার করিয়াছেন এবং চিত্রমূল্যও অস্বীকার করেন নাই। চৌধুরী মহাশয় জয়দেবের পদাবলীকে সংস্কৃত কবিতা ধরিয়া কালিদাসের রচনার সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। মর্মজ্ঞ ও রসজ্ঞ বলেন্দ্রনাথ সে ভুল করেন নাই। তিনি সেগুলিকে আদিরসাত্মক বলিয়াই সরাসরি বাতিল করেন নাই পরন্তু বিচার করিয়াছেন বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর সঙ্গে। এইখানেই বলেন্দ্রনাথের উচ্চতর বিশ্লেষণী ও সৃজনী দৃষ্টির পরিচয়।

> …গীতগোবিন্দ প্রকৃতই গীত। তাহা সুরসংযোগে গেয়। একদিন তাহা রাজসভায় গীত হইয়াছিল। সে রাগিণী অদ্য আমাদের নিকট মৌন—সুতরাং আমাদের নিকট গীতগোবিন্দ অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতেছে।
>
> …জয়দেব যে, হরিস্মরণ ও বিলাসকলা, উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্বল মানবহৃদয় এরূপ সঙ্কটস্থলে হরিস্মরণ অপেক্ষা বিলাসকলার দিকেই সাধারণতঃ কিছু আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এবং গীতগোবিন্দের কবিও এই মানবস্বভাবসুলভ দুর্বলতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়া আশঙ্কা হয়।
>
> তিনি রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে সেই যে কুঞ্জপ্রবেশ করিয়াছেন, তদবধি এই বিলাসকলাই রচনা করিতেছেন। এবং তাঁহার কাব্যে আদিরসের সমস্ত বাহ্য উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছে, কেবল কবির যে আত্মবিস্মৃতিটুকু থাকিলে এই সমস্ত বিলাসকলাও সরল ভাবে নিষ্কলঙ্ক হইয়া উঠিত, তাহাই নাই।
>
> …সম্ভোগবর্ণনা তাঁহার হৃদয় হইতে সহজ আবেগভরে বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই, বিলাস উদ্রেক মানসে ইঙ্গিতে ইসাবায় নানা ছলে তিনি সমস্ত বর্ণনার মধ্যে অনেকখানি গরল সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। এই নাগরিকতা, এই ঠারই সর্বাপেক্ষা জঘন্য।

'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী' কবিতা-পুস্তিকা। কবিতাগুলি অ-পূর্বপ্রকাশিত, প্রায় সবই

চতুর্দশপদী। প্রেয়সী নারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবিহৃদয়ের স্তবগান মধুলুব্ধ ভ্রমরগুঞ্জনের মতো মৃদুমর্মরিত হইয়াছে এই কবিতাগুলিতে। বলেন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় গদ্যলেখক হিসাবে। তবে তাঁহার স্পর্শবেদক অনুভূতিশীল কবিমনের ছাপ গদ্যরচনায় ততটা ব্যক্ত নয় যতটা ব্যক্ত এই প্রায়-ব্যক্তিগত কবিতাগুলিতে। কড়ি-ও-কোমলের কয়েকটি চতুর্দশপদী ছাড়া এ বস্তু ইতিপূর্বে বাঙ্গালায় অপ্রাপ্ত। বলেন্দ্রনাথ লেখা-চিত্রকর, রঙের ও প্রতিফলনের সন্ধানী তিনি। নির্বিশেষ মানবীর আকর্ষণ তাঁহার নাই। অন্তঃপুর-অন্তরঙ্গিণী প্রেয়সীই কবিকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

মাধবিকায় বসন্তের কবিতা, শ্রাবণীতে বর্ষার। এই দুই ঋতু ভারতীয় সাহিত্যে যথাক্রমে নারীসৌন্দর্যের ও নারীপ্রেমের প্রতীকের মতো। বসন্তের সৌন্দর্যোচ্ছ্বাস অপরিমিত অথচ ক্ষণিকতার আশঙ্কা-বিজড়িত, সুতরাং আবেগনিরুদ্ধ।

জেনেছিলে মনে
প্রলয় লুকান' যদি ওই আঁখিকোণে,
ফুৎকারে জাগালে কেন তাহা ? মর্ম দহি'
তুষানলে পলে পলে রহি' রহি' রহি'। [৩২]

মাধবিকার শেষ কবিতাটিতে যেন কবিজীবনেরই অকাল-অবসানের ইঙ্গিত।

হে মোর সঙ্গীত তোর পতঙ্গের প্রাণ
এক বসন্তেই শুধু হ'ল অবসান।
একবেলা নৃত্য শুধু একবেলা গান,
ছড়ায়ে রঙীন্ পাখা কুসুমে শয়ান।
একটুকু স্বর্ণরেণু, পুষ্পপরিমল,
একটুকু রবিকর, শিশিরের জল,
কিছুক্ষণ খেলাধূলা, মুগ্ধ অভিনয়,
তার পরে দিনশেষ—আর বেশি নয়। [৩৩]

শ্রাবণীতে কবির মনের একটু রঙ বদল হইয়াছে। প্রেয়সীকে কবি আপন সত্তার অন্তরে ও বাহিরে উভয়ত্রই আবাহন করিয়াছেন। রূপরেখার সৌন্দর্য কবিচিত্তকে বিশেষভাবে টানিয়াছে।

একরত্তি দেহযষ্টি তারি গবেষণা,
নিশিদিন অনুক্ষণ তাহারি সাধনা।
নানা ভঙ্গে নানা ছন্দে গ্রীবার মার্জন,
মুহুর্মুহু অঙ্গে অঙ্গে কর সঞ্চালন। [৩৪]

বলেন্দ্রনাথের মাধবিকার ও শ্রাবণীর মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের চৈতালি রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। চৈতালীর কবিতার ছায়া ও মায়া শ্রাবণীর অনেকগুলি কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত। যেমন

আবার বাঁধিনু তরী আর ঘাটে এসে,
ঝিকিমিকি বেলাটুকু উপনীত শেষে।...
জলে নেমে আসে বধূ অবলীলাভরে ;

পূর্ণ করি' শূন্য কুম্ভ তুলে' লয় ধীরে,
চলে' যেতে বার বার দেখে ফিরে' ফিরে'
গৃহতটিনীর পানে সকরুণ চোখে—
কি জানি আবার দেখা না হয় এ লোকে।[৩৫]

মনে হয়, হে কবীন্দ্র তব সাথে যদি
পথে পথে দিন শুধু যেত নিরবধি।
দেশ হ'তে দেশান্তরে, পথ হ'তে পথে,
পুরীমাঝে নদীতটে, প্রান্তরে পর্বতে
যৌবনের কুঞ্জগৃহে, প্রণয়ীর মনে,
নারীর রূপের মাঝে, বিরহগহনে,[৩৬]

কোন কোন কবিতায় সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের স্বাদ পাওয়া যায়। যেমন

সাম দান ভেদ দণ্ড চারি রাজগুণে
অমোঘ প্রয়োগ তব, অয়ি সুনিপুণে।
সামে যবে বাঁধ মন নাগপাশ সম
মনে হয়, স্বর্গ বুঝি কাছে আসে মম,
দান কর সুধা যবে বিম্বাধর হ'তে
হৃদয় প্লাবিয়া যায় যৌবনের স্রোতে।
কিন্তু তবু মাঝে মাঝে অভাগার প্রতি
ভেদবুদ্ধি ঘটে কেন,[৩৭]

সারাদিন কক্ষে কক্ষে ঘুরি আমি তব,
চিত্তে লভি, হে প্রেয়সী, সুখ নব নব।
জলভরে নাহি হাসি ;[৩৮]

শ্রাবণীব শেষ কবিতাটি যেন একটি পুরানো টপ্পা গানের যুগোপযোগী রূপান্তর।

মনে হয় শেষ করি—কিন্তু কোথায় ?
বলিবার যাহা ছিল সব রয়ে যায়।
এ বাদলে কোন কথা জমে নাকো ভাল,
এ বাতাসে আর্দ্রবক্ষে নাহি জ্বলে আলো।...
মিছে আশে দিশে দিশে ঘুরিছে হৃদয়,
বলিতে আসিয়া আর বলা নাহি হয়॥[৩৯]

যৌবনের গান, প্রেমের কবিতা হিসাবে বলেন্দ্রনাথের রচনার একটু বিশেষ মর্যাদা আছে। বলেন্দ্রনাথের কবিতায় রবীন্দ্র-পদ্ধতির অনুশীলনের সঙ্গে প্রাচীন কবিতার রসানুবৃত্তির সংযোগ ঘটিয়াছে। সংস্কৃত কবিতার সংহতিও বলেন্দ্রনাথের রচনায় লভ্য।

বাহিরে তোমারে চাহি' পাই অন্তপুরে—
অন্তরে খুঁজিতে গিয়া হেরি বহুদূরে।[৪০]

৮ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

প্রবন্ধরচনায় বলেন্দ্রনাথের অনেকটা সহধর্মী ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)। তবে বলেন্দ্রনাথ ছিলেন কলাবিদ্, রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানবিদ্। বিজ্ঞানের অধ্যাপকও ছিলেন তিনি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের কৌতূহল বিজ্ঞানের খুঁটিনাটিতে ব্যাপৃত না থাকিয়া জীবনের ও জগতের বৃহত্তর ও বিচিত্রতর বিষয়ের প্রতি সজাগ ছিল। ভাষাতত্ত্ব হইতে প্রাচ্য-প্রতীচ্য দর্শন, বিজ্ঞান হইতে বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড—ইত্যাদি নানা বিষয়ে কৌতূহলী রামেন্দ্রসুন্দরের মনীষা বিবিধ বিষয়ে আলোকপাত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যচিন্তাকে ধনী করিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য যদিচ তিনি জীবনের কোন সময়ে কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই।[৪১] রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যবোধ নিপুণ এবং রসবোধ গভীর। রচনা-শৈলীর প্রাঞ্জলতায় ও সজীবতায় তাহার পরিচয় নিহিত। দেশপ্রীতির গভীরতায় ও তাহার প্রকাশেও রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথেব সহপন্থী ছিলেন। দেশকে ভালোবাসিতে হইবে, দেশের ভিতর হইতে এবং সবদিক দিয়া দেশের শক্তি উদ্বোধিত না হইলে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইবে না—এই বাসনাই তাঁহার কর্মে চিন্তায় ও রচনায় পরিস্ফুট। দেশে রাষ্ট্রিক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন যখন প্রবল ঝটিকা তুলিয়াছে তখন রবীন্দ্রনাথ সহৃদয় দেশপ্রেমী কর্মীদেব ডাক দিলেন ছড়া রূপকথা ইত্যাদি লোকরচনা সংগ্রহ করাব মতো আপাত তুচ্ছ কাজে। এ ডাকে অল্প যে কয়টি লোক উৎকর্ণ হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে সেদিনের এই বিজ্ঞানবীরও ছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭) সঙ্কলিত 'খুকুমণির ছড়া'র (১৩৬০ সাল) ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দব নবীন যুগের সাহিত্য-জিজ্ঞাসার যে ইঙ্গিত দিয়াছিলেন তাহা স্মরণীয়।

> কিছুদিন হইতে অনন্যসাধারণ প্রতিভায় অলঙ্কৃত পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই জাতীয় কবিতাসংগ্রহের অভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। কযেক বৎসর হইল তিনি প্রকাশ্য সভায় 'মেয়েলি ছড়া' নামক একটি প্রস্তাব পাঠ করেন···
>
> রবীন্দ্রবাবু প্রবন্ধপাঠেই নিরস্ত ছিলেন না, তিনি স্বয়ং সংগ্রহকার্যে নিযুক্ত ছিলেন; এবং তাঁহাবই প্ররোচনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় কিছুদিন এই সংগ্রহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু কি কারণে জানি না, কাজটা অধিকদূর অগ্রসব না হইযাই থামিয়া যায়।
>
> সম্ভবতঃ পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকসম্প্রদায় অথবা পরিষদের পরিচালকগণ ছেলে-ভুলান ছড়াব সংগ্রহ তাঁহাদের মত প্রবীণ পণ্ডিত-মণ্ডলীর অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিযাছেন।··
>
> প্রকৃত-প্রস্তাবে ইতিহাসের প্রতি আমাদের কোন অনুরাগ নাই, এবং আমার বিশ্বাস এই বিরাগের মূল আমাদের বৈজ্ঞানিকতার অভাব। ইতিহাস মনুষ্যজীবনের সত্য ঘটনা লইয়া কারবার করে; বিজ্ঞান সমগ্র জগতের সত্য ঘটনা লইয়া কারবার করে। সুতরাং ইতিহাস বিজ্ঞানেরই একটা শাখা। ইতিহাস বিরাগের নাম, বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগ; এই বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগের নামান্তর সত্যের প্রতি বিরাগ। আমরা সত্য ঘটনার আধ্যাত্মিক ফলভোগের জন্য যতটা আগ্রহবান্, সত্যের প্রতি আমাদের ততটা আসক্তি নাই।

রামেন্দ্রসুন্দর 'সাধনা'র অন্যতম বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। প্রবন্ধলেখক হিসাবে তাঁহাকে

পাই প্রথমে 'নবজীবন' পত্রিকায় (পৌষ ১২৯১)। এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'মহাশক্তি' প্রবন্ধটি বি-এ পড়িবার সময় লেখা। ভারতীতে এবং সাহিত্যেও তাঁহার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তবে গদ্যলেখক হিসাবে ইঁহার প্রতিষ্ঠা প্রথমে সাধনার পৃষ্ঠাতেই। সাধনায় ও অন্যত্র প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি লইয়া ইঁহার প্রথম বই বাহির হইয়াছিল 'প্রকৃতি' (১৩০৩ সাল)। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' (১৩১০ সাল)। ইহাতে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি সঙ্কলিত হইল। তাহার পরে বাহির হইয়াছিল 'কর্মকথা' (১৩২০ সাল), 'চরিতকথা' (১৩২০ সাল) ও 'শব্দকথা' (১৩২৪ সাল)। 'বিচিত্র জগৎ', 'যজ্ঞ-কথা' ও 'জগৎকথা' মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় আছে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের (অসম্পূর্ণ) বঙ্গানুবাদে।[৪২]

বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শন মানবসংস্কৃতির এই প্রধান তিন বিষয়ই রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচ্য ছিল। তাঁহার আলোচনায় শুষ্ক পাণ্ডিত্যের অথবা নিরর্থ বাচালতার আভাসমাত্র নাই। সে আলোচনা স্বাধীন চিন্তার আলোয় দীপ্ত এবং সাহিত্যরসে অভিষিক্ত। রামেন্দ্রসুন্দর নূতনকে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পুরাতনকে অস্বীকার করেন নাই। এইখানে তিনি বিজ্ঞান ও ইতিহাসকে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন॥

৯ যোগেশচন্দ্র রায় (বিদ্যানিধি) ও জগদানন্দ রায়

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৮৫৯-১৯৫৬) ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অগ্রজন্মা এবং অনেক বিষয়ে সমানধর্মা ও সমানকর্মা। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান যোগেশচন্দ্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয়ভুক্ত ছিল। বাঙ্গালা ভাষা ও পুরানো সাহিত্য এবং বাঙ্গালার পুরানো সংস্কৃতি ইঁহার বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ বিষয়ে তাঁহার গবেষণা অনেক নূতন তথ্য ও সত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। যোগেশচন্দ্রের লেখার রীতি অত্যন্ত নিজস্ব—সহজ সরল, তদ্ভবশব্দময়। এই হিসাবে যোগেশচন্দ্রের গদ্যশৈলী বঙ্কিমী রীতির প্রত্যাশিত মিতভাষিণী পরিণতি। বাঙ্গালা ভাষার ও বানানপদ্ধতির বিষয়ে যোগেশচন্দ্রের গবেষণা সার্থক হইয়াছে।

যোগেশচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী বিভিন্ন মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। দুইটিমাত্র সঙ্কলন বাহির হইয়াছিল—'পত্রাবলী' (১৯০৬) ও 'ক্ষুদ্র ও বৃহৎ' (১৯২২)[৪৩]। গবেষণামূলক গ্রন্থ—'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' (১৩১০ সাল), 'রত্নপরীক্ষা' (১৩১০ সাল) এবং 'বাঙ্গালা ভাষা' (১৩১২ সাল) ও 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' (১৩২০ সাল)।

প্রথমে এস্টেটের কর্মচারী, পরে পুত্রকন্যার গৃহশিক্ষক এবং অবশেষে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকরূপে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩) বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে উৎসাহ পান। বিজ্ঞান-আলোচনায় ইঁহার কৌতূহল পূর্ব হইতেই ছিল। ১২৯৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা সাধনায় তাঁহার প্রেরিত তিনটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন ছাপা হইয়াছিল। একটির উত্তরে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 'দীপশিখা' প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন (সাধনা, আষাঢ় ১২৯৯)। প্রদীপে ভারতীতে বঙ্গদর্শনে সাহিত্যে প্রবাসীতে ও অন্যত্র জগদানন্দের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। ইঁহার প্রথম (?) প্রবন্ধ 'বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ' রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদিত ভারতীতে (ভাদ্র ১৩০৫) বাহির হইয়াছিল। ইনি কবিতা এবং গল্পও লিখিতেন।[৪৪] জগদানন্দের গ্রন্থাবলী প্রথমে এলাহাবাদ হইতে বাহির হইত—'বৈজ্ঞানিকী' (১৩২০ সাল), 'প্রাকৃতিকী' (১৯১৪), 'প্রকৃতি-পরিচয়' (১৩২১ সাল), 'গ্রহনক্ষত্র' (১৩২২ সাল), 'পোকা-মাকড়' (দ্বি-স ১৩৩১ সাল), 'আলো' (১৩২৬ সাল), 'গাছপালা' (১৯২১), 'মাছ ব্যাঙ সাপ' (১৯২৩), 'বাংলার পাখি' (১৯২৪), ইত্যাদি। ইঁহার প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি-পরিচয়'—বিবিধ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সমষ্টি—ঢাকা হইতে বাহির হইয়াছিল (১৯১১)। তাহাতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভূমিকা ছিল॥

১০ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

যোগেশচন্দ্রের অনুরক্ত বাঁকুড়া নিবাসী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) কলিকাতায় পড়িতে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন এবং যোগেশচন্দ্রের মতো দেশের ঐতিহ্যে আকৃষ্ট হন। তিনি এম. এ. পাস করিয়া এলাহাবাদে নব প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং সেখান হইতে দুইখানি পত্রিকা বাহির করেন 'মডার্ন রিভিউ' (Modern Review, ১৯০৭) ও প্রবাসী (১৯০১ ?)। এই দুইখানি পত্রিকায় যে বিবিধ সমালোচনা বাহির হইত তাহা অত্যন্ত মূল্যবান্। পুরানো ছেলে-ভুলানো গল্পেও রামানন্দবাবুর অনুরক্তি ছিল। তিনি আনন্দচন্দ্র শিরোমণির ফারসী হইতে অনূদিত আরব্য উপন্যাসের একটি 'গার্হস্থ্য সংস্করণ' প্রস্তুত করিয়া এলাহাবাদ হইতে ছাপাইয়া ছিলেন। প্রথম সংস্করণ ১৩১২, দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ ১৩১৬ সালে বাহির হয়। বইটি সুচিত্রিত, এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেসে ছাপা। চিত্রের সংখ্যা ২০টি। প্রথম দুইটি রঙীন। বইটির নামপত্র এইরূপ :

সচিত্র
আরব্যোপন্যাস
গার্হস্থ্য সংস্করণ

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত
দ্বিতীয় সংস্করণ

এলাহাবাদ
ইন্ডিয়ান প্রেস
১৩১৬

সর্বাধিকার রক্ষিত

এই পৃষ্ঠার অপর পৃষ্ঠে

প্রকাশক
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ.
এলাহাবাদ—ইন্ডিয়ান প্রেস
কলিকাতা—ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট

একটি চিত্র

এলাহাবাদ, ইন্ডিয়ান প্রেস হইতে শ্রী পাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত

বইটি তিনি এইভাবে শুরু করিয়াছেন

শাহরিয়ার ও তাঁহার মহিষী।

উপক্রমণিকা।

সেকালে পারস্য দেশে শাহরিয়ার নামে এক সুলতান ছিলেন। তিনি আপনার এক রাণীকে অতিশয় ভালবাসিতেন, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি ঐ রাণীকে অত্যন্ত দুর্বৃত্তা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি পারস্যদেশের তখনকার নিয়ম অনুসারে তাহার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। রাণীর ত প্রাণ গেল। এদিকে রাজা শোকে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা হইল যে, সকল নারীই তাঁহার রাণীর মত পাপীয়সী ; সুতরাং জগতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা যত কমে, ততই মঙ্গল। এই জন্য তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এক একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে লাগিলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে প্রধান মন্ত্রীর সম্মুখে তাহাদের ফাঁসী হইতে লাগিল। প্রতিদিন এক একটি স্ত্রী জুটাইবার ভার ছিল প্রধান মন্ত্রীর উপর ছিল।...

এই অদ্ভুত নিষ্ঠুরতার জনরব ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজ্য মধ্যে সুলতানের অত্যন্ত অখ্যাতি হইয়া উঠিল এবং প্রজাগণ ভীত হইয়া আপন আপন কন্যা লইয়া মহা বিপদগ্রস্ত হইল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ ;—কোন স্থানে পিতা কন্যার শোকে ব্যাকুল হইয়া দিবারাত্রি কাঁদিতেছেন, কোথাও বা স্নেহময়ী জননী অভাগিনী কন্যাদের ভাগ্যে কখন কি ঘটিবে, এই চিন্তা করিয়া ভয়ে ম্রিয়মাণা হইতেছেন। কেহ কেহ বা পারস্যদেশ ছাড়িয়া অন্যদেশে গিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল।...

মন্ত্রী সন্ধ্যার সময় রাজার হাতে পরম স্নেহাস্পদ কন্যা সঁপিয়া দিয়া বিষণ্ণমনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। রাজা শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রিদুহিতাকে ঘোমটা খুলিতে বলিলেন। তিনি ঘোমটা খুলিলে রাজা তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং তাঁহার চোখে জল দেখিয়া তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নূতন রাণী কহিলেন, "মহারাজ! আমার একটি ছোট ভগিনী আছে। আমি তাহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসি। তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ এই পর্য্যন্ত শেষ হইল, এই জন্যই আমি কাঁদিতেছি। যদি মহারাজ আজ রাত্রে তাহাকে এই ঘরে শুইয়া থাকিতে অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমি অন্তিম কালে আর একবার সেই প্রাণের ভগিনীর মুখ দেখিয়া পরম সুখে মরিতে পারি।" রাজা মন্ত্রিকন্যার এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ দিনারজাদীকে তথায় আনাইলেন। অনন্তর শাহারজাদী রাজার সহিত অনেক হীরকমুক্তমাণিক বসান এক উচ্চ পালঙ্কে শয়ন করিয়া রহিলেন। দিনারজাদী তাহার পাশে নীচে আর এক শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিতা হইল। রাত্রি প্রভাতের এক ঘটিকা পূর্ব্বে দিনারজাদী উঠিয়া কহিল, "দিদি, যদি তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়া থাকে, তাহা হইলে একটু কষ্ট করিয়া আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় একটী অদ্ভুত উপন্যাস শুনাইয়া জন্মের মত সুখী কর।" শাহারজাদী তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজের কি অনুমতি হয় ?" রাজা কহিলেন "আমার কোন আপত্তি নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে গল্প শুনাও।" শাহারজাদী রাজার আদেশ পাইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপে গল্প আরম্ভ করিলেন।

গ্রন্থটির সমাপ্তিতে তিনি একটি 'উপসংহার'-এর উল্লেখ করিয়াছেন।

সুলতান সাহারজাদীর অলোকসামান্য স্মৃতিশক্তির অনেক প্রশংসা করিলেন। ক্রমাগত একাধিক সহস্ররজনী এইরূপ বিশুদ্ধ আমোদ অনুভব করিয়া নৃপতির প্রকৃতি পূর্ব্ববৎ কোমলভাব ধারণ করিল এবং স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার যে বিজাতীয় ঘৃণা ও বিষম অবিশ্বাস ছিল তাহাও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল। সাহারজাদী জীবনাশা ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, নারী জাতির উপকারার্থ স্বীয় প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ইত্যাদি স্মরণ করিয়া নৃপতি তাঁহার গুণের একান্ত পক্ষপাতী হইলেন। তিনি তাঁহাকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে, তোমার গুণে আমার বিষম ক্রোধের শান্তি হইল, অদ্যাবধি আমি নারীহত্যা হইতে বিরত হইলাম, অদ্য হইতে সেই আসুরিক নিয়ম রহিত হইল। আমি তোমাকে আমার প্রধানা মহিষী করিলাম। আমার বিবেচনায় তুমি রমণীকুলের উদ্ধারকর্ত্রী। তোমার কৃপায় তাহাদিগকে আর আমার ক্রোধাগ্নিতে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইতে হইবে না।" সাহারজাদী নৃপতিকে প্রণিপাত ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া অশেষ প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ উজীর তৎক্ষণাৎ নৃপতির মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। নগর মধ্যে এই বার্তা প্রচারিত হইল, নগরবাসিগণ অমাত্য দুহিতাকে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

'আরব্যোপন্যাস'-এর উপক্রমণিকা ছাড়া গল্পসংখ্যা হইল কুড়ি। আকারে গল্পগুলি তিন রকমের। বড় (২৫ পৃষ্ঠার ঊর্দ্ধে), মাঝারি (১১-২৫ পৃষ্ঠা) ও ছোট (১০ পৃষ্ঠা)। আরব্যোপন্যাসের অধিকাংশ "উপন্যাস"ই বৌদ্ধ জাতক কাহিনী, অথবা রামায়ণ কিংবা মহাভারত হইতে উপলব্ধ। নিম্নে সবচেয়ে ছোটগল্পটি উল্লেখ করিতেছি। এইটি একটি জাতক কাহিনী অবলম্বনে। গল্পটির নাম "নরসুন্দরের ষষ্ঠ ভ্রাতার কথা"। পৃষ্ঠাসংখ্যা তিন (২৮৪-২৮৬ পৃষ্ঠা)

মহারাজ! আমার ষষ্ঠভ্রাতার নাম সাক্‌বাক্। তাঁহার খরগোসের ন্যায় ওষ্ঠ ছিল। তিনি প্রথম অবস্থায় ব্যবসার দ্বারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। পরে দৈবদুর্বিপাকে তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতে হইয়াছিল। একদিন তিনি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া উদর পোষণের উপায় অনুসন্ধানার্থ পথে পথে ভ্রমণ করিতে করিতে এক বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারে গিয়া দ্বারপালগণের নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। তাহারা বলিল, "বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রভুর নিকট আপন প্রার্থনা জানাও। অবশ্য সফল মনোরথ হইবে।" সাক্‌বাক্ আহ্লাদিত হইয়া পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটী দালানের মধ্যে সুন্দর পর্য্যঙ্কের উপরি এক বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। গৃহস্বামী স্বাগত ভাষণ করিয়া ভ্রাতাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভ্রাতা নিজ হীনাবস্থা বর্ণন করিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কর্ত্তা তাঁহার এই কথা শুনিয়াই হস্তপদ প্রক্ষালন করিবার জল আনিতে বলিলেন। ভ্রাতা মনে মনে আপন ভাগ্যকে বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ গত হইল, কেহই জল লইয়া আসিল না। কিন্তু কে যেন তাঁহার হস্তে জল ঢালিয়া দিতেছে, তাহাতে তিনি হস্ত প্রক্ষালন করিতেছেন, এইরূপ ভাবভঙ্গী করিয়া গৃহস্বামী ভ্রাতাকে কহিলেন, "আইস হস্ত প্রক্ষালন কর, ভৃত্য অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না।" ভ্রাতা কি করেন, কর্ত্তাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাঁহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তদ্রূপ মিথ্যা আহারার্থে উভয়ে উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধ মধ্যে মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ভ্রাতাও গৃহস্বামীর সন্তোষার্থ তাঁহার কথায় প্রতিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই প্রকারে সুরাপানও চলিল। ভ্রাতা পূর্ব্বের ন্যায় পান করিয়া উন্মত্তভাবে টলিতে টলিতে গৃহস্বামীর গণ্ডস্থলে সবলে এক চপেটাঘাত

করিলেন। গৃহস্বামী কুপিত হইয়া কহিলেন, "রে নরাধম! আমার সহিত এ কিরূপ আচরণ?" ভ্রাতা কহিলেন, "প্রভু! সুরাপানের মত্ততাতেই এরূপ কুকার্য্য করিয়াছি, মার্জ্জনা করিবেন।" গৃহস্বামী তাঁহার কথায় খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আমি বহুদিবসাবধি তোমার ন্যায় একজন সুরসিক পুরুষ খুঁজিতেছিলাম। অদ্য আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হইল। তুমি অদ্য হইতে আমার সহচর হইলে।" তিনি এই কথা বলিয়াই পরিচারকদিগকে নানাবিধ যথার্থ উপাদেয় সামগ্রী আনিতে বলিলেন। ভ্রাতা তদবধি সেই ব্যক্তির সহচর হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর অকস্মাৎ গৃহস্বামীর মৃত্যু হইলে অপত্য অভাবে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজভাণ্ডারস্থ হইল। ভ্রাতা পুনরায় সহায় সম্পত্তিহীন নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, ভাবিয়া আকুল। সেই সময়ে কতকগুলি লোক মক্কা যাইতেছিল। ভ্রাতা তৎসমভিব্যাহারে তীর্থ যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে দস্যুগণ যাত্রীদিগকে আক্রমণ করিল ও তাহাদের যথাসর্বস্ব হরণ করিয়া রীতিমত কষ্ট দিল। ভ্রাতা ঐ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া দস্যুদিগকে বলিলেন, "তোমরা আমাকে কেন অনর্থক যন্ত্রণা দিতেছ? আমার নিকট এক কপর্দ্দকও নাই যে, তাহা তোমাদিগকে দিয়া মুক্ত হই। তবে আমি তোমাদের আজ্ঞাধীন। যদি বাঞ্ছা হয়, আমাকে বিক্রয় করিতে পার।" দস্যুপতি অর্থলাভে নিরাশ হইয়া ক্রোধে একখান ছোরা লইয়া ভ্রাতার ওষ্ঠদ্বয় ছেদন করিয়া দিল এবং তাঁহাকে চিরদাস করিয়া বাটীতে রাখিল। সেই অবধি তাঁহার খরগোসের ন্যায় ওষ্ঠ হইল।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, দস্যুপতি কোন কারণে খড়্গাদ্বারা ভ্রাতার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া উষ্ট্রে চড়াইয়া এক অরণ্যস্থ পর্ব্বতে রাখিয়া আসিল। দৈববশে কতকগুলি পথিক সেই পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতেছিল। তাহারা দয়া করিয়া আমাকে সমাচার প্রদান করিল। আমি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতাকে নিজ বাটীতে লইয়া আসিলাম।"

কাসগরাধীশ্বর এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া দর্জী প্রভৃতি সকলেরই অপরাধ ক্ষমা করিলেন, এবং কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই নরসুন্দরকে ডাকাইয়া আনাইলেন।

নাপিত রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজ! ইহুদী দর্জী ও খ্রীস্টিয়ান সাধু কি নিমিত্ত এখান দণ্ডায়মান রহিয়াছে? এবং কুব্জই বা এ ভাবে পতিত কেন? আমি কুব্জের বিবরণ শুনিতে অভিলাষ করি।" এই কথায় রাজা বৃদ্ধ নরসুন্দরকে কুব্জের কথা শুনাইতে আজ্ঞা করিলেন। সুচতুর নরসুন্দর আদ্যোপান্ত কুব্জের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিল, "মহারাজ! কুব্জের যে মৃত্যু হয় নাই, ইহা আমি এই মুহূর্তেই প্রমাণ করিয়া দিতে পারি। এই কথায় যদি আমাকে উন্মত্ত জ্ঞান করেন করুন, কিন্তু আমি সত্য বলিতেছি।" ইহা বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ কুব্জের গলা হইতে কন্টক বাহির করিয়া নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিল। তাহাতে কুব্জ পুনর্জ্জীবিত হইল। এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে সভাস্থগণ এবং রাজা যে কি পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন তাহা বাক্যাতীত। পরে ঐ নাপিত রাজাদেশে রাজসভার একজন সভ্য হইয়া তাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজপ্রসাদ সম্ভোগ করিতে লাগিল।

আর একটি ভালো উদাহরণ দিতেছি। এটি মহাভারতের কাশীরাজ ও উর্বশীর উপাখ্যান অবলম্বনে। গল্পটির নাম হইতেছে "সিদিনোমানের কথিত কাহিনী"।

আরব্যোপন্যাস বইটি আরবী এবং ফারসী দুই ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। তবে নাম দেওয়া হইয়াছিল আরবী। নামটি "আলেফ লয়লাহ্ ওয় লয়লা", অর্থাৎ একাধিক সহস্র রজনী। এই নামটিও সংস্কৃত হইতে আগত। রামায়ণে রামচন্দ্রের বিবাহ রাত্রিতে জনকের পুরোহিত বশিষ্ঠ তাঁহার পত্নী অরুন্ধতীর পরিচয় দিয়া রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন

"দলরাত্রং কৃতারাত্রিঃ সেহয়ম্ মাতেব তেহনঘ।"

(তুলনা করুন পুরানো ইতালীয় ভাষায় (দশম শতাব্দী) Decameron; বাংলা রূপান্তর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "পুরুষ পরীক্ষা" ; তুলনীয় "একাধিক সহস্র দিবস" কেদারনাথ দত্ত অনূদিত (১৯০৮), সচিত্র) ॥

১১ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯১০) সাহিত্যকার ছিলেন না। তবুও তাঁহার কথা না বলিলে আমাদের দেশের সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের দেশচিন্তা ও অধ্যাত্মভাবনা এই তেজস্বী ও মনস্বী পুরুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। স্বদেশিযুগের অন্যতম চিন্তানায়ক এবং বিপ্লবপন্থার প্রধানতম অগ্নিহোত্রী নেতা ইনি। আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসিয়া ভবানীচরণ নববিধান মতে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিন্ধুদেশে গিয়া সেখানে আট দশ বছর ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার আগে সতেরো বছর বয়সে গোয়ালিয়র চলিয়া যান এবং সেখানে কিছুদিন মাস্টারি করেন। ভবানীচরণ ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে প্রোটেস্টান্ট মতে এবং তাহার ছয় মাস পরে রোমান ক্যাথলিক মতে খ্রীস্টান ধর্ম আশ্রয় করেন। খ্রীস্টান হইয়া তিনি নাম লইয়াছিলেন Theophilus-এর অনুবাদ "ব্রহ্মবন্ধু" (পরে "ব্রহ্মবান্ধব")। করাচীতে তিনি একটি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন *Sophia* নামে। তাহাতে 'ব্রহ্মবন্ধু উপাধ্যায়' নাম-গ্রহণের হেতু প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

> আমি ভিক্ষু সন্ন্যাসীর জীবন অবলম্বন করিয়াছি। আমাদের দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে নূতন নাম গ্রহণ করিতে হয়। তদনুসারে আমি নূতন নাম গ্রহণ করিয়াছি। আমার কৌলিক পদবী বন্দ্য (অর্থাৎ প্রশংসিত) উপাধ্যায় (অর্থাৎ শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক) আর আমার খ্রীষ্টীয় ধর্মাশ্রয়ের (baptismal) নাম হইতেছে ব্রহ্মবন্ধু (Theophilus)। আমি আমার কৌলিক নামের প্রথম অংশ ত্যাগ করিয়াছি, কেন না আমি সেই যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য যিনি দুঃখের মানুষ, যিনি নির্যাতিত মানব। অতএব আমার নূতন নাম হইল ব্রহ্মবন্ধু উপাধ্যায়।[৪৫]

খ্রীস্টান হইয়াও ব্রহ্মবান্ধব ভারতীয় অধ্যাত্মপন্থা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি খ্রীস্টান ধর্মের সঙ্গে ভারতীয়-সন্ন্যাস-সাধনার কোন বিরোধ দেখিতে পান নাই। আগে ভারতবর্ষ সব ধর্মকে আত্মসাৎ করিয়াছে, এখন ব্রহ্মবান্ধব চাহিলেন খ্রীস্টান ধর্মকেও ভারতীয় করিতে। তিনি ইসাপন্থী সন্ন্যাসিসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে জব্বলপুরের কাছে নর্মদাতীরে ছোট আশ্রম খুলিলেন। অর্থাভাবে এবং মিশনারিদের প্রতিকূলতায় আশ্রমটি অচিরে রুদ্ধদ্বার হইয়াছিল। তাহার পর তিনি *Twentieth Century* পত্রিকা বাহির করিলেন। উদ্দেশ্য বেদান্ত মতের প্রচার। *ব্রহ্মবান্ধব বেদান্ত মতের মধ্যে খ্রীস্টান ও হিন্দুধর্মের মিল খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন।* এই পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যের প্রশংসাময় আলোচনা বাহির হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

তৎপূর্বে আমার কোন কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখিনি। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।...শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রচেষ্টায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষ্যে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।

ব্রহ্মবান্ধবের মনে সর্বদা খোলা হাওয়া বহিত। তিনি কোন কিছুতেই বেশিদিন আটক থাকিতে পারিতেন না। কোন ধর্মমতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই ব্রাহ্মধর্ম হইতে প্রোটেস্টান্ট মত, তাহা হইতে রোমান ক্যাথলিক মত এবং অবশেষে বেদান্ত মত। ধর্মের এক মত হইতে মতান্তরে লঘুপদে বিচরণ করিলেও তিনি উদার দৃষ্টি হারান নাই। সেইজন্য খ্রীস্ট-উপাসনার সঙ্গে বেদান্ত-আলোচনা ও গৈরিকধারণ তিনি বেমালুম মিলাইয়া লইয়াছিলেন। স্বাদেশিকতার সূত্রে হিন্দুরীতিতেও তিনি যথাসম্ভব আস্থাবান্ ছিলেন। যেখানে সত্যের আলোক অনুভব করিয়াছিলেন, কর্মোদ্যমের আভাস দেখিয়াছিলেন সেইখানেই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন (১৯০১) তখন ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহার উপরে আর উপস্থিত বলিবার প্রয়োজন নাই।

তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপর-পক্ষে বৈদান্তিক,—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রতিভাশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।[৪৬]

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এক বছর থাকিয়া ব্রহ্মবান্ধব কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং সারস্বত আয়তন নামে অনুরূপ বিদ্যালয় খোলেন (১৯০২)। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের টাকা লাগিত না। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব জেনারেল আসেম্‌ব্লিস্ ইন্‌স্টিটিউশনে পড়িয়াছিলেন। এই দুই সতীর্থের মধ্যে যে আত্মিক যোগাযোগ ছিল তাহা বেদান্তাশ্রয়েই বোঝা যায়। বিবেকানন্দের তিরোধানের পর ব্রহ্মবান্ধব বিলাতে যাইবার জন্য উৎসুক হইলেন এবং বিন্দুমাত্র সম্বল না লইয়া বিদেশে পাড়ি দিলেন (অক্টোবর ১৯০২)। তবে বছরখানেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মবান্ধব অনেক কাজ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজে বেদান্ত হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা। এসব কথা জানি তাঁহার 'বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি'তে[৪৭]। বিলাতে তিনি সব সমাজেই মিশিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। একটি চিঠিতে অক্‌স্‌ফোর্ডের শ্রমজীবীদের রাজনীতিক মতামতের স্পষ্ট আলোচনা আছে। কিছু অংশ উদ্ধৃত করি। ভাষায় অমনস্কতার পরিচয় লক্ষণীয়.

এখানে একটি কর্মজীবীদের বিদ্যালয় আছে। দেশ-বিদেশ হোতে ছুতার রাজমিস্ত্রী কামার দরজী—এইরূপ লোকেরা এসে পড়াশুনা করে। তারা একদিন আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল। তাদের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়েছে। কিন্তু তাদের বড় মানুষদের উপর যে রাগ দেখিলাম তাতে বড় ভয় হয়। এরা ভালো লোক কিন্তু দায়ে পড়ে বিদ্বেষভাবাপন্ন হোয়েছে। সভ্যতার বাজারে এত টানাটানি যে এরা সামলে উঠিতে পারে না। তাই এরা বর্তমান সমাজের দ্রোহী

হয়ে উঠিতেছে। ...ইহারা বেশ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। এই সমাজদ্রোহিতা—সভ্যতার একটি অঙ্গ। ইহারা ধর্মঘট স্থাপন করে এবং ধনী ও কর্মীতে শক্রতা বাধায়। প্রতিযোগিতায় যার চালাকি আছে সেই খুব মেরে দেয় আর যে বেচারি ভাল মানুষ তার সহস্র সহস্র গুণ থাকিলেও কিছু সুবিধা হয় না। এই সমাজের ভয়ানক অসামঞ্জস্যভীতি য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে। ...সভ্যতার আর একটি শোচনীয় ব্যাপার ভয়ানক দারিদ্র্য। [৪৮]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইবার আগেই ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার সাহিত্যগোষ্ঠীতে যোগ দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথের 'সূচনা' ও বারোটি নৈবেদ্যের কবিতার পরেই ব্রহ্মবান্ধবের প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল—'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা'। এই বছরের (১৩০৮ সাল) বঙ্গদর্শনে ব্রহ্মবান্ধবের আরও তিনটি প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছিল—'তিন শত্রু' (শ্রাবণ), 'ভারতের অধঃপতন' (মাঘ) এবং 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' (ফাল্গুন)। (এই চারটি প্রবন্ধ 'সমাজতত্ত্ব' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল বৈশাখ ১৩১৭ সালে, ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর অল্পকাল পরে।) অতঃপর ১৩১১ সালের আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গদর্শনে ব্রহ্মবান্ধবের 'বেদান্তের প্রথম কথা' বাহির হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মূল প্রেরণা হইতেছে ভারতবর্ষীয় জনগণের মনকে পাশ্চাত্য বিস্রংসনমুখিতা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া একতায় নিষ্ঠিত করিবার বাসনা। প্রথম প্রবন্ধটি শুরু হইয়াছে নৈবেদ্যের—তখন পর্যন্ত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত—"হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর" কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া।

স্বদেশি-আন্দোলনের ঢেউ উঠিলে পর দেশবন্ধু এই বীরসন্ন্যাসী তাঁহার ধ্যানের আসনে অচঞ্চল বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বঙ্গভঙ্গ উত্তেজনায় ব্রহ্মবান্ধবের তেজ ও কর্মোদ্যম বিস্ফুরিত হইয়া বিপ্লব-পন্থা আলোকিত করিল। তাঁহার 'সন্ধ্যা' যেন যুগসন্ধ্যার প্রলয়শঙ্খ বাজাইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করি।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষ্যে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।

এমন সময় লর্ড কার্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হোলো। এই বিচ্ছেদে ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙ্গালী জাতকে কৃশ করে দেবে এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্বেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মরলি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময় দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারি মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন "সন্ধ্যা" কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথম দেখা গেল বাঙ্গালাদেশে আভাসে-ইঙ্গিতে বিভীষিকা-পন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এত বড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।

এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। মনে করেছিলুম হয়ত আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র আন্দোলন প্রণালীর প্রভেদ অনুভব ক'রে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অজ্ঞতাবশতই।

নানাদিকে নানা উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোর তেতালার ঘরে একলা বসেছিলেম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, "রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।" এই ব'লেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যেই তাঁর আসা। তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।

এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা।[৪৯]

রাজদ্রোহ অভিযোগে বিচারাধীন অবস্থায় ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যু যেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর কায়োৎসর্গ প্রায়শ্চিত্ত।

শুধু সন্ধ্যা নয়, ব্রহ্মবান্ধব আরও দুইটি কাগজ বাহির করিয়াছিলেন,—সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' (ফাল্গুন ১৩১৩ সাল) এবং অর্ধসাপ্তাহিক 'করালী'। ইহার অল্প কিছু আগেই তিনি শিবাজী-উৎসব শুরু করিয়াছিলেন এবং সাড়ম্বরে সিংহবাহিনী ভারতমাতার পূজাও জুড়িয়া দিয়াছিলেন। বন্দেমাতরং মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তিনি কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভিটায় ৮ই বৈশাখ ১৩১৪ সালে।[৫০]

সন্ধ্যার অনুষ্ঠানপত্র হইতে জানিতে পারি যে কাগজটি বাহির করিবার সময়ে ব্রহ্মবান্ধব সংগঠনের দিকটাও ভাবিয়াছিলেন। যেমন

> দুঃসময় পড়িলে লোকে বলে এই ত কলির সন্ধ্যা অর্থাৎ কালরাত্রি কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধকার ঘুরিয়া গিয়া সুপ্রভাত হইতে এখন অনেক বিলম্ব ; কিন্তু কলির সন্ধ্যার একটি শাস্ত্রীয় অর্থ আছে। বার শত বৎসর ধরিয়া কলির এক একটি সন্ধ্যা। এরূপ চারিটি সন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছে। এখন পঞ্চম সন্ধ্যা।...
>
> অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। এখন উপায় কি ? পুরাতন কথা ভাবিয়া দেখিলে উপায় কি তাহা বোধ হয় বুঝা যাইতে পারে। আমরা একটি লম্বা রসিতে বাঁধা আছি। যতদূর যাই না কেন, যতই ঘুরপাক খাই না কেন, খোঁটা ছাড়িবার যো নাই। সেই বেদ বেদান্ত, সেই ব্রাহ্মণ বর্ণধর্ম ছাড়া হিন্দু সন্তানের আর গতি নাই! কলির পঞ্চম সন্ধ্যায় আমরা সন্ধ্যা নামে যে এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে কেবল এই একমাত্র উপায় ভাল করিয়া বুঝান, রাজা ম্লেচ্ছ, উপজীবিকার জন্য মানসম্ভ্রমের জন্য ম্লেচ্ছ ভাষা, ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিখিতে হইবে, ম্লেচ্ছ হাবভাব ধরিতে হইবে নহিলে উপায় নাই।...বিদেশীর কলাকৌশল শিখিয়া কিরূপে ধন্যবাদের বৃদ্ধি করিতে হয় তাহারও মন্ত্রণা থাকিবে। কিন্তু সকল কথার মাঝে সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা আমরা সদাই বলিব। যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর, হিন্দু থাকিও—বাঙ্গালী থাকিও।...
>
> এই পত্রিকায় কোন নূতন কথা বলিবার আমরা স্পর্ধা রাখিব না। আমাদের অগ্রজের নিকট যাহা শিখিয়াছি, তাহা কেবল নূতন আকারে প্রকাশ করিব। তাঁহাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

অনুষ্ঠান-পত্রের এই উচ্চগ্রামের সুর পরে আর রাখিতে পারা যায় নাই। অল্পশিক্ষিত জনসাধারণ ও অল্পবয়স্কদের মাতাইয়া তুলিবার জন্য সে সুর মোটা করিতে হইল এবং ভাষাতেও সেই পরিমাণে স্থূল রস অবলিপ্ত হইল। যেসব প্রবন্ধের জন্য পুলিস সন্ধ্যা আপিস প্রথম সার্চ করিয়াছিল সেগুলির শীর্ষক হইতেই বিষয়ের ভাবের ও ভাষার হদিশ

পাওয়া যাইবে,—"এখন ঠেকে গেছে প্রেমের দায়ে", "ছিদিসানের হুড়ুমদুড়ুম, ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম", "বোচকা সকল নিয়ে যাচ্চেন শ্রীবৃন্দাবন", ইত্যাদি।

ব্রহ্মবান্ধবের অসঙ্কলিত অনেক রচনা যা পত্রপত্রিকায় বাহির হইয়াছিল সেগুলি এখন প্রায়ই অপ্রাপ্য। দুইখানি সঙ্কলন-পুস্তিকার উল্লেখ করিয়াছি। আর তিনটি হইতেছে 'ব্রহ্মামৃত' (১৩০৯ সাল), 'পাল পার্বণ' এবং 'আমার ভারত-উদ্ধার' ॥

১২ ইতিহাসে কৌতূহল ও গবেষণা : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, সখারাম গণেশ দেউস্কর, রামপ্রাণ গুপ্ত, কৃষ্ণবিহারী সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী রাজপুত-ইতিহাসকাহিনী হইতে পরাধীনতা-গ্লানিমোচনের একটু পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশ শাসন বিধাতার বিধানে। তাই ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশের শত্রু সে তাহারও শত্রু। বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয়-বোধ জাগ্রত হইয়াছে। ইংরেজ-শাসনের নাগপাশে দেশের চিত্ত নিষ্পিষ্ট বিদলিত হইতেছে, সে বিষয়ে ধীরে ধীরে চেতনা জাগিতেছে। বিদেশির লেখা ভারতের ইতিহাসে আর শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন ভরিতেছে না। সে নিজের দেশকে নিজে জানিয়া লইতে চায়। দেশের অতীত ও সমাজের বর্তমান সে স্বাধীন চিন্তার আলোকে স্পষ্ট করিয়া, সত্য করিয়া দেখিতে চিনিতে জানিতে চায়। সুতরাং এই সময়ে দেশের ইতিহাসের গভীরতর আলোচনায় উৎসাহ ও আগ্রহের সঞ্চার হইল। আলোচকদের অগ্রণী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬২-১৯৩০) 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন (১৮৯৯)। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সূচনায় রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে আত্মপরিচয়-অনুসন্ধিৎসায় সমুৎসুক বাঙ্গালীর নবজাগৃতির দিক্‌নির্দেশ পাই।

> পরের রচিত ইতিহাস নির্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্ত করিয়া এবং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া পণ্ডিত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধজলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের প্রাণ।

এই নব্য-ইতিহাসচর্চার শুরু হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'য়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের প্রথম গ্রন্থ 'সিরাজদ্দৌলা'র (১৩০৪ সাল) প্রথম অংশ সাধনায় ও শেষ অংশ ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত। ইংরেজ-শাসনের প্রতি তখন আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন হইতেছে। তাই প্রথমেই হইল দুইটি ইংরেজ-শত্রুর কলঙ্কক্ষালনে প্রযত্ন। অক্ষয়কুমারের 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিম' (১৩১২ সাল) সেই দৃষ্টিতেই লেখা। অক্ষয়কুমারের বই দুইটি হতভাগ্য নবাবদ্বয়কে রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় বীরের মহিমায় উন্নীত করিয়াছিল।[৫১] অক্ষয়কুমারের তৃতীয় গ্রন্থ 'ফিরিঙ্গি বণিক্' (১৩২৯ সাল)।[৫২] অপর গ্রন্থ সীতারাম রায় (১৩৩৫ সাল)।

মুসলমান আমলের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের গ্রন্থিমোচনে অগ্রসর হইয়াছিলেন কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬০-১৯২৯)। ইঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল' (দ্বি-স ১৯০৯) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল (১৮৫২-১৮৯৮) বৈদিক পুরাতত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস এবং সাংখ্যদর্শনের চর্চা করিয়াছিলেন। সাধনায় প্রকাশিত ইঁহার প্রবন্ধগুলি পরে 'সাংখ্যদর্শন' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৩০৬ সাল)। অপর সব প্রবন্ধ প্রধানত সাহিত্যে বাহির হইয়াছিল। অনেককাল পরে বৈদিক আলোচনাগুলি 'বেদ-প্রকাশিকা' নামে সঙ্কলিত হয় (১৯০৫)।

সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২) বংশক্রমে মারাঠী, দেওঘরের পাণ্ডার পুত্র। শিক্ষায় দীক্ষায় ছিলেন বাঙ্গালী। এনট্রান্স্ পাস করিয়া কিছুদিন দেওঘরে শিক্ষকতা করেন। অনুমান করি এখানে তিনি রাজনারায়ণ বসুর প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। তাহার পর হিতবাদী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদক হন। সাধনার ও সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক ছিলেন ইনি। টিলকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে হিন্দুধর্মকে উপলক্ষ্য করিয়া যে নবীন স্বাধীনরাষ্ট্র-চিন্তা জাগিয়াছিল তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তকে অবিলম্বে স্পর্শ করিয়াছিল। ইতিহাসের ধারা অন্য খাতে প্রবাহিত হইলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনেতৃত্ব যে মারাঠারই হস্তগত হইত তাহা শিক্ষিত মারাঠা ও শিক্ষিত বাঙ্গালী ভুলে নাই। তাই মারাঠা-ইতিহাসে এখন বাঙ্গালীর অভিনব কৌতূহল জাগিয়াছিল। সখারাম মারাঠী দলিলপত্র ঘাঁটিয়া মারাঠা ইতিহাসের কোন কোন ভূমিকাকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া বাঙ্গালী পাঠকেব গোচরে ধরিলেন। যেমন 'বাজীরাও' (১৩০৮ সাল), 'ঝান্সীর রাজকুমার' (১৩০৮ সাল), 'আনন্দীবাঈ' (১৩১০ সাল)। আধুনিক মারাঠী মনীষী মহাদেবরাও গোবিন্দ বানাড়ের পরিচয় দিয়াছেন 'মহামতি রানাড়ে' (১৯০১) গ্রন্থে। অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা—'এটা কোন যুগ ?' (১২৯৯ সাল),[৫৩] 'কৃষকের সর্বনাশ' (১৩১১ সাল), 'দেশের কথা' (১৩১১ সাল), 'বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ?' (১৯১০), ইত্যাদি।

রামপ্রাণ গুপ্তের (১৮৬৮-১৯২৭) রচনা সবই মুসলমান-ইতিহাস অবলম্বনে। যেমন, 'হজরত মোহাম্মদ' (১৩১১ সাল), 'মোগল বংশ' (১৩১১ সাল), 'পাঠান রাজবৃত্ত' (১৩১৮ সাল)। মুসলমান লেখকেরা স্বভাবতই এই দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। যেমন, সেখ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদের 'আরব জাতির ইতিহাস', আবু নাসের সইদুল্লার 'আফগান আমির চরিত', আবদুল করিমের 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত', সেখ আবদুল জব্বারের 'মক্কাশরীফের ইতিহাস' ও 'জিরুসালেম বা বরফুল মোকাদ্দিমের ইতিহাস', ইমদাদুল হকের 'মোসলেম জগতে বিজ্ঞানচর্চা' (১৩১১ সাল), ইত্যাদি। মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) 'শাহনামা' ফেরদৌসীর কাব্যের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য মর্মানুবাদ। ইতিহাসের আলোচনায় নিখিলনাথ রায় (১৮৬৫-১৯৩২) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের ভাবনিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহার 'প্রতাপাদিত্য' (১৩১৩ সাল), 'সোনার বাঙ্গালা' (১৯০৬), 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' (১৩১৭ সাল) ইত্যাদি রচনার সমাদর দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৩৮) মোগল-ইতিহাস কাহিনী রোমান্সের আকার দিয়া জনপ্রিয় করিয়াছিলেন। ইঁহার অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও গল্প ভারতী সাধনা ইত্যাদিতে বাহির হইয়াছিল।[৫৪] 'পঞ্চপুষ্প' (১৩০৯ সাল) ও 'রঙ্গমহাল' (১৩১১ সাল) ইঁহার শ্রেষ্ঠ ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীগুলির সঙ্কলন। 'ঔরঙ্গজেব' (১৯০৪), 'বঙ্গ বিক্রম' (১৯০৬) ও 'আকবরের স্বপ্ন' (১৯১১)—এই তিনখানি ইঁহার ঐতিহাসিক নাটক। ইঁহার

ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে এই দুইও উল্লেখযোগ্য—'শীশ্‌মহল' (১৯১২) ও 'সাহাজাদা খসরু'। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় গার্হস্থ্য গল্প-উপন্যাসও কয়েকখানি লিখিয়াছিলেন। যেমন, 'সতীলক্ষ্মী' (তৃ-স ১৯২১), 'স্বর্ণ-প্রতিমা', 'কমলার অদৃষ্ট', 'পরাধীনা' ইত্যাদি। ইনি অনেক ইংরেজী ডিটেক্‌টিভ গল্পেরও বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছিলেন। সেগুলি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল।

কালাপাহাড়ের কাহিনী লইয়া অন্তত তিন জন উপন্যাস লিখিয়াছিলেন—শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯০০), রসিকচন্দ্র বসু (১৯১০) ও যদুনাথ ভট্টাচার্য। গিরিশচন্দ্র ঘোষ আগেই 'কালাপাহাড়' (১৮৯৬) নাটক লিখিয়াছিলেন।

রানী ভবানীর জীবনী লইয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন হারাণচন্দ্র রক্ষিত (১৩১০ সাল) ও দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৩১৬ সাল)।

সিরাজুদ্দৌলার আমলের গোড়ার দিকের কাহিনী লইয়া একটি বৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন দীঘাপতিয়ার জমিদার শরৎকুমার রায় (১৮৭৮-১৯৩৫)। ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা ইতিহাস অনুসন্ধানে উৎসাহী ছিলেন। (বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ইঁহারাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সহযোগিতায়।) বইটির নাম 'মোহনলাল' (১৯০৮)। বইটি সুলিখিত। রচনায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সংশোধন থাকা অসম্ভব নয়। প্রকাশক লিখিয়াছেন

> এই পুস্তক বহুদিন পূর্বে রচিত হইয়া প্রায় তিন বৎসর হইল মুদ্রাযন্ত্রস্থ হইয়াছিল।...ইহা বাঙ্গালায় মুসলমান শাসনের পতন সময়ের চিত্র ও চরিত্র লইয়া লিখিত। বর্তমান পুস্তকে ঐ সময়ের প্রথমাংশের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকের আকার বৃহৎ হইয়া পড়ায় এই গ্রন্থে তৎসময়ের সম্পূর্ণ চিত্র প্রদান করার সুবিধা হইল না।...

কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেনের (১৮৪৭-১৮৯৫) 'অশোক চরিত' ভালো রচনা। ইঁহার 'বুদ্ধচরিত' গ্রন্থের অনেকটা সাধনায় বাহির হইয়াছিল (ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯ হইতে জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল পর্যন্ত)।

আরবী-ফারসী ভাষায় পণ্ডিত সিদ্ধমোহন মিত্র ভারতী সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় মুসলমান সংস্কৃতির কোন কোন বিষয় বাঙ্গালা প্রবন্ধে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন স্থায়ী কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব গবেষণার অনুরাগী ছিলেন। প্রথম জীবনে সম্বলপুরে ওকালতি এবং শেষ জীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞানের ও নৃতত্ত্বের অধ্যাপনা করিতেন। বাঙ্গালা পদ্যরচনায় বিজয়চন্দ্রের সহজ দক্ষতা ছিল। ইঁহার 'থেরগাথা', 'থেরীগাথা', ও 'গীতগোবিন্দ' অনুবাদ যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ রচনা। বিজয়চন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের গোড়ার দিকে প্রাচীন (বৌদ্ধ) ও অনার্য ঐতিহাসিক কাহিনী অথবা কিংবদন্তী অনুসরণ করিয়া কিছু গল্প ও গাথা লিখিয়াছিলেন।[৫৫] সেগুলি 'কথা ও বীথি' (১৮৯৩) ও 'কথা নিবন্ধ' (১৯০৫) বই দুটিতে সঙ্কলিত আছে। ইঁহার মৌলিক কবিতাগ্রন্থের মধ্যে 'ফুলশর' (১৯০৪), 'যজ্ঞভস্ম' (১৯০৪), ও 'হেঁয়ালী' (১৯১৫) উল্লেখযোগ্য॥

১৩ পাণ্ডিত্য ও রসিকতা : ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গদ্যে ভদ্র সরস রচনায় নেতা রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পূর্বগামী নিশ্চয়ই। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সরস রচনায় উপদেশের ফোড়ন থাকিতই। রবীন্দ্রনাথ সেদিক দিয়া যান নাই। তাঁহার 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' (নবজীবন ১২৯১ সাল), 'রসিকতার ফলাফল' (ভারতী ১২৯২ সাল) ইত্যাদি রচনায় যে অনাবিল দীপ্ত হাস্যরসের যোগান পাওয়া গেল তাহা অন্য কাহারও রচনায় দেখা যায় নাই।

সর্বদা খুব উচ্চাঙ্গের না হইলেও সরসরচনায় দুই-চারিজন দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে। কৌতুকরসাশ্রিত লঘু এবং গুরু দুই জাতীয় প্রবন্ধ লিখিয়া শিক্ষিতসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৯)[৫৬]। ইঁহার প্রবন্ধের বই 'ফোয়ারা' (১৩১৭ সাল), 'পাগলা ঝোরা' (১৩২৩ সাল), 'সাহারা' (১৩৩৪ সাল), ইত্যাদি। 'অনুপ্রাস' (১৩২০ সাল)[৫৭] ও 'ককারের অহঙ্কার' (১৩২২ সাল) শব্দসংঘট্টঘটিত অর্ধকৌতুক অর্ধ-সীরিয়াস রচনা। তাহার পরে ললিতকুমার বাঙ্গালা লেখ্য ভাষার আলোচনায় ব্যাপৃত হন। তাহার পরিচয় আছে এই পুস্তিকাগুলিতে—'ব্যাকরণ বিভীষিকা' (১৩১৮ সাল), 'সাধু-ভাষা বনাম চলিতভাষা' (১৩১৯ সাল) ও 'বানান সমস্যা' (১৩২৭ সাল)। বঙ্কিমচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলি লইয়া ইনি বিস্তৃতভাবে তৌলন আলোচনা করিয়াছিলেন। এই আলোচনা পাই এই বইগুলিতে—'প্রেমের কথা' (১৩২৭ সাল), 'সখী' (১৩২৮ সাল), ইত্যাদি। ললিতকুমারের সাহিত্যালোচনা-গ্রন্থের মধ্যে 'কাব্যসুধা' ও 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব' বই দুইটিও উল্লেখযোগ্য। ছেলেদের জন্যও ইনি কয়েকখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। সেগুলির আদরও হইয়াছিল। যেমন, 'ছড়া ও গল্প' (১৯১০), 'আহ্লাদে আটখানা' 'রসকথা' ও 'সাত নদী'। ললিতকুমারের একমাত্র গল্পের বই 'মোহিনী' (১৯২৭)। ইহাতে আটটি গল্প আছে, তাহার মধ্যে দুইটির বিষয় বিদেশি সাহিত্য হইতে নেওয়া এবং দুইটি সত্যঘটনামূলক। কৈফিয়তে লেখক বলিয়াছেন

> নিরবলম্বে গল্পলেখা এই অক্ষম লেখকের শক্তিতে কুলায় না, এবং স্বীকারোক্তি অনেকদিন পূর্বে 'বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষে'র উপলক্ষে করিয়াছিলাম। 'দাদামশায়' গল্প লিখিতে গিয়াও অর্ধপথে থামিয়া গিয়াছিলাম।

টীকা

১ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিভা দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী একসঙ্গে কিছুকাল (১৩০২-১৩০৪ সাল) এবং সরলা দেবী একাকী (১৩০৬-১৩১৪ সাল) ভারতীর সম্পাদনা করিয়াছিলেন। হিতেন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ ১৩০৪ সালে 'পুণ্য' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। ইহাতেও প্রধানত ঠাকুর-বাড়ির নবীন ও কিছু কিছু প্রবীণ লেখকদের রচনা স্থান পাইয়াছিল। হিতেন্দ্রনাথের (১৮৬৭-১৯০৮) দুইখানি কবিতাগ্রন্থ বাহির হইয়াছিল, 'শতদল' ও 'ত্রিশূল' (১২৯৫ সাল)। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং চিত্রকলারও চর্চা করিতেন। ঋতেন্দ্রনাথ ইঁহার কবিতাসংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন 'হিতগ্রন্থাবলী' (প্রথম খণ্ড) নামে (১৩১৮ সাল)। ইহাতে হিতেন্দ্রনাথের আঁকা কিছু ছবিও আছে।

সরলা দেবী ভালো গদ্য লিখিতেন। ফারসী ভাষাতে ইহার জ্ঞান ছিল। ফারসী হইতে ইনি 'লান্‌করানের উজ্জীর' নাটক অনুবাদ করিয়াছিলেন (ভারতী, ১৩০১ সাল)।

২ পরে হাইকোর্টের জজ এ. চৌধুরী নামেই সমধিক পরিচিত। ইহার ভগিনী প্রসন্নময়ী দেবী কবি এবং লেখিকারূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভ্রাতা প্রমথনাথ চৌধুরীর ও ভাগিনেয়ী প্রিয়ম্বদা দেবীর সাহিত্যসৃষ্টির কথা যথাস্থানে বলিব।

৩ ইনিই বাল্মীকি-প্রতিভার নামভূমিকায় সাজিয়াছিলেন। মনে হয় ইহার নামেই নাট্যরচনাটির নামকরণ।

৪ 'জীবনস্মৃতি' দ্রষ্টব্য।

৫ 'কাব্যজগৎ' (আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, মাঘ, ফাল্গুন); 'কথার উপকথা' (কার্তিক) সাধকসঙ্গীতের সমালোচনা (অগ্রহায়ণ)। এই সমালোচনাতে আশুতোষ রামপ্রসাদের জীবনী লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন।

৬ প্রথম প্রসঙ্গ। এটিতে আছে শেলির ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক লইয়া তৌলন আলোচনা।

৭ ভারতী-ও-বালক, চৈত্র ১২৯৩।

৮ প্রচলিত ধারণা অনুসারে রবীন্দ্রনাথ হিতবাদীর প্রথম ছয় সংখ্যায় এক-একটি করিয়া ছয়টি ছোটগল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন। "ছয়" সংখ্যাটি ভুল না হইতে পারে তবে কোন কোন সংখ্যায় যে একাধিক গল্প বাহির হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সমসাময়িক সাক্ষ্য আছে। প্রথম তিন সংখ্যা হিতবাদী পড়িয়া এক ছদ্মনামা ("গরিব ব্রাহ্মণ") সমালোচক 'নব্যভারত'-এ (আষাঢ় ১২৯৮) লিখিয়াছিলেন, "প্রত্যেক সংখ্যাতে একাধিক গল্প থাকিলে প্রবন্ধ দারিদ্র্য মনে হয়। এবং দুটী ক্ষুদ্র গল্পে যে স্থান দেওয়া যায়, তাহা একটী গল্পে দিলে তাহা অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ হয়।"

৯ হিতবাদীতে প্রকাশিত গল্পগুলি উপলক্ষ্যে উক্ত সমালোচকের অভিমত,—"গল্পগুলিতে একটু প্লট (plot) না থাকিলে, তাহা প্রায়ই মনোহর হয় না। তার পর কি হইল, তার পর কি হইল, জানিবার ইচ্ছা যে গল্প উদ্দীপিত না করে সেই গল্পই অধিকাংশ স্থলে প্রায় পঠিত হয় না। যেরূপ গল্প বাহির হইতেছে, ভরসা করি তদপেক্ষা শীঘ্র মনোহর গল্প বাহির হইবে।"

১০ সাধনা পুরাপুরি রবীন্দ্রনাথের পত্রিকা ছিল। তবে সম্পাদক ছিলেন নামে মাত্র তাঁহার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ, ঠাকুর-বাড়ির প্রথম বি-এ পাস গ্র্যাজুয়েট। জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছে বলা বাহুল্য যে পনেরো বছর বয়সে তাঁহার প্রথম গদ্য-রচনার প্রতিবাদে একজন বি-এ কলম ধরিতেছেন শুনিয়া অবধি অনেক দিন পর্যন্ত বি-এ পাস গ্র্যাজুয়েটের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সভয় সম্ভ্রম ছিল। সুধীন্দ্রনাথকে সম্পাদক করায় কি ইহারই ইঙ্গিত ?

১১ মানসীতে সঙ্কলিত 'শেষ উপহার' (রচনাকাল ৯ কার্তিক ১২৯৭)।

১২ যেমন 'বীণা' (সাধনা, কার্তিক ১২৯৯) ও ওমর খয়্যামের রুবাইয়াতের অনুবাদ (ভারতী, বৈশাখ ১৩০৮)।

১৩ ফাল্গুন ১২৯৮।

১৪ চৈত্র ১২৯৮।

১৫ বৈশাখ ১২৯৯।

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯।

১৭ আষাঢ় ১২৯৯।

১৮ শ্রাবণ ১২৯৯।

১৯ ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯।

২০ 'প্রসঙ্গ কথা' ('কথার ভেল্কি'), পৌষ।

২১ 'শিক্ষা প্রণালী', মাঘ।

২২ ভারতী, বৈশাখ ১৩০৮। রচনাকাল ভাদ্র ১৩০৭।

২৩ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকায় (১৩৭৫ সাল) 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসখা ও প্রমথনাথ চৌধুরী' দ্রষ্টব্য।

২৪ 'তখনকার কথা' সাধনা, চৈত্র ১২৯৮।

২৫ প্রদীপ, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬।

২৬ ভারতী, পৌষ ১২৯৬।

২৭ ভারতী ফাল্গুন ১২৯৫।

২৮ ভারতী, আশ্বিন ১২৯৭।

২৯ বলেন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রথম সঙ্কলন করিয়াছিলেন ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গ্রন্থাবলী' (১৩১৯ সাল)। সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হইয়াছে (১৩৫৯ সাল)।

৩০ সাধনা, ফাল্গুন ১৩০০।

৩১ ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭।

৩২ মৃঢ়তা।

৩৩ অবসান।
৩৪ দিনযাপন।
৩৫ অপরাহ্নে।
৩৬ পথে পথে।
৩৭ সুনিপুণা।
৩৮ কলসীর সুখ।
৩৯ অসমাপ্ত।
৪০ 'কোথা ?' (শ্রাবণী)।
৪১ এ কথা অবশ্য আক্ষরিক সত্য নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে (১৩১২ সাল) ইনি ব্রতকথা-পাঁচালীর রীতিতে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনা করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি লালকালিতে পুথির ধরনে আড়াআড়ি ভাবে ছাপা হইয়াছিল।
৪২ রচনাসংগ্রহ—'রামেন্দ্রসুন্দর-গ্রন্থাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত।
৪৩ 'ক্ষুদ্র ও বৃহৎ' নামক প্রবন্ধটি ১৮৯৬ অব্দের মাঘ সংখ্যা 'দাসী'তে বাহির হইয়াছিল।
৪৪। ইহার ডিটেক্‌টিভ গল্প 'দলিল-চুরি' ১৩১০ সালের কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় চতুর্থ পুরস্কারপ্রাপ্ত হইয়াছিল।
৪৫ *Sophia* (ডিসেম্বর ১৮৯৪) হইতে অনূদিত। প্রবোধচন্দ্র সিংহ প্রণীত 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
৪৬ 'চার অধ্যায়' প্রথম সংস্করণের পরিবর্জ্জিত ভূমিকা।
৪৭ ১৯০৬ অব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। চিঠিগুলি সবই প্রথমে বঙ্গবাসীতে বাহির হইয়াছিল।
৪৮ অক্‌স্‌ফোর্ড হইতে লেখা (২ জানুয়ারি ১৯০৩)।
৪৯ প্রথম প্রকাশিত চার-অধ্যায়ের 'আভাস' হইতে। কোন বিশেষ একটি সাধুসম্প্রদায়ের তরফ হইতে আপত্তি উঠায় রবীন্দ্রনাথ অবিলম্বে ভূমিকাটি পরিবর্জ্জন করেন।
৫০ শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৬১) দ্রষ্টব্য।
৫১ গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাশিম' নাটকের জনপ্রিয়তা তুলনীয়।
৫২ প্রথম প্রকাশ সাহিত্যে (মাঘ ১৩১১ সাল হইতে)।
৫৩ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ-আকারে প্রকাশিত।
৫৪ যেমন ১২৯৯ সালে ভারতীতে 'রুধিরোৎসব', 'লাল বারদোয়ারি', 'মথুরায় বৌদ্ধাধিকার', 'নূরজাহান' ও 'মুসলমান রাজদণ্ডবিধি'; সাধনায় (অগ্রহায়ণ ১২৯৯) 'জাহাঙ্গিরের মদিরাসক্তি'।
৫৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (আনন্দ সংস্করণ) পৃ ৪২৮-৪২৯ দ্রষ্টব্য।
৫৬ প্রথম প্রবন্ধ 'গোরুর গাড়ী' ১৩১১ সালে কার্তিক সংখ্যা সাহিত্যে বাহির হইয়াছিল।
৫৭ 'অনুপ্রাসের অট্টহাস' নামে প্রবাসীতে (১৩১৯ সাল) প্রথম প্রকাশিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
চিত্র ও চরিত্র

১ রবীন্দ্রবন্ধু

দেশের জীবনকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে, সংসারের ও সমাজের সব ক্ষেত্রে সব অবস্থায়, জানিতে ও জানাইতে বাসনা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ সাধনার মাধ্যমে। তাঁহার ছোটগল্পে এই উদ্দেশ্য অনেকটা সাধিত হয়। তবে গল্পগুচ্ছে যে-বাঙ্গালী মানুষের জীবনের যে-স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে তাহাতে অন্তর-বাহির কোনটিই ঢাকা নাই। বাঙ্গালী জীবনের শুদ্ধ বাহিরের রূপটুকু তাহার সংসারের-সমাজের মেঘরৌদ্রচ্ছবি, আঁকিবার জন্য তিনি নবীন লেখকদের আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার সে ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন সাহিত্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র এবং ভ্রাতৃবন্ধু কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারী। পরে আরও কয়জন লেখক এই কাজে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮) ছিলেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবি বলরাম দাসের বংশধর। যৌবনে ইঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্যের পরিচয় 'ছিন্নপত্র'-এর কয়েকটি চিঠিতে ও 'মানসী'র দুই একটি কবিতায় আছে। শ্রীশচন্দ্রের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ 'পদরত্নাবলী'র সঙ্কলন করিয়াছিলেন (১২৯২ সাল)। শ্রীশচন্দ্রের বড় গল্প ও উপন্যাসের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।[১] সাধনার সময়ে শ্রীশচন্দ্র বিহারে রাজকর্মচারী। সাধনায়, ভারতীতে ও বঙ্গদর্শনে তিনি বিহারের গ্রাম্যজীবনের আলেখ্য কিছু কিছু আঁকিয়া দিলেন।[২] বাঙ্গালার পল্লী-জীবনও বাদ যায় নাই।[৩] শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের (?-১৯১৪) চিত্রগুলিতে গল্পের রস সঞ্চারিত হইল।[৪] 'চিত্র-বিচিত্র' নামে সঙ্কলিত (১৯০২) এই সব রচনায় বৃহৎ সংসারের বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে ভদ্র বাঙ্গালী-জীবনের ব্যর্থ প্রয়াস ও অসার্থক অভীপ্সা সকৌতুক সরলতার সহিত বর্ণিত। 'ইন্দু' (১৩০৯ সাল)[৫] ও 'পূজার ফুল' (১৯১৩)[৬] বড় গল্প। শরৎকুমারী চৌধুরানী (১৮৬০-১৯২০) চমৎকার গার্হস্থ্য ও পারিবারিক চিত্র আঁকিয়াছিলেন।[৭] ইঁহার 'শুভবিবাহ' (১৩১২ সাল) উপভোগ্য ঘরোয়া

ছবি। ভারতীতে পরে প্রকাশিত চিত্রগুলি শরৎকুমারীর রচনাবলীতে সঙ্কলিত হইয়াছে।[৮]

রবীন্দ্রনাথের উপর ভারতীর সম্পাদনভার এক বছরের জন্য বর্তিয়াছিল (১৩০৫ সাল)। সেই বৎসর ভারতীতে অনেকগুলি চিত্র ও চিত্রগল্প বাহির হইয়াছে। যেমন, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের [৯] 'ষষ্ঠীব্রতের কথা' ও 'সামাজিক চিত্র'; শিবধন বিদ্যার্ণবের 'চতুষ্পাঠী'[১০], রাজনারায়ণ বসুর 'আমার ছাত্রাবস্থা'[১১], দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর 'ষ্টুডেন্ট্ মেস' ও 'ডেলি প্যাসেঞ্জার'; শরৎচন্দ্র রাহার 'কলিকাতার ছাত্রাবাস' ॥

২ দীনেন্দ্রকুমার রায়, যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ

শ্রীশচন্দ্র-শৈলেশচন্দ্রের অনুসরণে দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) উত্তর-মধ্যবঙ্গের পল্লীচিত্র নিয়মিতভাবে ভারতীতে প্রকাশ করিতে থাকেন। ইনি কবিতা লিখিতেন, এবং বরাবর লিখিয়া গিয়াছেন রোমন্টিক ও ডিটেক্‌টিভ্ কাহিনী ইংরেজীর অনুবাদ ও অনুসরণ করিয়া। দীনেন্দ্রকুমারের 'পল্লীচিত্র' (১৩১১ সাল) বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। 'পল্লীবৈচিত্র্য', 'পল্লীচরিত্র' এবং 'পল্লীকথা'ও সেইমতো উপভোগ্য। ইহা ছাড়াও দীনেন্দ্রকুমারের আর কয়েকটি পুস্তক হইল—বাসন্তী (গল্পসমষ্টি ১৩০৫), হামিদ (১৮৯৯), অজয়সিংহের কুঠী (১৩০৯ সাল, ফরাসী হইতে) চীনের ড্রাগন (১৯১৪) ইত্যাদি।

যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৭ ১৯৬০) বহু পল্লীকাহিনীকে গল্প-রূপ দিয়াছিলেন ভারতী প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠায়। সেগুলি সব সংগৃহীত হয় নাই। যোগেন্দ্রকুমারের স্টাইল তাঁহার নিজস্ব, সহজ সরল স্পষ্ট। হিতবাদীর সহকারী সম্পাদকরূপে ইনি যে সরস টিপ্পনীগুলি লিখিতেন তাহা পরে 'বৃদ্ধের বচন' নামে সঙ্কলিত হয় (১৯১৮)। ইঁহার গল্পের বই 'আগন্তুক' (১৯০৬), 'জামাই-জাঙ্গাল' (১৯০৯), ইত্যাদি।

অবিনাশচন্দ্র দাসের (?-১৯৩৬) 'পলাশবন' (১৮৯৬)[১২] সুখপাঠ্য গল্পচিত্র।

যতীন্দ্রমোহন সিংহের (১৮৫৮-১৯৩৭) 'উড়িষ্যার চিত্র' (১৯০৩) অত্যন্ত উপভোগ্য লোকচিত্রময় উপন্যাস। উড়িষ্যার সামাজিক ও আর্থিক ইতিহাসের অন্যথা অলভ্য বিশেষ মূল্যবান্ উপাদান ইহাতে সংগৃহীত আছে।[১৩] চিত্রগুলি প্রথমে কয়েকবছর ধরিয়া ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩০৭-০৯ সাল)। সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ এই রচনাগুলির প্রতি পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন

> লেখক উড়িষ্যাখণ্ডকে বেশ করিয়া জানিয়াছেন। কোন দেশে বেশিদিন বাস করিলেই যে তাহাকে জানা যায় তাহা নহে, জানিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। স্বদেশ স্বগ্রামকেই বা কয়জন লোক জানে? সচেতন চিত্ত এবং সর্বদর্শী কল্পনা বিধাতার দুর্লভ দান। আবার, জানিলেই জানানো যায় না। যতীন্দ্রবাবুর জানিবার শক্তি এবং জানাইবার শক্তি উভয়েরই ভালরূপ পরিচয় পাওয়া গেছে। এবারে তিনি উড়িষ্যার মঠের ছবি দিয়াছেন—তাঁহার মঠের করুণহৃদয় ভক্ত মোহান্তের সহিত মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হইবে আশা করিয়া রহিলাম।

যতীন্দ্রমোহন উড়িষ্যায় বহুদিন ছিলেন। সেটেল্‌মেণ্ট কর্মচারীরূপে তাঁহাকে উড়িষ্যার অভ্যন্তরে বিচরণ করিতে হইয়াছিল। দীর্ঘকালের সেই অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁহার দৃষ্টিকে প্রসন্নতা দিয়াছিল। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছিলেন

> ১৮৯২ সালের এপ্রিল মাসে যখন রাজকার্য্যোপলক্ষে প্রথম উড়িষ্যায় যাইতে বাধ্য হই, তখন নিজেকে নির্বাসিতের ন্যায় নিতান্ত দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই মনোমুগ্ধকর প্রদেশে অধিকদিন বাস করিতে গিয়া, তাদৃশ মনের ভাব বেশীদিন থাকিল না। তাহার পরবর্তী সাত বছর কাল উড়িষ্যার নানাস্থানে অবস্থান করিয়া সেই দেশের প্রতি মমতাকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। এমন কি, সর্ব্বশেষে উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিবার দিন, নিতান্ত দুঃখিত হৃদয়ে সে দেশের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলাম।
>
> এই সাত বৎসরে নানাস্থান দেখিয়া শুনিয়া ও বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার দ্বারা আমার নোট-বুকে অনেকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম।...

উড়িষ্যা ধনীর দেশ নয়, ভদ্র ও ভালো মানুষের দেশ। যতীন্দ্রমোহন যে-উড়িষ্যার চিত্র আঁকিয়াছেন তা বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগের। এখন উড়িষ্যার আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেই কারণে উড়িষ্যার-চিত্র বইটির একটু অতিরিক্ত মূল্য আছে। যতীন্দ্রমোহন সাধারণত গরীব গৃহস্থের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু ধনী শিক্ষিতের কথাও বাদ যায় নাই। সব দৃশ্যের সব চরিত্রের বর্ণনাতেই লেখক যথাসম্ভব আতিশয্য পরিহার করিয়াছেন এবং নিজের সংবেদনশীল স্বচ্ছ দৃষ্টির আলো ফেলিয়াছেন। তাহাতে চিত্রগুলি হৃদ্য হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যথার্থ।

একটি চিত্রাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। নীলকণ্ঠপুর গ্রামের মহাজন পঙ্কজ সাহুর দরবার।

> অপরাহ্ণ কাল। বারান্দা-সংলগ্ন তুলসী মঞ্চের উপরে বৃদ্ধ পঙ্কজ সাহু একটি কুঁড়োজালি (মালার বোটুয়া) হাতে করিয়া মালা জপ করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে একখানি মোটা, ময়লা, দেশী ধুতি—তাহা ধুতি, কি গামছা, ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। তবে এ কথা নিশ্চয় যে তাহা ৩/৪ মাস রজকের হস্তগত হয় নাই। গায়ে একখানা ময়লা গামছা। সর্ব্বাঙ্গে তিলকের ছাপ। তাহার জিহ্বা মদৃস্বরে "ক্রুষ্ণ" "ক্রুষ্ণ" উচ্চারণ করিতেছে...
>
> "পিণ্ডার" দক্ষিণভাগে একটি ময়লা শতরঞ্জ পাড়া। তাহার উপরে মহাজনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিম্বাধর সাহু উপবিষ্ট। বিম্বাধরের শরীর কিঞ্চিৎ স্থূল। বর্ণটি কালো, কিন্তু উজ্জ্বল, বার্নিশ করা। দুই কানে দুইটি বড় বড় সোনার "নুলী" (কুণ্ডল) ও গলায় একছড়া সোনার "কণ্ঠী"। অনবরত পান খাওয়াতে তাঁহার দাঁতগুলি পাকা কালো জামের শোভা ধারণ করিয়াছে। মস্তক কপাল পর্যন্ত মুণ্ডিত ; তাহার উপরে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে চুল ছোট করিয়া থাক্ কাটা, তাহার উপরে কুঞ্চিত কেশদামে মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে খোঁপা বাঁধা। কপালের ঠিক উপরে একটা বড় তিলকের ফোঁটা। কোমরে একছড়া রূপার "অণ্টাসুতা" (গোট) ছাড়া একটি পানের বোটুয়া ঝুলিতেছে।
>
> বিম্বাধরের নিকট "ছামকরণ" (গোমস্তা) বিচিত্রানন্দ মাহান্তি বসিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে এক বস্তা লম্বা তালপত্র ; তিনি বামহস্তের তলে একটি লম্বা তালপত্র রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলি দ্বারা একটি লোহার লেখনী সজোরে ধারণ করিয়া কর্ কর্ শব্দে লিখিতেছেন (বা খাঁড়িতেছেন)।...
>
> তাঁহার সম্মুখে বারান্দার নীচে গলির মধ্যে চারিজন লোক বসিয়াছিল। বিচিত্রানন্দ লেখা শেষ করিয়া বলিলেন, "আরে দামবারিক! তোর হিসাব হইল...একুনে ২৮১ টাকা হইল—বুঝিলি ত?""
>
> দামবারিক কলিকাতা ফেরত। তাহার নিদর্শন স্বরূপ দামবারিকের মাথায় টিকি ছাঁটা। তাহার হাতে একটা কাপড়ের ছাতা, এবং স্কন্ধদেশে একখানা ময়লা তোয়ালে বিদ্যমান।

উড়িষ্যার চিত্র আঁকিবার পূর্বে যতীন্দ্রমোহন 'সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব বিচার' (১৮৯৮) লিখিয়াছিলেন, এবং পরে লিখিয়াছিলেন উপন্যাস—'ধ্রুবতারা' (১৯০৭, অ-স ১৯২৪) ও 'অনুপমা' (১৯১৮)। ধ্রুবতারা বইটি সাধারণ পাঠকের সমাদর পাইয়াছিল।[১৪] কিছু কিছু গল্পও লিখিয়াছিলেন। গল্পের বই—'তোড়া' (১৯১৭), 'গল্পমাল্য' (১৯৩৩) ও 'সন্ধি' (১৯৩৪)। শেষে ইনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সাহিত্য বিচারেও নামিয়াছিলেন। সে কথা পরে আলোচনা করা হইতেছে।

যতীন্দ্রমোহন গুপ্তের 'বেহার-চিত্র' (১৯২১) গল্পগুলিও উল্লেখযোগ্য রচনা। ইনি কিছু উপন্যাস ও কবিতাও লিখিয়াছিলেন।

ডায়ারি ধরনের রচনার মধ্যে বস্তুগর্ভ রত্নখনি হিসাবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' (প্রথম খণ্ড ১৩১০ সাল)।[১৫] ইহাতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মুখের বাণী যথাসম্ভব যথাযথভাবে সঙ্কলিত ॥

৩ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, সুধীন্দ্রনাথ (১৮৬৯-১৯২৯) বোধ করি ঠাকুর-বাড়ির প্রথম গ্র্যাজুয়েট বলিয়া সাহিত্য-সাধনায় অগ্রসর হইবার আগেই সাধনার সম্পাদকের মর্যাদা পাইয়াছিলেন। সাধনায় ইঁহার গদ্য-পদ্য রচনা কিছু কিছু বাহির হইয়াছিল। তবে প্রথম দিকে কবিতা রচনাতেই সুধীন্দ্রনাথের ঝোঁক বেশি ছিল। সুধীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি 'বৈতানিক' (১৯১২) 'ও 'দোলা' (১৯১৩) নামক পুস্তিকা দুইটিতে সঙ্কলিত। শান্ত ও বাৎসল্য রসের অন্তর্বাহী ধারা সুধীন্দ্রনাথের রচনার বিশেষত্ব। এখানে লেখক কতকটা দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাবে পড়িয়াছেন বলিতে পারি। (কলিকাতায় দেবেন্দ্রনাথের আসরে সুধীন্দ্রনাথের গতায়াত ছিল)। কবিতাগুলি প্রায় সবই চতুর্দশপদী. এবং এগুলির গঠনে রবীন্দ্রনাথের নিশ্চিত প্রভাব আছে। সুধীন্দ্রনাথের শিশু কবিতার একটি নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি।

এণা

জননী অদূরে বসি' কোলের ছেলেরে
স্নেহের বন্ধনে বক্ষে ধরি' পহুফেরে
দিতেছিল সুধা-নীর—আর মাঝে মাঝে
কত না অপূর্ব ভাষে খোকা-মহারাজে
করে সম্ভাষণ ;—যত না আদর বাড়ে
কন্যা জ্বলে' যায় তত—চাহে আড়ে আড়ে ;
খেলা তার হ'ল ভার, আসি' একছুটে
মায়েরে জড়ায়ে ধরি'—আধ কথা ফুটে,—
বলে. "মা, খোকারে রাখি' লহ না আমারে !"—
"লহ না আমারে !" কেঁদে বলে বারে বারে।
খোকারে নামায়ে তবে থামে সে রাক্ষসী,
জননীর কোলে যেন হাতে পেল শশী !'[১৬]

সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক পরিচয়ের মুখ্য প্রকাশ তাঁহার ছোটগল্পে। এগুলি প্রথমে এবং

প্রধানত 'সাহিত্য' পত্রিকাতেই বাহির হইত। ইঁহার গল্পসঙ্কলন হইল 'মঞ্জুষা' (১৯০৩) ও তাহার পরিবর্ধিত সংস্করণ 'চিত্রালী' (১৯১৬), 'চিত্ররেখা' (১৯১০) এবং 'করঙ্ক' (১৯১২)। 'মায়ার বন্ধন' (১৯০৪) বড় গল্প। 'প্রসঙ্গ' (১৯১১) প্রবন্ধের বই।

সুধীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গল্পগুলি শান্ত বাৎসল্যের করুণ মাধুর্যে অভিষিক্ত। 'খ্রীষ্টানের আত্মকথা'[১৭], 'বুড়ি', 'পাগল', 'পোড়ারমুখ' ইত্যাদি গল্পগুলির মূল্য স্থায়ী। 'কাসিমের মুরগী'[১৮] বাঙ্গালা ভাষায় দুই-তিনটি উৎকৃষ্ট পশু-গল্পের অন্যতম। 'সন্তোষিণীর ডায়ারি'[১৯] কথ্যভাষায় লেখা। ভাব ভাষা ও বস্তু সব দিক দিয়াই চমৎকার ॥

৪ জলধর সেন

জলধর সেন (১৮৬১-১৯৩৯) ছিলেন সাময়িকপত্র-সেবী সাহিত্যিক। প্রথম জীবনে ও মধ্য জীবনে দুই চার বছর বিদ্যালয়ে ও গৃহে শিক্ষকতা ছাড়া তিনি পর পর এই সাময়িক পত্রগুলির সম্পাদনকার্যে সহায়তা অথবা সম্পাদন করিয়াছিলেন—'গ্রামবার্তা', 'বঙ্গবাসী', 'বসুমতী', 'সন্ধ্যা', 'হিতবাদী', 'সুলভ সমাচার' এবং 'ভারতবর্ষ'। জলধর সাহিত্যের দীক্ষা পাইয়াছিলেন হরিনাথ মজুমদার ওরফে "কাঙ্গাল হরিনাথ"-এর কাছে। হরিনাথের গ্রামবার্তাতেই ইঁহার প্রথম রচনাগুলি বাহির হইয়াছিল। হরিনাথের জীবনী লিখিয়া[২০] এবং হরিনাথের গ্রন্থাবলী সঙ্কলন করিয়া (১৩০৮ সাল) জলধর উপযুক্ত শিষ্যকৃত্য করিয়াছেন। সংসারের দুঃখশোকে বীতস্পৃহ হইয়া জলধর যৌবনে বছর তিনেকের জন্য দেশ ছাড়িয়া (১৮৯৭-৯৯) দেরাদুনে গিয়া শিক্ষকতাকার্য গ্রহণ করেন। সেই সূত্রে তাঁহার হিমালয়-চিত্রাবলী ভারতী পত্রিকায় বাহির হইতে থাকে (১২৯৯-১৩১০ সাল)। 'সাহিত্য' পত্রিকাতেও জের চলিয়াছিল (১৩০১-১৩০৭ সাল)। 'প্রবাস-চিত্র' (১৩০৬ সাল), 'হিমালয়' (১৩০৬ সাল), 'পথিক' (১৩০৮ সাল), 'হিমালয়-বক্ষে' (১৩১১ সাল), 'হিমাদ্রি' (১৯১১) ইত্যাদিতে সঙ্কলিত এই হিমালয়-ভ্রমণের ছবিগুলি বহু পাঠককে সহস্রধারা দেবপ্রয়াগ কর্ণপ্রয়াগ নন্দপ্রয়াগ বিষ্ণুপ্রয়াগ যোশীমঠ পাণ্ডুকেশ্বর বদরিকা গঙ্গোত্রী ইত্যাদি নানা হিমালয় তীর্থে ও সংকটে আনন্দের মানসভ্রমণ করাইয়া ফিরিয়াছে। পরবর্তী কালে জলধর অনেক গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছিলেন কিন্তু মনোহারিত্বে ও প্রত্যয়গুণে এই ভ্রমণচিত্রগুলিই শ্রেষ্ঠ।

জলধরের প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয় দাসীতে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ছোটগল্প বাহির হইবার পরের মাসে।[২১] তাহার পর ইঁহার গল্প সাহিত্যে বাহির হইতে থাকে। 'ছোট কাকী ও অন্যান্য গল্প' জলধরের প্রথম গল্পসংগ্রহ। ইহার দুইটি গল্প দীনেন্দ্রকুমাব বাযেব লেখা। মহিষাদলে শিক্ষকতা করিবার সময় জলধর দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সংস্পর্শে আসেন। সাহিত্যরচনার এই প্রথমদিকে দীনেন্দ্রকুমারের সহযোগিতা জলধরের পক্ষে সবিশেষ অনুকূল হইয়াছিল[২২]। (দীনেন্দ্রকুমারও ছিলেন গল্প-চিত্রকর, তবে হিমালয়ভ্রমণের নয় গ্রাম্যজীবনের)। দ্বিতীয় গল্পসংগ্রহ 'নৈবেদ্য' (১৩০৭ সাল)। তাহার পর 'নূতন গিন্নী ও অন্যান্য গল্প' (১৩১১ সাল), 'পুরাতন পঞ্জিকা' (১৩১৬ সাল), 'আমার বর ও অন্যান্য গল্প' (১৩১৯ সাল), 'পরাণ মণ্ডল' (১৩২১ সাল), 'আশীর্বাদ' (১৩২৩ সাল), 'এক পেয়ালা চা' (১৩২৫ সাল), 'পাগল' (১৩২৭ সাল), 'কাঙ্গালের

ঠাকুর' (১৩২৭ সাল), 'মায়ের নাম' (১৩২৮ সাল), ও 'বড় মানুষ' (১৩৩৬ সাল)।

জলধরের প্রথম বড় গল্প 'দুঃখিনী' (১৩১৬ সাল) তাঁহার প্রথমজীবনের রচনা[২৩]। পরে 'বড়বাড়ী' নামে প্রকাশিত (১৩২৩ সাল), 'মিত্র-পরিবার'ও এই সময়ের লেখা। জলধরের প্রথম জনপ্রিয় উপন্যাস 'বিশুদাদা' (১৯১১, দ্বি-স ১৯১৫)।[২৪] তাহার পর বাহির হয় 'করিম সেখ' (১৩১৯ সাল), 'কিশোর' (১৯১৫), তিন খণ্ড 'অভাগী' (১৯১৫-৩২), 'ঈশানী' (১৩২৫ সাল), 'হরিশ ভাণ্ডারী' (১৩২৬ সাল), 'চোখের জল' (১৩২৭ সাল), 'ষোল আনি' (১৩২৭ সাল), 'সোনার বালা' (১৩২৮ সাল), 'দানপত্র' (১৩২৯ সাল), 'শিবসীমন্তিনী' (১৩৩১ সাল), 'পরশ-পাথর' (১৩৩১ সাল), 'ভবিতব্য' (১৩৩২ সাল), 'তিন পুরুষ' (১৩৩৫ সাল)[২৫] এবং 'উৎস' (১৩৩৯ সাল)।[২৬]

জলধরের রচনার বিশেষ গুণ সারল্য ও স্বচ্ছতা। পল্লীগ্রামের দরিদ্র ভদ্রজীবনের আর্থিক ও সামাজিক দুঃখবেদনা ইঁহার গল্প-উপন্যাসের বিশেষ বস্তু। নির্যাতিত ও নিপীড়িত নারীর পক্ষ লইয়া জলধর সাহিত্যের দরবারে—নালিশ নহে, ক্ষীণ অনুযোগ—তুলিয়াছিলেন। সে কাজ হরিনাথের শিষ্যেরই উপযুক্ত। পতিত নারীর পক্ষ নেওয়াতে জলধরকে আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বগামী মনে করিলে ভুল করিব না ॥

৫ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১২৭২-১৩৩৮ সাল) ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ইঁহার গভীর অধিকার ছিল সঙ্গীতবিদ্যায়। গদ্য রচনায় সুরেন্দ্রনাথের স্টাইল তাঁহার নিজস্ব। এবং সে স্টাইল গল্পের বিষয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। সকৌতুক ব্যঙ্গ—তা প্রণয়কাহিনী হোক অথবা ভ্রমণবৃত্তান্ত হোক—সুরেন্দ্রনাথের রচনাকে অনুকরণের অতীত করিয়াছে। গল্পগুলি দুইটি সঙ্কলনে সংগৃহীত আছে—'ছোট ছোট গল্প' (১৯১৫) এবং 'কর্মযোগের টীকা ও অন্যান্য গল্প' (১৯১৬)। পরবর্তী কালে প্রকাশিত গল্পগুলি এখনও সঙ্কলিত হয় নাই।

সুরেন্দ্রনাথের গল্প ও চিত্র এখন অপরিচয়ের রাহুগ্রস্ত। তাই তাঁহার রচনারীতির কিছু নিদর্শন দেওয়া আবশ্যক মনে করি। অল্প পয়সায় আনন্দপর্যটনের অভিলাষী হইয়া লেখক তিন বন্ধু ও দুই পাড়াপ্রতিবেশী সহকারে এক শনিবার প্রাতঃকালে ঘাটালের স্টীমারে উঠিয়াছিলেন। সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা 'আনন্দ পর্যটন' গল্পচিত্রে বর্ণিত হইয়াছে। পর্যটকেরা গেঁওখালি হইতে নৌকা করিয়া বেলা তিন প্রহর অতীত হইলে পর তেরোপেক্যা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

> তেরোপেক্যা গ্রামটি দ্বাপর যুগের বলিয়া বোধ হইল। কোনও রোগ শোক নাই। তবে কখনও কখনও বিসূচিকা হয়। গ্রামের বিশেষত্ব এই যে, সেটা মাঠের মধ্যে, এবং মাঠের বিশেষত্ব এই যে, সেটা গ্রামের মধ্যে। উভয়ে উভয়,—হরিহরাত্মা। মানুষ মাঠে চরিয়া বেড়ায়, এবং গাভীগণ সবৎস গ্রামে চরিয়া বেড়ায়। কাহারও সহিত কাহারও দ্বন্দ্ব নাই। স্ত্রীলোকগণের চুল ছোট ও পুরুষগণের দীর্ঘ।
>
> দীনুবাবুর কাছারী-বাটী পহুঁছিয়া আমরা একটি বৃহৎ আটচালা অধিকার করিলাম। কাছারী-বাটীর নিকটেই একটি পুষ্করিণী, কিন্তু সেটা নূতন কাটান হইয়াছে। মাছ নাই।

জল অতিশয় সুমিষ্ট। পূর্বে সেখানে চিনির আড়ত ছিল।...

নিকটেই মিষ্টান্নের দোকান। তাহাতে একই প্রকার মিষ্টান্ন। সেটাকে সন্দেশ, কিংবা মনোহরা, কিংবা রসকরা, অথবা তিলেব নাড়ু বলিতে পাবেন। একাধারে বহু মুখরোচক পদার্থ সন্নিবিষ্ট ও সুচারুভাবে মিশ্রিত। প্রত্যহ একই ভাব, একই ওজনে প্রস্তুত হয়, এবং প্রত্যহ একই লোকে খায়। খাদ্য ও খাদকেব এই চিরন্তন পরিচয় ও স্নেহ-সম্বন্ধ অটুটভাবে কলের ন্যায় চলিতেছে। কেবল আমাদিগের সমাগমে ওজনটা অর্ধসেব বাড়িযাছিল।

সুরেন্দ্রনাথের গল্পগুলিতে গভীরতা নাই, তবে উজ্জ্বল চরিত্রচিত্রণ আছে। আর আছে চাপা হাসিব তড়িৎদীপ্তি। কঠিন গল্প একটি মাত্র আছে, 'যে হেতু ও সে হেতু'।[২৭] প্লট-নির্মাণেব কৌশলে ও বচনারীতির খর্বছন্দে গল্পটির বিষয়ের কদর্যতা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। যেকালে গল্পটি লেখা হইয়াছিল সেকালের পক্ষে কাহিনীর বাস্তবতা অসমসাহসিক বলিতে পাবি ॥

৬ কুন্তলীন পুরস্কার

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায গল্প লিখিতে সবে শুরু করিযাছেন এমন সময় ছোটগল্প রচনার এক অপ্রত্যাশিত নূতন প্রেরণা উচ্ছলিত হইল। স্বদেশি গন্ধতৈল কুন্তলীন প্রস্তুতকারী হেমেন্দ্রমোহন বসু তাঁহাব তৈয়ারি দ্রব্যেব প্রচার উদ্দেশ্যে ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপনবাহী গল্প রচনাব জন্য কয়েকটি পুরস্কার বৎসর বৎসর দিতে থাকেন (১৩০৩ সাল হইতে)। গল্প ভালো হওয়া চাই এবং তাহাতে সুকৌশলে তাঁহার প্রস্তুত দেলখোস ও কুন্তলীনের নাম থাকা চাই। এ পুরস্কার অর্থমূল্যে মোটা রকম কিছু ছিল না, তবে যশেব দিক দিযা উপেক্ষণীয নয়। কুন্তলীন-পুরস্কার প্রত্যাশায় অনেক তরুণ লেখক গল্পরচনায় আগাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্তী কালে উল্লেখযোগ্য অথবা মূল্যবান্ সাহিত্যসৃষ্টি কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[২৮] কুন্তলীন-পুরস্কার প্রাপ্তি রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও ঘটিয়াছিল, তবে অযাচকভাবে। 'কর্মফল' গল্পটি যখন কুন্তলীন-পুরস্কার রূপে প্রথম প্রকাশিত হয় (১৩১০ সাল) তখন রবীন্দ্রনাথ "গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন"-এ এই কথা লিখিয়াছিলেন

> আমার বচিত এই ক্ষুদ্র গল্পটি গ্রহণ করিয়া কুন্তলীনের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমেব সাহায্যার্থে তিনশত টাকা দান কবিযাছেন।

লিখিয়া টাকা পাওয়া রবীন্দ্রনাথেরও বোধ করি এই-ই প্রথম।

কুন্তলীন-পুরস্কারের মূল্য ছিল তিরিশ (প্রথমে পঁচিশ) হইতে পাঁচ টাকা এবং পুরস্কারের সংখ্যা সাধারণত পনেরো। তবুও পুরস্কারের কৌলীন্যের জন্য প্রার্থীদের আগ্রহ বাড়িয়াই চলে। ১৩১০ সালে পুরস্কৃত রচনাগুলির মুখবন্ধে[২৯] প্রকাশক যাহা বলিয়াছেন তাহাতে সাহিত্যের এই নবমধুচক্রে মধুলোভীর ভিড সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিতে পারি।[৩০]

> ...মহিলাগণ অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াও যে পুরুষলেখকগণের সহিত প্রতিযোগিতায় এবাবেব পঞ্চদশটী পুরস্কারের মধ্যে দুইটি ভিন্ন সমস্তই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা আমাদের অতীব আনন্দের বিষয়।
>
> এবার পুরস্কারলাভের জন্য সহস্রাধিক লেখক লেখিকার গল্প আমাদের হস্তগত হইয়াছিল ; তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিধারী হইতে লক্ষপতি রাজকুমাব পর্যন্ত সকল শ্রেণীব লেখকই ছিলেন, তাঁহাদের লেখা যে পুরস্কারলাভের যোগ্য হয় নাই,

ইহাতে আমরা দুঃখিত আছি। কিন্তু তাঁহারা অনেকেই গল্প লেখেন নাই, কেহ লিখিয়াছেন 'নন্দী-ভৃঙ্গি-সংবাদ', কেহ লিখিয়াছেন 'ইলোরা-ভ্রমণ', কেহ 'ছারপোকার আত্মকাহিনী', বা আরব্য উপন্যাসের গল্প রচনা করিয়া পাঠাইয়াছেন ; একজন লেখক গীতা ও দর্শন লইয়া একটি সুদীর্ঘ দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। কোন কোন গল্পের ভাষা ভাল, আখ্যানভাগ নৈপুণ্যের সহিত সম্বদ্ধ—কিন্তু তাহা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের হস্তে অসঙ্কোচে প্রদান করা যায় না। আবার কোন কোন গল্প বঙ্গভাষার উৎকৃষ্ট গল্পলেখকগণের বহুপূর্বলিখিত গল্পের নকলমাত্র!

আবার কেহ কেহ আমাদের ঠিক উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া এমন গল্পও লিখিয়াছেন যে, কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া অর্ধরাজ্য ও এক রাজকন্যা লাভ হইল, কিম্বা দেলখোসের আঘ্রাণে মৃতপ্রায় রোগী উঠিয়া দৌড়িতে লাগিল!

৭ অপরাপর

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরও কোন কোন লেখকের দুই চারটি ভালো গল্প সাহিত্যে এবং অপর মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরে গল্পলেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬)[৩১] কবিতাও লিখিতেন। 'অদৃষ্টলিপি', 'ফুলদানী' এবং 'কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প' (১৮৯৮) গল্পের বই, 'হাসি ও অশ্রু', অশোকা (১৩০৮ সাল) এবং 'শতদল' (১৯১০) কবিতাগ্রন্থ ; উপন্যাস 'প্রেমের সমাধি' (১৯২২)। ইঁহার কবিতায় দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। সরোজকুমারীর অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত (সিভিলিয়ান) সাহিত্য-গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ ছিলেন। ইনি 'মনীষা' (১৯১৯) নাটকের রচয়িতা। সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির (১৮৭০-১৯২১) গল্পগুলি 'সাজি'তে (১৯০০) সঙ্কলিত। ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (?-১৯৩২) মানসীর সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন। ইঁহার গল্পের বই—'ঘরের কথা' (১৯১০), 'পরিকথা' (১৯১১), 'নবান্ন' (১৯১২), ইত্যাদি। সুবোধচন্দ্র মজুমদার ছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আত্মীয়। ইনি কতকটা সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুসারী ছিলেন। ইঁহার গল্পের বই—'গল্প' (১৩১৩ সাল) ; 'পঞ্চপ্রদীপ' (১৯১১) টলস্টয়ের পাঁচটি গল্পের অনুবাদ। অনুবাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭২-১৯৪০) 'একটি বসন্ত-প্রাতের সকুরা পুষ্প' (১৯০৮) উল্লেখযোগ্য। এটি একটি জাপানী উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে লেখা।

মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস মানসী-ও-মর্মবাণীতে বাহির হইবার আগে 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকায় (১৩১৪-১৭ সাল) কিছু গল্প ও একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহার গল্পের বই 'পূর্ণিমা' (১৯২০), 'পঞ্চক' (১৯২২) ; উপন্যাস[৩২] 'অপরাজিতা' (১৯২০), 'মানদা' (১৯২০), 'অশ্রুকুমার', 'মোক্ষদা' (১৯২২), ইত্যাদি। গল্পে ও উপন্যাসে মনোমোহন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

'দাসী' ও 'আর্যাবর্ত' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'সাহিত্য' পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬-১৯৬২) কিছু গল্প ও অনেক উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইঁহার গল্পের বই 'প্রেমমরীচিকা' (১৯০৯) ও 'হৃদয়শ্মশান' (১৯১৯), আর উপন্যাস 'অধঃপতন'

(১৮৯৯), 'বিপত্নীক' (১৯০২), 'প্রেমের জয়' (১৯০২), 'নাগপাশ' (১৯০৮), 'অদৃষ্টচক্র' (১৯১৩), 'প্রত্যাবর্তন' (১৯১৯), 'নাতবৌ' (১৯২৩), 'রক্তের সম্বন্ধ' (১৯২৭), 'সান্ত্বনা' (১৯৩৬), ইত্যাদি। ইনি ছেলেদের গল্পও কিছু লিখিয়াছিলেন।

অন্যান্য গল্প-রচয়িতার মধ্যে ইঁহারাও এখানে উল্লেখযোগ্য—প্রকাশচন্দ্র দত্ত (সাহিত্যের লেখক)[৩৩], পাঁচুলাল ঘোষ[৩৪], ভবানীচরণ ঘোষ (১৮৬২-১৯২৫)[৩৫], সরোজনাথ ঘোষ (১৮৭৮-১৯৪৪)[৩৬], আমোদিনী ঘোষ[৩৭], শরচ্চন্দ্র ঘোষাল[৩৮], সুরেশচন্দ্র সিংহ[৩৯] (১৮৫৩ ?-১৯৫৮)।

শতাব্দীর একবারে গোড়ার দিকে প্রকাশিত একটি উপন্যাস গতানুগতিক ধরনের হইলেও কাহিনীর উপস্থাপনে এবং স্টাইলের স্বাচ্ছন্দ্যে সমসাময়িক উপন্যাসের উপর স্তরের। বইটির নাম 'গৃহদাহ' "বিয়োগান্ত সামাজিক উপন্যাস" (১৯০১), লেখক "পদ্মালয়া প্রণেতা" বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। বিবাহের পূর্বের প্রেম বিবাহের দ্বারা চাপা পড়ে নাই,—ইহাই কাহিনীটির অন্যতম প্রতিপাদ্য।

এক প্রবীণ পণ্ডিত বাঙ্গালা রচনায় অত্যন্ত সহজ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৪৯-১৯২৯) সংস্কৃত কলেজে রামনারায়ণ তর্করত্নের ছাত্র ছিলেন। পাঠ্যপুস্তকরূপে রচিত হইলেও ইঁহার তিন ভাগ 'বঙ্গের রত্নমালা' (প্রথম ভাগ ১৩১৭ সাল, তৃতীয় ভাগ ১৯২০) অতিশয় উপাদেয় রচনা। কালীকৃষ্ণের অপর গ্রন্থ 'পৃথিবীর স্তম্ভ বা নবরত্ন' এবং 'বঙ্গের উপন্যাসরত্ন' (১৩১৯ সাল)। প্রথম গ্রন্থখানি বিক্রমাদিত্য কাহিনীর ফ্রেমে বাঁধান একটি অভিনব রূপকথা। দ্বিতীয় বইটিতে "বুদ্ধিমত্তা প্রকাশক সদুপদেশপূর্ণ কয়েকটি গল্প" আছে ॥

টীকা

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ সংস্করণ, পৃ ৪৮২। 'অন্ধদেবতা' (১৯২৬) অন্য এক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের লেখা।

২ যেমন, 'গোপনীব গান', 'চাকচন্দা', 'লোরিকের গান, ইত্যাদি।

৩ যেমন, 'পুরুৎ ঠাকরুণ', 'মেলা-দর্শন', 'জামাই-ষষ্ঠী'।

৪ যেমন, 'উমেদার', 'ডাক্তারবাবু', 'আমার কৃষাণী', 'উকীলের কাহিনী', 'পূজার ছুটি', 'গুরুঠাকুর', ইত্যাদি।

৫ 'উৎসাহ' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণে তারিখ নাই। সম্ভবত ১৯১৮।

৬ 'কলিকাল' নামে প্রদীপে প্রথম প্রকাশিত (১৩০৪-০৫ সাল)।

৭ যেমন, 'আমাদের পুতুলের বিয়ে', 'শৈশবে ধর্মশিক্ষা', 'কন্যাদায়'।

৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত।

৯ ইঁহার রচনা সাধনায়ও থাকিত।

১০ বিদ্যার্ণবের কয়েকটি উৎকৃষ্ট লোকচিত্র রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে (১৩০৮ সাল) বাহির হইয়াছিল। ১৩০৬ সালের আষাঢ় সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত 'অধ্যাপক চিত্র' শিবধন বিদ্যার্ণবের রচনা হওয়া সম্ভব। আরম্ভ এইরূপ, "চতুষ্পাঠী ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক চিত্র তাহারই উপসংহার।"

১১ ১৮৮৯ অব্দে লেখা।

১২ 'দাসী'তে (১৮৯৬) প্রকাশিত।

১৩ বইটির একটি ইংরেজী নামপৃষ্ঠাও আছে,—SKETCHES OF ORISSA : Or, An Ethnographical Study of Orissa "Fact Draped with Fiction" গ্রন্থকার ১৮৯২ হইতে সাত বছর উড়িষ্যায় ছিলেন সেটেলমেন্ট কর্মচারীরূপে। "এই সাতবৎসরে নানাস্থান দেখিয়া শুনিয়া ও বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার দ্বারা আমার নোট-বুকে অনেকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ...এইসকল চিত্রে উড়িষ্যার বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা সকল যতদূর সম্ভব অবিকল অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। চরিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি বাস্তব নর-নারীর প্রতিকৃতি আর কয়েকটি আমার কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু তাহাদের উপাদান সত্যমূলক।"

১৪ হেমেন্দ্রকুমার রায় জনপ্রিয় ধ্রুবতারাকে নাট্যরূপ দিয়াছিলেন। তাহা ছাপা এবং অভিনীত হইয়াছিল।

১৫ ইহার কয়েক বছর পূর্ব হইতেই কিছু কিছু অংশ ভারতী প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৬ বৈতানিক।

১৭ প্রথম প্রকাশ সাহিত্য ফাল্গুন ১৩০৭।

১৮ ঐ ভারতী শ্রাবণ ১৩১৮।

১৯ মঞ্জুষায় সঙ্কলিত।

২০ দুই খণ্ড 'কাঙ্গাল হরিনাথ' (১৩১০, ১৩২১ সাল)। মানসীতে প্রথম প্রকাশিত।

২১ 'পোষ্টমাষ্টার', অক্টোবর ১৮৯৬।

২২ শেষের দিকে এই বিষয় লইয়া দুই লেখকের মধ্যে বেশ কিছু বাদপ্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছিল।

২৩ প্রথম প্রকাশ জাহ্নবী, ১৩১৫ সাল।

২৪ ঐ মানসী ১৩১৬-১৭ সাল।

২৫ ভারতবর্ষে এই উপন্যাসের প্রথম কিস্তি বাহির হইলে পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'তিনপুরুষ' উপন্যাসের নাম পাল্টাইয়া 'যোগাযোগ' রাখেন। জলধর দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

২৬ প্রথম প্রকাশ 'টিউবওয়েল' নামে (গল্পলহরী ১৩৩৮-৩৯ সাল)।

২৭ প্রথম প্রকাশ সাহিত্য (১৩১১ সাল)।

২৮ যেমন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ছদ্মনামে), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বেনামিতে), জগদানন্দ রায়, ইন্দিরা দেবী (চুঁচুড়া), নিরুপমা দেবী, অনুপমা দেবী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, সরলাবালা দাসী, নগেন্দ্রবালা বসু, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

২৯ ১৩১১ সালে ভাদ্রমাসে প্রকাশিত।

৩০ এই 'প্রকাশকের নিবেদন' ১৩১০ সালের পুরস্কার-নির্বাচক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা বলিয়া অনুমান করি।

৩১ আরও একজন সমসাময়িক লেখিকা ছিলেন, সরোজকুমারী নামে।

৩১ প্রথমে মানসী-ও-মর্মবাণীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

৩৩ গল্পের বই 'পঙ্কমুখী' (১৯০৪)।

৩৪ গল্পের বই 'আঙুর' (১৯১১), উপন্যাস 'আঁধারের শিউলী', (১৯২১) ইত্যাদি।

৩৫ ইহার 'পরিণয় কাহিনী' ও সরমার সুখ' ১৩১০ সালে বাহির হইয়াছিল, অপর উপন্যাস 'হেমেন্দ্রলাল' (১৯১২)।

৩৬ গল্পের বই 'মস্তকের মূল্য' (১৯০২) ইত্যাদি।

৩৭ গল্পের বই 'যুথিকা' (১৯১১), উপন্যাস 'ডায়ারির দৌত্য' (১৯১৫) প্রথম জাহ্নবীতে (১৯১৩) বাহির হইয়াছিল।

৩৮ ইহার 'বারুণী' (১৯১৫) ও 'যৌতুক' গল্পের বই, 'অভিমানিনী' উপন্যাস। শরচ্চন্দ্র বেদান্ত ও জৈন দর্শনের চর্চাও করিতেন। বাঙ্গালা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা টিপ্পনী ইত্যাদি সহ 'বেদান্ত পরিভাষা' এবং ইংরেজীতে অনুবাদ সহ সটীক 'দ্রব্যসংগ্রহ' প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৩৯ 'মঞ্জুলা'র (১৯১৭) লেখক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১

সাধনায় রবীন্দ্রনাথ যে ছোটগল্পের ধারা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাহাই অনতিবিলম্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভাবান্ লেখকদের সুগমতম সরণি হইল। কিন্তু সে পথে সরিতে অগ্রগামীদের বেশ কিছুদিন ইতস্তত করিতে হইয়াছিল। কবিতার বাঁধা রাস্তায় চলিলে তখনকার সাধারণ পাঠকের অনুমোদনের অভাব হইত না। রবীন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যে ভালো কবিতা লেখাও নিতান্ত সহজসাধ্য হইয়া আসিয়াছিল। এই কারণে পরে যাঁহারা গল্পে-উপন্যাসে নাম করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছিল কবিতালেখক রূপে মাসিকপত্রে। রবীন্দ্রনাথের পরেই যিনি ছোটগল্প রচনার সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী সেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও (১৮৭৩-১৯৩২) এই নিয়মের অন্যথা করেন নাই।

কিছুদিন ধরিয়া প্রভাতকুমার গল্প ও কবিতা দুইই লিখিতেন, ১৩০৮ সালের পর কবিতারচনা প্রায় ছাড়িয়া দেন। তাঁহার কবিতা প্রধানত 'দাসী', 'ভারতী' ও 'প্রদীপ' এই তিন পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইত। প্রভাতকুমারের একটিমাত্র কবিতা অতিক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল—'অভিশাপ (ব্যঙ্গকাব্য)'। কবিতাটি ভারতীতে (১৩০৬ সাল) প্রথম বাহির হয়।

প্রভাতকুমারের গদ্যরচনায় যে একটি বিশিষ্ট গুণ—প্রচ্ছন্ন স্নিগ্ধ কৌতুক—তাহা ইঁহার প্রথম-রচিত কবিতার মধ্যেও দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন

তাই আমি নাহি যা'ব চক্ষুকর্ণ রোধ করি
  নাম-জপ-তরণীতে ভক্তি-নদী বাহি ;
হে কাণ্ডারী গুরুদেব, চরণে প্রণাম করি,
  অত শীঘ্র অধমের মোক্ষে কাজ নাহি।[১]

তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মক্‌শই প্রধানত পাই। যেমন

সারাদিন শুধু তাহারে ভাবিয়া
কাটিয়া যায়।
রাত্রি আসিয়া সে সুখ আমার
রাখে না হায়।
চেতনা, নিদ্রা ; আলোক, আঁধার ;
দিবস, যামিনী ;—সব অধিকার ;
তবে কি আমার অর্ধজীবন
যাবে বৃথায় ?
তারে না ভাবিয়া নিশ্বাস লওয়া
—সে ত মিছায়।
চেতনা আমার আছেই তাহার
অনুক্ষণ।
সুপ্তিও চাহি করিতে মাত্র
তার স্বপন।
কোন্ দেবতায় কোন্ প্রকরণে
কতকাল ধরি নিয়ত পূজনে
আমার আকুল মনের বাসনা
হবে পূরণ ?
—জীবন হবে—কিছু—না—কেবল—
তার স্মরণ ?[১]

রবীন্দ্রনাথ যে বছর ভারতী সম্পাদনা করিয়াছিলেন সেই বছরে (১৩০৫ সালে) ভারতীতে প্রভাতকুমারের শুধু চারটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে একটি তাঁহার ভালো কবিতার অন্তর্গত বলিয়া এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম।

সেকালের প্রতি

প্রণাম। শুনিয়া তব মহত্ত্বের কথা
আসিয়াছি দূর হতে দরশন আশে।
অবাক দাঁড়ায়ে আছি মন্দিরের পাশে ;
হেরিতেছি স্বর্ণময় চূড়ার উচ্চতা।...
কিন্তু হে পূজিত, ওহে বিরাট, মহান,
প্রতিমূর্তিখানি তব যেমন সুন্দর,
ছিল হেন তুষ্টি-সুখে চিরদীপ্যমান
সত্য কি জীবিতকালে তব কলেবর ?
—অথবা জর্জর ছিলে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়,
অভিশপ্ত "আজ-কাল", ইহারি দশায় ?

আর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'মিলনান্তে' রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর 'বিরহান্তে' সহ একসঙ্গে 'অবসান' শীর্ষনামে ভারতীতে (ভাদ্র ১৩০৩) বাহির হইয়াছিল। (ঠিক এমনিভাবেই কিছুকাল পরে প্রদীপে প্রিয়নাথ সেনের ও রবীন্দ্রনাথের জোড়া কবিতা ছাপা

হইয়াছিল।) প্রভাতকুমারের কবিতাটি এই

আমি যে তাহার পানে চাহিয়া থাকি না
নিমেষবিহীন হয়ে আপনা ভুলিয়া,
পাগল না হই শুনে তার কণ্ঠবীণা,
পরশ-আবেশে আঁখি আসে না ঢুলিয়া,
সে কি হায় ভালোবাসা শুখায়েছে বলে,
লুকায়েছে ইন্দ্রজাল তাই অবসাদ ?
না গো না, অনেকদিন এ হৃদয়তলে
বহেছে সুখলহরী, আসে নি বিষাদ,
বহুদিন বন্ধ আছি মিলন পিঞ্জরে।
তার হাসি, তার কথা, মোহন চাহনি
তীব্র মদিরার মত দিবস-রজনী
করি পান, আছি ভোর উন্মাদনা জ্বরে।
বুকে সে আছে কি ভুমে, বুঝিতে পারি না ;
সহসা যদি সে চুমে, তবু শিহরি না।

রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট্' ("স্বপ্নমঙ্গল") কবিতার দূর-অনুসরণে প্রভাতকুমার 'অভিশাপ' ("স্ত্রীশিক্ষা-মঙ্গল") রচনা করিয়াছিলেন।[৩] সরল রচনাটির কৌতুকরস স্বচ্ছ ও উপভোগ্য। বাঙ্গালীর সংসারে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হওয়াতে বঙ্গদেশবাসী আর্যগ্রন্থকারদের মনে আতঙ্ক জাগিয়াছিল।

ক্ষান্ত নাহি হয় পিতা ঘরে শিক্ষা দিয়ে,
মেয়ে-ইস্কুলেতে মেয়ে ভর্তি করে গিয়ে।
সকালে উঠিয়া মেয়ে বসে বহি খুলি,
খাতা দেখে, ম্যাপ দেখে, কসে অঙ্কগুলি।
পরে করি কোনও মতে স্নানাহার শেষ,
পরিতে লাগিল মেয়ে বিবিয়ানা বেশ।
কে করিবে কুমারীর ব্রত আদি ধর্ম ?
কে শিখিবে রাঁধা-বাড়া আদি গৃহকর্ম।
তাড়াতাড়ি বিভা দিলে পড়া বন্ধ হয়,
উঠি গেল 'গৌরীদান'—ওহো দুঃসময় !...

"আর্যমতি গ্রন্থকারগণ" মহাকোলাহলে ক্রন্দনধ্বনি তুলিলেন। সে ক্রন্দন পৌঁছিল মানস-সরসীতীরে, সরস্বতীর সঙ্গীত-আসর ভাঙ্গিয়া দিল। তিনি বিরক্ত হইয়া এই অভিশাপ দিলেন,

লিখেছে পড়েছে যাহা বঙ্গকুলবালা,
সমুদয় ভুলে যাক্—ঘুচে যাক্ জ্বালা।

অমনি বাঙ্গালা দেশের ঘরে ঘরে বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। সুরবালা ঘরে খিল লাগাইয়া বিছানায় বসিয়া ফুল পাতা আঁকা রঙীন চিঠির কাগজ লইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতেছিল।

মাঝখানে থেমে গেল লেখনী তাহার,
চিঠিপানে সুরবালা চাহে বারবার।
যাহা লিখিয়াছে কিছু পড়া নাহি যায়।

সুরবালা কাগজখানি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

শাপমুহূর্তে উষারানী সখী তমালিনীকে স্বামীর চিঠি দেখিতে দিয়াছিল। তমালিনী একটি অক্ষরও পড়িতে পারিল না।

"একি পরিহাস ভাই"—তমালিনী কহে,
"এ কোন্ ভাষায় লেখা, বাঙ্গালা ত নহে !"

মধ্যাহ্নভোজন সারিয়া শাশুড়ীঠাকুরানী কমলাকে বলিল, "তুমি রোজ রাত্রিবেলায় রামায়ণ পড়িয়া শুনাও। আজ আমি পড়ি, তুমি শুন।

তোমাদের একালের পড়িবার ধাঁজ,
আমরা শুনিয়া মনে পাই বড় লাজ।
তোমাদের নাহি সুর নাহি অলঙ্কার
আবৃত্তি করিয়া যাও, যেন 'পদ্যসার'।...
আমার চশমাখানি ওখানেতে আছে,
নিয়ে এস ; রামায়ণ শুন মোর কাছে।"

পড়িতে গিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। চশমার কাঁচ আঁচলে ঘষিয়াও কিছু হইল না। তিনি ভাবিলেন, অনেকদিন বই পড়ি নাই। চোখের বিশ্রাম হওয়ায় বোধ হয় চাল্‌শে কাটিয়া গিয়াছে। চশমা খুলিয়া ফেলিলে শাদা চোখেও কিছু পড়া গেল না। তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন

"এতদিনে চক্ষু দুটি গেল একবারে,
কি ফল আমার আর থাকিয়া সংসারে।"

সরস্বতীর অভিশাপে বঙ্গদেশবাসী আর্যগ্রন্থকারেরা মহাবিপদে পড়িয়াছেন।

আর না বিক্রয় হয় গ্রন্থ একখানি,...
যদিও কভু না ছিল অধিক বিক্রয়—
তথাপি মুদ্রণব্যয় উঠিত নিশ্চয়।
সম্মুখে আসিছে পূজা—না করিলে আর
ছাপাখানা ঋণশোধ, পথ চলা ভার !..

রঙ্গালয়ে নাট্যকারেরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে "অন্নহৃত অভিনেতা অভিনেত্রীদল" যোগ দিয়া মহাকোলাহল তুলিয়াছে।

"যদি না রহিল দেশে স্ত্রীশিক্ষা এখন
কি লইয়া বিরচিত হবে প্রহসন !
অন্তে প্রহসন লোভে দর্শকনিচয়,
ধৈর্য ধরি দেখে যেত অন্য অভিনয়।
এখন আসিবে তারা কিবা প্রলোভনে,
স্ত্রীশিক্ষা উঠিয়া গেল হায় কি কুক্ষণে।"

স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধবাদীদের পাপ তাহাদেরই কষ্ট দিতে লাগিল। সেই সঙ্গে নির্দোষেরা ও সাধুসজ্জন গ্রন্থাকারেরাও ভুগিতে লাগিলেন।

মাসিক পত্রিকা লাগি পাঠক উন্মুখ—
পড়িবে পূজার সংখ্যা পাবে কত সুখ!
চাহিয়া চাহিয়া পথ, আশা হয় ক্ষীণ,
পূজা সে চলিয়া যায়, ফুরায় আশ্বিন।
কি আক্ষেপ! এতকাল ভারতীরে সেবি,
আজিকে বিস্মৃতবিদ্যা সম্পাদিকা দেবী![৪]

সকলের সমবেত কাতর বিলাপধ্বনি মানস-সরসীতীরে পৌঁছিল। সরস্বতীর দেবসখীদেব সনির্বন্ধ অনুরোধে দেবী শাপ প্রত্যাহরণ করিলেন। তখন

সুখশান্তি ফিরে এল দেশে পুনর্বার
স্ত্রীশিক্ষা-মঙ্গল গান গাহিলাম সার ॥

বহুকাল পবে প্রভাতকুমার পদ্যে একটি ক্ষুদ্র পঞ্চাঙ্ক প্রহসন লিখিয়াছিলেন, নাম 'সূক্ষ্মলোম-পরিণয়'।[৫] এই রচনায় কৌতুকরস গার্হস্থ্য এবং আরও সরল। বাঙ্গালী সংসারে পুত্র-কন্যার বিবাহ-ব্যবস্থা লইয়া কাহিনী পরিকল্পিত। ভূমিকার নামগুলি পশুর, তবে মানুষের (বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের) মার্কামারা। যেমন, কৃষ্ণলোম মেষোপাধ্যায়, ঋজুশৃঙ্গ ছাগোপাধ্যায়, শৃগাল ভট্টাচার্য, নীলচক্ষু শৃগালোপাধ্যায়, ইত্যাদি।

২

কবিতা লেখার সূত্রেই বোধ করি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারের প্রথম যোগাযোগ। প্রভাতকুমারের লিখিবার প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন।[৬] রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত ব্যর্থ হয় নাই। প্রভাতকুমারের গদ্য লেখাতেই তাহার মনের সতেজ ভাব ও প্রকাশের ঋজুভঙ্গি প্রকট হইয়াছে। চিত্রার সমালোচনা এই গদ্য রচনাটি শুধু প্রভাতকুমারের গদ্য রচনার ইতিহাসে নয় সমসাময়িক সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও মূল্যবান্। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেকালের তরুণ ও অতরুণ শিক্ষিতসমাজকে কিভাবে আলোড়িত করিয়াছিল তাহার নির্দেশ এই প্রবন্ধটিতে লভ্য। প্রভাতকুমার লিখিয়াছিলেন

যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সংবাদ বাখেন, তাঁহারে মধ্যে এখন দুইটি দল। একদল রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে, একদল বিপক্ষে। প্রথম দলের অধিকাংশই সুশিক্ষিত মার্জিতরুচি নবা যুবক;—ইহারা সকলেই প্রায় একপ্রকারের লোক। দ্বিতীয় দলে অনেক প্রকারের লোক—মনুষ্যের চিড়িয়াখানা। (ক) বৃদ্ধ—তাঁহাদের কানে দাশুরায়ের অনুপ্রাস, ভারতচন্দ্রের শব্দপারিপাট্য এমনি লাগিয়া আছে, যে অপর কিছু একেবারে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে কেহ কেহ মাইকেল অবধি নামেন, আর নহে। তাহা ছাড়া তাঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এক মহাদোষে দোষী—তিনি অল্পবয়স্ক।...(খ) প্রৌঢ়—এখনকার প্রৌঢ়েরা একদিন কাব্যে, সাহিত্যে ভারি মাতিয়াছিলেন—সেই বঙ্গদর্শনের সময়। ইহাবা অনেকে হেমচন্দ্রের "আবাব গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে" আবৃত্তি করিয়া বয়সকালে অনেক হা হুতাশ

করিয়াছিলেন, যদিও এখন তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করেন না। ইঁহারা এখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দেন...(গ) যুবকদের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যর্থকাম কবি।...ইঁহারা অনেকে বিদ্বান্, কৃতী, সম্ভ্রান্তশ্রেণীর ;...আমাদের কলেজের কতকগুলি যুবক অকালে নিতান্ত জেঠা হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করে। এইসকল যুবককে চিনিবার জন্য কতকগুলি লক্ষণ এখানে নির্দেশ করিতেছি। (১) তাহারা অশ্লীল কথা কহিয়া মনে করে ভারি রসিকতা করিলাম। (২) পথে ঘাটে ভদ্রলোকের মেয়েছেলে দেখিলে আপনা-আপনির মধ্যে কুৎসিৎ হাসি-তামাসা করে। (৩) কোনও নূতন ভাল বিষয়ে কাহারও চেষ্টা দেখিলে তাহাকে বিদ্রূপ করে। (৪) কোনও বিষয় পুরাতন হইলে, যদি নিতান্ত মন্দও হয়, তথাপিও তাহার জন্য খুব লড়িয়া থাকে—ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, প্রথম দল অপেক্ষা দ্বিতীয় দলের লোকসংখ্যা অধিক। কিন্তু পূর্বাপেক্ষা রবি-ভক্তের দল এখন অনেক বাড়িয়াছে—এ বৃদ্ধি "রাজা ও রাণী" প্রকাশিত হইবার পর হইতে। তাঁহার চমৎকার ক্ষুদ্র গল্পগুলিতেও শত্রুপক্ষের অনেকে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।...অনেক ছাত্রাবাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়া শেষকালে শত্রুপক্ষে মিত্রপক্ষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছে শুনিয়াছি।...বঙ্গের আর কোনও লেখকের ত এরূপ দৃঢ়বিভক্ত শত্রুপক্ষ মিত্রপক্ষ নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমুদ্রের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। যদি কাহারও হৃদয়বাঁধে একটু ছিদ্র থাকে সেই পথ দিয়া অল্পে অল্পে জলপ্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ছিদ্র আরও বড়, আরও বড় হইয়া পড়ে, তখন হৃদয়টা জলপ্লাবিত হইয়া যায়। আর যাহার হৃদয়বাঁধে ছিদ্রই নাই, তাহার কোন ল্যাঠাই নাই ; তাহার ভিতর এক ফোঁটাও জল প্রবেশ করিতে পায় না, এমন লোকে তর্ক করিয়া সেই সমুদ্রের অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা ত করিবেই।[৭]

চিত্রা সমালোচনার পর দাসীতে (১৮৯৬) আর তিনটিমাত্র গদ্য রচনা বাহির হইয়াছিল—'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়' (আগস্ট), বলেন্দ্রনাথের মাধবিকার সমালোচনা (ঐ) ও নিজের প্রথম ছোটগল্প 'একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত' (সেপ্টেম্বর)[৮]। ১৩০৩ সালের শেষে তাঁহার দ্বিতীয় ছোটগল্প বাহির হয় 'ভূত না চোর'[৯] দুইটি গল্পই ইংরেজীর ছায়া অবলম্বনে রচিত। অতঃপর তাঁহার প্রথম মৌলিক গল্প-চিত্র 'পূজার চিঠি' ১৩০৪ সালের কুন্তলীন প্রথম পুরস্কার লাভ করে। গল্পটি "শ্রীমতী রাধামণি দেবী" ছদ্মনামে লেখা হইয়াছিল। তাহার পর প্রদীপ পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩০৫-বৈশাখ ১৩০৬) চারটি গল্প বাহির হইল,—'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি', 'বেনামি চিঠি', 'অঙ্গহীনা', ও 'হিমানী'। 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' প্রভাতকুমারের দ্বিতীয় মৌলিক রচনা।[১০] এই গল্পটিও বাহির হইয়াছিল "শ্রীমতী রাধামণি দেবী'র নামে। 'বেনামি চিঠি'তে (ভাদ্র ১৩০৫) কোন স্বাক্ষর ছিল না, তবে সূচীপত্রে "শ্রীমতী রাধামণি দেবী" নাম আছে। প্রদীপের গল্প চারটির পরে প্রভাতকুমারের ছোটগল্প ভারতীতে বাহির হইতে থাকে, তাহার পর প্রবাসীতে, শেষে মানসী-মর্মবাণীতে।

১৯০১ অব্দের জানুয়ারিতে প্রভাতকুমার বিলাতে যান ব্যারিস্টারি পড়িতে। ইহার পূর্বেই তাঁহার প্রথম গল্পের বই 'নবকথা' বাহির হইয়াছিল (১৯০০)। প্রথমে বইটিতে বারোটি গল্প ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে পাঁচটি গল্প যুক্ত হয়।[১১] নবকথার গল্পগুলিতে কাঁচা হাতের ছাপ আছে, রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ঋণ অবশ্যই আছে। 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি'র আদি ও অন্ত্য রবীন্দ্রনাথের ধরনের। গল্পটির প্রথম ও শেষ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শ ছিল বোধ করি। রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' পড়িয়া যে

প্রভাতকুমাব 'ভুলভাঙ্গা' লিখিয়াছিলেন তাহা বোঝা দুঃসাধ্য নয়। 'দেবী'র কাহিনী রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া।[১২] 'সারদার কীর্তি'র বস্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত আছে।[১৩] তবুও গল্পগুলিতে লেখকের নিজস্বতার যথেষ্ট পরিচয় আছে, এবং 'কুড়ানো মেয়ে' গল্পটিতে প্রভাতকুমারের গল্পলেখার ক্ষমতা প্রায় পূর্ণ বিকশিত দেখা যায়। ঘটনাবিন্যাসে ও চরিত্রচিত্রণে গল্পটি নবকথার শ্রেষ্ঠ রচনা।

দ্বিতীয় গল্পের বই 'ষোড়শী'র (১৯০৬)[১৪] কয়েকটি গল্প বিলাত যাইবার পথে ও বিলাতে থাকিতে লেখা। যেমন 'ধর্মের কল', 'প্রণয়-পরিণাম', 'কলির মেয়ে', 'ছদ্মনাম', 'সচ্চরিত্র' ইত্যাদি। বিলাতপ্রবাসী বাঙ্গালীর ছেলের চিত্র ও চরিত্র তৃতীয় গল্পের বই 'দেশী ও বিলাতী'র (১৯০৯)[১৫] "বিলাতী" অংশের গল্পগুলিতে এবং পরবর্তী কালের কোন কোন গল্পে নিপুণভাবে অঙ্কিত। এই গল্পগুলির দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিষয়াধিকার পশ্চিমে লন্ডন-এডিনবরা পর্যন্ত বিস্তারিত হইল। 'ষোড়শী' ও 'দেশী ও বিলাতী' বই দুইটির গল্পে প্রভাতকুমারের শক্তি পূর্ণবিকশিত।

প্রভাতকুমারের অপর গল্পের বই—'গল্পাঞ্জলি' (১৯১৩)[১৬], 'গল্পবীথি' (১৯১৬)[১৭], 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭)[১৮], 'গহনার বাক্স' (১৯২১)[১৯], 'হতাশ-প্রেমিক' (১৯২৪), 'বিলাসিনী' (১৯২৬), 'যুবকের প্রেম' (১৯২৮), 'নূতন বউ' (১৯২৯) ও 'জামাতা বাবাজী' (১৯৩১)।

গল্প লেখা আরম্ভ করিবার সময়েই প্রভাতকুমার একটি উপন্যাস রচনায় হাত দিয়াছিলেন। কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই উপন্যাস রচনা বন্ধ হইয়া যায়। ১৩০২-০৩ সালের ভারতীতে এই 'লামাকুমারী' উপন্যাসেব প্রথম দুই পরিচ্ছেদ বাহির হইয়াছিল। কাহিনী সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া। রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পের (১৩০১ সাল) ক্ষীণ ছায়া ইহাতে আছে। বহুকাল পরে উপন্যাসটি 'সত্যবালা' নামে মানসী-ও-মর্মবাণীতে আদ্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩২৯-৩০ সাল)।[২০]

প্রভাতকুমারের প্রথম রচিত সম্পূর্ণ উপন্যাস বিলাতে থাকিতে লেখা এবং ভারতীতে—প্রথমে 'সুন্দবী' পরে 'রমাসুন্দরী' নামে ধারাবাহিকভাবে (১৩০৯-১০ সাল) এবং শেষে 'রমাসুন্দরী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত (১৯০৮)।[২১] উপন্যাসটির শেষ অংশের ঘটনাস্থল কাশ্মীর। এই উপন্যাসে কাশ্মীর-বর্ণনা পড়িয়াই রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'র জন্মভূমি কাশ্মীর ভ্রমণে মন করেন (১৩২১ সাল)। প্রভাতকুমার কাশ্মীরে যান নাই। রমাসুন্দরীতে যে প্রত্যক্ষবৎ কাশ্মীরবর্ণনা আছে তাহা ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসিয়া বই পড়িয়া লেখা। এবিষয়ে সমসাময়িক সাক্ষ্যপ্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

রবিবাবু বলিলেন—"কাশ্মীরের দৃশ্যের খুব সুখ্যাতি শুনি। তুমি ত গিয়াছিলে।"
প্রভাতবাবু বলিলেন—"না, আমি কখনও যাই নাই।"
একথা শুনিয়া রবিবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"যাও নাই ?—তবে রমাসুন্দরীতে ওসব বর্ণনা লিখিলে কেমন করিয়া ?"

প্রভাতবাবু বলিলেন—"ওসব বিবরণ, বৃটিশ মিউজিয়মে বসিয়া আমি লিখিয়াছিলাম।"

রবিবাবু বলিলেন—"অ্যাঁ ? বল কি। তুমি ত সাংঘাতিক লোক হে। নূতন সংস্করণ রমাসুন্দরী কাল তুমি আমায় দিলে, বুদ্ধগয়ায় তোমার বই পড়িতে পড়িতেই ত আমার কাশ্মীর

দেখিবার সখ হইল। ভাবিলাম, প্রভাতকুমার গিয়াছিল, আমিই বা যাইব না কেন ?—তুমি যাও নাই !—এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পড়িলে মনে হয় স্বচক্ষে দেখিয়া এসব লিখিয়াছ।"[২২]

সে সময়ের শিক্ষিত তরুণ বাঙ্গালীর মনে আত্মসম্মানবোধ ইংরেজ শাসকের প্রতি বিদ্বেষে প্রতিফলিত হইয়া যে কতটা উগ্র হইতেছিল তাহার খানিকটা প্রতিবিম্ব রমাসুন্দরীর স্থানে স্থানে পড়িয়াছে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় (রঙ্গপুর, ভাদ্র ১৩১৪) লেখক এবিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

"লাঠ্যৌষধি" নামক দশম পরিচ্ছেদে পাঁচ বৎসর পূর্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা তখন বড় দুঃখেই লিখিয়াছিলাম। স্বদেশী আন্দোলনের কৃপায় বাঙ্গালী এখন লাঠ্যৌষধির মহিমা বুঝিয়াছেন। ইহাতে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিতেছি।

প্রভাতকুমারের অপর উপন্যাস—'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২)[২৩], 'রত্নদীপ' (১৯১৫)[২৪], 'জীবনের মূল্য' (১৯১৭)[২৫], 'সিঁদুর কৌটা' (১৯১৯)[২৬], 'মনের মানুষ' (১৯২১), 'আরতি' (১৯২৪), 'সুখের মিলন' (১৯২৭)[২৭], 'সতীর পতি' (১৯২৮), 'প্রতিমা' (১৯২৮), 'গরীব স্বামী' (১৯৩০) ও 'নবদুর্গা' (১৯৩০)[২৮]। 'নবীন সন্ন্যাসী' প্রভাতকুমারের বৃহত্তম ও সমধিক পরিচিত উপন্যাস।

প্রভাতকুমারের গল্প-উপন্যাস ভাবাইবার জন্য লেখা নয় ভুলাইবার জন্য লেখা। তবে পাঠকের মন ভুলাইতে প্রভাতকুমার কল্পনাকে ব্যতিব্যস্ত করেন নাই, সম্মুখের পরিচিত জীবন হইতেই তিনি বস্তু ও মশলা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার রচনা যতই দীর্ঘ হইয়াছে তাহাতে গাঁথুনির ফাঁক ততই স্পষ্ট হইয়াছে। প্রভাতকুমারের উপন্যাসকে সাধারণত উপন্যাসচিত্র বলিলেই ঠিক হয়। নবীন-সন্ন্যাসীতে এই চিত্রের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য খুব বেশি। কয়েকটি ভূমিকা অসাধারণ জীবন্ত। যেমন গদাই পাল, হরিদাসী, কেনারাম ঘোষ, দারোগা সাহেব, সন্ন্যাসী ঠাকুর, কাশিয়াদহের সন্ন্যাসী।

কাশিয়াদহের সন্ন্যাসীই নায়ক মোহিতলালের চক্ষে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা লাগাইয়াছিল। এ সন্ন্যাসী-চরিত্র এখনকার দিনের কোন লেখক আঁকিলে নিশ্চয়ই ফৌজদারিতে পড়িবেন।

"দেখ, একটা বিষয় সাবধান করে দিই। ঠাকুরবাড়ীতে গিয়ে খুব ভারিক্কে হয়ে থাক্‌বে, বুঝেছ ? এমনি ভাবটা দেখাবে যেন সর্বদাই মনে মনে পরমার্থ চিন্তা করছ। ...আমরা যে সব হাসি-মস্করা করি, তা গোপনে নিজেদের মধ্যে। ওদের সামনে একেবারে বিশ্বম্ভর মূর্তি। এক কায কর না—তুমি বরং আমার চেলা সাজ। দুই একটা চেলাটেলা না থাকলে সাধুসন্ন্যাসীর ইজ্জৎ বাড়ে না। আর তোমার লাভ এই হবে, আমার সঙ্গে বেড়ালে, নানারকম বুজরুকি, রোজগারের ফন্দি তোমায় বাৎলে দেব। আর, একটুও বিজ্ঞানও শিখিয়ে দেব।"

মোহিত বলিল, "আপনি বিজ্ঞান পড়েছেন না কি ?"

"পড়েছি বৈ কি। আজকাল সহর অঞ্চলে বিজ্ঞানের ভারি কদর। দু-চারটে বিজ্ঞানের বুলি যদি তাক্ মাফিক ঝাড়তে পার, তা হলে বড় বড় লেখক—ডেপুটি, মুন্সেফ তোমায় গুরু করে মন্তর নেবে। দিব্যি পাওনা থোওনা হে...পড়াশুনো কতদূর হয়েছিল ?"

মোহিত বলিল, "বেশী দূর নয়।"

"হেঁ হেঁ—ওদিকে বুঝি ঢু ঢু ? ঘট উবুড় ? আচ্ছা, তা আমি তোমায় মুখে মুখেই শিখিয়ে দেব এখন, কিছু ভেবনা। সবাই কি আর ছাত্রবৃত্তি পড়েছে ? ও কথা বল্লে চলবে কেন ?..."

'জীবনের মূল্য' প্রভাতকুমারের উপন্যাসের মধ্যে বোধ করি শ্রেষ্ঠ। প্লটরচনা নিশ্ছিদ্র,

কাহিনীবিস্তার তাঁহার গল্পের মতোই নিটোল। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন

এই আখ্যায়িকার মূল ঘটনাটি সত্য। এক বুড়া, কোনও প্রকার স্বপ্ন না দেখিয়াও, বাস্তবিকই বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়াছিল ; কথা দিয়া কন্যাপক্ষ অবশেষে অন্য এক ব্যক্তিকে আনিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছিল ; বুড়া বর সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া সেখানে যায়, এবং বিবাহ সভায় পৈতা ছিঁড়িয়া পুস্তক-বর্ণিত মত অভিশাপও দিয়াছিল। মেয়েটি কিছুদিন পরে বিধবা হইয়া যায়—এবং বুড়ার মনে অত্যন্ত অনুতাপও হয়। কয়েক বৎসর হইল ঘটনাটি আমি শুনি, এবং তখন হইতেই মনে মনে ইহাতে আমি 'ডালপালা' লাগাইতে আরম্ভ করি। টাকার থলি হাতে করিয়া মেয়েটির নিকট বুড়ার যাওয়া প্রভৃতিও, প্রকৃতঘটনা স্বরূপ শুনিয়াছিলাম, অথবা ও অংশ আমার মনরূপ জঙ্গল হইতে আহৃত ডালাপালা মাত্র, তাহা এখন স্মরণ করিতে পারিতেছি না। শেষের দিকটা, আমার মনে হয়, "সত্য-মিথ্যা একাকার, মেঘ আর গিরির মতন" হইয়া গিয়াছে।

প্রভাতকুমারের সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক-প্রিয়তার ভালো পরিচয় আছে জীবনের মূল্য বইটিতে।

'সুখের মিলন' বড় গল্পের মতো। মীর্জাপুরে বাঙ্গালী খ্রীস্টান ভদ্রলোকের জীবনযাত্রা, বেশ রোমান্টিক ছবি। কাহিনীর পরিসমাপ্তি চমকপ্রদ।[২৯] এই বইটি পড়িয়া মনে হয় প্রভাতকুমার যদি ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখিতেন তবে আধুনিক সাহিত্যের একটা অংশ এমন অপূর্ণ থাকিত না ॥

৩

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অবিলম্বে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই প্রভাতকুমারের পক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্যে নিজের পথ চিনিয়া লওয়া অত সহজ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে সহজ-দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সে দৃষ্টি সহজলভ্য নয়। সে দৃষ্টি উপরের রঙে রসে আটকাইয়া পড়ে না, সে চলিয়া যায় জীবনের গভীর মূলে যেখানে অবোধ বাসনা ও অস্ফুট ব্যাকুলতা নিরুদ্ধ প্রকাশ-বেদনায় মূক ও মূঢ়। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের গল্প পড়ার পর "অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে—শেষ হয়ে না হইল শেষ।"

প্রভাতকুমারের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অবিস্তীর্ণ ছিল না। তাঁহার জন্ম পশ্চিমবঙ্গে, তিনি স্কুল-কলেজের শিক্ষা পাইয়াছিলেন বিহারে—মুঙ্গেরে ও পাটনায়। বিহারের ও উত্তর প্রদেশের এবং সিমলার ও কলিকাতার নানা স্থানে থাকিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা সঞ্চিত। ব্যারিস্টারি উপলক্ষ্যে রঙ্গপুরে ও গয়ায় তিনি বেশ কিছুকাল কাটাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রভাতকুমারও জীবনকে দেখিয়াছিলেন সহজভাবে, কিন্তু তাঁহার সে দেখা "নিতান্তই সহজ সরল",—সে দৃষ্টি তলায় নামে না, উপরে ভাসিয়া খুশির আলোক বিকীর্ণ করে। প্রভাতকুমার জগৎ-ও-জীবনকে দেখিয়াছিলেন শুধু চোখ দিয়া। সে চোখে মনের রঙ যেটুকু লাগিয়াছে তাহা কৌতুকের ও তৃপ্তির। গভীর সংবেদনা এবং ইমোশন তাহাতে সর্বদা স্পষ্ট নয়। পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগ্রামে, বিহারের ছাত্রাবাসে, উত্তরবঙ্গের ছোট শহরে, উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের রেল কোয়ার্টারে, কাশীতে, গাজীপুরে,

লন্ডনে, ব্রাইটনে, এডিনবরায়—যেখানে যেখানে প্রভাতকুমার জন্ম, শিক্ষা অথবা কর্মসূত্রে গিয়াছেন থাকিয়াছেন, সর্বত্র সাধারণ মানুষই তাঁহার অনুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে। নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ, বিশেষ করিয়া যাহারা দৈন্যের চাপে সংসারে সমাজে মাথা তুলিতে পারিতেছে না এমন মানুষ, প্রভাতকুমারের সমবেদনার বৃহত্তম অংশ অধিকার করিয়াছে। পটলডাঙ্গা-বেনেটোলার মেস-বাসী কলেজের ছাত্র, হেদো-বিডনগার্ডেন বিচরণকারী পেনসনভোগী বৃদ্ধ, বউবাজারে বোর্ডিং-অধিষ্ঠিত নবীন কেরানি, বাঁকিপুর-সাসারামের চাকুরে ও উকীল, মফস্বল আদালতের মোক্তার, উপেক্ষিত রেল-স্টেশনের ছোটবাবু, প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ফিরিঙ্গি গার্ড, উত্তরবঙ্গের জমিদার, পশ্চিমবঙ্গের চাষী গৃহস্থ, মাসিক পত্রের সহকারী সম্পাদক, চিৎপুরের জ্যোতিষী, পর্যটক বাজীকর, কাশীবাসিনী বিধবা, লন্ডনের ল্যান্ডলেডি ইত্যাদি রকমারি চরিত্র প্রভাতকুমারের গল্পের মধ্য দিয়া পরিচয় জমাইয়া আমাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন কি পশুও বাদ যায় নাই। বাঙ্গালায় যথার্থ পশুভূমিক গল্প (animal story) রচনায় প্রভাতকুমারই পথপ্রদর্শক ও শ্রেষ্ঠ লেখক। রবীন্দ্রনাথও কোন পশুভূমিক গল্প লিখেন নাই—কেবল একটি গল্পে ('হালদার-গোষ্ঠী') পশুর ক্ষুদ্র ভূমিকা গল্পরঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়াই অন্তর্ধান করিয়াছে। হাতি ও কুকুর লইয়া লেখা প্রভাতকুমারের দুইটি গল্প ('আদরিণী' ও 'কুকুরছানা') এ ধরনের গল্পের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ। সমসাময়িক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনও প্রভাতকুমারের গল্পে ঢেউ তুলিয়াছে। বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, স্বদেশি আন্দোলন, বোমা, ডাকাতি, নন্‌কোঅপারেশন—সবই তাঁহার গল্পে রস ও রসদ যোগাইয়াছে।

প্রভাতকুমারের দৃষ্টি কৌতূহলী ও কৌতুকী প্রেক্ষকের—সে দৃষ্টিতে সমবেদনা যথেষ্ট কিন্তু সংবেদনা এতটা পর্যাপ্ত নয় যাহাতে চরিত্রের অন্তরে বা ঘটনার ভিতরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ব্যাপারটার একটা মোট তাৎপর্যে পৌঁছানো যায়। সে দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের সাধারণ ঘটনা হইতে গল্পের উপাদান খুঁজিয়া লওয়া যায়, এবং সে উপাদানে ঘটনাসংযোগটাই প্রধান, মানুষ তাহার উপকরণ মাত্র। সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য গল্পগুলির প্লট বিরচিত, তবুও প্রভাতকুমারের গল্পে প্রত্যাশিত অশ্রুসজলতার দীর্ঘনিঃশ্বাস-পরম্পরার সাক্ষাৎ পাই না। লেখকের দৃষ্টিতে জীবনের মূল্য আছে, সবকিছু জালজঞ্জাল আশা-নিরাশা সত্ত্বেও। তারুণ্যের উৎসাহ কৌতূহল ও সাগ্রহ প্রতীক্ষা—এই মনোভাব গল্পগুলির বিষয়-নির্বাচনে ও নির্মাণে লেখককে যেন অবাধ অধিকার দিয়াছিল। জীবনের প্রতি যাঁহার এমন জাগ্রত কৌতূহল তাঁহার গল্পবস্তুর অভাব কোথায়।

অতঃপর বোধ করি এ কথা বলা অনাবশ্যক যে প্রভাতকুমার ছিলেন "জন্ম-রোমান্টিক"। তবে প্রভাতকুমারের গল্পে সাধারণত যে রোমান্‌স-রস পাই তাহা মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী ঘরের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী ছেলের নিতান্ত ঘরোয়া অথচ উজ্জ্বল প্রীতি ও প্রেম রস। গল্পরচনার পর এই শতার্ধ বৎসরে বাঙ্গালীর জীবনভূমিকায় পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। গোলদীঘিতে তৃণশয়ন আর আতিথ্য বিস্তার করিয়া নাই, হেদো এখন মানিকতলা হইতে বীডন স্ট্রীটে পড়িবার শর্ট কাট্, বীডন গার্ডেন তো বহুদিন পরিত্যক্ত, লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রাবাস এখন ব্যারাকে পরিণত। তা হয় হোক। বাঙ্গালা সাহিত্যের

রসভাণ্ডারে প্রভাতকুমারের গল্পের পটলডাঙ্গা-ঠনৃঠনে-হেদো-বেজ্‌ওয়াটার-আর্ল্‌স্‌কোর্ট-ব্রাইটনের স্মৃতি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া বিরাজ করিতে থাকিবে।

প্রভাতকুমারের দৃষ্টিকোণ বাস্তবাভিমুখ। তবে সে বাস্তবাভিমুখিতা সেই ধরনের যাহা অপ্রিয়কে অপ্রিয় ছাড়া এবং বদলোককে বদলোক ছাড়া অন্য কিছু করিয়া দেখায় না। প্রভাতকুমারের গল্পে-উপন্যাসে বদলোক আছে (যেমন অদ্বৈত, বদনচন্দ্র), কিন্তু লেখক তাহাদের প্রতি বিরূপতা অবলম্বন না করিয়া তাহাদের দৃষ্টিতেই তাহাদের আঁকিয়াছেন। তবে মোটের উপর প্রভাতকুমারের প্রসন্নতা শহরবাসী শিক্ষিতের উপর এবং অপ্রসন্নতা পাড়াগেঁয়ে বর্ষীয়ান্ কুচক্রীর প্রতি। এবং নারীর প্রতি অনুকূলতা সর্বাবস্থায় সর্বদা সজাগ।

প্রভাতকুমারের গল্পের প্লট ঘটনানির্ভর নয়—এ কথা মনে রাখিতে হইবে। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার গল্প অধিকাংশই পরিণাম-রমণীয়। তবুও তাঁহার যে যথার্থ ট্রাজিক গল্প নাই, এমন কথা বলা চলে না ('প্রিয়তমা', 'কাশীবাসিনী'), এবং নিষ্ঠুর গল্পও আছে ('হীরালাল')।

প্রভাতকুমারের রচনারীতি নিতান্ত সরল। ভাষা কথ্য না হইলেও কথ্যতুল্য। শব্দ প্রায় সবই চলিত অথবা সুপরিচিত তৎসম। বর্ণনা-অংশ নিতান্ত অল্প, ভাব-অংশ একেবারেই নাই। ভূমিকাগুলি নিজের ভাষাই বলে, তা সে কলিকাতার কলেজি ছাত্রই হোক, বীরভূমের চাষাই হোক, ভোজপুরী কনেস্টবলই হোক। ভাষার লঘুতা ও উজ্জ্বলতায় প্রভাতকুমারের গল্প-কাহিনীর গতি মসৃণ ও ক্ষিপ্র ॥

৪

প্রভাতকুমারের কয়েকটি বিশিষ্ট গল্পের আলোচনা করিতেছি। প্রথম যুগের শেষ গল্প 'কুড়োনো মেয়ে'। এক মাত্র ভূমিকা—সীতানাথ মুখোপাধ্যায়—এই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গল্পটিকে উজ্জ্বল ও বাস্তব করিয়াছে। 'প্রিয়তম'-এর[৩০] কাহিনীতে বিশিষ্টতা আছে। নববিবাহিত ও বিধবা—দুই তরুণী সখীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্কে একটু নূতনত্ব আছে। 'প্রিয়তম'-এর মতো 'কাশীবাসিনী'তেও[৩১] মনোগহনের নির্দেশ আছে। কাশীবাসিনীর কাহিনী-পরিকল্পনায় ও চরিত্রচিত্রণে স্বাভাবিকতা লঙ্ঘিত হয় নাই, এবং ভাবোচ্ছ্বাসের সুযোগ সত্ত্বেও লেখকের শিল্প-সংযম বাস্তবতা ও রসসঙ্গতি দুইই রক্ষা করিয়া গিয়াছে। এই গল্পটিতে প্রভাতকুমারের পরবর্তী কালের গল্পলেখকদের কোন কোন দিগ্‌দর্শন করিয়া দিয়াছেন। 'প্রত্যাবর্তন'[৩২] গল্পে শিক্ষিত-সমাজে জাতিবিচার সমস্যার উজ্জ্বল ও বাস্তবচিত্র উপস্থাপিত। মেসের ছাত্র, পল্লীগ্রামের বৃদ্ধ, কটকের নেটিভ খ্রীস্টান প্রভৃতি ভূমিকা গল্পটিতে দেখা দিয়াছে এবং ভিড় না করিয়া নিজের নিজের চিত্রে ও চরিত্রে স্পষ্ট হইয়া ব্যক্তি হইয়া ফুটিয়াছে। বাস্তবতার সঙ্গে সরলতার, চিন্তার সঙ্গে পর্যবেক্ষণের, চরিত্রের সঙ্গে উক্তির সামঞ্জস্যে রচনাটি নিখুঁত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। গল্পটি পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো স্থিতধী মনীষীও বিচলিত হইয়াছিলেন।[৩৩]

প্রভাতকুমার বিহারে মানুষ হইয়াছিলেন, ভোজপুরী ভাষায় তাঁহার বেশ দখল ছিল। তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় 'নিষিদ্ধ ফল'[৩৪] গল্পে কনেস্টবলের উক্তি।

কনেষ্টবল বলিল, "ভাগ গেলই কা ?—আপন আঁখিয়ামে হাম্ কুদতে দেখলি হো, তোহর্ কির্ ।"

'অদ্বৈতবাদ'[৩৫] অত্যন্ত রিয়ালিস্টিক ও উজ্জ্বল গল্প । প্রায় এমনি বিষয় লইয়া পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্র 'বৈকুণ্ঠের উইল' লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সে গল্প অদ্বৈতবাদের কাছে তরল ও নিষ্প্রভ । বীমার টাকার লোভে কাঠ-গুদাম পোড়াইয়া দিয়া বড় ভাই অদ্বৈত ছোট ভাই নিতাইকে যে সাফাই দিয়াছিল তাহা চিরকালের অসাধুর ন্যায়ের ফাঁকি । এই অল্প কয়টি কথার মধ্য দিয়াই অদ্বৈত-ভূমিকার বাস্তবতা মূর্তিমান্ ।

> হ্যাঁ, এমন যদি হ'ত, যে, একজন মহাজনের তহবিল থেকে ঐ টাকাটা আমি বের করে নিচ্ছি—ও টাকাটা দিয়ে তার ব্যবসা মাটি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে বটে অধর্ম আছে—তার ক্ষতি করছি । এ যে কোম্পানি হে, কোম্পানি । এ কি একজনকার ? এই ধর, শিবপুরে কোম্পানির বাগানে গিয়ে, একটা কুলগাছ থেকে আমি দুটো কুল পেড়ে খাই তাতে কি কোনও পাপ আছে ? লক্ষ লক্ষ কুল রয়েছে, দুটো যদি আমি পেড়ে খাই-ই—যার কুলগাছ সে ত জানতেও পারবে না । অধর্ম হবে বলে তুমি কেন ভয় করছ ?

'রসময়ীর রসিকতা'র[৩৬] মতো গল্প যে-কোন দেশের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের প্রতিযোগী । প্লটের গঠনকৌশলে অতি অনায়াসে ডিটেক্‌টিভ গল্পের ঔৎসুক্য ও ভূতের গল্পের ভীতিশহরণ একত্র সঞ্চারিত । অথচ কাহিনীর মধ্যে কোন জটিলতা অথবা অলৌকিকত্ব নাই ।

ষোড়শীর 'সচ্চরিত্র' এবং হতাশ-প্রেমিকের 'অলকা' অনেকটা একই বিষয় লইয়া রচিত । দুইটি গল্পের রচনাকালেব মধ্যে ব্যবধান প্রায় বিশ বছরের । এই বিশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে সংস্কারের বন্ধন কতটা শিথিল হইয়া গিয়াছে তাহার পরিমাপ মিলে গল্প দুইটির বিভিন্ন পরিণামে । সচ্চরিত্রে নায়ক প্রেম উপেক্ষা করিয়া সংস্কার বজায় রাখিল, অলকায় সংস্কারকে উপেক্ষা করিয়া সে প্রেমের মর্যাদা স্বীকার করিল । সচ্চরিত্র গল্পটির আরও একটা মূল্য আছে, সে রজনী দাদার চরিত্র । চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত ও হৃদ্য ।

'হীরালাল'[৩৭] গল্পটি বোধকবি প্রভাতকুমারের একমাত্র নির্মম গল্প । এ গল্পটির প্লট স্বচ্ছন্দে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অথবা জগদীশচন্দ্র গুপ্তের কলম হইতে বাহির হইতে পারিত । গল্পটি সত্যঘটনামূলক, এবং সে সত্যঘটনা পরে লেখক অন্যত্র বিবৃত করিয়াছেন ।[৩৮]

নবকথা, ষোড়শী ও দেশী-ও-বিলাতী হইতে দশটি গল্প ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া বাহির হইয়াছিল *Stories of Bengali Life* নামে (১৯১২) । চারটি গল্পের অনুবাদ করিয়াছিলেন স্বয়ং লেখক—'উকীলের বুদ্ধি' (The Wiles of a Pleader'), 'খালাস' ('His Release'), 'হাতে হাতে ফল' ('Swift Retribution'), 'কাশীবাসিনী' ('The Lady from Benares') । বাকি ছয়টি ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন মিসেস নাইট (Mrs. M.S. Knight)—'কলির মেয়ে' ('Signs of the Time'), 'বন্যশিশু' ('The Forest Child'), 'কুড়ানো মেয়ে' ('The Founding'), 'প্রতিজ্ঞাপূরণ' (The Fulfilment of a Vow), 'ভুল শিক্ষার বিপদ' ('The Danger of Being Wrongly Taught') এবং

'ছদ্মনাম' ('Pseudonyms')।

কয়েকটি সংস্কৃত খোশগল্পকে প্রভাতকুমার নূতন করিয়া বলিয়াছেন।[৩৭] এগুলিতে সেকালের বিদগ্ধতার সঙ্গে একালের রসিকতার মিলন হইয়াছে ॥

৫

প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলিতে তাঁহার ছোটগল্পের শিল্পচাতুর্যের পরিচয় নাই। ইহার হেতু লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিহিত। প্রভাতকুমারের শিল্পীমন জীবনকে তলাইয়া দেখে নাই। জীবনের যে গভীরতর অংশ ঘটনার অন্তরালে চাপা পড়িয়া থাকে সে বিষয়ে তাঁহার খুব কৌতূহল ছিল না। সেই কারণে উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ—চরিত্র-অনুসারে ধারাবাহিকতা এবং চরিত্রের দিক দিয়া ঘটনার নিয়ন্ত্রণ ও তাৎপর্যবিশ্লেষণ—তাঁহার উপন্যাসে পাই না। প্রভাতকুমারের উপন্যাসে ঘটনার ঘনঘটা আছে, ভূমিকার যথাসম্ভব ভিড়ও আছে। কিন্তু সে ঘটনা পরম্পরা যেন রেলগাড়িতে বসিয়া বাহির পর্যবেক্ষণ এবং সে ভিড় যেন রেলস্টেশনে যাত্রীর ভিড়। অর্থাৎ প্রভাতকুমারের উপন্যাস যেন চিত্রশালিকা অথবা ছোটগল্পের মালা। সেখানে পাই না মানুষের জীবনকাহিনী। প্লট রোমান্টিক— তাঁহার ছোটগল্পের চেয়েও রোমান্টিক, এবং কাহিনী চিত্রবহুল এবং তাহার মধ্যে চমকপ্রদ ঘটনাও বেশ আছে। তবে চিত্র ও ঘটনা প্রায়ই কাহিনীর মধ্যে মিশাইয়া মিলাইয়া যাইতে পারে নাই। ইমোশনের মশলার অভাব আছে। আসলে প্রভাতকুমারের উপন্যাসে কাব্যধর্মের অপেক্ষা নাটকধর্মের লক্ষণই সমধিক।

প্রভাতকুমারের অধিকাংশ উপন্যাসের প্লট সত্যঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিস্তারিত। এই কারণেই বোধকরি কোন কোন ভূমিকা যতটা উজ্জ্বল হইয়া ফোটে অপর ভূমিকাগুলি সে অনুপাতে তেমন ফোটে না। তাহার ফলে যেখানে লেখকের সাক্ষাৎ জ্ঞানের অভাব আছে সেখানে চিত্রণ রঙচটা হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় অবান্তর চিত্রের উজ্জ্বলতায় অথবা ঘটনার চমৎকারিত্বে মূল কাহিনীর কৌতূহল খর্ব হইয়া গিয়াছে, এবং সে কারণে প্রধান চরিত্রগুলি প্রাণহীন ও অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ব্যতিক্রম পাই একটি জায়গায়, রত্নদীপে বৌ-রানীর ভূমিকায়। (রত্নদীপের কাহিনীর অনুরূপ ঘটনা আমাদের দেশে সার্ধ শত বৎসরের মধ্যে অন্তত দুই-তিনবার ঘটিয়া গিয়াছে।) ছোট ছোট চরিত্রগুলির অধিকাংশই লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হইতে নেওয়া। তাই সেখানে সার্থকতা সুস্পষ্ট। প্রভাতকুমারের হিউমার, অর্থাৎ স্মিতকৌতুক-ভাব, ছোটখাট চরিত্রগুলিকে—বিশেষত পাষণ্ডভূমিকাগুলিকে—হৃদ্য করিয়াছে। উপন্যাস হিসাবে নবীন-সন্ন্যাসী খুব উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তাহার গদাই পাল আবহমান বাঙ্গালা সাহিত্যের পাষণ্ড-দলের পংক্তিতে ভাঁড়ু-দত্তের ও ঠক-চাচার পরের আসনটিতেই অধিষ্ঠিত ॥

টীকা

১ 'মহাযাত্রা' (দাসী, সেপ্টেম্বর ১৮৯৬)। রচনাকাল ১২ কার্তিক ১৩০১। প্রভাতকুমারের কবিতাগুলি 'প্রভাত গ্রন্থাবলী' প্রথম খণ্ডে (১৯৫৯) সঙ্কলিত হইয়াছে।

২ কামনা (ঐ অক্টোবর ১৮৯৬)।

৩ রচনা সমাপ্তি ৪ আশ্বিন ১৩০৬। প্রথম প্রকাশ ভারতী, আশ্বিন ১৩০৬। পুস্তিকাকারে অবিলম্বে মুদ্রিত (মূল্য দুই আনা)। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত পাঠ কিঞ্চিৎ সংশোধিত।

৪ তখন সরলা দেবী ভারতীর সম্পাদিকা।

৫ সাপ্তাহিক 'মর্মবাণী'তে প্রকাশিত (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২২)। রচনাটি 'প্রভাত গ্রন্থাবলী' প্রথম খণ্ডে সঙ্কলিত আছে, পৃ ৫৫০ দ্রষ্টব্য।

৬ "রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য রচনায় হাত দিই।...ইহাতে রবিবাবু উত্তরে লেখেন, গদ্য রচনার জন্য প্রধান জিনিষ হইতেছে রস। রীতিমত আয়োজন না করিয়া, কোমর বাঁধিয়া সমালোচনা হউক, প্রবন্ধ হউক, গল্প হউক একটা কিছু লিখিয়া ফেল দেখি। ইহার ফলে দাসীতে চিত্রার এক সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইলাম" (প্রভাত-কথা, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৯)।

৭ দাসী মে ১৮৯৬ পৃ ২৪১-৫৫।

৮ প্রভাতকুমারের প্রথম গদ্য রচনা 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর' ১৩০২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। পরবর্তী সংখ্যায় বাহির হয় 'নীলকুল্ বাসুদেবের ব্রতকথা'।

৯ ভারতী, চৈত্র ১৩০৩। দাসীর পরিচালকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ রবীন্দ্র-বিদ্বেষী হইয়া পড়ায় প্রভাতকুমার দাসীতে লেখা দেওয়া বন্ধ করেন। অতঃপর ভারতীতে ও প্রদীপে তাঁহার রচনা বাহির হইতে থাকে।

১০ নবকথা দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩১৮ সাল) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১১ 'কাজির বিচার', 'কাটামুণ্ড', 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি', 'শাহজাদা ও ফকিরকন্যার প্রণয়কাহিনী' ও 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর'। 'কাটামুণ্ড' ও 'শাহজাদা ও ফকিরকন্যার প্রণয়কাহিনী' বিদেশি রচনার ছায়াবলম্বনে লেখা। 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর' সত্যঘটনামূলক।

১২ " 'দেবী' গল্পটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে দান করিয়াছিলেন" (দ্বিতীয় সংস্করণ নবকথার ভূমিকা)।

১৩ 'বালক' অংশ দ্রষ্টব্য।

১৪ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১৫।

১৫ ঐ ১৯১১, তৃতীয় সংস্করণ ১৯১৫।

১৬ তৃতীয় সংস্করণ ১৯২০।

১৭ ঐ ১৯১৯।

১৮ ঐ ১৯২১।

১৯ ঐ ১৯৩০।

২০ পুস্তকাকারে ১৯২৫।

২১ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১৪, তৃতীয় সংস্করণ ১৯১৯।

২২ 'রবীন্দ্র-সঙ্গমে', সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মানসী, মাঘ ১৩২১ পৃ ৭১৬)।

২৩ প্রথম প্রকাশ প্রবাসী, ১৩১৭-১৮ সাল।

২৪ মানসীতে প্রথম প্রকাশিত।

২৫ ঐ মানসী (১৩২২-২৩ সাল)।

২৬ প্রথম প্রকাশ মানসী-ও-মর্মবাণীতে ধারাবাহিকভাবে।

২৭ 'সুধার বিবাহ' নামে গল্প বইটির শেষে সন্নিবিষ্ট আছে।

২৮ মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বাহির হইবার সময়ে লেখকের মৃত্যু হয়। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করেন (১৯৩৩)। বইটির নাম 'বিদায় বাণী'।

২৯ সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের অধিকাংশ গল্পলেখকের মতো প্রভাতকুমারের কখনও বিদেশি রচনা হইতে না বলিয়া বস্তু সংগ্রহ করেন নাই। সুখের-মিলনে অপরাধী ধরিবার চমকপ্রদ কৌশলটি যে ধার করা তাহা প্রভাতকুমার নিজেই ভূমিকায় বলিয়া দিয়েছেন। ("ফাঁদ রচনার কৌশলটি বিখ্যাত ইংরাজী উপন্যাস লেখক ফার্গাস্ হিউমের একটি গল্প হইতে আমি গ্রহণ গ্রহণ করিয়াছি।")

৩০ প্রথম প্রকাশ ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৬, ষোড়শীতে সঙ্কলিত ।

৩১ বিলাত যাইবার পথে জাহাজে লেখা (জানুয়ারি ১৯০১)। প্রথম প্রকাশ ভারতী, বৈশাখ ১৩০৮, ষোড়শীতে সঙ্কলিত ।

৩২ প্রথম প্রকাশ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৬, দেশী-ও-বিলাতীতে সঙ্কলিত ।

৩৩ দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর' দ্রষ্টব্য (প্রবাসী ১৩১৬ সাল)।

৩৪ পত্রপুষ্পে সঙ্কলিত ।

৩৫ পত্রপুষ্পে সঙ্কলিত ।

৩৬ প্রথম প্রকাশ প্রবাসী, মাঘ ১৩১৬, গল্পাঞ্জলিতে সঙ্কলিত ।

৩৭ হতাশ-প্রেমিকে সঙ্কলিত ।

৩৮ জামাতা বাবাজীতে সঙ্কলিত 'মাতঙ্গিনীর কাহিনী' ।

৩৯ যেমন বিলাসিনীতে সঙ্কলিত 'ভোজরাজের গল্প'। কালিদাসের সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন অঞ্চলের গল্পও প্রভাতকুমার সরসভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এগুলি মানসী-ও-মর্মবাণীতে বাহির হইয়াছিল ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
প্রথম দশ বছরের কবিতা

১ প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রনাথ বসু

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে বাঙ্গালা কবিতায় রবীন্দ্র-প্রতাপের শুরু। তরুণ ও শিক্ষিত লেখকলেখিকারা রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিচিত্র ভাব, সরল ও হৃদ্য রীতি, এবং মসৃণ ও মধুর ছন্দ অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রণোদিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা রবীন্দ্রকাব্যের স্বাদ কিছুমাত্রও অনুভব করিয়াছিলেন তাঁহারা, সাহস থাকিলে, কবিতারচনায় হাত দিতে ইতস্তত করিতেন না! সেকালের মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ইহার সাক্ষ্য মিলিবে। বহুশাখ ও বহুবিসর্পিত রবীন্দ্র-শিল্পের অনুকরণে বাহবা পাওয়া যেমন অ-কষ্টসাধ্য, অনুসরণে নিজস্ব কিছু গড়িয়া তোলা তেমনই অসাধ্য। এই কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ত্য ও বিংশ শতাব্দীর আদ্য—এই দুই দশকে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা অগনতি, কিন্তু লব্ধসিদ্ধি কবির সংখ্যা দুই চারটির বেশি নয়। তথাপি এ কথা স্বীকার করিব যে অনেকেই অন্তত দু-একটি ভালো কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের লেখনী বাঙ্গালা কবিতায় নব নব ছন্দ উৎসারিত করিয়া গিয়াছে। কবি সর্বদা আপনার সৃষ্টির মায়া পদে পদে কাটাইয়া নূতন নূতন সৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার পিছু পিছু অনুধাবকেরাও ছুটিয়াছিলেন। ইঁহাদের লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ 'শিশু'র কবিতাগুলিকে মাসিকপত্রে ছাপাইতে রাজি হন নাই।[১] পরবর্তী কালেও দেখিয়াছি মাসিকপত্রিকায় মাসের পর মাস চলিয়াছে বলাকার সিঁড়িভাঙ্গা ছন্দের কবিতার নকল, পলাতকার কবিতা-প্যাটার্নের মক্‌শোর পর মক্‌শ।

রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে যাঁহারা অধ্যবসায় সহকারে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯) উল্লেখনীয়। একদা ইনি রবীন্দ্রনাথের বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাকে 'কণিকা' উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সকল প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকাতেই প্রমথনাথের কবিতা প্রকাশিত হইত।[২]

রবীন্দ্রনাথ কবিযশঃপ্রার্থীদের যে সর্বদাই উৎসাহ দিতেন এমন প্রমাণ পাই নাই, তবে

গদ্যরচনায় তিনি যে নবীন লেখকদের উৎসাহিত করিতেন তাহার প্রমাণ আছে। কবিতারচনায় অধিকারবাদ স্বীকার করিতেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথ জানিয়া শুনিয়া ভালোমানুষি করিয়া সর্বদা কবিতারচনার সমর্থন করেন নাই। তবে তাঁহার স্নেহভাজন কবিযশঃপ্রার্থীরা তাঁহার কাছে প্রশ্রয় পাইত, এবং তিনি তাঁহাদের রচনা সংশোধন করিয়া দিতে কখনো অনবসরের অজুহাত দেখাইতেন না। (এ কথা কোন কোন কাব্যকর্তা স্বীকার করিয়াছেন, সকলে নয়।) ব্রহ্মচর্যাশ্রমের তদানীন্তন শিক্ষক, পরে কলিকাতায় নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য টেনিসনের 'এনক আর্ডেন' অবলম্বনে 'গৃহহারা' (১৩১২ সাল) রচনা করিয়াছিলেন। এই গাথা-কবিতাটির মুখবন্ধে লেখক বলিয়াছেন

> পূজনীয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি অনুগ্রহপূর্বক আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।

গৃহহারায় রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শ সহজেই ধরা পড়ে।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কবিতা বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), প্রবাসী, সাহিত্য ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। এগুলি সংগৃহীত হইল 'কাকলি' (চুঁচুড়া, ১৩৩১ সাল) নামে।[৩] কাব্যগ্রন্থটি "বিশ্ববন্দিত কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীচরণেষু" নিবেদিত। নিবেদন কবিতাটি এই

> তব ভাণ্ডারে কত সম্পদ্ কত না রত্ন মণি
> কত ভিক্ষুক ভরিছে আঁচল ভাগ্য সফল গণি',
> আমি আর কিছু চাহিনা চাহিনা তোমার দুয়ার হ'তে
> শুধু এ জীবন ডুবায়ে লইব তোমার সুরের স্রোতে।
> আমার বীণায় তোমার তন্ত্রী বাঁধিয়া লইতে হবে
> আমার কণ্ঠ তব সঙ্গীত যাচিয়া শিখিয়া লবে।
> ভগ্ন আমার ভিক্ষাভাণ্ড ফেলিয়া এসেছি তাও
> এনেছি কেবল ভিখারীর বীণা বাঁধি দাও, বাঁধি দাও।

কাব্যকর্তার স্বীকারোক্তি না থাকিলেও অনেকেরই রচনায় রবীন্দ্রনাথের রিপুকর্ম বোঝা যায়। শুধু তাহাই নয়। বহু নবজাতকের যেমন বহু নবকাব্যের নামকরণেও তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রায়ই ডাক পড়িত। প্রমথনাথ চৌধুরীর 'পদচারণ' কাব্যের নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া, নিরুপমা দেবীর 'গোধূলি' (১৩৩৫ সাল) কাব্যের নামও রবীন্দ্রনাথ রাখিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় যাঁহারা দুই চারটি ভালো কবিতা লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহ কেহ পরে কবিতা রচনা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এমনি একজন ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বসু। ছবি আঁকাতেও ইঁহার দক্ষতা ছিল। যতীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক 'প্রভাতী' (১৮৯৯) কুন্তলীন প্রেসে সুচারুভাবে ছাপা হইয়াছিল।[৪] গোড়ায় ও শেষে লেখকের আঁকা দুটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আছে।[৫] সব শুদ্ধ নয়টি কবিতা আছে। শেষ কবিতা, 'অদৃষ্ট'। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

> রক্ষা কর, ভাগ্যদেবি! তুমি কি ঘটালে।
> কবি আমি! ও কি কথা লিখিছ কপালে!

শব্দময় মহাব্যোমে, অর্থহীন ভাষা,
গঞ্জিকার প্রসাদাৎ স্বপ্নময়ী আশা,
বিদ্রূপের রসপূর্ণ কপট গম্ভীর,
রাজবাস নাম মাত্র শতচ্ছিন্ন চীর,
স্বর্গীয় প্রেমের ছাঁচে তুচ্ছ অবহেলা,
দেশোদ্ধার মহাব্রত শুধু ছেলেখেলা ;
মহত্ত্বের ঝুলি স্কন্ধে স্বার্থের সন্ধান,
দু'মুটো অন্নের তরে হরিনাম-গান,
সত্যের নামেতে শুধু মিথ্যা প্রবঞ্চনা ;
এই লয়ে যত কবি ! তারি এক কণা ।
দিও না আমারে দেবি ! শুধু মোরে লয়ে
রহিব যেমন আছি আপন আলয়ে ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধি-দশক দুইটিতে, রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে দুইজন মাত্র কবি ছিলেন যাঁহাদের রচনার প্রভাব সমসাময়িক তরুণ কবিতা-লেখকদের উপর অল্পস্বল্প পড়িয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হইতেছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। দেবেন্দ্রনাথের কবিতার অজস্রতা প্রায় শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এবং তাঁহার প্রভাব এই সন্ধি-যুগান্তের দিকেই কার্যকর হইয়াছিল। কবিতার রীতিতে দ্বিজেন্দ্রলালের নিজস্বতা ছিল। তিনি কবিতার ভাষায় ঘরোয়া কথ্য ছাঁদ ব্যবহার পছন্দ করিতেন এবং ছন্দে গদ্যের অসমতা চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অগভীরতার জন্য তাঁহার অধিকাংশ কবিতা যেন ব্যঙ্গের দিকে ঝুঁকিয়াছে।[৬] দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা নয়, বৈঠকি হাসির গানগুলি কোনও কোনও শক্তিমান লেখককে গান-রচনায় উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। আলোচ্য সময়ে গান রচনার ধারা বিশেষভাবে বেগবান্ হইয়াছিল প্রধানত রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত ও স্বদেশিগানের গভীর আবেদনে এবং অংশত দ্বিজেন্দ্রলালের বৈঠকি গানের সরস উচ্ছ্বাসে।

২ রজনীকান্ত সেন

রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার উদ্দীপনায় যাঁহারা গান লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে রজনীকান্তের গান দেশের সর্বত্র জনগণের চিত্তে যতটা আবেগচঞ্চলতা জাগাইয়াছিল ততটা রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া আর খুব কম রচনার দ্বারাই হইয়াছিল। কবিতা হিসাবে রজনীকান্তের রচনার বিশেষ দাম নাই, কিন্তু গান হিসাবে তাহার মূল্য তখন যেমন ছিল এখনও তেমনি। এই বিষয়ে রজনীকান্তকে কাজী নজরুল ইসলামের অগ্রজ বলিতে পারি।

রজনীকান্তের পিতা গুরুপ্রসাদ ব্রজবুলিতে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।[৭] তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ভাবুক ভক্ত ছিলেন। এই গুণ রজনীকান্তেও বর্তিয়াছিল। রজনীকান্ত অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ও সঙ্গীতপটু ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যপ্রকাশ তাই গানের মধ্য দিয়াই পথ খুঁজিয়াছিল।

প্রথম জীবনে রজনীকান্ত কিছু কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন। রাজশাহীতে যখন তিনি ওকালতি করেন, সেই সময়ে (১৮৯৫) তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সহিত পরিচিত হন। সেই হইতে রজনীকান্তের হাসির-গান রচনার সূত্রপাত। রজনীকান্ত ভক্তিরসের গানের প্রেরণা পাইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত এবং কাঙ্গাল হরিনাথের বাউল-গান হইতে। (হরিনাথের এক প্রধান ভক্ত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রজনীকান্তের সুহৃৎ ছিলেন।) রজনীকান্তের কোন কোন গানে "কান্ত" ভনিতা দেখা যায়। এই ভনিতা দেওয়ার রীতি বোধ করি হরিনাথের রচনাসূত্রে পাওয়া।

রাজশাহী-সিরাজগঞ্জের বাহিরে, বৃহৎ বাঙ্গালাদেশের মর্ম্মস্থল কলিকাতায় রজনীকান্তের প্রতিষ্ঠালাভ হইল স্বদেশি আন্দোলনের গোড়ার দিকে, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" গানটির দ্বারা।[৮] এ গানের সম্বন্ধে রজনীকান্ত মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ডায়ারিতে লিখিয়াছিলেন

> স্কুলের ছেলেরা আমাকে বড ভালবাসে। আমি 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে'র কবি বলে তারা আমাকে ভালবাসে।[৯]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছিলেন

> ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে বঙ্গব্যবচ্ছেদ-ঘোষণার কয়েক দিন পরে কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ধরিয়া কতকগুলি যুবক নগ্নপদে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান গাহিয়া যাইতেছিল। এখনও মনে আছে, গান শুনিযা আমাব রোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়াছিল।[১০]

গানটির সাহিত্যিক মূল্য বেশি কিছু না থাকিলেও ঐতিহাসিক মূল্যের জন্যই এখানে সমগ্র উদ্ধৃত হইবার যোগ্য।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই ;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরে দোরে ভিক্ষে চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান, মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'রবো ভাই ;
পরের জিনিস কিনবো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

হাসির গানের উদাহরণরূপে 'তিনকড়ি শর্মা'র[১১] শেষাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

(এই) দু'খানি রাতুল শ্রীচরণ
দিয়ে, যেখানে করিব বিচরণ
(দ্যাখো) সেটা যদি তুমি তোমার বলিবে,
ভূত হ'য়ে ঘাড়ে চাপ্‌ব।
(দেখো) আমি তিনকড়ি শর্ম্মা,
(এই) ধরাধামে ক্ষণজন্মা,
(দ্যাখো) তখনি সে নদী হবে ভাগীরথী
আমি যার জলে নাব্‌ব।
(দীন) কান্ত বলিছে ভাই রে,
(অতি) তোফা! বলিহারি যাই রে,
(আমি) তোমার নামটা "হামবড়া" প্রেসে,
সোনার আখরে ছাপ্‌ব।

রজনীকান্তের সরল নম্র স্নিগ্ধ বিশ্বস্ত আনন্দময় হৃদয়ের প্রকাশ তাঁহার ভক্তিরসের গানগুলির মধ্যে জীবন্ত রহিয়াছে। মৃত্যুর প্রায় তিন মাস পূর্বে রজনীকান্ত যখন হাসপাতালে তখন তাঁহার আগ্রহ জানিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখা করিতে গিয়াছিলেন।[১২] রবীন্দ্রনাথ চলিয়া যাইবার পর রজনীকান্ত "আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ গর্ব করিতে চূর" এই গানখানি রচনা করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বোলপুর হইতে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তাহা শুধু রজনীকান্তের কবি-আত্মার প্রশস্তি নহে, সবদেশের সবকালের মহৎ অপরাজয্য মানবাত্মার পরম জয়কার।

সে দিন আপনার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সে দিন আপনি আমার "রাজা ও রাণী" নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

"—এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?"

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইয়াছিল, সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত-স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা কোথায় তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সে দিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও

সেইরূপ আশ্চর্য।

আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন, তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা ত আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই ত তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত ত তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ ত একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন ; আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।

মরণান্তিক রোগযন্ত্রণার মধ্যেও রজনীকান্তের গান ও কবিতারচনা বন্ধ হয় নাই। কয়েকটি উৎকৃষ্ট গান এই সময়েই লেখা।

রজনীকান্তের প্রথম বই 'বাণী' (১৯০২) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের উদ্যোগে বাহির হইয়াছিল। কবির জীবৎকালের মধ্যে প্রকাশিত অপর গ্রন্থ হইতেছে 'কল্যাণী' (১৯০৫), 'অমৃত' (১৯১০), 'অভয়া' (১৯১০), 'আনন্দময়ী' (১৯১০), ও 'বিশ্রাম' (১৯১০)। পরে বাহির হয় 'সদ্ভাব-কুসুম' (১৯১৩) ও 'শেষদান' (১৯২৭) ॥

৩ অতুলপ্রসাদ সেন

অতুলপ্রসাদ সেনও (১৮৭১-১৯৩৪) সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতরসিক ছিলেন এবং কবিতারচনা দিয়া সাহিত্যজীবন শুরু করিয়া অচিরে শুধু গানেই নিবিষ্ট হইয়াছিলেন। [১৩] তাঁহার কোন কোন গান কবিতার ছাঁদে লেখা। অতুলপ্রসাদের গানে সুরের বৈচিত্র্য আছে। উর্দু গজল গানের ঢঙে সুর তিনিই বাঙ্গালা গানে প্রথম চালাইয়াছিলেন। গানগুলির রচনায় রবীন্দ্র-রচনার ছায়া ও কায়া বেশ স্পষ্ট। আসলে তাঁহার গানের পসরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানের টুকরা দিয়া সাজানো। যেমন, "কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা"—রবীন্দ্রনাথ, "আমি কি আর কব" ; "ওহে নীরব ! এস নীরব ! এস নীরবে"—রবীন্দ্রনাথ, "তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম" ; "আর কতকাল থাকব বসে দুয়ার খুলে, বঁধু আমার"—রবীন্দ্রনাথ, "দিবসরজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি" ; "একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়নজলে"—রবীন্দ্রনাথ, "কূল থেকে মোর গানের তরী দিলাম খুলে" ; ইত্যাদি।

দুই একটি গানে অতুলপ্রসাদ দাশরথি-নীলকণ্ঠের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। যেমন, "আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায় বলছ হরি 'আমায় ধর'।" গানটির শেষের দুই ছত্রে

শকতি নাই তোমায় ধরি
হার মেনেছি, হে শ্রীহরি !
দিয়ে খুলি চোখের ঠুলি
দেখা দাও হে দুঃখহর !

অতুলপ্রসাদের দুই-তিনটি জাতীয়-সঙ্গীত একদা বহুপ্রচলিত ছিল। যেমন, "উঠ গো ভারত-লক্ষ্মি ! উঠ আজি জগতজন-পূজ্যা" ; "হও ধরমেতে বীর, হও করমেতে বীর" ; "বল, বল, বল সবে, শত বীণা-বেণু-রবে"। শেষের গানটির প্রচলন এখনও খুব আছে।

অতুলপ্রসাদের গানের সঙ্কলন 'কয়েকটি গান'। ইহারই পরিবর্ধিত সংস্করণ 'গীতিগুঞ্জ' (১৯৩১) ॥

৪ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রিয়ম্বদা দেবী

বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দুইজন কবির রচনায় স্বকীয়তা প্রকাশোন্মুখ হইয়াছিল। একজন হইলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইঁহার কবিতার আলোচনা গদ্য-রচনার প্রসঙ্গে করিয়াছি। আর একজন হইলেন প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫)। প্রিয়ম্বদার মাতা প্রসন্নময়ী বিগতযুগে কবিতারচয়িত্রী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।[১৪] মাতুল প্রমথনাথ চৌধুরী পরবর্তী কালে সাহিত্যের দিক্‌পাল হইয়াছিলেন।

বলেন্দ্রনাথ ও প্রিয়ম্বদা প্রায় একসময়েই লেখা শুরু করিয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদার প্রথম কবিতা ও বলেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কবিতা ১২৯৩ সালের কার্তিক সংখ্যা ভারতী-ও-বালক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। কবিতা দুইটির মধ্যে বাহ্য ও আভ্যন্তর সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। বলেন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল চিত্রকর্মের দিকে, তাই তিনি অনতিবিলম্বে গদ্যের পথেই স্বচ্ছন্দতা বোধ করিলেন। প্রিয়ম্বদার রচনা ভাবগভীর লিরিকের সরণি ধরিয়াই রহিল। বলেন্দ্রনাথের মতো প্রিয়ম্বদারও কবিকর্মে নিষ্ঠা ছিল। উভয়েরই রচনার বিশিষ্ট গুণ বাক্‌শুচিতা এবং সুগভীর সৌন্দর্যানুভূতি। বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা বাস্তবস্বীকারী ও বুদ্ধিনিষ্ঠ, প্রিয়ম্বদার প্রতিভা ভাবপরতন্ত্র ও হৃদয়নিষ্ঠ। বলেন্দ্রনাথের কবিতায় হৃদয়াবেগহীনতা ও নিরাসক্তির প্রকাশ, প্রিয়ম্বদার কবিতায় হৃদয়াবেগ অত্যন্ত গভীর বলিয়াই তাহার প্রকাশ মৃদু এবং অচঞ্চল।

রবীন্দ্রনাথ যখন ভারতীর সম্পাদক (১৩০৫ সাল) তখন একটি সংখ্যায় (কার্তিক) প্রিয়ম্বদার পাঁচটি কবিতা[১৫] ও দুইটি গদ্যরচনা বাহির হইয়াছিল। কবিরূপে প্রিয়ম্বদার এইই যথার্থ আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন প্রিয়ম্বদার দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশ। ইতিমধ্যে 'রেণু' (১৩০৭ সাল) বাহির হইয়া লেখিকার কবিপ্রতিষ্ঠা অসংশয়িত করিয়াছিল। রেণুর অধিকাংশ কবিতা সনেট। বলেন্দ্রনাথের কবিতার ফর্মও তাহাই। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কাব্যফর্মের মধ্যে নবীন কবিরা সনেটই বাছিয়া লইয়াছিলেন। ভাবের অস্ফুটতা ও বস্তুর ক্ষীণতা চতুর্দশপদীর আধারে যেমন গাঢ়তা পায় গীতিকবিতার অন্য ফর্মে তেমন পায় না। প্রধানত এই কারণেই সেকালে সনেট-ছাঁদের কবিজনপ্রিয়তা হইয়াছিল। প্রিয়ম্বদার রচনায় সনেটের রূপ একটু যেন নূতনতর হইয়াছে।

রেণুর অখণ্ডগ্রথিত ভাবৈকরস কবিতাগুলির মধ্যে কবিহৃদয়ের লাজনম্র প্রকাশভীরু কুণ্ঠিত প্রেমের করুণ আত্মনিবেদন একতানে কলগুঞ্জরিত। নারী-হৃদয়ের গোপনকরুণ ব্যাকুলতা স্নিগ্ধ ও কোমল হইয়া কবিতাগুলির মধ্য দিয়া যেন বিশ্বপ্রকৃতিকে অন্তরের অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়াছে।

একটি উদাহরণ দিই।

ভীরুতা

বড় যত্নে, বড় স্নেহে কত শতবার
এতটুকু ঠাঁইজোড়া নামটি তোমার
লিখে মুছে ফেলি তবু, মসি-রেখা-জালে

বহু ধৈর্যে লুপ্ত তারে করি এককালে !
হেথায় নিভৃতকক্ষে মর্ম-অন্তঃপুরে
যেথা লেখা তব নাম সর্ব ঠাঁই জুড়ে
কোন চেষ্টা নাই সেথা মুছিতে তাহারে,
নবীন সুন্দর বর্ণে শুভ্র আলোধারে
করিতে উজ্জ্বলতর নিত্য সাধ যায়,
পত্র-পুষ্প-লতিকার লাবণ্য-লেখায় !
ললিত মধুর ছন্দে আনন্দ সঙ্গীতে
বেষ্টিয়া রাখিতে তারে দিবসে নিশীথে ;
সেথা শুধু দেবতার করুণ নয়ন,
বাহিরে নিষ্ঠুর বিশ্ব, কৌতুক বচন !

কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। তাহা থাকিবেই, নহিলে এমন কবিতা হইত না। কিন্তু সে প্রভাব প্রিয়ম্বদার কাব্যলতিকার আলম্বনী নয়, স্থিতিভূমি। 'রেণু' প্রকাশিত হইলে সর্বত্র প্রশংসিত হইয়াছিল। কাব্যটির সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র রায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই যথার্থ মর্মানুধাবন।

'রেণু' ব্যাপক প্রতিভার চতুর্দিক্‌ব্যাপ্ত অসংখ্য ভাবফুলের আকাশ-ভরা গন্ধরেণু নহে—একটিমাত্র ভাবের বাগানে একজাতীয় মাত্র ফুলের রেণু—আপনার মধ্যে আপনি এত সম্পূর্ণ যে, প্রথমটা ভাবিয়া পাই না,—এ কবির আর কোন দিকে বিকাশের সম্ভাবনা আছে কি না। কিন্তু আর একটু অনুধাবন করিলে একটি রন্ধ্র পাওয়া যায়। বাস্তবিক দুঃখে অভিভূত করিয়া ভাঙিয়া দেয়, আনন্দে অভিভূত করিয়া সবল করে। রেণুর কবি বিশ্বাসের বলে যেন শেষোক্তরূপেই অভিভূত। তাই তাঁহার উঠিয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা ছাড়া রেণুতে যে প্রকৃতির ছবিগুলি দেখিলাম, কিংবা অন্য দুই-একটি ভাবের আলোচনা দেখিলাম—তাহাতে প্রিয়তমের বিচ্ছেদ-মিলনের ছায়ালোকপাত থাকিলেও, সেগুলির মধ্যে যেন কবির একটু স্বতন্ত্র আনন্দ আছে—সেগুলি যেন ঐ সর্বগ্রাসী ভাবটির ছায়া ছাড়াইয়া একটু এদিক ওদিকে কাঁপিতেছে। এই পথে রেণুর কবির বিকাশের সম্ভাবনা যেন আছে বলিয়া বোধ হয়।

রেণুর পরে প্রিয়ম্বদার কবিতা আরও আঁটসাঁট, ক্ষুদ্রতর রূপ ধরিল। তাহাতে তাঁহার কাব্যে যেন সংস্কৃত কবিতার ঘনত্ব দেখা দিল। চতুর্দশপদী হইল অষ্টপদী ও ষট্‌পদী। যেমন

আশ্বাস

যে-মিলন অসম্পূর্ণ রহিল জীবনে
পূর্ণ তাহা হবে পরে অজানা ভুবনে,
এ আশায় আছি বুক বেঁধে, তাই যবে
সন্ধ্যারবি অস্ত যায় একান্ত নীরবে,
বিরহকাতর শ্রান্ত হৃদয়েরে বলি—
হে আর্ত আশ্বস্ত হও, অই গেল চলি
দিবস মিলনহীন ;—দেখ আনিয়াছে
প্রিয়-সম্মিলন আরো একদিন কাছে।[১৬]

এই রকম কতকগুলি কবিতা রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে (১৩০৮ সাল হইতে) বাহির হইয়াছিল। এগুলিতে স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের সংশোধনের সম্ভাব্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও উৎকর্ষ বিস্ময়াবহ। এরকম কয়েকটি কবিতা পরে রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনা বলিয়া ভুল করিয়া 'লেখন'-এ (১৯২৭) স্বাক্ষরিত করিয়াছিলেন। যেমন

শুভক্ষণ

আকাশ গহন মেঘে গভীর গর্জন,
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন।
ও কি এতটুকু নামে সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমারে তুমি! পূর্ণনাম ধরে'
আজ ডাকিবার দিন; এ হেন সময়
সরম-সোহাগ-হাসি-কৌতুকের নয়।
আঁধার অম্বর পৃথ্বী পদচিহ্নহীন,
এল চিরজীবনের পরিচয়-দিন।[১৭]

'রেণু'র পর বাহির হয় 'পত্রলেখা' (১৯১১) ও 'অংশু' (১৯২৭) এবং মৃত্যুর পরে 'চম্পা ও পাটল' (১৯৩৯)।

প্রিয়ম্বদার কবিতার বাণী সুমিত এবং প্রসন্ন। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "প্রিয়ম্বদার অধিকার ছিল যে সংস্কৃত বিদ্যায়, সেই বিদ্যা আপন আভিজাত্যঘোষণাচ্ছলে বাংলা ভাষার মর্যাদা কোথাও অতিক্রম করেনি; তাকে একটি উজ্জ্বল শুচিতা দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে অনায়াসে গঙ্গা যেমন বাংলার বক্ষে এসে মিলেছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। বিশ্বপ্রকৃতির সংস্রবে প্রিয়ম্বদার সচেতন মন যে আনন্দ পেয়েছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছে জলের উপর যেন আলোর বিচ্ছুরণ, আর জীবনে যত সে পেয়েছে দুঃসহ বিচ্ছেদ বেদনা কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছে নারীর অবারণীয় অশ্রুধারার মতো।" প্রিয়ম্বদার কবিতায় রচয়িত্রীকে কবি এবং নারী দুইরূপেই প্রকাশিত দেখি।

প্রিয়ম্বদার গদ্যরচনাও সহজ ও সরল। তাঁহার গদ্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল শিশুপাঠ্য 'কথা ও উপকথা'। গল্পগুলি ইংরেজী মূল অবলম্বনে কথ্যভাষায় লেখা এবং 'মুকুল' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত ॥

৫ সতীশচন্দ্র রায়

কাব্যপ্রতিভায় সফলতার অসন্দিগ্ধ আশ্বাস লইয়া সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯০৪) দেখা দিয়াছিলেন বাঙ্গালা সাহিত্যে নিতান্ত ক্ষণকালের জন্য। ১৩০৮ সালের শেষে তাঁহার রচনার প্রকাশ শুরু, অবসান ১৩১০ সালের মাঘ মাসে, তাঁহার জীবনান্তের সঙ্গে। ইহার মধ্যে সতীশচন্দ্র অল্প যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহাতে সমসাময়িক তরুণ কবি ও গদ্য লেখকদের মধ্যে তাঁহার সম্ভাবিত উৎকর্ষের ইঙ্গিতটুকু মাত্র আছে।[১৮]

কলিকাতায় বি. এ. পড়িতে আসিয়া সতীশচন্দ্র পরীক্ষার কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। এই পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ অজিতকুমার চক্রবর্তী। সতীশচন্দ্র ধনীর সন্তান ছিলেন না, অভাব যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয়

অন্তররসে পরিপূর্ণ ছিল। অজিতকুমার লিখিয়াছেন

> কলিকাতায় তাঁহার বাসায় তাঁহার হৃতশ্রী লক্ষ্মীছাড়া দৈন্যদশা দেখিলে সেখানে বসিতে ইতস্ততঃ করিতে হইত। দারিদ্র্য যে তাঁহাকে ভয়ঙ্কররূপে ঘিরিয়া আছে তাহা সেই নিয়তরসপিপাসু কবিটি বোধ হয় ভাল করিয়া জানিতেনই না। আনন্দের সম্পদ তাঁহার এতই অধিক পরিমাণে ছিল। [১৯]

রবীন্দ্রনাথ লিখিযাছেন

> তাঁর পরনে ছিল না জামা, একটা চাদর ছিল গায়ে, তাঁর পরিধেয়তা জীর্ণ। যে ভাবরাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতিব বসভাণ্ডাব থেকে। [২০]

রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শের কথা শুনিযা সতীশচন্দ্র পরীক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া কাহারো কোন কথা না শুনিয়া আশ্রমের কাজে যোগ দিলেন প্রাণমন দিয়া (১৩০৮ সালের শেষে)। তাহার আগে থেকেই তিনি কবিতা লিখিতেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

> সতীশের বয়স তখন উনিশ, বি. এ পরীক্ষা তাঁর আসন্ন। তার পূর্বে তাঁর একটি কবিতার খাতা অজিত আমাকে পড়বার জন্যে দিয়েছিলেন। পাতায় পাতায় খোলসা করেই জানাতে হয়েছে আমার মত। সব কথা অনুকূল ছিল না। আর কেউ হলে এমন বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতুম না। সতীশের লেখা পড়ে বুঝেছিলুম তাঁর অল্প বয়সের রচনায় অসামান্যতা অনুজ্জ্বলভাবে প্রচ্ছন্ন।

শান্তিনিকেতনে আসিয়া সতীশচন্দ্র পরিপূর্ণ ও অভেদ ভাবে পাইলেন বিশ্বপ্রকৃতিকে ও রবীন্দ্রনাথকে। এই পাওযাতেই তাঁহার অন্তব-বাহির ভরিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার রচনার অসামান্যতা আর অনুজ্জ্বল ও প্রচ্ছন্ন রহিল না। সতীশচন্দ্রই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে "গুরুদেব" বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। অজিতকুমারকে লেখা একটি চিঠিতে এই কথা পাই। [২১]

> গুরুদেবের রচনা ঠিক প্রকৃতির মত। আমি এই প্রান্তর পারে অদ্ভুত শালবনে বেড়াইয়া প্রকৃতির যে হৃদয়হর মুখ দেখিতে পাই উঁহার লেখার ভিতরেও তাহাই দেখিতে পাই। 'গুরুদেব' বলিযাছি—কারণ কি জান ? এই দেখ চারিদিকে দুপুবের রৌদ্র নিঃশব্দে পড়িয়া আসিতেছে —এই সময়ের এমনি একটি দৃষ্টি আছে তাহা বুঝানো যায় না—এমনি একটি নরম দৃষ্টি ঐ সুদূর আকাশ হইতে আমাদের উপবনে আমাদের প্রাণের উপর চাঁপাফুলের জ্যোতিঃ ফেলিয়াছে—মাঠের একদিক হইতে বাতাস নামিয়া আরেকদিকে পালাইতেছে—যে এই সমযে কেবলমাত্র গভীর অনুরাগগুলিই হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া থাকে—কত শালবন মনে পড়িতেছে—আর মনে পড়িতেছে অন্তর-বাহির-সুন্দর আমাদের ললাটের দেবতা রবিবাবুকে। সেইজন্য ইচ্ছা হইতেছে উঁহাকে নানা মধুর নামে জ্ঞাপিত কবি, তাই ইটি উটি বলিয়া শেষে 'গুরুদেব' বলিলাম—।

রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসিয়া সতীশচন্দ্র আপনাকে চিনিতে ও বুঝিতে পারিতেছিলেন। সেই চেনার ও বোঝার আলোয় তাঁহার জীবনভাবনা ও রসদৃষ্টি প্রসন্নতর হইতেছিল। প্রায়-বালকবয়সী তরুণটি তাঁহার হৃদয়মাধুর্যে ও মননশীলতায় রবীন্দ্রনাথেব

অন্তরে স্থানলাভ করিযাছিলেন। প্রথম বয়সের পর রবীন্দ্রনাথ খুব কম ব্যক্তির প্রতিই এতখানি আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্রের স্মৃতি যে তাঁহার অন্তরের কত বড় সম্পদ এবং শান্তিনিকেতনের বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যে সতীশচন্দ্রের স্মৃতি অক্ষয় হইয়া আছে তাহা অনেক উপলক্ষ্যে তিনি গদ্যে পদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরেই রবীন্দ্রনাথ স্বসম্পাদিত বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন

> সতীশচন্দ্র সাধারণের কাছে পরিচিত নহে। সে তাহার যে অল্প-কয়টি লেখা রাখিয়া গেছে, তাহার মধ্যে প্রতিভাব প্রমাণ এমন নিঃসংশয় হইয়া উঠে নাই যে, অসঙ্কোচে তাহা পাঠকদের কৌতূহলী দৃষ্টিব সম্মুখে আত্মমহিমা প্রকাশ কবিতে পারে। কেহ বা তাহাব মধ্যে গৌরবেব আভাস দেখিতেও পারেন, কেহ বা না-ও দেখিতে পারেন, তাহা লইয়া জোর করিয়া আজ কিছু বলিবার নাই।
>
> কিন্তু লেখার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি লেখকটিকেও কাছে দেখিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইযাছেন, সে ব্যক্তি কখনো সন্দেহমাত্র করিতে পারে না, সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইযা যাইতে পারিল না, তাহা জ্বলিলে নিভিত না।
>
> আপনার দেয় সে দিযা যাইতে সময় পায় নাই, তাহার প্রাপ্য তাহাকে এখন কে দিবে? কিন্তু আমার কাছে সে যখন আপনাব পরিচয় দিয়া গেছে, তখন তাহার অকৃতার্থ মহত্ত্বের উদ্দেশে সকলেব সমক্ষে শোকসন্তপ্ত চিত্তে আমার শ্রদ্ধার সাক্ষ্য না দিয়া আমি থাকিতে পাবিলাম না। তাহাব অনুপম হৃদয়মাধুর্য, তাহার অকৃত্রিম কল্পনাশক্তিব মহার্ঘতা জগতে কেবল আমাব একলাব মুখেব কথাব উপবেই আত্মপ্রমাণের ভাব দিয়া গেল, এ আক্ষেপ আমাব কিছুতেই দূব হইবে না।[২২]

সতীশচন্দ্রেব স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনার মধ্যেও লুকোচুরি খেলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথেব 'রাজপুত্তুর'[২৩] সতীশচন্দ্রের কথা স্মরণ করায়। সতীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন 'রাজকন্যা'।[২৪] রাজকন্যাকে তিনি মাটির জগতে খুঁজিয়া পান নাই এবং খুঁজিযা পাইতে চাহেনও নাই, "রাজকন্যা চিবকাল পরে পরে তাহার সুখ এবং বেদনা লইয়া বাস করুক – প্রাসাদশিখব হইতে নাবিয়া পৃথিবীব উপরে বাহির হইয়া না পড়ুক"। রবীন্দ্রনাথ রাজপুত্রকে চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার ছদ্মবেশ সত্ত্বেও, "আর রাজপুত্তুরের এ কি বেশ? এ কি চাল? গায়ে বোতামখোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাযেব ছেলে, সহরে পড়ে, টিউশানি করে' বাসাখরচ চালায়।" রাজপুত্তুরের পরিণাম সতীশচন্দ্রেরই, "সেদিন তাকে দেখবার লোক কেউ ছিল না। শিয়রে কেবল একজন দয়াময় দেবতা জেগেছিলেন। তিনি যম।"

'স্পাই' কবিতাটিতেও[২৫] সতীশচন্দ্রের ভূমিকা—জোড়াসাঁকোর আসরে।

> দেযাল ঘেঁষে ঐ যে সবার পাছে
> সতীশ বসে আছে।
> থাকে সে এই পাড়ায়,
> চুলগুলো তার উর্ধ্বে তোলা পাঁচ আঙুলের নাড়ায়
> চোখে চশমা আঁটা,
> এক কোণে তার ফেটে গেছে বাঁয়ের পরকলাটা।
> গলাব বোতাম খোলা,

প্রশান্ত তার চাউনি ভাবে ভোলা।
সর্বদা তার হাতে থাকে বাঁধানো এক খাতা,
হঠাৎ খুলে পাতা
লুকিয়ে লুকিয়ে কী যে লেখে, হয়ত বা সে কবি
কিম্বা আঁকে ছবি।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সতীশচন্দ্র আসিয়াছিলেন শিক্ষক হইয়া ব্রহ্মবান্ধবের পরে। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন যাহাকে বলে অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ বা ডিসিপ্লিনেরিয়ান, আর সতীশচন্দ্র ছিলেন "আত্মভোলা মানুষ, যখন তখন ঘুরে বেড়াতেন যেখানে সেখানে। প্রায় তার সঙ্গে থাকত ছেলেরা, চলতে চলতে তাঁর সাহিত্যসম্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও।" এই দুই ব্যক্তি অচলায়তনের কাহিনীতে যথাক্রমে মহাপঞ্চক ও পঞ্চক ভূমিকা-কল্পনায় ছায়াপাত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করি।

সতীশচন্দ্রের প্রতিভা অনুশীলনের দ্বারা পরিস্ফুট হইতেছিল। ছাত্রজীবন হইতেই তিনি ইংরেজী কাব্যরসিক, বিশেষ করিয়া ব্রাউনিঙের ভক্ত পাঠক। কালিদাসের কাব্যেও তাঁহার প্রবেশ অন্তরঙ্গ ছিল। শান্তিনিকেতনে আসিয়া তিনি কাব্য ও ভাষা দুইয়েরই ব্যাকরণের রীতিমত চর্চা শুরু করিয়াছিলেন। "শ্রীযুক্ত রবিবাবুর lines অনুসারে বাঙ্গালায় ছন্দশাস্ত্র লিখিব কল্পনা করিতেছি।"[২৬]

সতীশচন্দ্র বাঙ্গালা পড়াইতেন, "ছন্দ শুনাইয়া ছন্দবোধ এবং ছন্দরচনায় তাহাদের উৎসাহিত করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করাইয়া দিতেন। ভাষার মধ্যে প্রত্যেক শব্দের ধাতুগত অর্থ এবং ক্রমে ক্রমে ব্যবহারে তাহার অর্থের বিকাশ কিরূপে সংঘটিত হইয়াছে তাহা জানাইয়া দিতেন।"[২৭] নিজের সাহিত্য সাধনার আদর্শ যে কী তাহা তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে একটি চিঠিতে প্রকারান্তরে জানাইয়াছিলেন।

Prophets কিছু রোজ আসে না—interimগুলি আমাদের সাহিত্যের democratic culture দিয়া ভরিয়া রাখিতে হইবে। স্বদেশের ভাবগতি এবং condition দেখিয়া তাহার মধ্যে মানবের Highest ideals of beauty জাজ্বল্যমান করিয়া দেখিতে হইবে—এ ত গেল পরের কাজ—তারপরে আত্মোৎকর্ষের পক্ষে আমার ত মনে হয় সাহিত্য নিতান্ত দরকার। সাহিত্যেই আমরা, আমাদিগকে ideally create করি—যেমন Progenyতে আমরা আর এক দিকে create করি।...আমার আশা এই যে একটি নিঃস্বার্থ, বিপুল উৎসাহ-প্রবাহ আসিয়া আমাদের সাহিত্যকে সৌন্দর্যে ভরিয়া দিয়া যাইবে—এবং তারি একটি রুদ্ধ waterhead আপনি। Culture এবং পরিশ্রমের দ্বারা আপনার ভিতর হইতে সেই রুদ্ধ স্রোত বাহির হইবে এই আশায় আমি বসিয়া আছি। আমি এখন শুধু নিজেকে তৈয়ার করিতেছি এবং আজকালকার আমার লেখা অল্পাধিক experimental জানিবেন।[২৮]

সতীশচন্দ্র অল্প কয়দিন ডায়েরি লিখিয়াছিলেন।[২৯] সেই ডায়েরিটুকুর মধ্যে তাঁহার জীবনভাবনার ও সাধনার মর্মকথা আছে। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে তিনি ডায়েরিতে লিখিয়াছিলেন

কবিতা রচনার মত নিবিড় ব্যথা আমি কোন দিন ধরিতে পারিব না? জানি না—কিন্তু আজ অন্ততঃ এটা নিশ্চয় দেখিতে পাইতেছি যে একটা ভবিষ্যতের সাহিত্যের মধ্য দিয়া একটি শান্ত সুন্দর গদ্যধারা বহিয়া যাইতেছে, উহাই আমার। ঐ ধারা কল্পনা-সৌন্দর্য এবং বিলাসের

আক্রমে বড় এবং বিচিত্র কিন্তু নিবিড় বেদনায় সুগভীর না হইতেও পারে। আমার চিত্তক্ষেত্রে বিচরণশীল এই তেজস্বী কল্পনামূর্তিগুলি কবে বাহির হইবে? আমি essentially Indian —ভারতের রস আমার প্রাণে রহিয়াছে।

সতীশচন্দ্রের কবিপ্রকৃতির মধ্যে রোমান্টিক ভাবটাই প্রবল ছিল—সে রোমান্স বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবিমানসের ঐকতান। সেই সঙ্গে ছিল চোখের ভালো-লাগা। সতীশচন্দ্রের কবিতায় তাহা ছবির রঙ লাগাইয়াছে। যেমন

সখি, মোরে তোর স্বপনের কথা বল্।
এ প্রভাতে তোর মুখখানি নিরমল!
কুন্তলে তোর বিকচ কুসুম
পাতা মেলি যেন নয়নের ঘুম
উড়ে গেছে যেন অজানা গগনতল।
বল্ সখি, তোর স্বপনের কথা বল্।[৩০]

সোনার সন্ধ্যার পরে এল রাত্রি, বিকাশিল তারা
দিগন্ত মিলায় বনে নভস্তল চন্দ্রকলাহারা।
কালো অন্ধকার যেন কালো এক ভ্রমর বিপুল
আবরিয়া বসিয়াছে ধরণীর মধুময় ফুল।
সেই আলো প্রস্ফুটিত লক্ষদল কুসুম সুন্দর
তারি পরে বিস্তারিয়া কালো ডানা গভীর অন্তর
বিদারি, অতল মধু বিহ্বলিয়া করিতেছে পান
ধরণী গগনে লাগে মধুরস জোয়ারের টান![৩১]

তোমার চরণমূলে কুণ্ডলিয়া রব—
সুখ দুঃখ হর্ষ আশা দৈন্যে নোয়াইয়া,
ধীরে ধীরে গর্ব ভাঙ্গি লুটাইব হিয়া!
তুমি দিও পাদস্পর্শ নিত্য অভিনব।
নিত্য মোরে জাগাইও বিরল প্রত্যূষে—
শিশিরের বিন্দুসম-শষ্পে লম্বমান—
এক ফোঁটা অশ্রু যেন;—কোরো অবসান
নিত্য মোর—দুদণ্ডেই তব তাপে শুষে।[৩২]

কাহিনীগর্ভ (ballad) কবিতায় সতীশচন্দ্রের সফলতা সবচেয়ে পরিস্ফুট। যেমন, 'দুয়ো-রাণী'[৩৩] ও 'চণ্ডালী'[৩৪]। ভাষায় ভাবে ও ছন্দে দুয়ো-রাণী নিটোল রচনা। তিন ছত্রের ছন্দ (triolet)। যেমন

তার তরে শুধু ব্যাপিয়া হৃদয়
সুগভীর ম্লানছায়া লেগে রয়—
যাহা নাই তারি অভিমুখে বয়
নদীর মতন বনছায়া দিয়া

আপনার মাঝে আপনি কাঁদিয়া !
নিজে সে কি ধায় ? হায়, মূঢ় হিয়া !

'চণ্ডালী' কবিতা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে লেখা। তিনিই কবিতাটিকে নাট্যরূপ দিতে বলিয়াছিলেন।[৩৫] খানিকটা লেখাও হইয়াছিল।[৩৬] শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়াছিলেন, 'চণ্ডালিকা' নামে (১৯৩৩)। চণ্ডালীর কিছু নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি।

সেই বটতরুমূল, আভরণহীনা সেই ছবি,
সেই চমকিত চোখ।—নিখিল পুড়িছে—দীপ্ত রবি—
তার মাঝে বটচ্ছায়ে তৃষাতুরে করে জলদান—
বহ্নিবর্ণে কে লিখিল নিদারুণ এই ছবিখান
ভিক্ষু আনন্দের বুকে ! দাঁতে দাঁত ঘরষি' সন্ন্যাসী
নিজমর্ম্ম হ'তে যেন আক্রোশে উৎসারি রক্তরাশি
চাহিল ভুলিয়া যেতে' !—হায় !—শেষে সংঘসভা ছাড়ি
কোথায় আনন্দ চলে সেই অন্ধঝটিকা বিদারি' !
হাহা করি চারিদিকে লোটায়ে পড়িছে বেণুবন—
বিশ্ব দাবাইয়া নভ বারবার করে গরজন—
আপনার সঙ্গে বুঝি' তেমনি ঝটিকা বুকে ধরি'
আনন্দ, প্রান্তরপথ চলিছেন অতিক্রম করি' ;
শাখাপত্র ওড়ে মুখে, ত্রিবস্ত্র বাহিয়া পড়ে নীর—
কি টানে চলিছে ভিক্ষু অম্বিকার সুদুর কুটীর।

সতীশচন্দ্রের শেষ রচনা দুইটি কবিতা—'তাজমহল' ও 'আগ্রাপ্রান্তরে'।[৩৭] শান্তিনিকেতন হইতে সতীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন সেইসঙ্গে কবিতা দুইটিও পাঠাইয়াছিলেন। সতীশচন্দ্রের শোচক প্রবন্ধটিতে তাহার অকালমৃত্যুর তাৎপর্য অনুভব করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন

মম্‌তাজের সৌন্দর্য এবং প্রেম অপরিতৃপ্তির মাঝখানে শেষ হইয়া অশেষ হইয়া উঠিয়াছে—তাজমহলের সুষমাসৌন্দর্যের মধ্যে কবি সতীশ সেই অনন্তের সৌন্দর্য অনুভব করিয়া তাহার জীবনের শেষ কবিতা লিখিয়াছিল।

সতীশের তরুণ জীবনও সম্মুখবর্তী উজ্জ্বল লক্ষ্য, নবপরিস্ফুট আশা ও পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের মাঝখানে অকস্মাৎ গত মাঘীপূর্ণিমার দিনে সমাপ্ত হইয়াছে।

এই সমাপ্তির মধ্যে আমরা শেষ দেখিব না, এই মৃত্যুর মধ্যে আমরা অমরতাই লক্ষ্য করিব। সে যাত্রাপথের একটি বাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু জানি, তাহার পাথেয় পরিপূর্ণ—সে দরিদ্রের মত রিক্তহস্তে জীর্ণশক্তি লইয়া যায় নাই।

তাজমহলে একটি চমৎকার উৎপ্রেক্ষা আছে।

আমি দেখি নাই সেই মর্মর কবর
জ্যোৎস্নাচন্দনের রসে রাত্রি জরজর—

গদ্যরচনায় সতীশচন্দ্রের প্রবীণতা আরও পরিস্ফুট। ব্রাউনিঙের 'আরো একটি কথা' কবিতার ও প্যারাসেল্‌সাস কাব্যের, দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণের, রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার

এবং প্রিয়ম্বদা দেবীর রেণুর ভাব ও রস-বিশ্লেষণ করিয়া সতীশচন্দ্র যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার ডায়েরিতে যতটুকু পাই তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন শক্তির আবির্ভাব সূচিত ছিল। মহাভারত হইতে উতঙ্কের কাহিনী লইয়া সতীশচন্দ্র 'গুরুদক্ষিণা' নামে বালকপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় (১৯০৪)। বইটি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠ্য হইয়াছিল।

সতীশচন্দ্রের বাল্য এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। কলিকাতায় ছাত্রাবস্থায় আর এক সুহৃৎলাভ হয়—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁহার রচনাশক্তি যেন এই দুই বন্ধু ভাগাভাগি করিয়া লইলেন। অজিতকুমার প্রবন্ধে ও সমালোচনায়—রবীন্দ্ররচনার বিশ্লেষণে—সতীশচন্দ্রের পথ অনুসরণ করিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ অনুসন্ধিৎসা-অনুশীলনের দ্বারা সাহিত্যের ভাণ্ডারে নূতন রসদ যোগাইতে প্রবৃত্ত হইলেন॥

৬ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ও সুখরঞ্জন রায়

মাসিকপত্রেব পৃষ্ঠায় এবং কবিতার বই প্রকাশ করিয়া যাঁহারা অল্পবিস্তর কবিখ্যাতি অর্জন কবিযাছিলেন তাঁহাদেব সংখ্যা নেহাত কম নয়। ইঁহাদের রচনার মধ্যে ভালো কবিতা বেশ কিছু আছে। অনেকের বাণীতে প্রসন্নতাও আছে। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উল্লেখযোগ্য তাঁহাদেব কথা বলিতেছি।

সতীশচন্দ্র রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মাঝামাঝি একজন হইলেন চট্টগ্রামের জীবেন্দ্রকুমাব দত্ত (১৮৮৩-১৯২৩)। তিনখানি ছোট কবিতাপুস্তক ছাড়া ইঁহার আর কোন বই পাই নাই।[৩৮] এই তিনখানি বই হইতেছে 'অঞ্জলি' (১৯০৭, দ্বি-স ১৯১৯), 'তপোবন' (১৯১২) এবং 'ধ্যানলোক' (১৯১৩)। নানা মাসিক পত্রিকায় ইঁহার কবিতা ছড়াইয়া আছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতোই ইনি দেশপ্রেমিক এবং প্রাচীন ভারতাদর্শের অনুরাগী। ঋগবেদেব দুই একটি সূক্ত ইঁনি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

'তপোবন' হইতে গৃহীত এই কবিতায় তাঁহার রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

> পঞ্চ ঠাঁই হতে নিত্য পঞ্চ মুঠি ভিক্ষা করে আনি
> তুমি করিতেছ রক্ষা আপনার জীব দেহখানি!
> তব এ যোগিনী সাজে লুকাইয়া আছে কি মাধুরী,
> যাব দ্বারে যাও যবে ভিক্ষা-ঝুলি দেয় সেই পুরি!
> সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে কত যুগ, কত বর্ষ মাস,
> কালের বিরাট গর্ভে রচে নিল আপন আবাস!
> নাহি শ্রান্তি, নাহি ক্লান্তি, শৈথিল্য বিশ্রামক্ষণ আর,
> তুমি সদা এক ভাবে পালিতেছ ব্রত আপনার।
> এ ব্রতের কোথা আদি, কোনখানে হবে অবসান,
> বিশ্বের কল্পনা কিছু নাহি করে সদুত্তর দান!
> জানি শুধু রাজেন্দ্রাণী, তব এই ভিখারিনী বেশ,
> সাধিতেছে প্রতি পলে জগতেব কল্যাণ অশেষ।

আনন্দে বিস্ময়ে তাই ভাবি বসে দিবা-বিভাবরী,
কিবা আশে কল্পে কল্পে আচরিছ পূত মাধুকরী ।

সুখরঞ্জন রায়ের (১৮৮৯-১৯৬৪) দক্ষতা ছিল গদ্য ও পদ্য দ্বিবিধ রচনাতেই। তাঁহার কবিতা সবই গাথা-শ্রেণীব। বচনাবীতিতে গদ্যের কঠিনতা ও দৃঢ়তা আছে। ইনি তিনটি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে প্রথম 'শুক্লা' (১৯১০) আখ্যায়িকা কাব্য। কাহিনীটিকে বলিতে পারি অভিনব স্বপ্নপ্রয়াণ। অতিপবিচয়ে গার্হস্থ্য প্রেম বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, কবি তাই স্বপ্ন-অভিসার করিয়াছেন অতীত কাহিনীতে। সেই কল্পিত কাহিনীই কাব্যের বিষয। পরস্পব স্নেহমুগ্ধ দুই ভগিনীর মধ্যে তৃতীয ব্যক্তি—পুরুষের—আবির্ভাব, এবং কনিষ্ঠ ভগিনী শুক্লার ঈর্ষালু ও অশান্ত প্রকৃতির জন্য দুইজনের জীবননাশ এবং একজনেব—নাযিকা শুক্লার—অভিশপ্ত জীবনযাপন। স্বপ্ন যখন শেষ হইয়া আসিতেছে তখন কবি বুঝিতে পারিলেন যে তিনিই পূর্বজন্মে ছিলেন নাযক পূর্ণেন্দু। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি পত্নীব মূর্তিতে শুক্লাকে চিনিতে পারিলেন। অমা, শুক্লা, পূর্ণেন্দু, উদযন, যূথী, কুর্চিকা—এই নামগুলি হইতে এবং কাহিনী হইতে বোঝা যায যে লেখক কাব্যেব মধ্যে একটু রূপকের ইঙ্গিত করিয়াছেন। চরিত্রচিত্রণ মোটামুটি ভালোই। ছন্দ একটানা যোল-অক্ষবেব দীর্ঘায়িত পয়ার, অনেকটা গদ্যেবই মতো। স্থানে স্থানে রবীন্দ্র-বচনাব ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ভালো লাগে।

কাব্যটি 'সূচনা'য় দুই খণ্ডে চার ও সাত 'শাখা'য় এবং 'পবিশিষ্টে' বিভক্ত। সূচনাব প্রথমেই দেখি কবি নিদ্রামগ্ন। গৃহিণী কাজকর্ম সাবিয়া শয়নকক্ষে আসিয়া স্বামীকে জাগাইলে কবি বিরক্ত হইয়া বলিলেন

নাঃ আর লাগে না ভালো
এই শুষ্ক চুম্বনেব মালা বচে' যাওয়া দিন
হতে দিনান্তের পানে, অনন্ত কর্তব্য ভাব।
বড়ই পুরানো তুমি, তেলেতে কালীতে ম্লান,
আগুনে শোষিতবস, জীর্ণ গৃহব্যবহাবে,
স্বপ্ন-স্বর্গলোকভ্রষ্ট একখণ্ড গতবহ্নি-
ধাবার প্রস্তব! হায়! সমস্ত পরাণখানা
আর ত যায না গলি অধব-সঙ্গমে!

জায়া

বটে,
আমি পুরাতন! আব তোমায বসন্ত আসি
বরণ কবিযা গেছে, শুধু বর্ষ লাগি নয়,
অন্তহীন রূপ-যৌবরাজ্যে, ধ্বা-ক্ষয় 'পবে
অফুরান শ্যামল যৌবনে। যাও তবে ত্বরা,
নূতনে লওগে খুঁজি।

কবি

ধরণী পরাণহীন ;
চিত্তব্যধিগ্রস্ত জড় ; হৃদয়-নির্ঝর তব,
উৎস মোর কবিতার, আজ শুষ্কপ্রায় ; আর
ঝরে না ত ঝরঝরি বসন্তমঞ্জরি সম
কাব্য-পুষ্প মোর কল্প-কুঞ্জবনে !

জায়া

দোষ এটা
পুরানো প্রেমের, দেখ আবার পাগল করে'
যে দিবে তোমায় খুঁজে পাও কিনা তায় ।

কবি

সত্য
যাইব বিদেশে আমি ভাবিয়াছি মনে, দেখি—

জায়া

আকাশে পাতিয়া কান গান কারো যায় কিনা
শোনা ।

কবি

ইচ্ছাটা তেমনি তবে দেখা যাক্ । মালা
ছিল, ফুলগুলি গেল যবে, ডোরের বাঁধন
আজিকে ছিঁড়িব আমি ।

দ্বিতীয় বই 'মায়াচিত্র' (১৩১৮ সাল)[৩৯] চার অঙ্কে গাঁথা নাট্যকাব্য । কাহিনী রোমান্টিক । আরম্ভ রবীন্দ্রনাথের বিদায়-অভিশাপের মতো, অবসান ফারসী প্রেমকাহিনীর মতো । 'আকাশপ্রদীপ'ও (ঢাকা, ১৩২১ সাল, নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক প্রকাশিত) তাহাই । কাহিনী মুক্তকল্পনা (fantasy)-মূলক, নারীপ্রেম সম্পর্কিত । বিহারীলাল চক্রবর্তীর ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রভাব আছে । 'হিমানীর বর' (ঢাকা, ১৩৩৩ সাল) ছোট গল্পের বই ।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের অগ্রণী সমালোচকদের মধ্যে সুখরঞ্জন রায় ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন তিনি । তাঁহার কবিপ্রকৃতি ও অধ্যাপকসুলভ অনুসন্ধিৎসা একাজে তাঁহার প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল । রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ও উপন্যাসের আলোচনায় তিনিই সর্বপ্রথম এবং বিস্তৃতভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । সে আলোচনা ধারাবাহিকভাবে 'প্রতিভা' পত্রিকায় (ঢাকা, ১৩১৮ সাল হইতে) প্রকাশিত হইয়াছিল । 'মানসী ও মর্মবাণী', 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'বিচিত্রা', 'নারায়ণ' প্রভৃতি পত্রিকায়ও কিছু কিছু প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল । রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার এবং তাঁহার সামগ্রিক প্রতিভা বিশ্লেষণেও তিনি তৎপর ছিলেন । এই সমস্ত মূল্যবান্ প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে । সুখের কথা কিছু কাল পূর্বে (১৩৮০ সাল) সুখরঞ্জনবাবুর একটি প্রবন্ধ পুস্তক 'রবীন্দ্রকথাকাব্যের শিল্পসূত্র' প্রকাশিত

হইয়াছে। সুখরঞ্জনবাবুর অপ্রকাশিত রচনা আরও বহু আছে বলিয়া শুনিয়াছি। সেগুলির অপ্রকাশে থাকা বাঙ্গালা সাহিত্যের অগৌরবের কথা ॥

৭ বিচিত্র কবি প্রতিভা

রমণীমোহন ঘোষ (১৮৭৫ ১৯২৮) এই সময়ের কবিদের মধ্যে বোধ করি বিশেষভাবে রবীন্দ্র অনুগত ছিলেন। তিনখানি কবিতার বই ইনি প্রকাশ করিয়াছিলেন—'মুকুর' (১৮৯৯, দ্বি-স ১৯০৮), 'মঞ্জরী' (১৯০৭) ও 'ঊর্মিকা' (১৯১৩)। রমণীমোহনের রচনায় রবীন্দ্র অনুগতির ও স্বচ্ছতার কিছু নিদর্শন দিই।

আজি নব বসন্তের বিজন নিশাতে
আসিয়াছি কাছে ল'য়ে আকুল হৃদয়,
আজি চাহি আপনারে দিতে তব হাতে
দেখাতে এ পরাণের নিভৃত নিলয়।
হৃদয়ের অন্তস্থলে আজি দেখ নামি'
সেই দুটি ক্ষুদ্র কথা—'ভালবাসি আমি'। [৪৫]

আবার নব হরষভরে বরষা আসে ভুবনে
ফুল্ল করি তাপিত তরু লতিকা,
গগনপথে নবীন মেঘ বেড়ায় ভাসি পবনে,
কাননে ফুটে কামিনী জাতী যূথিকা। [৪১]

প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর (১৮৭২ ১৯৪৮) উল্লেখ আগে করিয়াছি। ইনি কিছুদিন 'সুহৃৎ' পত্রিকা চালাইয়াছিলেন। ইঁহার পদ্য ও নাট্যরচনাবলী জলধর সেনের সম্পাদনায় কয়েক খণ্ডে বাহির হইয়াছিল। প্রমথনাথের রচনার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—'পদ্মা' (১৮৯৮), 'দীপালি' (১৯০১), 'আরতী' (১৯০২), 'গৌরাঙ্গ' (১৯০৩), 'গাথা' (১৯০৫), 'যমুনা' (১৯০৫), 'গৈরিক' (১৯১৩), 'পাথার' (১৯১৪), 'পাথেয়' (১৯১৬), 'লীলা' (১৯৩০), 'স্মরণ' (১৯৩৭) ইত্যাদি কাব্য, 'ভাগ্যচক্র' (১৯১৩), 'হাম্বির' (১৯১৫), 'দিল্লী অধিকার' (১৯২৪) ইত্যাদি নাটক।

ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী (১৮৭২ ১৯৪০) কতকটা রমণীমোহন ঘোষের সমানধর্মা। দুইজনেই 'সাহিত্য' পত্রিকার গোষ্ঠীভুক্ত হইলেও বরাবর রবীন্দ্র অনুরাগী ছিলেন। ভুজঙ্গধরের কবিতার বই— 'মঞ্জীর' (১৯০৮, দ্বি-স ১৯১০), 'গোধূলি' (১৯১১), 'শিশির' (১৯১৪), 'ছায়াপথ' (১৯১৪) ও 'রাকা' (১৯১৬)। ইনি বসিরহাট হইতে 'পল্লীবাসী' পত্রিকা দুই বৎসর (১৩২৪-২৬ সাল) সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭০-১৯৩৫) অনেকগুলি কবিতা রবীন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল। ইনি এই কাব্যগ্রন্থগুলির রচয়িতা—'পরিমল' (১৯০০), 'বেলা' (১৯০৩), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৪), এবং 'অর্পণ' (১৯৩০)।

সুরমাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৪- ?) দুইখানি ছোট কাব্যগ্রন্থের রচয়িত্রী -'সঙ্গিনী' (১৯০১) ও 'রঞ্জিনী' (১৯০২)। বই দুইটির নামকরণ রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান

করি। বইটির বাহ্যিক সৌষ্ঠবে নূতনত্ব ছিল, গোলাপি কাগজে লাল হরফে কুন্তলীন প্রেসে ছাপা, আকার 'কুন্তলীন পুরস্কার'-এর মতো।

'অশ্রু'র (১৯০৮) রচয়িতা বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের (১৮৮৭-১৯৬১) কবিতার ভাষা সহজ, ছন্দ হালকা। ফিট্‌জেরাল্‌ডের ইংরেজী অবলম্বনে ইনি ওমর খয়্যামের 'রোবাইয়াৎ' অনুবাদ করিয়াছিলেন (দ্বি-স ১৯২৩) এবং ইংরেজী হইতে আরনল্‌ডের *The Light of Asia* কাব্যের ও জেব্‌উন্নিসার কবিতার অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার 'পঞ্চপাত্র' গদ্যে পদ্যে গল্পের বই।

রসময় লাহা (১৮৬৯-১৯২৯) অনেকগুলি ছোট ছোট কবিতাপুস্তক বাহির করিয়াছিলেন। যেমন, 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৯৭), 'ছাইভস্ম' (১৯০০), 'আরাম', 'আমোদ' (১৯১৩), 'পরিহাস' (১৯২৮) ইত্যাদি। প্রথম বইটি ছাড়া সবই হাস্যকৌতুকের কবিতা ও প্যারডি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভক্ত জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীর (?-১৯২৯) কবিতাসংগ্রহ, 'প্রভাতী', 'মাধুরী' (১৯০৯), 'অরুণ' (১৯০৫) ও 'ধারা' (১৯১৫)। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ কন্যা অনঙ্গমোহিনী দেবী (১৮৬৪-১৯১৮) দুইটি কবিতার বই, 'শোকগাথা' (১৯০৬) ও 'প্রীতি' (১৯১০) লিখিয়াছিলেন। রজনীকান্ত সেনের ভগিনী অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা (১৮৭০-১৯৪৬) লিখিয়াছিলেন 'প্রীতি ও পূজা' (১৮৯৭) ও 'খোকা' (১৯০২)। ইঁহার 'কৃষ্ণকেলিরসালাপ' (১৯৩৪) বৈষ্ণব-কবিতার মতো ভক্তিরসময় রচনা। নগেন্দ্রবালা (মুস্তোফী) সরস্বতীর (১৮৭৮-১৯০৬) রচনা এই ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডে উল্লিখিত আছে।

এই সময়ে অনেক মহিলা কবির রচনা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইত। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই—আত্মরচনার প্রতি মোহহীনতার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে—কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হন নাই। কেহ কেহ হয়ত দুই-একটি বই বাহির করিয়াছিলেন কিন্তু আত্মীয়বন্ধু-সমাজের বাহিরে প্রচার না হওয়ায় সেগুলি এখন নিতান্ত দুর্লভদর্শন। রাজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠ কন্যা লজ্জাবতী বসুর (১৮৭৩-১৯৪২) বহু কবিতা বামাবোধিনী পত্রিকায় এবং অন্যত্র বাহির হইয়াছিল। বিনয়কুমারী বসুর কবিতা বেশির ভাগ সাহিত্যে প্রকাশিত হইত।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত লেখিকাদের লক্ষ্য বিশেষ করিয়া কবিতা রচনাতেই নিবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় দশকে তাঁহাদের সে দৃষ্টি গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সাফল্য খুঁজিয়াছে।

আলোচ্য সময়ে কবিতা রচনায় মুসলমান লেখকেরা আগেকার তুলনায় বেশ স্বাচ্ছন্দ্য দেখাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জীবনমঙ্গল' ও 'মুকুর' (১৯২১) রচয়িতা দৌলত আহাম্মদ, 'নবনূর'-এর (১৯০৩ হইতে) সম্পাদক ও 'ডালি'র (১৯১২) রচয়িতা সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-?) এবং কাজী ইমদাদুল হক। হকের একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

হাসি

ভাল নাহি লাগে তত চন্দ্রিকার খেলা
চঞ্চলবাহিনী বুকে—লহরে লহরে

জ্যোছনায় ছুটাছুটি। স্থির সরোবরে
ফুল্ল কুমুদিনী-হাসি কৌমুদীর মালা
হৃদে ধরি,—তাও নহে তত প্রাণময়।
নিরজন রসময় কুসুমের হাসি
মলয়-চুম্বনে মৃদু, বড় ভাল বাসি—
সে হাসিরাসিতে তবু হয় না হৃদয়
কখনো আপন হারা। নিকুঞ্জকাননে
উষাদেবী হাসে যবে, কত মনোহর
হয় সে যে, ছোটে তাহে সুধার লহর—
সে হাসি মলিন আজি আমার নয়নে।
আমি যে হেবেছি হাসি সে চাঁদ-মুখের
উচ্ছ্বাসের প্রতিমূর্তি আমার বুকের। [৪২]

ইমদাদুল হকের অন্য বচনাও আছে। ইঁহার উপন্যাস 'আব্দুল্লাহ' (১৯৩২) পাঠকদের সমাদর লাভ করিয়াছিল ॥

টীকা

১ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস চতুর্থ খণ্ড (আনন্দ সংস্কবণ) পৃ ১০১ দ্রষ্টব্য।

২ প্রমথনাথেব গ্রন্থাবলী জলধব সেনের সম্পাদনায় সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৯১৫-১৬)।

৩ কবিতা সংখ্যা ৫৭। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, "ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর হইলেও কবিবর ববীন্দ্রনাথেব কবস্পর্শ লাভ কবিবাব সৌভাগ্য আমাব এই কবিতাগুলির হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রকাশে ইহাই আমার প্রধান উৎসাহ।"

৪ ইহাব আগে এমন সুসজ্জিত শোভন-ছাপা কবিতাব বই বাহির হইয়াছিল বলিয়া আমার জানা নাই।

৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস চতুর্থ খণ্ড (আনন্দ সংস্কবণ) পৃ ৪৫৬ (চিত্রাবলী) দ্রষ্টব্য।

৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস তৃতীয় খণ্ডে (আনন্দ সংস্করণ) দেবেন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালেব কবিতা-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৭ 'পদচিন্তামণিমালা' (১২৮৩ সাল)। রজনীকান্তের ভগিনী অম্বুজাসুন্দরীও কবিতা লিখিতেন।

৮ 'কান্তকবি বজনীকান্ত', নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পৃ ৭৩।

৯ ঐ ৭৬।

১০ বাঙ্গালীর প্রথম কাপড়ের কল বঙ্গলক্ষ্মী কটন-মিলসের প্রথম প্রস্তুত মোটা সুতার শাড়ি তৈয়ারি উপলক্ষ্যে গানটি লেখা হইয়াছিল।

১১ 'বাণী'তে সঙ্কলিত।

১২ রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের হাসপাতালের ব্যবস্থা ও পরিবেশ অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন। তাই পারতপক্ষে তিনি সহবেব হাসপাতাল মাড়াইতেন না।

১৩ ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতীতে অতুলপ্রসাদের 'চোর' কবিতা বাহির হইয়াছিল।

১৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড (আনন্দ সংস্করণ) পৃ ৪১৬ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১৫ 'চাঞ্চল্য', 'ম্লানিমা', 'প্রেমকোজাগব', 'অজ্ঞাতে' ও 'প্রত্যাগমন'।

১৬ সমালোচনী প্রথম বর্ষ (১৩০৮-০৯ সাল)।

১৭ প্রথম প্রকাশ বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩০৯।

১৮ সতীশচন্দ্রের অনেক বচনা প্রথমে রবীন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ও তাহার অনুজা সমালোচনীতে বাহির হইয়াছিল (১৩০৮ চৈত্র হইতে ১৩১১ বৈশাখ)। অজিতকুমার চক্রবর্তী শান্তিনিকেতন হইতে 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' বাহির করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতী-পত্রিকায় (ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা) কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা উদ্ধৃত

হইয়াছে।

১৯ 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৩১৮ সাল)।

২০ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (১৩৪৮ সাল।)

২১ বিশ্বভারতী-পত্রিকা (ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা) পৃ ১৮৫-৮৬।

২২ 'পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়' (বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১০)।

২৩ লিপিকায় সঙ্কলিত।

২৪ প্রথম প্রকাশ বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১০।

২৫ রচনাকাল জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯।

২৬ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা পত্র (বিশ্বভারতী-পত্রিকা ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা পৃ ১৮৭)।

২৭ অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (বিশ্বভারতী-পত্রিকা ঐ পৃ ২০৯)।

২৮ বিশ্বভারতী-পত্রিকা ঐ পৃ ১৭৭-৭৮।

২৯ 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী'তে (১৯১২) প্রকাশিত।

৩০ 'প্রাতঃপ্রবুদ্ধা' (প্রথম প্রকাশ সমালোচনী, চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৮-০৯)।

৩১ 'নিশীথিনী' (প্রথম প্রকাশ বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১১)।

৩২ 'আত্মসমর্পণ' (প্রথম প্রকাশ সমালোচনী, আষাঢ় ১৩০৯)।

৩৩ প্রথম প্রকাশ বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০।

৩৪ প্রথম প্রকাশ বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১০।

৩৫ "রবিবাবুর অনুদিষ্ট 'আনন্দ ভিক্ষু'র কাহিনীটিকে ছন্দোবদ্ধ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত রবিবাবু উহাকে ভাল বলিয়াছেন—তবে তাঁহার ইচ্ছা ওটাকে Drama করি। কিন্তু আমার ইচ্ছা থাকিলেও কেমন যেন হইতেছে না।" অজিতকুমারকে লেখা চিঠি (বিশ্বভারতী-পত্রিকা ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা পৃ ১৮৭)। এই চিঠিতে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি সংযুক্তার স্বয়ংবর লইয়া একটি কাহিনী-কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি শিশুপাঠ্য পত্রিকা 'মুকুল'-এ ছাপাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র বসুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

৩৬ "বৌদ্ধ নাটক বাড়ীতে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া প্রথম অঙ্কের কতদূর লিখিয়া হারাইয়া ফেলিয়াছি।" সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি (বিশ্বভারতী-পত্রিকা ষষ্ঠ তৃতীয় সংখ্যা পৃ ১৭৯)।

৩৭ প্রথম প্রকাশ বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১০।

৩৮ ধ্যানলোকের শেষ পৃষ্ঠায় 'মাতৃলোক' এবং 'গীতি ও গাথা' নামে দুইখানি বই "যন্ত্রস্থ" বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

৩৯ "'চিত্রাঙ্গদা', 'চোখের বালি' ও 'রাজা'র রবীন্দ্রনাথকে এই গ্রন্থ ভক্তিভরে অর্পণ করিলাম।

—গ্রন্থকার।"

৪০ দুটি কথা' (মুকুর)।

৪১. 'বর্ষা' (ঐ)।

৪২. সমালোচনী প্রথম বর্ষ (১৩০৮ সাল)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
যুগান্তরাল

১ উপক্রম

'অচলায়তন' রচনা (আষাঢ় ১৩১৮), পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের রাষ্ট্রীয় পুনর্মিলন (পৌষ ১৩১৮), রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা (১৪ মাঘ ১৩১৮), তাঁহার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি (কার্তিক ১৩১৯), সবুজপত্র প্রকাশ (বৈশাখ ১৩২১) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)—এই ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনাপরম্পরা বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তরাল বর্ষ-দশকের (১৯১১-২০) ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যবহ।

স্বদেশি আন্দোলনের উত্তেজনা কোন বড় রকমের গঠনাত্মক কর্মক্ষেত্র না পাইয়া বাহিরের দিক হইতে ধীরে ধীরে থামিয়া আসে এবং ভিতরের দিকে খানিকটা কেন্দ্রীভূত হইয়া হিংসাত্মক বিপ্লব-পন্থার ভূমিগর্ভে সুড়ঙ্গপথ খুঁজিতে থাকে। একদিকে তীব্র আবেগ-উত্তেজনার পর নিষ্ফলতার ব্যর্থ ক্ষোভ, অপরদিকে শাসনকর্তাদের ক্রমবর্ধমান পরুষ ও ক্রুদ্ধ ব্যবহার—এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া দেশের কর্ম-ও-চিন্তা-নেতৃত্ব দ্বিধাগ্রস্ত ও বহুখণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিধাবিভক্ত বাঙ্গালা দেশ একত্রিত হইলে পর খানিকটা আত্মতৃপ্তি আসিলেও গোল মিটিল না। নূতনতর বিপদের সম্ভাবনাও দেখা দিল,—স্বদেশি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ধর্ম সমাজ ও অশিক্ষার জালজঞ্জালগুলিকে মহীয়ান্ করিয়া এবং আত্মত্রাণের শেষ উপায় ভাবিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার পুনশ্চেষ্টা,—এককথায় বিগত শতাধিক বর্ষকালের অগ্রগতি হইতে পশ্চাদপসরণ। রবীন্দ্রনাথ বুঝিলেন, এই জালজঞ্জালগুলি জড়াইয়া আছে বলিয়াই আমাদের অগ্রগতি সব দিকেই প্রতিহত হইতেছে। মরণবাঁচনের এই সমস্যাকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়া সমাধান নির্দেশ করিলেন। যেমন রোগ কড়া তেমনি ঝাঁজালো ঔষধ। উচ্চতম শিল্পের মিষ্টতম মধুর অনুপান সত্ত্বেও এ ঔষধে যে কতটা উপকার দিল তাহা ক্রমশ বিবেচ্য। তবে ঝাঁজটা লাগিল। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক অন্তঃপুরে আঘাত হানিতেছেন বলিয়া প্রতিবাদ উঠিল। এ প্রতিবাদ কাজেকাজেই অপরিস্ফুট, কেননা অচলায়তনের মর্মানুধাবন ও রসগ্রহণ তখনও প্রত্যাশিত

ছিল না। তবে এই রকম একটি প্রতিবাদের সূত্রেই অবগত হই রবীন্দ্রনাথ কোন্ অচলায়তনের উপর আঘাত হানিয়াছিলেন এবং কেন, আর আসল রোগটিই বা কি।

> আমার লেখা পড়িয়া অনেকে বিচলিত হইবেন এ কথা আমি নিশ্চিত জানিতাম ; আমি শীতলভোগের বরাদ্দ আশাও করি নাই। অচলায়তন লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। ...দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে ; সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এ দেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে—সেই কান্নাই ক্ষুধার কান্না, মারীর কান্না, অকালমৃত্যুব কান্না, অপমানের কান্না। সেই কান্নাই নানা নাম ধরিয়া আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতার সঞ্চার করিযাছে, সমস্ত দেশকে নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছে, এবং বাহিরের সকল আঘাতের সম্বন্ধেই তাহাকে এমন একান্তভাবে অসহায় কবিয়া তুলিয়াছে। ইহার বেদনা কি প্রকাশ করিব না ? কেবল মিথ্যা কথা বলিব এবং সেই বেদনার কারণকে দিনরাত্রি প্রশ্রয় দিতেই থাকিব ? অন্তরে যে-সকল মর্মান্তিক বন্ধন আছে বাহিবের শৃঙ্খল তাহারই স্থূল প্রকাশ মাত্র। অন্তরের সেই পাপগুলোকে কেবলই বাপু-বাছা বলিয়া নাচাইব, আর ধিক্কার দিবার বেলায় ওই বাহিরের শিকলটাই আছে ? আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে। যত লড়াই ওই শাস্তির সঙ্গে ? আর, যত মমতা ওই পাপের প্রতি ? আপনার মধ্যে যেখানে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু আছে, যেখানে সকলের চেয়ে ভীষণ লড়াই প্রতীক্ষা করিতেছে, সে দিকে কেবলই আমরা মিথ্যার আড়াল দিয়া আপনাকে বাঁচাইবাব চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমি আপনাকে বলিতেছি, আমাব পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই—এই পাষাণ-প্রাচীরের চারিদিকেই তাহার মাথা ঠেকিয়া সে কোনো আশার পথ দেখিতেছে না। ·অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে।[১]

২ প্রথম বিশ বছর

রবীন্দ্রনাথেব সৃষ্টিব বিচিত্রতা ও ঐশ্বর্য সাহিত্যে পুরাতনপন্থীদের নিরুৎসাহ করিয়া আনিতেছিল, কিন্তু তাঁহাদের মনে পরিবর্তন ঘটাইয়া বিদ্বেষের মুখরতা সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহার যশ-অসহিষ্ণু কোন কোন প্রতিষ্ঠাবান্ লেখক ও গোষ্ঠিপতি পত্রিকা-সম্পাদক রবীন্দ্র-রচনার বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে লেখনী-অভিযান চালাইতেছিলেন। তবে ইঁহাদের দল দিন দিন হতবল হইয়া আসিতেছিল। এ দলের চূড়ান্ত পরাজয় হইল বলিতে গেলে ১৪ মাঘ ১৩১৮ (২৮ জানুয়ারি ১৯১২) তারিখে, যেদিনে বাঙ্গালা দেশের নবীন-প্রবীণ নেতা মনীষীরা রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশদ্বর্ষ-বয়ঃপূর্তি উপলক্ষ্যে টাউন-হলে প্রকাশ্যভাবে বিপুল আনন্দে ও উৎসাহে তাঁহাকে সংবর্ধিত করিলেন। এই অনুষ্ঠান যেন বাঙ্গালা সাহিত্যসভায় রবীন্দ্র-প্রতিভার রাজ্যাভিষেক।[২] রবীন্দ্রনাথের একপঞ্চাশতম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কবির অচিরাগামী অভূতপূর্ব সম্মানের ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যায়।

> জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব,
> বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব।

দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইবে মানি'
হে গুণী তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব।

১৯১৩ নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নোবেল-প্রাইজ প্রাপ্তির খবর বাহির হইল। এই ঘটনার প্রধান তাৎপর্য এই যে ইহার দ্বারা পাশ্চাত্য মনীষা আপনার সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় প্রতিভার সমকক্ষতা স্বীকার করিয়া লইল। বিশ্বসাহিত্য সংস্কৃতিতে আধুনিক ভারতবর্ষ জাতে উঠিল, বলিতে পারি। দেশের মধ্যে ইহার ফল কম গুরুত্বপূর্ণ হয় নাই। বুঝুক আর নাই বুঝুক রবীন্দ্রনাথের রচনার সর্বাতিশায়িত্ব সর্বসাধারণে মানিয়া লইল। শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে বাঙ্গালা সাহিত্যের দরও বাড়িল। দুই চার মাস আগেও যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াইতেছিলেন তাঁহারাও এখন তাঁহাকে সংবর্ধনা করিতে স্পেশাল ট্রেনে করিয়া বোলপুরে ছুটিলেন (২৩ নভেম্বর ১৯১৩)। এই হৈচৈ রবীন্দ্রনাথ একটুও পছন্দ করেন নাই। তিনি সংবর্ধনার প্রতিভাষণে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য ও হিতকর কিন্তু কিছুতেই বিরোধিপক্ষের মনোহর নয়।

সংবর্ধনা-সভায় রবীন্দ্রনাথের উক্তি আরও অনেকের ভালো লাগে নাই। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না, যে তাঁহাদের মধ্যে এমন কোন কোন ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সম্ভাবনায় হিংসার জ্বালায় বিলাতে পর্যন্ত বিষ বিকীর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সমসাময়িকের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করি।'[৩]

> লণ্ডন মহানগরীতে কবির অভ্যুদয় লণ্ডনের বিখ্যাত পত্রিকাগুলি মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কবির প্রশংসায় লণ্ডন সহর মুখরিত হইয়া উঠিল। এ সময়ে দেশ হইতে সংবাদ আসিল—"কবির এ সব তর্জমা স্বকীয় নহে—কারণ কবির ইংরাজী জ্ঞান অতিশয় সঙ্কীর্ণ।" এরূপ উক্তির পিছনে কতিপয় স্বদেশবাসীর নীচ মনের পরিচয় প্রচ্ছন্ন ছিল ইহা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের আচরণ ও উক্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত হইয়াছিল॥

৩ বিপিনচন্দ্র পালের সহিত বিরোধ ও 'সবুজপত্র'-এর উদ্‌গম

প্রমথনাথ চৌধুরীর গাঢ়বন্ধ ও অ-গতানুগতিক পদ্য ও গদ্য রচনা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ স্থির করিলেন, ইঁহাকে অগ্রণী করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে আধুনিকতার পথে পরিচালিত করিতে হইবে। কয়েক বছর আগেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পর বিপিনচন্দ্র পাল বঙ্গদর্শনের আসরে জাঁকিয়া বসিয়া উলটা সুরের তান ভাঁজিতে ছিলেন। বিপ্লবপন্থার দিকে উস্‌কানি এবং রবীন্দ্রনাথের রচনার ও চিন্তার বিরূপ সমালোচনা তাঁহার রচনার উদ্দেশ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তায় এখন আর খুব ফাঁক নাই, তাঁহার রচনাশিল্পের উপর ঠোকর মারাও সাধ্যাতীত। তাই বিপিনচন্দ্র আক্রমণ করিলেন রবীন্দ্র-রচনার ভাব ও বস্তু। রবীন্দ্রনাথের রচনা যে "বস্তুতন্ত্রতাহীন" তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। প্রতিবাদও উঠিল। প্রবাসীতে অজিতকুমার চক্রবর্তী বিপিনচন্দ্রের প্রতিবাদ উপলক্ষ্যে রীতিমত রবীন্দ্রকাব্যালোচনা শুরু করিলেন। কিন্তু যে রীতিতে আক্রমণ সে রীতিতে তো আত্মসমর্থন সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করিলেন আধুনিকতম অস্ত্র—নির্মল

বুদ্ধির, অনাবিল চিন্তার ও শাণিত বচনের—যাহা প্রতিপক্ষের বর্ম ও মর্ম ভেদ করিবে এবং সেই সঙ্গে পাঠক ও লেখক মনের জড়তা হইতে, সাহিত্য-কর্মের ধূলি-আবর্ত ও পুনরাবৃত্তির চক্রভ্রমণ হইতে মুক্ত হইবার দিশা পাইবে।

এই উদ্দেশ্য লইয়া প্রমথ(নাথ) চৌধুরী 'সবুজপত্র' বাহির করিলেন (১৫ বৈশাখ ১৩২১)। কর্তৃপক্ষের কোন রকম লাভের উদ্দেশ্য ছিল না, তাই পত্রিকাটি একেবারে বিজ্ঞাপনবিরহিত। এই দিক দিয়া সবুজপত্র সাধনার একধাপ উপরে উঠিয়াছিল। (সাধনায় বিজ্ঞাপন থাকিত স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায়, তবে মলাটের চার পৃষ্ঠায় কোনরকম বিজ্ঞাপন থাকিত না।) পত্রিকাটি বাহির করিবার সঙ্কল্প শুধু প্রমথনাথের একার নয়, রবীন্দ্রনাথেরও।[৭] এবং সবুজপত্র নাম বোধ করি রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া।

> সবুজপত্র উদ্‌গমের সময় হয়েছে—বসন্তের হাওয়ায় সে কথা ছাপা রইল না—অতএব সংবাদটা ছাপিয়ে দিতে দোষ নেই।[৫]

> আচ্ছা রাজি আছি। ১৫ই বৈশাখেই বের কর। ইতিমধ্যে দু একটা লেখা দিতে পারব।[৬]

সতেজ প্রাণের ও সজীব চিন্তার প্রতীক ও লাঞ্ছন রূপে তালপাতার ছবি সবুজপত্রের সবুজ মলাটে কালো রঙে সিলুয়েতে ছাপা থাকিত। পালাবদলের সাহিত্যচিন্তায় সবুজপত্র অনেকগুলি ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিল। যথা, (১) জীবনের সঙ্গে মননের সোজাসুজি ও সজাগ সংযোগ না থাকিলে সাহিত্যরচনা বহুলাংশে মিথ্যা হইতে বাধ্য। তাই অতীতের ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া বর্তমানের বেদনা ও চিন্তা রাখিয়া মানিয়া লইয়া ও নিজের শক্তিতে সচেতন থাকিয়া সাধনায় সাহিত্যকর্ম করিতে হইবে। (২) পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য আমাদের মানসমুক্তি আনিয়া দিয়াছে। সেই প্রভাবকে সবলে প্রত্যাখ্যান না করিয়া এবং বাঙ্গালীর জীবনে ও চিন্তায় যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহার দিকে পিছু না ফিরিয়া আমাদের নিজস্ব চিন্তাপথে এবং স্বাধীনভাবে মনন ও প্রকাশ না করিলে সার্থকতা নাই। (৩) অন্যমনস্ক ও পুঁথিগত চিন্তারীতিকে যথাসাধ্য দুরস্ত করিতে হইবে। ভাষার শৈথিল্য ও নিরর্থ আড়ম্বরের জন্য সমসাময়িক সাহিত্যকর্মে যে নাবালকত্ব প্রকট তাহা ঘুচাইতে না পারিলে সাহিত্যের মান উন্নত হওয়া সম্ভব নয়। (৪) এইজন্য সংস্কৃত-ব্যাকরণপীড়িত, শিক্ষার্থী-অনুকৃত, বক্তৃতা-উপদেশেরই উপযুক্ত সাধুভাষার পরিবর্তে চিন্তার সহজ-যান, মুখের কথার কাছাকাছি চলিত-ভাষাকে মনের কথার বাহন করিতে হইবে।[৭]

সবুজপত্রের তথা রবীন্দ্রনাথের বিরোধীরা মাস সাতেক পরেই তাঁহাদের মুখপত্র বাহির করিলেন, 'নারায়ণ' (অগ্রহায়ণ ১৩২১)। পত্রিকাটির সম্পাদক ও পোষক হইলেন একদা রবীন্দ্র-বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। মুখ্য লেখক বিপিনচন্দ্র পাল অনেককাল আগেই রণং দেহি বলিয়া তাল ঠুকিতেছিলেন। বিপিনচন্দ্রের বাগ্মিতা ছিল, লিখিবার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। এখন তিনি সবুজপত্রের মাথা মুড়াইতে আগাইয়া আসিলেন। কিন্তু একাগ্র প্রমথনাথের সঙ্গে তিনি পারিয়া উঠিলেন না। রবীন্দ্রনাথের অভয়বাণী সর্বদা জাগ্রত ছিল।

> বি—এবং বি—র পালকবর্গ যে তোমার সবুজপত্রের মাথা মুড়িয়ে খাবার চেষ্টা করবেন সে আমি জানতুম।…

যাই হোক আমি নিশ্চয় বলে দিচ্চি তোমার কাছে এদের হার মানতেই হবে। অনেকদিন পর্যন্ত এরা বিনা বাধায় আমাদের দেশের যুবকদের বুদ্ধিকে পঙ্কিল ক'রে তুলছিল—বিধাতা বরাবর তা সইবেন কেন ? দেশের কোন জায়গা থেকেই কি এরা ধাক্কা পাবে না ? সরল মূঢ়তাকে সওয়া যায় কিন্তু বাঁকা বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়। [৮]

প্রমথনাথের "অ-সাধু" ভাষার খুঁত বাহির করিতে গিয়া বিপিনচন্দ্র হাতে-নাতে ধরা পড়িলেন। [৯]

সম্পাদক সবুজপত্রের নৌকায় চলিত-ভাষার পাল তুলিয়া দিলেন। কাণ্ডারী হাল ধরিয়া রহিলেন। তাঁহার গল্প (যেমন, 'স্ত্রীর পত্র') ও উপন্যাস ('ঘরে বাইরে') বাঙ্গালা সাহিত্যের অভিনব পণ্যের বোঝাই লইয়া নূতন বন্দরের দিকে যাত্রা করিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে "আধুনিকতা"র এই দ্বিতীয় শুভারম্ভ ॥

৪ স্বদেশি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় ও প্রথম মহাযুদ্ধ

দিল্লী-দরবারে (ডিসেম্বর ১৯১১) পঞ্চম জর্জ পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের পুনর্মিলন এবং বিহার ও উড়িষ্যার ছেদ ঘোষণা করিলেন। ইহাতে বাঙ্গালীর বিক্ষত আত্মসম্মানে খানিকটা মলম লাগিল। কিন্তু ইতিমধ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিন্তায় বেশ অন্যমনস্কতা দেখা দিয়াছে। স্বদেশি শিল্পপ্রচেষ্টার প্রথম উদ্যমগুলির ব্যর্থতা প্রত্যাশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়া জাগাইতেছে। উৎসাহী দৃঢ়সঙ্কল্প তরুণ-সমাজে বিপ্লবপন্থার মোহঘোর ঘনাইয়াছে। চিন্তাশীল নেতাদের মধ্যে গুরুতর মতানৈক্য ঘটিয়াছে। সাধারণ মধ্যবিত্তেরা জাতীয় আন্দোলন হইতে ক্রমশ দূরে সরিয়া পড়িতেছে। ভালোর মধ্যে দেখা যাইতেছে কর্জনের ইউনিভার্সিটি আইনের দরুন (১৯০৯ হইতে) কলেজি শিক্ষার প্রসার। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষায় কৌতূহল ও বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসায় উস্‌কানি লাগিল। কিন্তু সেই অনুপাতে উচ্চশিক্ষিতের উপার্জনের পথ প্রশস্ত হইতে পারে নাই। শিক্ষার মানও অপতিত থাকে নাই।

ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ আসিয়া পড়িল (আগস্ট ১৯১৪)। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আঁচ আমাদের দেশে লাগে নাই। তবে সাধারণ জীবনযাত্রায় খানিকটা অসুবিধা হইয়াছিল বিদেশি মালের অভাবে। লাভের মধ্যে হইল কোন কোন দেশীয় শিল্পের উন্নতি যোগ এবং চাকুরিয়া নয় এমন কিছু সহরবাসী মধ্যবিত্তের কিঞ্চিৎ আর্থিক উন্নতি। ১৯১৯ অব্দে প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের বিধানে শিক্ষিত ছাত্রেরা বিদ্যাবলে উচ্চতর রাজকর্মে নিযুক্ত হইবার আরও কিছু সুযোগ পাইল ॥

টীকা

১ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি (২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮)। রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড, পৃ ৫০৮-১০ দ্রষ্টব্য।

২ ইহার পরেও বিরুদ্ধবাদীরা একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হন ১৩১৯ সালের পৌষ মাসে স্টার থিয়েটারে আনন্দবিদায়ের অভিনয়-বিড়ম্বনায়।

৩ 'রবীন্দ্র-সঙ্গমে য়ুরোপ-প্রবাসের স্মৃতিকথা', শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মন (বিচিত্রা, চৈত্র ১৩১৮)।

৪ "সেই কাগজটার কথা চিন্তা কোরো। যদি সেটা বের করাই স্থির হয় তাহলে শুধু চিন্তা করলে হবে না—কিছু লিখতে শুরু কোরো। কাগজটার নাম যদি "কনিষ্ঠ" হয় ত কি রকম হয়? আকারে ছোট—বয়সেও।" চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড, পৃ ১৭১।

'কনিষ্ঠ' নামটি রবীন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিলেন বোধ হয় বিরুদ্ধবাদী 'জ্যেষ্ঠ' অর্থাৎ জ্যাঠাদের মনে রাখিয়া।

৫ ৫ মার্চ ১৯১৪ তারিখে প্রমথবাবুকে লেখা চিঠি। চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড পৃ ১৭১।

৬ ২৩ মার্চ ১৯১৪ তারিখে প্রমথবাবুকে লেখা চিঠি। চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড, পৃ ১৭৩।

৭ 'সবুজপত্রের মুখবন্ধ' (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩২১)। প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধসংগ্রহ' (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় প্রকাশিত) দ্রষ্টব্য।

৮ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠি (২ আগস্ট ১৯১৪)। চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড, পৃ ১৮৩-৮৪ দ্রষ্টব্য।

৯ 'কৈফিয়ৎ' (প্রথম প্রকাশ সবুজপত্র, আশ্বিন ১৩২১)। 'বীরবলের-হালখাতা' দ্রষ্টব্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
উদ্‌ঘাটক : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি

১ উপক্রম

রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কবিত্বশক্তি প্রবীণ সাহিত্যিকদের সকলকে উদ্বোধিত করিতে পারে নাই। তবে মধ্যপূর্ব কলিকাতার একটি নবীন সম্প্রদায়কে অত্যন্ত প্রভাবিত করিয়াছিল। ইঁহারা বলিতে গেলে ঈশ্বর গুপ্তের বংশধ্বজ। ইঁহারদের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় গজেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের। গজেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিয়ে ছিলেন না ; তিনি ছিলেন আস্বাদক। তিনিই উৎসাহ দিয়া তাঁহার সাহিত্যগোষ্ঠীকে অত্যন্ত উৎফুল্লিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়িতে তরুণ সাহিত্যিকদের জমাট আড্ডা বসিত। তাঁহার বাস ছিল কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগ স্থলে অক্সফোর্ড মিশনের পাশে একটি দোতলা বাড়িতে। এখন সেটি ভাঙ্গিয়া নূতন বাড়ি হইয়াছে। তাঁহার বাড়িতেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রভৃতি নবীন ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম সাহিত্যিকদের ঘোরতর আড্ডা বসিত ॥

২ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

যুগান্তরালের মুখ্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। তাঁহার সময়ের কোন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার ইঙ্গিতই তাঁহার রচনায় উপেক্ষিত হয় নাই, এবং অধিকাংশ সমবয়সী ও কনিষ্ঠ কবিতা-লেখকদের উপর সত্যেন্দ্রনাথের রচনার প্রভাব স্পষ্ট প্রতিভাত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কৃতিত্ব সম্বন্ধে এখনকার গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্য-সমালোচকদের অভিমত খুব স্পষ্ট নয়। সেইজন্য ইঁহার রচনার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক মনে করি।

সত্যেন্দ্রনাথের মানসপ্রকৃতির গঠন তাঁহার পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের সূত্রে পাওয়া। অক্ষয়কুমারের তথ্যদৃষ্টি ও জ্ঞানবিজ্ঞানপ্রিয়তা সত্যেন্দ্রনাথে বর্তাইয়াছিল। অনুবাদ-কর্মে পৌত্র-পিতামহ দুইজনেই সমান ক্ষমতাবান্ ছিলেন। পিতামহ গদ্যে, পৌত্র পদ্যে ও গদ্যে। ধর্মবিষয়ে নিরুৎসুকতায়ও দুইজনের মধ্যে মিল পাই। ১৩০৮ সালের দিকে

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার (সহপাঠী ?) সুহৃদ্দ্বয় সতীশচন্দ্র রায় ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গসৌভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন এবং ১৩১০ সালে সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ইঁহার কাব্যশিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকেন। সতীশচন্দ্রের রোমান্টিক নিসর্গদৃষ্টি এবং সমাজসচেতনত্ব সঞ্চারিত হইয়া সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পকে নিজস্ব বিকাশের পথনির্দেশ করিয়াছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ পাঠ্যাবস্থা হইতে কবিতা লেখা শুরু করিয়াছিলেন। তাঁহার যে কয়টি বাল্যরচনা তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ দুইটিতে স্থান পাইয়াছে তাহাতে বিশেষ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়াল এই চার কবির রচনার অল্পবিস্তর অনুসরণ চোখে পড়ে। তাহার পর রবীন্দ্রনাথের রীতি অনুধাবনের সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় রঙ ধরিতে থাকে। সহজ ভাষা ও প্রসন্ন-চপল ছন্দ—এই দুই বিষয়েই রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্যেন্দ্রনাথের শিক্ষা। ভাবের ঋণ কোন কোন কবিতায় দেখা যায়, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহ নিজের পথ চিনিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে সে কারবার চুকিয়া যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ চার বছর হেদুয়ার পূর্বদিকে অবস্থিত পাদরীদের কলেজে পড়িয়াছিলেন (১৮৯৯-১৯০৩)। কলেজি বিদ্যায় তাঁহার মন ছিল না। কিন্তু শেষ অবধি জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকাংশ বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ অটুট ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞানী বুদ্ধির অংশ প্রবল ছিল। তাই তাঁহার কবিতা যতটা বস্তুগর্ভ, ততটা ভাবগভীর নয়। মানব-সংসারেব জ্ঞানভাণ্ডারের প্রায় সকল সামগ্রীর প্রতিই তাঁহার যে সজাগ কৌতূহল ছিল, তাহার পরিচয় তাঁহার কাব্যে প্রায় সর্বদা লভ্য, তা সে প্রাচীন ইতিহাস হোক আর আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানই হোক। কবিতারচনার জন্য জ্ঞানের সঞ্চয় প্রচেষ্টা আধুনিক কালে আমাদের দেশে সত্যেন্দ্রনাথের রচনাতেই প্রথম প্রকটিত।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানসের বহিঃপ্রকাশ স্বদেশপ্রীতিতে ও জ্ঞানবিজ্ঞানপ্রিয়তায়। সদা-জাগ্রত দেশচেতনায় ও সমাজচেতনায় তাঁহার কবিকর্ম প্রায় সর্বদা উদ্ভাসিত। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতাপুস্তিকা 'সবিতা'র (১৯০০) "সূচনা"য় সত্যেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা অনুধাবনযোগ্য।

> প্রাচ্যের বৈদিক ঋষি এবং প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক উভয়ের চক্ষেই সবিতা জ্ঞানের আধার—প্রাণের আধার। এত উৎসাহ—এত তেজ আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। মানবের এমন গুরু আর নাই। তাই আমাদের প্রাণহীন জাতিকে অতীত ও বর্তমান স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত আজি ঐ প্রাণময় অমিততেজা বিশ্বজ্ঞানরূপী সবিতার মূর্তি অঙ্কিত করিবার প্রয়াস। জীবনে উৎসাহ চাই, মনে তেজ চাই, কর্মে আনন্দ চাই, হৃদয়ে স্ফূর্তি চাই। দর্শনের অবসাদ ঔদাস্য যথেষ্ট হইয়াছে। ...পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতায় শত শত লোক বর্ষে বর্ষে অনশনে প্রাণ হারাইতেছে, এমন করিয়া কতদিন চলিবে ?...তাই যদি স্বজাতীয়ের বিলোপ বাঞ্ছিত না হয় তবে এখনও দার্শনিক নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানোন্নত শিল্পশিক্ষা কর্তব্য। সত্য বটে দর্শনই বিজ্ঞানের ভিত্তি, তাহা হইলেও অভিব্যক্তি হিসাবে বিজ্ঞান দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।..এখনও সময় আছে। পূর্ব প্রতিভার অঙ্গারে এখনও অনল আছে। কে বলিল উৎসুক ফুৎকারে জ্বলিয়া উঠিবে না ? ভারত দর্শনে শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞানে না হইবে কেন ?

৩

সত্যেন্দ্রনাথের জীবৎকালে এই পুস্তকপুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল,—'সবিতা' (১৯০০), 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫), 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬, দ্বি-স ১৯২২), 'হোমশিখা' (১৯০৭), 'তীর্থসলিল' (১৯০৮), 'তীর্থরেণু' (১৯১০), 'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২), 'জন্মদুঃখী' (১৯১২)[১], 'চীনের ধুপ' (১৯১২)[২], 'রঙ্গমল্লী' (১৯১৩)[৩], 'তুলির লিখন' (১৯১৪), 'মণিমঞ্জুষা' (১৯১৫), 'অভ্র-আবীর' (১৯১৬) ও 'হসন্তিকা' (১৯১৭)। কবির মৃত্যুর পর তিনখানি বই বাহির হয়,—'বেলা শেষের গান' (১৯২৩), 'বিদায় আরতি' (১৯২৪) এবং 'ধূপের ধোঁয়ায়' (১৯২৯)[৪]। বেলা-শেষের-গানের "উৎসর্গ"[৫] হইতে অনুমান করি, কাব্যটির গ্রন্থন ও প্রকাশসঙ্কল্প কবির জীবৎকালেই ঘটিয়াছিল।

কবিমানসের ধারা ও কাব্যশিল্পের ইতিহাস অনুসরণ করিলে কাব্যগ্রন্থগুলিকে এইভাবে ভাগ করা যায়,—(১) বেণু-ও-বীণার অধিকাংশ কবিতা ; (২) সবিতা,[৬] হোমশিখার দ্বিতীয় হইতে সপ্তম কবিতা, এবং সন্ধিক্ষণ[৭] ; (৩) বেণু-ও-বীণার অবশিষ্ট কবিতা[৮] এবং হোমশিখার শেষ কবিতা ('সাম্য-সাম') ; (৪) তীর্থসলিলে ও তীর্থরেণুতে সঙ্কলিত অনুবাদ কবিতা এবং ফুলের-ফসল ; (৫) কুহু-ও-কেকা ; (৬) হসন্তিকা, এবং (৭) অভ্র-আবীর হইতে শেষ পর্যন্ত।

বেণু-ও-বীণার অধিকাংশ কবিতা সত্যেন্দ্রনাথের "কৈশোরক" পর্বের (১৩০০-১৩০৬ সাল) রচনা বলিতে পারি। সেগুলির মধ্যে আদিতম বলিয়া বোধ হইতেছে চতুর্দশপদী পয়ার কবিতাগুলি। ষোড়শপদীগুলি কিছু পরবর্তী কালের রচনা। 'উল্কা', 'প্রবালদ্বীপ', 'আগ্নেয়দ্বীপ,'—এগুলির বিষয় যোগাইয়াছে পিতামহের 'চারুপাঠ'। 'ঝড় ও চারাগাছ', 'অপূর্ব সৃষ্টি', 'অক্ষয় বট' ও 'শাহারজাদী',—এই চারটি কবিতায় মাইকেলের ভাবভঙ্গির অনুসরণ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের চৈতালির চতুর্দশপদীর অনুকৃতি দেখা যায় 'শিশুর আশ্রয়', 'অরণ্যে রোদন' ও 'দেবতার স্থান'—এই তিনটিতে। দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাব অনুভূত হয় কয়েকটি কবিতায়,—'অনিন্দিতা', 'মূল ও ফল', 'হাসি-খেলা', 'জীর্ণ-পর্ণ' ইত্যাদিতে। অক্ষয়কুমার বড়ালের রচনার ইঙ্গিত বোঝা যায় এই কবিতাগুলিতে—'ফাগুনে', 'দ্বিতীয় চন্দ্রমা', 'স্খলিত পল্লব', 'ভ্রষ্ট' ইত্যাদি। কাহিনীগর্ভ কবিতাগুলিতে এবং বিশেষ করিয়া 'আলেয়া' ও 'মমতাজ' কবিতা দুইটিতে সতীশচন্দ্র রায়ের অনুসরণ লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ক্রমবর্ধমান এবং ব্যাপকতম। প্রথমদিকে পাই মানসীর ছায়া, মাঝের দিকে দেখি চৈতালী, কথা-ও-কাহিনী, কণিকা, কল্পনা, ক্ষণিকা ও শিশুর ছায়া, শেষের দিকে পাই বাউল গানের প্রতিফলন। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-প্রভাব ছন্দে ও ভাষাতেই পর্যবসিত।

বেণু-ও-বীণায় বিবিধ কবির ও কাব্যশিল্পের ছায়াপাতের কিছু কিছু নির্দশন দিতেছি।

মাইকেলের অনুসরণ

> জন্ম তব সত্যযুগে, হে অক্ষয়-বট,
> শাস্ত্রে কহে. সত্য কি ? কহ তা' মোরে তুমি

বড় সাধ মনে, যেতে তোমার নিকট,
ধন্য সে, চক্ষে যে হেরে তব পীঠ-ভূমি। [৮ক]

দেবেন্দ্রনাথের অনুসরণ

ওরে দিদি, দেখি, দেখি—একবার আয়,
ওই দুষ্ট হাসি যেন দেখেছি কোথায়!
বুড়া যে হয়েছি আমি ভাই,
সব কথা ভুলে ভুলে যাই।
ওই যে চতুর হাসি সরল প্রাণের
ও যেন রে কর্‌তব মধুর গানের;
হয়েছে,—ও হাসিটুকু, ভাই,
যা'র ছিল, সে-ও আর নাই। [৮খ]

অক্ষয়কুমারের অনুসরণ

স্বপনে দেখিনু রাতে, হে ভারত-ভূমি,
সাগর বেষ্টিতা অয়ি মর্ত্যের চন্দ্রমা,
কুহকী নিদ্রার বশে সংজ্ঞাহীনা আমি—
শুনিনু মহিমা তব অয়ি বিশ্বরমা! [৮গ]

সতীশচন্দ্রের অনুসরণ

পুড়ে মরি—পতি নাই পাই,
কোথা পাব জুড়াবার ঠাঁই?
জ্বালার অবধি মোর নাই। [৮ঘ]

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ

(ক)

বরযার নিবিড়তা দিক্ প্রাণে আকুলতা,
আপনা চিনিব তবু, আপনা চাহিয়া;
সৌন্দর্য নিবিয়া যাক্, ধরণী ডুবিয়া থাক্
আপন দারিদ্র্য শুধু উঠুক ফুটিয়া। [৮ঙ]

(খ)

বহুদিন পরে চলিয়াছি গ্রামে,
নূতন হয়েছে পুরাণো
চোখের উপরে বেড়ে ওঠে ধান,—
দায় হ'ল আঁখি ফেরানো।
নাচে বুলবুলি আর ফিঙে,
জাল ফেলে ফেলে জেলের ছেলেরা
বেয়ে নিয়ে চলে ডিঙে। [৮চ]

(গ)

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?

কোন্ দেশেতে চ'ল্‌তে গেলেই—
দ'ল্‌তে হয় রে দূর্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ
আমাদেরি বাংলা রে ![৮ছ]

রবীন্দ্রনাথের হাল্‌কা ভাষা ও ছন্দের অনুসরণ করিয়াই বেণু-ও-বীণার নিজস্ব সুরটুকু বাজিয়া উঠিয়াছে। দুইটি উদাহরণ দিতেছি। একটিতে শিশুর "তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া" কবিতার ছাপ, অপরটিতে কথা-ও-কাহিনীর 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি' এবং শেষেরটিতে কল্পনার 'প্রকাশ' ইত্যাদির অনুবৃত্তি। এই ছন্দচপলতার পথই সত্যেন্দ্রনাথ নিজের বলিয়া অচিরে চিনিয়া লইয়াছিলেন।

তুমি গো আছ মগন ঘুমে
ফুলের বিছানা ;
জানালা দিয়ে পড়িছে গিয়ে
আকুল জোছনা।[৮জ]

ঝর্ঝর রবে ঝরে বারিধার, শিথিলিত কেশ বেশ ;
গর্জন ধ্বনি সহসা উঠিল ব্যাপিয়া সর্বদেশ।
এ পারে বজ্র অট্ট হাসিল, ও পারে প্রতিধ্বনি,—
সংজ্ঞা হারানু কি যে হ'ল পরে আর কিছু নাহি জানি।[৮ঝ]

রচনাকালের হিসাবে প্রথম কবিতা 'আরম্ভে' বেণু-ও-বীণার শেষ কবিতা। কবিতাটিতে সত্যেন্দ্রনাথ কাব্যনামের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। জীবনে দুঃখ-দুর্দশা-অসফলতার বেদনার দ্যোতক "বেণু", আর কামনা-বাসনা-ভালোবাসার ব্যাকুলতার প্রতীক "বীণা"। 'বেণু ও বীণা' নাম দিয়া কবি তাঁহার কবিতার এই বস্তুগত ও ভাবগত তত্ত্বটুকু বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

বাতাসে যে ব্যথা যেতেছিল ভেসে, ভেসে,
যে বেদনা ছিল বনের বুকেরি মাঝে,
লুকানো যা' ছিল অগাধ অতল দেশে,
তারে ভাষা দিতে বেণু সে ফুকারি' বাজে।...

হৃদয়ে যে সুর গুমরি মরিতেছিল,
যে রাগিণী কভু ফুটেনি কণ্ঠে-গানে,
শিহরি, মূরছি—সেকি আজ ধরা দিল,—
কাঁপিয়া, দুলিয়া, ঝঙ্কারে—বীণাতানে ?

বেণুর তান জোরে বাজিয়াছে সেই পাঁচটি কবিতায় ('পথে', 'অন্ধশিশু', 'অবগুণ্ঠিতা ভিখারিণী', 'বিকলাঙ্গী' ও 'কুস্থানাদপি') যেখানে কবি শহরের হৃদয়হীন ঐশ্বর্যের মাঝখানে অনাথ নিপীড়িত দুর্বল লাঞ্ছিত মানবের ছবি আঁকিয়াছেন। বীণার তারে ঝঙ্কার উঠিয়াছে সেখানে যেখানে মাঠের ঘাটের চিত্ররসে কবির নয়ন মগ্ন।

কলায়ের সুঁটে প্রজাপতি ফুটে,—
প্রজাপতি লুটে বেড়ায় খালি ;
নারিকেল-শিরে বেজে ওঠে ধীরে
শত জোড়া ছোট হাতের তালি !
কাঠ-বিড়ালেরা মুখে মুখে করে
ঘুরণি-ঘোরার হরষ-ধ্বনি ;
কাছিমেরা দেয় রোদে গা-ভাসান্,
শালিকেরা ফেরে ফড়িং চুমি । [৮ক]

আর একটি ভালো কবিতা, "রম্যাণি বীক্ষ্য" ।

আন্ গগনের চাঁদ,
যেন হেথায় পাতে ফাঁদ ;
আর নিশীথের আলো
আজ হেথায় কিসে এল ?
আরেক সাঁজের গান,
ফিরে জাগায় যেন তান ;
তারার বনে পরাণ হ'ল সারা !

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতাপুস্তিকা দুইটি—'সবিতা' (১৯০০) ও 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫), এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হোমশিখা' (১৯০৭) এক স্তরের রচনা । নামগুলিও সব দেবতা এবং আরাধনা-ঘটিত । সবিতা হোমশিখার প্রথম কবিতারূপে অন্তর্ভুক্ত, এবং সন্ধিক্ষণ দ্বিতীয় সংস্করণ বেণু-ও-বীণার অন্তর্গত । কেবল হোমশিখার শেষ কবিতা 'সাম্য-সাম' এই স্তরের বাহিরে পড়ে । এইটিকে বাদ দিলে হোমশিখা স্তরের কবিতা-রচনার কাল ১৩০৫ হইতে ১৩১২ সাল ধরিতে হয় । [৯] সবিতা, সন্ধিক্ষণ এবং হোমশিখার সমস্ত কবিতাগুলির মধ্যে, সামান্য হইলেও, উল্লেখযোগ্য একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে কবিতাগুলির নাম সবই স-কারাদি,—সবিতা, সোম, সর্বংসহা, সমীর, সিন্ধু, স্বর্ণগর্ভ, সাগ্নিকের গান, সাম্য-সাম, সন্ধিক্ষণ । কবিতানামের এই আদ্যানুপ্রাস যে কবির ইচ্ছাকৃত তাহা বোঝা যায় 'স্বর্ণগর্ভ' হইতে । এই দেবতা বেদে হিরণ্যগর্ভ নামেই প্রসিদ্ধ । অনুপ্রাসের খাতিরেই সত্যেন্দ্রনাথ হিরণ্যের প্রতিশব্দ স্বর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন ।

হোমশিখায় সত্যেন্দ্রনাথের বিদ্যাপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় বেদ এবং সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য হইতে গৃহীত কপালটুকি উদ্ধৃতিগুলিতে । প্রাচীন ভারতের জ্ঞানযজ্ঞোপাসনার প্রতি ঝোঁকও লক্ষণীয় । বইখানি পিতামহের নামে উৎসর্গিত, তাহাও তাৎপর্যপূর্ণ । কাব্যগ্রন্থের নামকরণের হেতু সূচিত হইয়াছে এই কয় ছত্রে

প্রাচীন বেদীর 'পরে, নূতন সমিধ, সাজাইয়া',—
তীর্থ-জলে রচিয়া পরিখা,—
ব'সে আছি প্রতীক্ষায়, আকাশের পানে তাকাইয়া,
কেমনে জ্বালিব হোমশিখা ?

গগনে বাড়িল বেলা,— মানবের মেলা পথে ঘাটে,
আচম্বিতে আমারি সকাশে—
বিদ্যুৎ পড়িল খসি'। সোনায় মুড়িয়া শুষ্ক কাঠে,
হোমশিখা উঠিল আকাশে।

সাম্য-সাম ছাড়া, সবিতা হইতে সন্ধিক্ষণ অবধি সব কবিতাই সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক 'মহিলা' কাব্যে ব্যবহৃত ছোটবড় আট ও দশ ছত্রের স্তবক-বদ্ধ ছাঁদে লেখা।[১০] সবিতায় জ্ঞানের ধ্যান। তাই কবিতাটির কপালটুকিতে উদ্ধৃত হইতেছে গায়ত্রী ঋক্। কবি তাহার অনুবাদও দিয়াছেন গায়ত্রী ছন্দে

ধ্যেয়াই বরেণ্য সবিতায়।
রমণীয় দীপ্তিদেবতায়
আমাদের বুদ্ধি বিধাতায়॥

সবিতার প্রথম স্তবক

তিমির-রূপিণী নিশা—সবিতা-সুন্দর!
সে তিমিরে তোমার সৃজন,
বিমল উজ্জ্বল আলো, সৌন্দর্য আধার!
ফুল্ল-উষা—অপূর্ব-মিলন।
কুসুমিতা বসুন্ধরা—
দ্যু-লোক আলোক-ভরা—
জনয়িতা সবিতা সবার!
বরণীয়—রমণীয় নিত্য-জ্ঞানাধার!

সোম প্রেমের দেবতা।

সারা দিনমান করি ক্ষয়
নিশি আনে মহেন্দ্র সুযোগ,
সোম, সোম, কি আনন্দময়,
নয়নের মনের সম্ভোগ ;
রূপ মাঝে মোহ বীজ,—
স্বর্ণকোষে প্রেমাঙ্কুর,
মধু! সোম! মনসিজ!
দেহ লবে আনন্দ প্রচুর,
গণ্ডূষে শুষিব সুধা সব,
সোম, সোম—আজি মধুৎসব।[১১]

সর্বংসহা শৌর্যের দেবতা, পৃথিবী।

শক্তি দাও ছিঁড়িব শৃঙ্খল,
সর্বংসহা!—সহেছি অনেক!
দূর কর সর্ব অমঙ্গল—
দূর কর প্রভেদের ভেক
মুক্তিজলে সর্বজনে কর অভিষেক!

মুক্ত হ'ব শক্তি কর দান,
দুঃখ হতে কর পরিত্রাণ।[১২]

সমীর প্রাণের দেবতা, সিন্ধু দুঃখের। স্বর্ণগর্ভ আকাশের—আনন্দের—অধিদেবতা, ব্রহ্ম। সাগ্নিকের গানে অগ্নির অর্থাৎ কর্মতপস্যার জয়কার। এই ছয়টি বিশ্বপ্রকৃতিক (elemental) দেবতা-অধিদেবতার স্তুতির পরে হোমশিখার কবিতা সাম্য-সামে বিশ্বপ্রকৃতির সর্বপ্রাণের জন্মসত্ত্ব হইতে বঞ্চিত দরিদ্র ঘৃণিত নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতি সমবেদনা অভিব্যক্ত। ছন্দে ভাষায় ও ভাবে এই কবিতায় কবির মৌলিকতার ও "আধুনিকতা"র প্রকাশ আছে।

খনির তিমিরে, কারা কি কহিছে, ওগো শোন পাতি কান,
অনেক নিম্নে পড়ি' আছে যারা শোনো তাহাদের গান।
দূর সাগরের হলাহল সম উঠিছে তাদের বাণী,
বহু সন্তাপ, বহু বিফলতা, অনেক দুঃখ মানি';
অশ্রু হারায়ে রক্ত নয়ন জ্বলিছে আগুন হেন,
পঙ্কিল ভাষা, স্বল্প বচন,—নাহি সে মানুষ যেন!
শ্রমের মাতাল পাষাণের চাপে উঠিছে পাগল হ'য়ে,
রসাতল পানে ছুটে যেতে চায় বোঝার বালাই লয়ে;
জীবন বিকায়ে ধনের দুয়ারে খাটিয়া খাটিয়া মরে,
কলঙ্কহীন শ্রমের অন্নে জঠর নাহিক ভরে।
হেথায় কুবের ফুলিছে, ফাঁপিছে,—ফুলিছে টাকার থলি,
চিবুকের তলে বাড়িছে তাহার দ্বিতীয় পাকস্থলী!
নরবাহনেব সুবিপুল ভারে মানুষ মরিল, হায়,
মরিল ধরম, মরিল সরম, ধরণী গুমরি' ধায়।
তবু ঘর্ঘরে, চলে মন্থরে, জুড়িয়া সকল পথ,
ধনী-নির্ধনে সমান কল্পিয়া জগন্নাথের রথ![১৩]

সন্ধিক্ষণে স্বদেশি আন্দোলনের যুগোদ্‌বোধন ও কর্মপ্রশস্তি। শেষ স্তবক

সুবেশ রাখাল-বেশ সকল ভুলিয়া,
ধন্য হও স্বদেশের কাজে;
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া স্থির স্থাণুর মতন
মান্য হও জগতের মাঝে।
আত্মতেজে করি' ভর—
কর্মে হও অগ্রসর।
মূর্খে শুধু বলে এ 'হুজুক';
বঙ্গ-ইতিহাসে আজ এল স্বর্ণ যুগ।

আগেই বলিয়াছি যে, পিতামহের মতো পৌত্রেরও অনুবাদ-কাজে সহজ প্রবণতা এবং দীপ্ত উৎসাহ ছিল। ভাষান্তর হইতে বাঙ্গালায় কবিতার অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যিক

জীবনের প্রথম হইতেই শুরু করিয়াছিলেন এবং অনুবাদের কাজেই তাঁহার কবিতা রচনায় হাত পাকে। হোমশিখার পরে তাঁহার দুইখানি অনুবাদ-কাব্যগ্রন্থ পর পর বাহির হইয়াছিল,—'তীর্থসলিল' (১৯০৮, দ্বি-স ১৯১২) ও 'তীর্থরেণু' (১৯১০)। পাঁচ বছর পরে আরো একখানি প্রকাশিত হইয়াছিল,—'মণিমঞ্জুষা' (১৯১৫)। এই কাব্যত্রয়ীকে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম বিশ্বসাহিত্য-কবিতাসমুচ্চয় বলা যাইতে পারে। সব দেশের সব ভাষার (—অবশ্য অধিকাংশই ইংরেজী অনুবাদ হইতে—) প্রাচীন ও নবীন গান ছড়া ও গীতি কবিতার সহিত বাঙ্গালী পাঠক এখন কিছু পরিচয়ের পথ পাইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে এ ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ। বই তিনখানিতে সর্বসমেত প্রায় সাড়ে পাঁচ শ[১৪] অনুবাদ কবিতা আছে। ভারতীয় ভাষার কতকগুলি এবং ফারসী কবিতা সবই মূল হইতে অনূদিত। তবে তামিল, তেলুগু, মুণ্ডারি প্রভৃতি ভিন্নগোত্রীয় ভারতীয় ভাষার এবং ফারসী ও ইংরেজী ছাড়া অন্য অভারতীয় ভাষার কবিতা ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ। অনুবাদে দক্ষতা প্রথম হইতেই পরিস্ফুট। তবে ভাষায় ও ছন্দে দখল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদে সুভগতা বাড়িতে থাকে।

'তীর্থসলিল' নামটির ইঙ্গিত হোমশিখার ভূমিকা-কবিতাটিতে আছে।[১৫] তীর্থসলিলে সত্যেন্দ্রনাথ এই কৈফিয়ৎ দিতেছেন

আনন্দের আত্মীয়তা করিতে স্থাপন,—
লঙ্ঘিয়া সকল বাধা,—ভাষা, কাল, দেশ,
বর্ণ, জাতি, পাঁতি, কূল,—ছিল এ মনন ;
নাহি জানি কি করিতে কি করিনু শেষ।[১৬]

তীর্থরেণুর কৈফিয়ৎ

তীর্থের ধূলি মুঠি মুঠি তুলি'
করিয়াছি এক ঠাঁই,
বিশ্ব-বীণার তারে তারে তারে
পরশ বুলায়ে যাই ;

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ গান বাঙ্গালা-সংস্কৃত মিশ্র ভাষায় লেখা। তীর্থসলিলে সত্যেন্দ্রনাথ সে গানটির এই অনুবাদ দিয়াছেন,[১৭]

বন্দনা করি মায় !
সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, চন্দন-শীতলায় !
যাঁহার জ্যোৎস্না-পুলকিত রাতি
যাঁহার ভূষণ বনফুল পাঁতি,
সুহাসিনী সেই মধুরভাষিণী—সুখদায়—বরদায় !
বন্দনা করি মায় !
সপ্তকোটির কণ্ঠনিনাদ যাঁহার গগন ছায়,
চৌদ্দ কোটি হস্তে যাঁহার
চৌদ্দ কোটি ধৃত তরবার,

এত বল তাঁর তবু মা আমার অবলা কেন গো হায় ?
বন্দনা করি মায় !

অনুবাদ বই তিনখানিতে বাঙ্গালীর লেখা ইংরেজী কবিতারও অনুবাদ কিছু আছে।[১৮] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌলিক ইংরেজী কবিতাটির অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। এটিতে রবীন্দ্রনাথের ভাব সত্যেন্দ্রনাথের কলমে কেমন রূপ লইতে পারে তাহার নির্দশন মিলিবে। কবিতাটির নাম 'একটি গান'।

পাখী গাইত নিতি হৃদয়-খোলা খেয়ালে খুসী
ও সে মেল্‌ত পাখা মেঘের সীমানায় ;
আহা কোন্ ক্ষণে প্রেম সঙ্গ নিলে কোন্ আশা পুষি
পাখী জান্‌লে নাক' হায় !
আজ সে পাখীর স্বস্তি নাহি আর,—
হারিয়েছে নীড়,—হিয়ায় হাহাকার।
আর সে খেয়াল নাই গো উড়িবার,—
গানের-বিহার বন্ধ আজি তার।
বন্দী সে আজ প্রেমের বন্ধনে,
তবে চরম কথা মরম ক্রন্দনে
নিক্ সে ক'য়ে হায় !
আজ ফুরিয়েছে তার গগন-বিহার
হারিয়েছে কুলায়।

অনুবাদ-কবিতার মধ্য দিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা গীতিকবিতায় নূতন নূতন ফর্ম ও ছন্দোরীতি আমদানি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যেমন জাপানী 'তান্‌কা'[১৯] ফরাসীর মাধ্যমে মালয় 'পান্তুম্'[২০], উগোর (Victor Hugo) ও ভেয়ারলেনের (Paul Verlaine) বিচিত্র স্তবক নির্মাণরীতি ইত্যাদি। তান্‌কার উদাহরণ[২১]

জেলেদের জাল
দেখা নাহি যায় জলে,
এমনি কুয়াসা ;—
দৃষ্টি নাহিক চলে,
'বেলা হ'ল' তবু বলে !

পান্তুমের উদাহরণ,—বোদ্‌লেয়ারের (Charles Baudelaire) *Harmonic du Soir* কবিতার অনুবাদ 'সন্ধ্যার সুর'[২২]।

ওই গো সন্ধ্যা আসিছে আবার, স্পন্দিত সচেতন
বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস ;
ধ্বনিতে গন্ধে ঘূর্ণি লেগেছে, বায়ু করে হা-হুতাশ,
সান্দ্র ফেনিল মূর্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন।

বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস,
শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন গো ব্যথিত মন ;

সান্দ্র ফেনিল মূর্ছা শিথিল নৃত্য-আবর্তন।
সুন্দর-ম্লান, বেদী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ।

শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন গো ব্যথিত মন,
অগাধ আঁধার নির্বাণ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস,
সুন্দর-ম্লান, বেদী সুমহান সীমাহীন নীলাকাশ,
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য হ'য়েছে অদর্শন।

অগাধ আঁধার নির্বাণ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস,
ধরার পৃষ্ঠে মুছে গেছে শেষ আলোকের লক্ষণ;
ঘণীভূত নিজ শোণিতে সূর্য হয়েছে অদর্শন,
স্মৃতিটি তোমার জাগিছে হৃদয়ে, পড়িছে আকুল শ্বাস।

অনুবাদ-কবিতাগুলির মধ্য দিয়া সত্যেন্দ্রনাথের আর একটি প্রয়াস প্রকটিত। সে হইল ইউরোপের নবীন ও প্রবীণ সমসাময়িক কবিদের নামের ও রচনার সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচয় করিয়া দিয়া সাহিত্যে নূতন সৃষ্টির পথ দেখানো। নবীন কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন,—ইংরেজীতে অস্টিন (Alfred Austin), ব্রিজেস্ (Robert Bridges), ইয়েটস্ (William Butler Yeats), ও'শনেসি (Arthur O' Shaughnessy), পাউন্ড (Ezra Pound); ফরাসীতে প্রুধোম্ (Sully Prudhomme),ভেয়ার্হেরেন (Emile Verhaeren), মেটারলিঙ্ক (Maurice Maeterlinck),ভ্যালেরি (Paul Valery); জার্মানে ডেহ্মেল (Richard Dehmel), হোল্ৎস্ (Arno Holz); ইত্যাদি। ইউরোপের এই সমসাময়িক কবিদের রচনার অনুবাদের উৎকর্ষ নীচের উদ্ধৃতিগুলি হইতে বোঝা যাইবে।

ইয়েট্সের *Lake Isle of Innisfree*

এবার আমি নিচ্ছি ছুটি,—ছুটছি এবার জলটুঙিতে,—
ছোট্ট আমার পাতার কুঁড়ে তুল্‌ব সেথায় কাদার ভিতে;
হোগ্‌লা দিয়ে ছাইব তারে,—কাঠের আড়া, বাঁশের ডাঁসা,
পাহাড়তলীর নিদ্‌মহলে মৌমাছিদের শুনব ভাষা!...[২৩]

পাউন্ডের অনুবাদ 'স্বর্ণমৃগ'

দেখিয়াছি তারে মেঘের মাঝারে
পাহাড়ের জঙ্গলে
দুঃখে গলে না স্নেহে সে ভোলে না,
কেবলি নাচিয়া চলে।
তবু তার সেই চাহনিটি যেন
পূর্বরাগের চাওয়া,
দোলাইয়া যেন যায় বনে বনে
প্রভাত-শুভ্র হাওয়া!
চিরকামনার স্বর্ণমৃগ সে
কীর্তি তাহার নাম

শিকারী এবং কুক্কুরদলে
দেয় না সে বিশ্রাম। [২৪]

মেটারলিঙ্কের একটি কবিতার অনুবাদে ('চোখের চাহনি')[২৫] সত্যেন্দ্রনাথ সিঁড়িভাঙা ছন্দসজ্জা অবলম্বন করিয়াছেন। তখনো 'বলাকা' বাহির হয় নাই, তবে এই ছন্দসজ্জায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা সবুজপত্রে ও অন্যত্র ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতাটির প্রথম অংশ এই

ক্লান্ত শত নয়নের শ্রান্তিভরা চাহনি মলিন
আর এই আমাদের দৃষ্টি চির ক্ষীণ!
আর যারা গেছে চিরতরে, ফিরিবে না আর
তাদের চাহনি করুণার!
আর যারা হবে,
যারা আজ রয়েছে সম্ভবে,
আর যারা হ'ল না, পেল না হ'তে হায়,
তাহারা সবাই আজ আঁখি দিয়ে আঁখি মোর ছায়।
কারো আঁখি যেন, চির-অনাথ-আতুর,
করুণায় কারো পরিপূর,
কারো আঁখি দয়া করে তফাতে থাকিয়া
যেন দয়া-দেখানোর অজানিত স্বাদ আল্‌গোছে দেখিছে চাখিয়া;
চাহনি সে নানা
কারো আঁখি ধব্‌ধবে ফরাসের পরে
কালোকোলো ছাগলের ছানা।

তীর্থরেণু পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের যথার্থ মূল্য বিচার হইয়া গিয়াছে।

> এক রকম অনুবাদ আছে যাহা রূপ হইতে প্রতিরূপ আঁকার মত—তাহাতে কেবল চেহারাটা দেখা যায় কিন্তু সে চেহারা কথা কহে না—অর্থাৎ তাহাতে খানিকটা পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশই বাদ পড়ে। তোমার এই অনুবাদগুলি যে জন্মান্তর-প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য নহে ইহা সৃষ্টিকার্য।

'চীনের ধূপ'[২৬] গদ্য পুস্তিকা হইলেও তীর্থসলিল তীর্থরেণু ও মণি-মঞ্জুষার সমপর্যায়ভুক্ত। চীনের অধ্যাত্মচিন্তার পরিচয় তাঁহার কবিতায় পাই না। সেই অভাব পূরণের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ এই পুস্তিকায় চারটি প্রবন্ধে তাও ও কন্‌ফুসিয়সের ধর্ম ও নীতি চিন্তার সহজ এবং মনোজ্ঞ পরিচয় দিয়াছেন। চার স্তবকের একটি কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ ভূমিকারূপে যোগ করিয়াছেন। কবিতাটির প্রথম ও শেষ স্তবক উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে বোঝা যাইবে কবি সত্যেন্দ্রনাথ কোন্ আশা লইয়া বিশ্বসাহিত্যে বাঙ্গালার সাজ চড়াইতে চাহিয়াছিলেন।

বিশ্বে মহামানবের মানস-সুন্দরী
উদ্বোধিত, প্রতিষ্ঠিত সিংহাসন 'পরে,

দিগ্‌গজেরা তীর্থজলে অভিষেক করি'
দিকে দিকে মন্ত্রধ্বনি করে হর্ষভরে।

সুরূপা য়ুরোপা তারে অঞ্জন জোগায়,—
ভারত সে অনবদ্য লীলাপদ্মখানি,
বিশ্বরাজ-সমাগম-আসন্ন-আশায়
বিশ্বে মহামানবের সাজে চিত্তরাণী।

৪

সত্যেন্দ্রনাথেব মৌলিক রচনার দ্বিতীয় স্তরে (১৩১০-১৩১৩ সাল) যে কবিতাগুলি লেখা হইয়াছিল সেগুলি প্রধানত তিনটি গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল,—'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২) ও 'তুলির লিখন' (১৯১৪)। এই সময়েই সত্যেন্দ্রনাথের শক্তির বিচিত্র বিকাশ। তাঁহার কাব্যভাবনায় আত্মচিন্তার স্থান বেশি ছিল না। যেটুকু ছিল সেটুকুও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াইবার চেষ্টায় এখন মুছিয়া গেল। চোখে রঙের নেশা আব কানে ধ্বনির রেশ কবির মনে ঘোর ধরাইয়া দিল। ধ্বনির প্রবাহ ও নৃত্যচাপল্য ভাষায় ও ছন্দে ধরিবার চেষ্টাই এখন তাঁহার কাব্য-সাধনায় ঈপ্সিত হইল।

'ফুলেব ফসল' নামটি নেওয়া ফারসী "ফসল্-ই গুল্' হইতে।[২৭] গোড়াতেই দুই স্তবকের একটি কবিতা, হজরৎ মোহম্মদের উক্তির অনুবাদ। এই কবিতাটির মধ্যে ফুলের-ফসলের মর্মকথা নিহিত।

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধাব লাগি',
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুবাগী।

বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
হৃদয়-প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই ত সুধা।

ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন, "এই কবিতাগুলি ১৩১৩ সাল হইতে ১৩১৭ সালের মধ্যে রচিত।"

বেশির ভাগ কবিতাই আকারে ছোট, কতকগুলি গানের ধরনের। কতকগুলি কবিতায় (সম্ভবত গোড়ার দিকে লেখা) রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ বেশ স্পষ্ট। যেমন

হায়! বারণ করে!
বাবণ শুনি'—কি গো—তটিনী ফেরে?
তবু, বারণ করে!
চবণ-ধ্বনি—তার—যখনি শুনি
বুকে সে বাজে—লাজে—কথা না সরে।[২৮]

সত্যেন্দ্রনাথ যে ১৩১৬-১৭ সালের দিকেই ছন্দ লইয়া পরীক্ষা শুরু করিয়া দিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ দুই চারটি কবিতায় আছে। এখানে কবি চেষ্টা করিয়াছেন—অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের পথ ধরিয়া—পর্বে আদি অক্ষরে ঝোঁক ফেলিয়া গড়ানে ছন্দকে নৃত্যবৃত্ত করিতে। যেমন, 'স্রোতেব ফুল', রবীন্দ্রনাথের "যদি বারণ কর তবে গাহিব না" গানের ছন্দের প্যাটার্নে।

জীবন কুস্বপন—জনম ভুল।
চলেছি ভেসে ভেসে স্রোতের ফুল।
যুঝি মরণ সনে,—
মরিতে ক্ষণে ক্ষণে,
না পাই তল কিবা না পাই কূল।

নিম্নের উদাহরণটিতে ছন্দের কুশলতা আরও পরিস্ফুট।

ওগো নবীনা লতা !
কেন দোলায়ে পাতা
বাতাসে জানাও
কচি কুঁড়ির কথা !
এই তো সকল
শাখা উঠিতে পূরি',
এই তো নকল
রাখী বাঁধিছে ঝুরি !
নহে বিহ্বল
আছে বহুল পাতা ;
এখনি কেন গো
এত চঞ্চলতা ?[২৯]

কোন কোন কবিতায় ধ্বনি ও চিত্রের একাত্মতা ঘটিয়াছে। এইগুলিই ফুলের-ফসলের বিশিষ্ট রচনা। যেমন

হাওয়ার মত হাল্‌কা হিমের
ওঢ়ন দিয়ে গায়,
অন্ধকারে বসুন্ধরা
শূন্য চোখে চায় ;
তারার আলো দূর,
কণ্ঠভরা বাষ্প, আঁখি
অশ্রু-পরিপূর।[৩০]

সত্যেন্দ্রনাথের আঁকা বাঙ্গালা দেশের পল্লীশ্রীর এইরকম ধ্বনিচিত্র সমসাময়িক তরুণ কবিতা-লেখকদের অনেককেই এই ধরনের রচনার দিকে প্রবলবেগে টানিয়াছিল।

তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল.

তার আলতা-পরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল।
করমচা-ডাল আঁচল ধরে,
ভোমরা তারে পাগল করে,
মাছ-রাঙা চায় শিকার ভুলে,
কুহরে পিক অনর্গল,
তার গঙ্গাজলী ডুরের ডোরা
বুকে আঁকে দীঘির জল।[৩১]

'ঘুমের রাণী'[৩২] ফুলের-ফসলের শেষ কবিতার অন্যতম। ইহাতে দেখা গেল যে কবির মন চোখের চেয়ে কানের উপর বেশি ঝোঁক দিয়াছে।

দেখা হ'ল ঘুম-নগরীর রাজকুমারীর সঙ্গে
সন্ধ্যা বেলায় ঝাপ্‌সা ঝোপের ধারে,
পরণে তার হাওয়ার কাপড়, ওড়না ওড়ে অঙ্গে,
দেখ্‌লে সে রূপ ভুল্‌তে কি কেউ পারে?...

তুঁত-পোকাতে তাঁতে বুনে তার জান্‌লাতে দেয় পর্দা,
হুতোম পেঁচা প্রহর হাঁকে দ্বারে,
ঝর্ণাগুলি পূর্ণ চাঁদের আলোয় হয়ে জর্দা
জলতরঙ্গ বাজ্‌না শোনায় তা'রে!

এই ছন্দটি পরে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বার বার দেখা দিয়াছে॥

৫

ফুলের-ফসলের প্রকাশের পর এক বছরের মধ্যেই 'কুহু ও কেকা' বাহির হইল। তবে বইটির পরিকল্পনা ফুলের-ফসলের সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছিল। ১৩১৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা ভারতীর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই কথা পাই।

> আগামী পূজার পূর্বেই মৌলিক কবিতার পুস্তক 'ফুলের ফসল' প্রকাশিত হইবে। এবং আগামী বড়দিনের সময় আর একখানি মৌলিক কবিতার পুস্তক 'কুহু ও কেকা' প্রকাশিত হইবে এরূপ সম্ভাবনাও আছে।

কাব্যনামটির ইঙ্গিত কবি পাইয়াছিলেন বোধ করি রবীন্দ্রনাথের এই গান হইতে—"এপারে মুখর হল কেকা ঐ, ওপারে নীরব কেন কুহু হায়।" বেণু-ও-বীণার মতো কুহু-ও-কেকায়ও সত্যেন্দ্রনাথ একটু রূপকের ইশারা দিয়াছেন। তাহা বোঝা যায় প্রথম কবিতা 'দুই সুর' হইতে।[৩৩] কুহু রঙের, সুরের, রসাবেশের প্রতীক। কেকা রূপের, গন্ধের, উল্লাসের। এবং এই প্রতীক দুইটি দুইদিকেই খাটে—বনে ও মনে। কবিতাটিতে ফারসী রুবাইয়ের মিল অনুকৃত।

কোকিল—কালো কোকিল রচে সুরের ফুলে ফুলঝুরি,
বসন্তে সে ভুলায়ে আনে হাওয়ায় করি মন চুরি!

কুজ্ঝটিকা-কুটিল নভে বুলায় তুলি রঙ্গিলা,
দোলায় তৃণ-বল্লরীতে মঞ্জু ফুল-মঞ্জরী ।

সুখীর সুখী শিখী সে নাচে হেলায়ে গ্রীবা গৌরবে,
আওয়াজে তার কদম ফোটে—কানন ভরে সৌরভে ;
কলাপ মেলি করে সে কেলি রৌদ্রে স্নেহ সঞ্চারি',
ঘনায় ছায়া মোহন মায়া উচ্চকিত ঐ রবে !

মনের রঙ মননের রূপ কবি-অনুভাবগম্য । কাব্যে তাহার প্রকাশ সঙ্গীতের ইঙ্গিতে । আর সে বড় কঠিন কাজ । তাই

ফুটিতে যাহা ঝরিয়া পড়ে গাঁথিবে তারে সঙ্গীতে !
কামনা বুঝি কনক-ধুনী সুমেরু-চূড়া লঙ্ঘিতে !
মানস-লীনা বাজে যে বীণা শিখিবে তারি মূর্চ্ছনা,—
প্রকাশ যার আকাশ তটে অযুত শত ভঙ্গীতে ।

শুধু কাব্যনামে নয়, কুহু-ও-কেকার অধিকাংশ কবিতায়ও দেখি যে কবি রঙ ছাড়িয়া সুরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন এবং তাঁহার কাব্যচিন্তা ধ্বনির পথ বাহিয়া রূপের অভিসারে অগ্রসর । তবে ইহাও স্পষ্ট যে রূপের বিষয়ে কবি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছেন এবং ধ্বনিই প্রধান উদ্দিষ্ট হইয়া উঠিতেছে । ধ্বনি ও রূপের সহযোগিতা কয়েকটি কবিতায় অসাধারণ চিত্রসৌন্দর্য দিয়াছে, এবং এইখানেই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের চরম বিকাশ । কুহু-ও-কেকায় এই ধরনের যে কবিতা আছে তাহা সমসাময়িক কবিদের পল্লীপ্রীতির প্রেরণা দিয়াছিল ।

'পাল্কীর গান' যেন খর গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের পল্লী-প্রকৃতির রূপবাণী ।

বৈরাগী সে,—
কণ্ঠী-বাঁধা,—
ঘরের কাঁথে
লেপ্‌ছে কাদা,
মট্‌কা থেকে
চাষার ছেলে
দেখ্‌ছে—ডাগর
চক্ষু মেলে !—
দিচ্ছে চালে
পোয়াল গুছি ;
বৈরাগীটির
মূর্ত্তি শুচি ।

'ভাদ্রশ্রী' কবিতায় শরতের শান্তশ্রীর বর্ণনা চলিত কথায় গাঁথা ।

টোপর পানায় ভরল-ডোবা নধর লতায় নয়ান-জুলী,
পূজা-শেষের পুষ্পে পাতায় ঢাকল যেন কুঞ্জগুলি ।
তাজা আতার ক্ষীরের মত পূবে বাতাস লাগছে শীতল,

অতল দীঘির নি-তল জলে সাঁৎরে বেড়ায় কাৎলা-চিতল।

এই কবিতাটি ফুলের-ফসলের 'কিশোরী' কবিতার সহিত মিলাইয়া পড়িলে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। কিশোরীতে পল্লী-প্রকৃতির ছবিটি রঙে রূপে উজ্জ্বল, ভাদ্রশ্রীতে সে রূপ যেন কলকল্লোলে অবগুণ্ঠিত।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে কবির নিজের কথা নাই বলিলেই হয়। কেবল কুহু-ও-কেকার দুইটি কবিতায় ইহার ব্যতিক্রম দেখি ('সৎকারান্তে' ও 'ছিন্নমুকুল')। সহজ সরল আন্তরিকতায় এই কবিতা দুইটি সত্যেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে গণ্য। কয়েকটি কবিতায় 'শিশু'র ও 'গীতাঞ্জলি'র ভাবপ্রেরণা আছে।[৩৪] এই কবিতাগুলির মধ্যে আন্তরিকতার উষ্ণতা অনুভূত। এই ধরনের কবিতার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'নমস্কার'।[৩৫] ইহার শেষ স্তবক

সৃজন-ধারার সোনার কমল
    ধরেছে যে জন বুকে,—
শমীতরু সম রুদ্র-অনল
    বহিছে শান্তমুখে,—
অনুখন যেই করিছে মথন
    অতীতের পারাবার,—
অনাগত কোন অমৃতের লাগি',—
    তাহারে নমস্কার।

হোমশিখার 'সাম্য-সাম'-এর ধারা চলিয়াছে কয়েকটি কবিতায়।[৩৬] জাতীয় উৎসাহ-উদ্যমের নূতন সুর বাজিয়াছে কয়েকটিতে।[৩৭] বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবির আশার অন্ত নাই।

অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।
প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি :
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।[৩৮]

কুহু-ও-কেকায় যে কয়টি প্রেমের কবিতা আছে সেগুলি সত্যেন্দ্রনাথ রচনাবলীর মধ্যে স্বতন্ত্র।[৩৯] এগুলিতে কবিহৃদয়ের অতর্কিত আত্মপ্রকাশ। দুইটি হাল্‌কা চালের কবিতা নারীর উক্তি।[৪০] প্রেমের কবিতা হিসাবে এ দুইটি ভালো রচনা। বিরহিণীর পত্র

দূর থেকে আজ ওগো তোমায় মনের কথা কই,
নূতন খবর নেই কিছু আজ মনের খবর বই।
ভাব্‌ছি আমি কোথায় তুমি হায় সে কতদূর,
কোথায় সহর কল্‌কাতা আর কোথায় কুসুমপুর।
না জানি কি ভাবছ এখন কর্‌ছ কিবা কাজ,
কার সাথে বা কইছ কথা ? পরেছ কোন্ সাজ ?

ইচ্ছা করে হাওয়ায় ভরে তোমার কছে যাই,
করছ কি যে পিছন থেকে লুকিয়ে দেখি তাই।
ইচ্ছা করে শুনতে তোমার বচন সোহাগের,
ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে ঢের![৪১]

'সহজিয়া' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি হয়ত আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে গুঞ্জরিত আছে কবির মনের গোপন কথাটিও।

আমি চাই সেই দূর-হ'তে-পাওয়া,
আমি চাই সে মধু-মশ্‌গুল হাওয়া,
অন্তরে চাই শুধু রূপসীর
অরূপ আবির্ভাব,
যাহা দিলে তার ক্ষতি নাই, তবু
আমার পরম লাভ।

কুহু-ও-কেকায় একটিমাত্র গাথা-ধরনের কবিতা আছে। কবিতাটি একোক্তি নয় বলিয়াই কি তুলির-লিখনে স্থান পায় নাই?

ইতিমধ্যেই যে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার ছন্দ-অন্বীক্ষায় লব্ধকাম হইয়াছেন তাহার প্রমাণ কুহু-ও-কেকার অনেক কবিতায় মিলিবে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'দুই সুর', 'পাল্কীর গান', 'ভাদ্রশ্রী', 'সাগর-তর্পণ', 'কবি-প্রশস্তি', 'বিশ্ববন্ধু', 'বন্দরে'। 'রিক্তা' ও 'যক্ষের নিবেদন' কবিতা দুইটিতে যথাক্রমে সংস্কৃতের মালিনী ও মন্দাক্রান্তা ছন্দ অনুকৃত হইয়াছে।[৪২] 'এখন ও তখন' কবিতাটির ছন্দ কবি নির্দেশ করিয়াছেন (সংস্কৃত) রুচিরা বলিয়া। কিন্তু প্রায় এই ছন্দেই রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে কবিতা লিখিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখিলেন

তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,
কদম-কোরক দুলিছে বাদল বাতাস লেগে;

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন

নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে হৃদয় নাচে;
ত্রাসে উল্লাসে পরাণ আমার ব্যাকুলিয়াছে।[৪৩]

'সিংহল' কবিতাটির ছন্দ-ইঙ্গিতও রবীন্দ্রনাথ হইতে পাওয়া বলিতে পারি। সত্যেন্দ্রনাথ নির্দেশ করিয়াছেন, "Young Lochinvar-এর ছন্দে" লেখা। সত্যেন্দ্রনাথ লিখিলেন

ওই সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ!
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বূল-বন কেশ।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে![৪৪]

তফাৎ এই যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যতির শেষ ব্যঞ্জন স্বরহীন নয়॥

৬

'তুলির লিখন'-এর কবিতাগুলি ১৩১৬ সালের বর্ষাকালে লেখা এবং সবগুলিই "একাত্মিক পদ বা একোক্তি গাথা"। সর্বসমেত সতেরোটি কবিতা আছে। কবিতাগুলিতে কোন না কোন অপূর্ণ বাসনার আকুলতার গুঞ্জন মর্মরিত। প্রথম কবিতা 'বিদ্যুৎপর্ণা'য় অমর্ত্য অপ্‌সরীর কামনা মর্ত্য সৌন্দর্যের জন্য।

আমি পরী অপ্‌সরী
বিদ্যুৎপর্ণা,—
মন্দার কেশে পড়ি
পারিজাত-কর্ণা ;
নেমে এনু ধরণীতে
ধূলিময় সরণীতে
ক্ষণিকের ফুল নিতে
কাঞ্চন-বর্ণা।

দ্বিতীয় কবিতা 'সূর্য-সারথি'তে অকালজন্মা অরুণের আকুতি।

পঙ্গুর এই ভঙ্গুর দেহ
চালাবে আলোর রথ,
রশ্মি হেলনে সপ্ত অশ্ব
ছুটাইবে যুগপৎ
দীপ্ত ললাটে উজলি চলিবে
আকাশের রাজপথ।

'শোভিকা'য় মথুরা-নাগরীর প্রেমবেদনা।

অনেক যামিনী ব্যর্থ গিয়েছে ;
অনেকের পরিচর্যা করি',
ক্ষণিকের মোহ ক্ষণে সে টুটেছে
ভুলেছি, ঠেলেছি, রাখিনি ধরি'।
না পেয়ে নাগালে যে পাওয়া পেয়েছি
তারি লেহা শুধু পরাণে ভায়,
হায় গো হায়!

'অনার্যা'য় পরের বাছার জন্য সন্তানহারা জননীর অন্তর্দাহ। 'পরিব্রাজক'-এ গুপ্ত আত্মদৌর্বল্যের পরম অনুতাপ। কবিতাটি তুলির-লিখনের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। 'বাজশ্রবা' পুত্র নচিকেতার জন্য পিতার খেদ। 'রাজবন্দিনী' ইতিহাসের আভাস লইয়া লেখা। দেশশত্রুর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার পর আত্মত্যাগের ব্যাকুলতার প্রকাশ ইহাতে। 'যশ্‌মন্ত্‌'-এ বাদশাজাদীর প্রেমের দুরাশায় উন্মত্ত শিল্পীর ছটফটানি।

আয়ী! আমায় ছেড়ে দে গো করব না কিছু,
(শুধু) নীল যমুনায় দেখব গো জল, শির করে নীচু,

ডবল্ শিকল পরাস্—যদি উঁচু চোখে চাই,
নীল যুমনার জল দেখিতে বারণ তো কই নাই।

মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা স্বামীকে বশ করিতে গিয়া স্বামিঘাতিনীর বেদনার প্রকাশ 'দুর্ভাগা'য়। বয়স্ক বিদ্যার্থীর বিদ্যালাভ-কামনা অভিব্যক্ত 'বিদ্যার্থী'তে। 'শবাসীন'-এ ব্রহ্মচারীর প্রেমতন্ময়তা। 'পরেয়া'য় আর্যদের প্রতি অনার্যদের ধিক্কার। 'সতী' সতীদাহের উজ্জ্বল ও দীপ্ত কাহিনী। 'বিষকন্যা'য় ও 'দেবদাসী'তে ভাগ্যবঞ্চিত নারীহৃদয়ের ক্রন্দন। 'মরিয়া'য় ভারতের কোন কোন অঞ্চলে একদা প্রচলিত নরবলিপ্রথার কাহিনী। শেষ কবিতা 'শেষ'-এ অতলের ভাণ্ডারী শেষনাগের উক্তি।

যত সে হারা মন
পুরাতন
হারা প্রাণ,—
হারানো আলোছায়া
স্নেহমায়া
ভোলা গান।...

যা' কিছু নিবে যায়
উবে যায়
মম ভায়
রহে সে,
যা' কিছু উঠে হেসে—
ডুবে ভেসে
জমে এসে
এ দেশে;
আমারি মণি-ঘরে
থরে থরে
অবিরল
জমিছে আসলের
ফসলের
শেষ ফল।

'অভ্র-আবীর' (১৯১৬) বইটিতে ১৩১৯ সালের শেষার্ধ হইতে ১৩২২ সাল পর্যন্ত লেখা কবিতা সঙ্কলিত আছে। কাব্যনামের ইঙ্গিত রহিয়াছে দ্বিতীয় কবিতা 'অঞ্জলি'র শেষ স্তবকে।

এই নে আমার অঞ্জলি গো এই নে আমার অঞ্জলি,
বীণায় যে গান ধরেছিলাম হয় তো এ তার শেষ কলি;
"আবির্" "আবির্" মন্ত্র-রাবে
কর্ গো সফল আবির্ভাবে
অশ্রু-হাসির অভ্র-আবীর আঁখির আলোয় উজ্জ্বলি'।

১৩২০ সালে শরৎকালে সত্যেন্দ্রনাথ পশ্চিমভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের কাশ্মীরভ্রমণে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। এই ভ্রমণের ফলে অভ্র-আবীরের কতকগুলি কবিতা লেখা হইয়াছিল।[৪৫] কতকগুলি কবিতা মনীষি-বন্দনা। এ-ধরনের কয়েকটি কবিতা কুহু-ও-কেকায় দেখা গিয়াছিল। সমসাময়িক ঘটনা লইয়া দুইটি কবিতা আছে,[৪৬] তাহার মধ্যে একটি দক্ষিণ আফ্‌রিকায় সত্যাগ্রহ বিষয়ে।[৪৭] হাল্‌কা চালে লেখা কয়েকটি গান ও ছোট কবিতাও আছে। যেমন

তোমার বিচার মিছার বিধি !
চাইলে মিলে না !
ক্ষুধাই শুধু দিলে মোদের
সুধা দিলে না !
ক্ষুধাই কেবল চাইছে সুধা,
সুধার প্রাণে দাওনি ক্ষুধা !
তাইত এমন—হয় না সহজ—
দেনা কি লেনা।[৪৮]

ক্ষুব্ধ কবিহৃদয়ের আকুলতার প্রকাশ আছে কয়েকটি কবিতায়। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুইটি,—'ঊর্ধ্ববাহুর প্রেম' এবং 'বৈকালী'। জীবনের বঞ্চনা প্রথমটির বক্তব্য।

অসময়ের এই যে মাতন জম্‌ল না সে তেমন ক'রে
দরদী ঠিক জুটল না কেউ প্রৌঢ়দিনের শেষ বাসরে।
কোথায় কিসের রইল বাধা
গেল না ঠিক কাউকে বাঁধা
ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীর এই একটা বাহুর বাহুর ডোরে।

'বৈকালী' জাপানী তান্‌কা ছন্দে লেখা।

অভ্র-আবীরের অনেকগুলি বিশিষ্ট কবিতায় দেখা যায় কবিভাবনা যে রঙের প্রতি অনুরক্ত, সে মোটা রঙ। যেমন, 'সূর্যমল্লিকা', 'সবুজ পাতার গান', 'সবুজ পরী', 'কুঙ্কুম পঞ্চাশৎ', 'জর্দাপরী', 'লাল পরী', 'নীল পরী', 'চিত্র শরৎ', 'জাফ্‌রানের ফুল', 'সন্ধ্যামণি'। তবে ধ্বনির মুখরতায় প্রায়ই রঙের জলুস ফিকা হইয়া গিয়াছে।

সব্‌জে তোমার দোব্‌জাখানি আলোছায়ার সঙ্গমে
জলে স্থলে বিশ্বতলে লুটায় বিভোল বিভ্রমে !
সবুজ শোভার সা রে গা মা
ছয় ঋতুতে না পায় থামা,—
শরতে সে ষড়্‌জে জাগে, বসন্তের সুর পঞ্চমে।[৪৯]

'জাগৃহি' কবিতাটিতে বিজ্ঞান ও পুরাণকাহিনী মিলাইয়া জীবন-উন্মেষের রূপক-বর্ণনা। সত্যেন্দ্রনাথের কবিভাবনার একটু বিশেষ প্রকাশ ইহাতে আছে। 'ইন্দ্রজাল' কবিতাটিও বিশিষ্ট রচনা। ইহাতে প্রাবৃট্‌বর্ণনায় বেদ হইতে আধুনিক ইতিহাস যেন যুগপৎ প্রতিফলিত। কবির পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও ইহাতে অভিব্যক্ত।

ত্রাস-দস্যুর ত্রি-অরুণ আঁখি
ফিরে কি আবার ত্রিলোক শোষে ?
কাহারে দমন করিতে দেবতা
বাহিনী সাজান জ্বলিয়া রোষে ?[৫০]

কুহু-ও-কেকায় রবীন্দ্র-বন্দনা ছিল দুইটি। অভ্র-আবীরেও দুইটি আছে। পরবর্তী সঙ্কলন-দুইটিতেও আরও ছয় সাতটি পাওয়া যায় ॥

৭

সত্যেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ কবিতা লিখিতে শুরু করেন অনেকটা প্রয়োজনের তাগিদে। ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধ লিখিয়া রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন। যাঁহারা এই আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহারা সবাই রবীন্দ্র-অনুগত তরুণ লেখক,—যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এবং বিপিনবিহারী গুপ্ত। 'মানসী' পত্রিকা ইঁহাদের আশ্রয় হইয়াছিল। যতীন্দ্রমোহন, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ও বিপিনবিহারী লিখিলেন প্রবন্ধ, সত্যেন্দ্রনাথ লিখিলেন ব্যঙ্গ কবিতা এবং প্রবন্ধ। যতীন্দ্রমোহনের 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধ বাহির হইল ভাদ্র সংখ্যা মানসীতে। যতীন্দ্রমোহন ঝাঁঝ দিয়া লিখিলেন

> পাপ কলি বোধ হয় পূর্ণ হইল ; নতুবা কল্কি-অবতারের সাক্ষাৎ কেন ? সর্বতোমুখী প্রতিভা আজ হাসির গান ত্যাগ করিয়া, থিয়েটারের গ্যালারি মাতাইয়া, অনুকরণে শিশুশিক্ষা পুস্তক রচনাব অবসানে, সমালোচনার রঙ্গমঞ্চে নূতন রূপ ধরিয়া অবতীর্ণ—জীবের আর ভাবনা নাই।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের 'বিরহ কাব্য' বাহির হইয়াছিল বেশ কিছুকাল পরে, ১৩১৭ সালের আষাঢ় সংখ্যায়। প্রবন্ধটি ঝাঁঝালো নয়, অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুলিখিত। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধকে দ্বিজেন্দ্রলাল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। অনেকে এই উপহাসে বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছিল, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই। তিনি গোড়াতেই স্বীকার করিয়া লইলেন যে মহৎ লেখকেরও রচনার সমালোচনা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। রবীন্দ্রনাথের রচনার বেলায় সে অধিকার বেশি করিয়া মানিতে হইবে যেহেতু তিনি অত্যন্ত মহৎ লেখক ; "তাঁহার ভাষা ও রচনাভঙ্গীর ইন্দ্রজাল যে সৌন্দর্যের মায়ালোক সৃজন করে, তাহার মধ্যে সত্য মিথ্যা নির্ধারণ করা বড়ই কঠিন কাজ। আজ এরূপ বিচার করিয়া দেখিবার অধিকার সকলেরই আছে—নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তির পর্যন্ত।" কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনা জিজ্ঞাসা-জনিত নয় বিদ্বেষপ্রণোদিত, তাই দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ লিখিলেন, "কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রতিবাদটী পড়িয়া ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইতে হইয়াছে—নিরাশ হইয়াছি বলিতে পারিলে সুখী হইতাম।" দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের প্রবন্ধে রবীন্দ্রকাব্যের গভীর দিকের মর্মজ্ঞ সমালোচনা প্রথম পাইলাম। (ইহাতে রবীন্দ্রনাথের সংশোধন থাকা অসম্ভব নয়।) এই ঐতিহাসিক মূল্যের জন্য প্রবন্ধটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য।

"Wordsworth, Browning প্রভৃতি কবিগণ মানুষের উজ্জ্বল ছবিই আঁকিয়াছেন"—

দ্বিজেন্দ্রলালেব এই উক্তির জবাবে দ্বিজেন্দ্রনাবায়াণ লিখিলেন

> উজ্জ্বল ছবিই আঁকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, সত্য ছবি আঁকিতেই কবি বাধ্য, তবে সত্য শিব সুন্দব অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলিয়া সকলরূপ মলিনতাব মধ্যে উজ্জ্বল আপনি ফুটিয়া উঠে। সংসাবে দুঃখ দৈন্য বেদনার অন্ত নাই, কিন্তু তাব মধ্যেও গভীর আনন্দেব নির্ঝব উৎসাবিত হইয়া উঠিতেছে—Paradise সত্যই Lost হইয়াছে, কিন্তু তাহাই শেষ কথা নহে, Eden-এ যে ইতিহাসেব আবম্ভ Calvary-তে মহত্তব পরিণামেব মধ্যে তাহাব শেষ। এ তত্ত্ব ববীন্দ্রবাবু যেরূপ উপলব্ধি কবিয়াছেন খুব অল্প স্থানেই তাহা দেখিযাছি।

পূজাব সময বসুমতী পত্রিকায একটি ছবি বাহিব হইল—দ্বিজেন্দ্রলাল "বাজপাখীব মত পক্ষ বিস্তাব কবিযা ববীন্দ্র হংসেব উপব ছোঁ মাবিতেছেন, আব বলিতেছেন, 'সাহিত্যে দুর্নীতি' "। এই ছবিটিকে উপলক্ষ্য কবিযা সত্যেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ কবিতা লিখিলেন 'মবাল ও পেচক'।[৫১]

> " "বাস্‌বে হেঁয়ালি" কহিল পেচক সকৌতুকে,
> "ঝালাপালা। বলি, কবিতাব পালা গেল কি চুকে?
> আসল কথাটা বল দেখি মোবে, ঘুচুক ধাঁধা
> তুষাবেব মাঝে খাদ্য কি পাও মবাল দাদা?"
>
> কহিছে মবাল "বয়েছে মৃণাল শুভ্র শুচি'
> "ক্ষুধা নিবাবণ তাতে হয? বোকা বুঝাও বুঝি'
> কবিত্ব ভুলি বল দেখি খুলে, আমাব কাছে
> ইন্দীববেতে কাজ নাই—বলি ইঁদুব আছে?"

মানসীব পববর্তী সংখ্যায বাহিব হইল সত্যেন্দ্রনাথেব প্রবন্ধ– 'অপহবণ'। প্রবন্ধটিব আবম্ভ

> বঙ্গভূমিব গৌববস্থল, বর্তমান যুগেব সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যসম্রাট, ঋষিকল্প শ্রীযুও ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয়েব নিষ্কলঙ্ক কাব্য ও কবিতাগুলিকে শঙ্কাস্পৃষ্ট প্রমাণ কবিবাব জন্য ইংবাজী ও মার্কিন গানেব বিখ্যাত অনুকাবক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল বায মহাশয দিঙনাগেব ভূমিকা গ্রহণ কবিয়া সাময়িক সাহিত্যের আসবে নামিযাছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালেব এক অভিযোগ ছিল,—"বৈষ্ণব কবিগণেব কবিতা হইতে অপহবণ"। এ অভিযোগেব উপযুক্ত জবাব যতীন্দ্রমোহন দিতে পাবেন নাই। এখন সত্যেন্দ্রনাথ দেখাইযা দিলেন যে অভিযোগ-কর্তা নিজেই অপহবণ দোষে দোষী, এবং সে অপহবণ যথার্থই চুবি। ববীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসঙ্গীতে লিখিযাছিলেন

> অনুগ্রহ ক'বে এই কোবো
> অনুগ্রহ করো না এ জনে।

দ্বিজেন্দ্রলাল দুর্গাদাস নাটকে লিখিলেন

> সম্রাট। অনুগ্রহ কর্বেন না, এইটুকু অনুগ্রহ করুন।

প্রবন্ধেব শেষ অংশটুকুও উদ্ধৃতিব যোগ্য।

সুদুর ভবিষ্যতে যাঁরা বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিবেন তাঁহাদের মধ্যে যিনি কঠোর সমালোচক হইবেন তিনি সত্যের অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রবাবুকে বহু বিষয়ে রবীন্দ্রবাবুর অনুকারক বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যিনি উদার প্রকৃতির লোক তিনি রায় মহাশয়কে রবীন্দ্রবাবুর শিষ্যের দলে, লাঞ্ছিত হরি ঘোষের দলে, স্থান দিবেন। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রবাবুর বর্তমান ব্যবহার তাঁহার চক্ষে গুরুনিন্দা রূপে প্রতিভাত হইবে। চিরন্তন মানব-জাতির এজলাসে, হাকিম হইলেও দ্বিজেন্দ্রবাবু সহজে রেহাই পাইবেন না। আমি "অকুতোভয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলাম"।

তাহার পর দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁহার রচনাকে কটাক্ষ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথের আরও তিনটি ব্যঙ্গ কবিতা বাহির হইল—'কে তুমি ?' (পৌষ), 'দশপদীর স্বরূপ' (মাঘ) এবং 'চড়কের চানাচুর'। "বইঠি বিকায়" (চৈত্র)। শেষ কবিতাটির আদি ও অন্ত উদ্ধৃত করি। সত্যেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কবিতার পরিপক্ক রীতি ইহাতে আবির্ভূত।

অয়ি তবলিকা ! অয়ি মধুলিকা !
হে দেবী সুরেশ্বরী !
তোমার প্রসাদে চাট্‌নি এবং
চাটের দোকান করি। ...

গোরস বেচিয়া পথে পথে বোদে
যে খুসী সে হ'ক কালো,
আমি জানি যাহা বইঠি বিকায়
তাহারি ব্যবসা ভালো।

১৯১৩ ১৪ অব্দ হইতে আবার ব্যঙ্গকবিতা লিখিবার ঝোঁক আসিল সত্যেন্দ্রনাথের। এ ঝোঁক আকস্মিক নয়, 'সবুজ পত্র' প্রকাশের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ আছে। এই সময়ের ব্যঙ্গ কবিতাগুলিতে প্রায়ই কবির ছদ্মস্বাক্ষর থাকিত "শ্রীনবকুমার কবিরত্ন"।[৫২] অতঃপর সত্যেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গকবিতার সঙ্কলন 'হসন্তিকা'[৫৩] বাহির করিলেন (১৯১৭)। ইহাই তাঁহার জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ। নামপত্রে আসল ও ছদ্ম দুই নামই আছে।

হসন্তিকার এইটি কবিতায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের[৫৪] এবং অল্প কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের[৫৫] ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের[৫৬] অনুকরণ আছে। একটি কবিতা 'রাত্রি বর্ণনা'[৫৭]—ব্যঙ্গকবিতার উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। ইহা যেন পুরানো দিনে কলকাতা-পল্লীর নিদাঘ-নিশীথের ধ্বনি-ফোটোগ্রাফ।

ঘড়িতে বারোটা ; পথে 'বরোফ ! বরোফ !'
লোপ !
উড়ি' উড়ি' আরসুলা দেয় তুড়িলাফ
সাফ !
পাল্‌কি-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে
তুড়ে !
আঁধারে হাডু-ডু খেলে কান করি উঁচা
ছুঁচা !

পাহারা'লা ঢুলে আলা, দিতে আসে রোঁদ
খোদ !
বেতালা মাতালগুলা খায় হাল ফিল
কিল !

এই কবিতাটির কয়েকবছর আগে লেখা "দশপদী কবিতা", নাম 'কেন ?' তুলনীয়।[৫৮] কবিতাটি এই

কেন নাচে ভালুক—কেন লাফায় ব্যাং ?
আর্সুলারা ওড়ে ?
রাজা কেন বলে লোকে ক্ষমতাহীন
খেতাব-ওয়ালাকে ?
কেন বুড়া শুভ্র সত্য কলপ দিয়ে চুল
কালো করে রাখে ?
মিউনিসিপ্যাল-উড়ে কেন নিত্য নিত্য
রাস্তাগুলো খোঁড়ে ?
পৌষের শীতে ভোর না হ'তে কেন ঠাণ্ডা
খেজুর রস চাখে ?
কেন টাঙায় মশারি লোক ? ঢুকতে যখন
মশাই আগে ঢোকে ?
ভূত পালায় যে তাঁতির তানে তারো কেন
তারিফ করে লোকে ?
চাঁদের সাথে রাতে কেন বাদুড়, পেঁচা
চার্মচিকেরা থাকে ?
প্রাণের গভীর পাগলামি সে ; কিম্বা
একটা মৌলিকতার বেগে
এ সব কর্ম করে ; এবং তাহা ছাড়া
দশপদী (ও) লেখে ॥

কবিতাটিতে মসৃণতা নাই, তবে জোর আছে। রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাব একটু অনুভূত হয়।

১৩২১ সালের চৈত্রমাসে বর্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন মহা-আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্যশাখার সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি এই খেদ করিয়াছিলেন যে বাঙ্গালার সাহিত্যে এখন বড়ই দৈন্যাবস্থা, বড় বড় মহাকাব্য ইত্যাদি রচিত হইতেছে না, এবং যাহা লেখা হইতেছে তাহা সবই "চুট্‌কী"—অর্থাৎ চটুল, ক্ষীণকায়, লঘু ও অস্থায়ী।

"এখন মনে হয় যেন, বেশী দিন ভাবিয়া, বেশী দিন চিন্তিয়া বড় একখানা কাব্য লিখিয়া জীবন সার্থক করিব—সে চেষ্টাই লোকের মনে নাই। চটক্‌দার দু'চারটা গান লিখিয়া চট্‌ করিয়া নাম লইব, সেই চেষ্টাই যেন অধিক। গানের দিকে, ছোট ছোট কবিতার দিকে, চুট্‌কীর দিকেই লোকের ঝোঁক বেশী। উঁহাদের কবি আছে—চিরকালই থাকে, আমাদের দেশেও

আছে। চুট্‌কীতে সময় সময় মুগ্ধও করে, কিন্তু চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্বস্ব হইবে? বড় জিনিষ কি আর হইবে না?...রবিবাবু 'নোবেল প্রাইজ' পাইলেন, বাঙ্গালা ভাষার জয়-জয়কার হইল; ইহাতে কে না আনন্দিত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ভবিষ্যতের কি হইতেছে?"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তির প্রতিবাদে সত্যেন্দ্রনাথ একটি মর্মভেদী কবিতা লিখিলেন, "অ!"[৫৯] ইহা তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা।

দেখ চুট্‌কি সূত্র গোটা সত্তর
লিখিল সাংখ্যকার,
তাই কন্‌ফারেন্‌সে ডায়েসের পরে
চেয়ার পড়েনি তার।
দাদা তিনটি ভালুমে লিখিলে মালুম
হইত এলেম যত,
(আর) দর্শন-শাখে হত যোগে-যাগে
শাখা-পতি অন্তত।
(হায়) অল্পে সারিতে মরিল বেচারা
লিখে হ য ব র ল,
(এই) জম্বুদ্বীপে কোন ফেলোশিপে
বক্তা না হল।
(কোরাস) ... ... অ!
(ওরে) ইতিহাস কেউ লেখেনি চুট্‌কি
কিম্বদন্তী জুড়ি
(ঢালি) তিন পয়সার তাম্রশাসনে
টিপ্পনী ত্রিশ ঝুড়ি।
(আর) গুরুগম্ভীর বিজ্ঞান-পুঁথি
পড়ানো হবে না পুত্রে,
(ওতে) চুট্‌কি ঢুকেছে, লিখেছে—বিজলী
ধরেছে ঘুড়ির সূত্রে।
(আর) চায়ের কেটলি ঢাকন ঠেলিয়ে,
নাচন দেখায় তারি।
(হল) হাজার চুট্‌কি-গল্পের ভারে
ভিজা কম্বল ভারী।...
(ছি ছি) চুট্‌কি ঘৃণ্য দৈন্যের-ধ্বজা
দুটি শুধু তার ভালো,
(ওগো) পণ্ডিত-শির নারীর চরণ
চুটকিতে করে আলো!
(ওরে) এ দুটি চুট্‌কি রক্ষা করিয়া
রণে আগুয়ান হ,
(আর) চুট্‌কি-নিধনে চ' রে ভাই জিভে
দিয়ে খরশান।
(কোরাস, হাই তুলিতে তুলিতে)... ... অ!

এই কবিতার ঢঙে লেখা আর একটি রচনা হইল 'হুঁঃ'। এটিরও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও সরস আন্তরিকতা অত্যন্ত উপভোগ্য। কবিতাটি অহিংসা-সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হইবার অনেক আগে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে লেখা। তবুও অত্যন্ত আধুনিক। এবং আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী আজ দেশময় প্রতিফলিত। সত্যেন্দ্রনাথ এখানে রবীন্দ্রনাথের জুড়িদার হইয়াছেন।

(ওই) বুদ্ধ বকিল মিথ্যা বকুনি,—
বজায় রহিল যুদ্ধ ;
(আর) যেহেতু খ্রীষ্ট নেহাত শিষ্ট
(তাই) ক্রুদ্ধ জগৎ সুদ্ধ !
(দ্যাখো) শিংশপা শাখে ঝোলে অহিংসা
রজ্জু বাঁধিয়া গলাতে,
(হুঁহুঁ) মাতাল দুনিয়া চলেছে বেতাল-
পঞ্চায়তের সলাতে।
(দ্যাখো) চাষা বোনে ধান, যাঁরা ধ্বংসান
তাঁরা হন মহাশয়,—
জমীদার, দাবীদার বা সিধার ;
চাষা সে চাষাই রয়।
(দাদা) জ্যান্ত লোকের ভাত রেঁধে হ'ল
রসুয়ে বামুন হীন
(ও সে) প্রেতের জন্য পিণ্ড রাঁধিলে
পূজা পেত চিরদিন।
(আহা) মরণের পথে আল্‌পনা দিয়ে
(হ'ল) বামুন পূজ্য, ভাই,
(আর) জনমের কুঁড়ে আঁতুড় নিকায়ে
ছোটো জাত হ'ল ধাই।
...
(এই) ইতিহাস কারে বলে তা' জানো কি ?
শোনো তোমাদের বলি—
(লাখো) লাখো খুন যারা করেছে তাদের
নামলেখা নামাবলী !...

বেলাশেষের-গান এবং বিদায়-আরতি এই দুটি সংগ্রহেও কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতা আছে, সমসাময়িক ব্যক্তি ও ব্যাপারকে কটাক্ষ করিয়া লেখা। 'বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ'[৬০] ও 'নাপ্পি-পীরিতি কথা' কবিতা দুইটিতে ঝাঁঝ অত্যন্ত কড়া, ব্যঙ্গবাণ জ্বালাময়। উত্তরবঙ্গের এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভালো সংস্কৃত শ্লোক লিখিতে পারিতেন। ইনি 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথের ছন্দ' প্রবন্ধ লিখিয়া রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্র-অবোদ্ধারা ঘটা করিয়া তাঁহাকে "কবি সম্রাট" উপাধি দিয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে সত্যেন্দ্রনাথ 'বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ' কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার প্রথম ছত্র

কে করেছে ঠাট্টা তোমায় দিয়ে কবির তক্ত ?

শেষ দুই ছত্র

পণ্ডিতে বুঝিতে নারে, মূর্খে বছর চল্লিশে
তারও দ্বিগুণ কাট্‌ল বয়েস, আর বোধোদয় হয় কিসে ?

এই কবিতায় উত্তর ও পূর্ববঙ্গের অনেকেই কবির উপর চটিয়া গিয়াছিলেন।

১৯১৯ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় এম্‌-এ ক্লাস খোলা হয়। এই বিভাগে তখন যিনি প্রধান অধ্যাপক ছিলেন তিনি একদিন ক্লাসে বৈষ্ণব-কবিতা পড়াইবার সময় বর্তমান হিন্দু-সমাজের মর্যাদা রক্ষা করিয়া "পূর্বরাগ" শব্দটির অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ বিলাতি কোর্টশিপ্ বা pre-nuptial love নয়, তা রাধাকৃষ্ণের গোপন বিবাহের পরেই জন্মিয়াছিল। অর্থাৎ কিনা হিন্দু-সমাজে বিবাহের পরে বর-বধূর হৃদয়ে প্রেমের যে প্রথম-সঞ্চার তাহাই পূর্বরাগ। তখন বাঙ্গালা বিভাগে অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের অঙ্গরঙ্গ বন্ধু, প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি সত্যেন্দ্রনাথকে এই অভিনব ব্যাখ্যার কথা জানাইয়া দেন। তাহাতে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সত্যেন্দ্রনাথ 'নাপ্লি-পীরিতি-কথা' লিখেন।

বাজাইয়া ধামি রজকিনী রামী কহিছে চণ্ডীদাসে,
'চল বড়ু, রসতত্ত্ব শিখিব পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে।'...

ডিগ্‌বাজী খায় ছাপার হরফ ডিক্‌স্‌নারী গেল তল,
রসের কুঞ্জে চাষ দিতে আসে পদ্মা-পারের দল !...

পূর্বরাগের পান্তা করিয়া, পান্‌সে করিয়া নাড়ী,
নাপ্লি-পীরিতি সাধনার রীতি বাখানে পদ্মাপারী।

এই ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর ছত্রগুলিই পূর্ববঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাকে অগ্রহণীয় করিয়াছিল।

৮

বেলাশেষের-গানে ও বিদায়-আরতিতে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের কোন নূতনতর বিকাশের পরিচয় অথবা ইঙ্গিত নাই। আত্মচিন্তা একেবারে নাই বলিলেই হয়। এই ধরনের কবিতার একটিমাত্র নিদর্শন 'খাঁচার পাখী'। কিন্তু এখানেও রঙের ভিড়ে ছন্দের নাড়ায় মনের কথা যেন তলাইয়া গিয়াছে।

তোতা সে আজ আতা-গাছের[৬১]
পাতায় পাতায় ফিরছে কি ?
সবুজ-শিখার দীপান্বিতা
সকল শাখা ঘিরছে কি ?
হঠাৎ কেমন হচ্ছে মনে
ফুল ধরেছে সব গাছে ?

সবুজ পাতার সার দিয়েছে
এই খাঁচারি খুব কাছে।

ধ্বনি ও ছবি এক হইয়া উঠিয়াছে 'দূরের পাল্লা'য়।[৬২]

চুপ চুপ—ওই ডুব
দ্যায় পান কৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোমটার বৌটি।
রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ী
তার হাসি মিষ্টি।...
ডাক-পাখী ওর লাগি
ডাক ডেকে' হদ্দ,
ওর তরে সোঁত-জলে
ফুল ফোটে পদ্ম।

সমসাময়িক পোলিটিক্যাল ও সমাজ-উন্নয়ন আন্দোলন সত্যেন্দ্রনাথের মন বিশেষ করিয়া টানিয়াছিল। এই ধরনের দুইটি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'চরকার আরতি'[৬৩] ও 'গান্ধিজী'[৬৪]। প্রথম কবিতাটিতে নগরসভ্যতার বীভৎসতা ও কদর্যতা প্রকাশিত।

ভস্মলোচন সব সভ্যতা রুক্ষ
কল ক'রে গিলে খায় জোয়ানের জোয়ানী,
চুঁয়ে যায় ক্ষেত-ভুঁই চিম্‌নির ধোঁয়াতে,
গঙ্গা সে সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের ধোয়ানী।

বাস্তুতে ঘুঘু চরে, তার ঠাঁয়ে বস্তি!
উবে গেল উড়ে গেল মমতার প্রিয় নীড়;
কুলিনী কোলের শিশু ফেলে' স্বামী রুগ্‌ণ
ভেগে যায় 'মেট্‌' সাথে, অনাচার করে ভিড়।

পদে পদে বাড়ে শুধু হৃদয়ের লঙ্ঘন—
ময়দানে কাঁদে কচি গোপনের পয়দা,
সহরের বিষ ঢোকে পল্লীর ঘর ঘর—
লালসার লোলশিখা বাড়ে রে বে-ফয়দা।

দ্বিতীয় কবিতাটিতে মহদাশয়ের মহৎকীর্ত্তির আগমনী।

যাহার পরশে খুলে গেছে যত নিদ্‌মহলের খিল,
পুরা হয়ে গেছে যার আগমনে তিরিশ কোটি দিল্‌,
তার আগমনী গা রে ও খেয়ালী! গৌড়-বঙ্গময়

গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধির গাহ জয় ।

বেশির ভাগ কবিতায় ছন্দের নিপুণতা ও মাধুর্যই মুখ্য। ধীর ও চপল, মৃদঙ্গের ও নূপুরের বিচিত্র বোল ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন

প্রাণে মনে হিল্লোল বনে বনে হিন্দোল
মেঘে মৃদঙের বোল মৃদু-মন্থর ;
শ্রাবণেরি ছন্দে কদমের গন্ধে
আয় তুই চঞ্চল ! চির-সুন্দর ![৬৫]

আজি মন ফেরে মেঘে মেঘে অভ্র-শিখায়
খুঁজে দূর রাকা, দূর রাস, দূর রাধিকায় !
আজ আকাশের রুধি দ্বার রসের রণ !
সারা দুপুরের নূপুরের শিঞ্জিনিকায় ![৬৬]

গলে সূর্য, ঝরে বহ্নি, মরে পাখী,
মেলে জিহ্বা মরু-তৃষা মোছে আঁখি,
ছায়া-কাঁপে খর তাপে বুকে চাপে মরীচিরে।
ধীরে ! ধীরে ! ধীরে ![৬৭]

সহর-অঞ্চলে অপ্রচলিত তদ্ভব শব্দ কবিতায় প্রচলন করার চেষ্টা সত্যেন্দ্রনাথ অনেকদিন হইতেই করিতেছিলেন। শেষের দিকে কোন কোন রচনায় তদ্ভব শব্দের প্রতি ঝোঁক প্রায় মাত্রা ছাড়াইবার জো করিয়াছিল।

ভোর হ'ল রে ফরসা হ'ল ফুট্‌ল উষার ফুলদোলা,
আন্‌কো আলোয় যায় দেখা ওই পদ্মকলির হাইতোলা।
জাগলো সাড়া নিদ্‌মহলে অথই নিথর পাথার জলে
আল্‌পনা দেয় আল্‌তো বাতাস ভোরাই সুরে মনভোলা।[৬৮]

'ছন্দ সরস্বতী'[৬৯] সত্যেন্দ্রনাথের অত্যন্ত বিশিষ্ট রচনার অন্যতম। পদ্য-আকীর্ণ গদ্যে লেখা, সীরিয়াস বস্তু লইয়া, চমৎকার ফ্যানটাসি। বাল্যকালে কবিতা লেখায় হাতে-খড়ি হইতে শুরু করিয়া সত্যেন্দ্রনাথের বাঙ্গালা ছন্দ রচনায় বিচিত্র এক্সপেরিমেন্টের ইতিহাস ইহাতে কাব্যকথার ছাঁদে উপস্থাপিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বরকমের রচনার জ্ঞান এবং দেশি বিদেশি নানা ভাষার ছন্দধাতুতে তাঁহার কৌতূহলের পরিচয় ইহাতে পাই। পরবর্তী কালের কোন কোন শক্তিশালী কবি এই রচনাটি হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ যে বাঙ্গালা গদ্যে পদ্যের মসৃণতা ও ধীরপ্রবাহ সঞ্চার করিতে সমর্থ ছিলেন তাহা ছন্দ-সরস্বতী হইতে বোঝা যায়। যেমন

মঞ্জু-মরালের নৃত্যের তালে কান তৈরী হওয়ার বছর পাঁচেক পরে আবার একদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে খেয়ালী মেয়ে ছন্দময়ী এসে হাজির। বাইরে তখন ঝর্ণার মতন ঝঙ্কার করে বৃষ্টি

ঝরছে, বাদলা হাওয়ায় জুঁই-ফুলের গন্ধ, জানলা দিয়ে এসে আস্তে আস্তে ঘুমের চামর বোলাচ্ছে। চোখ একেবারে ঝাম্‌রে আসছে। আমি জড়ানো আওয়াজে বললুম—"কে গা ?"

মেয়েটি বললে—

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান,
শিবঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান।'

আজ এই তিন কন্যের তৃতীয় কন্যাটির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব ব'লে এলুম।"

আমি সসম্ভ্রমে উঠে বসে বললুম—"দেবী, আজ তোমার এ আবার কি মূর্তি ? আজকের মেঘাডম্বর দেখে মত্ত ময়ূরকে ধ'রে বুঝি বাহন করেছ ? হাতে নীল পদ্মের কুঁড়ির মতন ওটি কি ?"

ছন্দময়ী বেশ একটি নাম বললেন , নামটি সংস্কৃত গোছের, তা'র মানে হ'চ্ছে বিদ্যুৎ। তাড়াতাড়ি সেই অপূর্ব-নাম-বিশিষ্ট নীল পদ্মটিকে হাতে নিতে গিয়ে দেখলুম, সেটি পদ্ম নয়, হাতের পোঁছার মতন ছোটো একটুখানি মেঘের টুকরো, তাতে বিদ্যুৎ ঝলক দিচ্ছে। আমি স্পর্শ করবার আগেই সে হাত ফস্‌কে অন্ধকারে ঘরের কোণে কোণে, বিদ্যুৎ হাসি হাসতে লাগল।

ছন্দময়ী বললেন—"ওকে অত সহজে আয়ত্ত করতে পারবে না। ও হ'ল বাংলাভাষার প্রাণপাখী। ওকে যে বশ করতে পারবে বঙ্গবাণীর স্বরূপ-মূর্তি সে প্রত্যক্ষ করবে, বাংলা সঙ্গীতের মর্মের কথা তার কাছে রূপ ধ'রে ফুটে উঠবে। দেখ্‌তে ছোট বটে, কিন্তু, সহজে তুমি ওকে হাত করতে পারবে না। আচ্ছা, বোসো' আমিই ওকে ধরে দিচ্ছি।"

এই ব'লে ছন্দময়ী বীণার তারে আঙুল সঞ্চালন করতে লাগলেন। বীণা বলে উঠল–

"তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি।"

ছন্দটি নতুন অথচ চিরপরিচিত মনে হ'ল—বাড়ীর মেয়েকে পূজো বাড়ীতে দেখার মতন।

পদ্য অংশের মধ্যে উদ্ধৃতি আছে, তবে বেশির ভাগই সত্যেন্দ্রনাথের নিজের রচনা -আগেকার লেখা হইতে উদ্ধৃত অথবা নূতন রচিত। নূতন রচিত কবিতাগুলির মধ্যে মূল্যবান রচনাও কিছু আছে। যেমন

"অ। বটে এই বুঝি। দেখলুম দেখলুম।"
"ছি। ওকি রাগ করে' তুই ভাই যাচ্ছিস ?"
"তা তুমি বলবে না, থাকবার দরকার ?"
"হুঁ, বলি আয় কাছে, 'ফুসফুস্ ফিস্‌ফিস' ।"
'এ—কিএ ? ছাই কথা, 'ফুসফুস ফিসফিস্' ।"
—ধাঁ ক'রে ভেংচিয়ে কমলীর প্রস্থান।
—হাঁ ক'রে রয় চেয়ে ফট্‌কের দুইচোখ।
গোঁ হয়ে ভাবছে কি ?—গম্ভীর মুখখান॥

ছন্দ-সরস্বতীর মধ্যে আত্মকথার দুই চারটি যে টুকরা আছে তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের

প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের তথা সমসাময়িক কবিতা রচনার ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান্। যেমন

কলেজের পড়ায় ইস্তফা দিয়ে এবং বাংলা-ছন্দের ত্রয়ী[১০] মোটামুটি আয়ত্ত ক'রে একদিন কবিগুরুর মন্দিরে উপস্থিত হলুম। এবং প্রণাম করে আমার যৎসামান্য ছন্দের অর্ঘ্য তাঁর পায়ের কাছে রেখে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলুম।

কিছুদিন যাতায়াতের পর একদিন কথায় কথায় কবিগুরু বললেন—"বাংলায় ছন্দবন্ধের অভাব নেই ; কিন্তু ছন্দস্পন্দ (rhythm) জিনিসটা তেমন ফুটতে পেলে না।"

আমি বল্লুম—"কেন আপনার

'পৌষ প্রখর শীতে জর্জর
ঝিল্লিমুখর রাতি।'

প্রভৃতি কবিতা তো ছন্দস্পন্দনের চমৎকার উদাহরণ।"

কবি বল্লেন—"কিন্তু, আনাড়ির হাতে ঐ ছন্দই এমন ছন্ন-ছাড়া মূর্তিতে দ্যাখা দেয় যে ও'কে আর চিন্‌বার জো থাকে না। বাংলায় হ্রস্ব-দীর্ঘের তেমন স্পষ্ট প্রভেদ না থাকায়, সংস্কৃতের মতন বিচিত্র ধ্বনির পর্যায়-বিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত হ'তে পারছে না। কেবল—'বিজোড়ে বিজোড় গেঁথে জোড়ে গেঁথে জোড়'—হরফের পর হরফ সাজিয়ে কম্পোজিটারের নকল করলে ঠিক চল্‌বে না। বাংলা উচ্চারণেব বিশেষত্ব বজায় রেখে সংস্কৃতের ছন্দস্পন্দ বাংলায় আন্‌তে হবে। হরফের মাথায় খুসি মতন ঘন ঘন কসি টেনে কাজ[১১] সারলে চলবে না। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ না। আমার বিশ্বাস তুমি ঠিক পারবে।"

কুণ্ঠিত হ'য়ে বললুম—"ছন্দে নূতনত্ববিধানের চেষ্টা আপনি ছাড়া আর সকলের পক্ষেই অনধিকাব চর্চা!"

কবি বল্লেন—"ওই দ্যাখ, তোমাদের এক কথা! আমি চিরকালই এই করব? খালি আমাকেই খাটাবে? তোমরা একটু খাটবে না? সে হ'চ্ছে না। তোমাকেই এ কাজ করতে হবে। মন্দাক্রান্তা দিয়ে শুরু কর।...আচ্ছা এক হপ্তা সময় রইল।"

আমি প্রণাম করে বিদায় নিলুম।[১২]

১০

সত্যেন্দ্রনাথ কয়েকটি ছোট বিদেশি নাট্যরচনার অনুবাদ করিয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে চারটি 'রঙ্গমল্লী'তে (১৯১৩) সঙ্কলিত আছে।[১৩] 'আয়ুষ্মতী' স্টিফেন ফিলিপ্‌সের লেখা ইংরেজী মূল অবলম্বনে কাব্যনাট্য,[১৪] 'বন্দী দেবতা' গ্রীক নাট্যকার এস্কিলাসের *Prometheus Desmotes* অবলম্বনে কাব্যনাট্য,[১৫] 'দৃষ্টিহারা' মেটারলিঙ্কের রচনার অনুবাদ,[১৬] 'সবুজ সমাধি' চীনা নাটকের, আর 'নিদিধ্যাসন' জাপানী প্রহসনের ইংরেজীর অনুবাদ। একটি কবিতা-ভূমিকা আছে, তাহাতে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নটরাজের বর্ণনা।

বাজে নটেশের নৃত্যের তালে
রঙ্গমল্লী বীণা,
তানে সুরে মহু পল্লবি' উঠে
রাগিণী বিশ্বলীনা।

'ধূপের ধোঁয়ায়'[১৭] মৌলিক কৌতুকনাট্য। সবই নারীভূমিকা। স্থান দশরথের পুত্রবধূদের অন্তঃপুর। কৌতুকনাট্যটির রচনায় পুরানো দিনের রূপ-রঙ-রস জাগাইয়া

তুলিবার বিশেষ চেষ্টা আছে।

শেষকালে সত্যেন্দ্রনাথ পুরাপুরি কথ্যভাষা আশ্রয় করিয়া একটি ঐতিহাসিক নাটক লিখিতেছিলেন।[৭৮] নাটকটির নাম 'ডঙ্কানিশান', নন্দবংশের রাজ্যাবসানের কালের কাহিনী। সেকালের ভাব ও রস জমাইয়া তুলিবার চেষ্টা আছে। বইটি সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালা ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে পারিত ॥

১১

সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হইল 'জন্মদুঃখী' (১৯১২)। বইটি নরোয়ের লেখক য়োনাস লী-র (Jonas Lie) 'লিভ্‌সস্লাভেন (Livsslaven) উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ। শ্রমজীবীদের দুঃখ-কাহিনী ইহার বিষয়। বিষয়নির্বাচনে সত্যেন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

সত্যেন্দ্রনাথের ছোটখাট গদ্যরচনা—অনুবাদ ও মৌলিক—ভারতী ও প্রবাসী প্রভৃতি মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় ছড়ানো আছে ॥

১২

আমার সংগ্রহে এমন একটি পুরানো বই আছে যাহা অন্যত্র কোথাও পাই নাই এবং যাহার নামও কোথাও উল্লিখিত আছে বলিয়া জানা নাই। লেখকের নাম নাই। কিন্তু ইহার রচনাকাল এবং নাম ও ঠিকানা হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে বইটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া কাহারও কলম হইতে নির্গত হইতে পারিত না। বইটির সম্পূর্ণ পরিচয় যথাসাধ্য সংক্ষেপ করিয়া দিতেছি।

বইটির নাম 'বেতিক'। অনুবাদ ইংরেজী অথবা ফরাসী হইতে। ইংরেজী হইতে হইলে অনুবাদে শ্রীহীনতার চিহ্ন অনেক কম থাকিত। তবে ইহাও ঠিক যে অনুবাদক প্রায় ইচ্ছা করিয়া অনুবাদের ভাষায় অ-বাঙ্গালা ছাঁদ আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মূল বইটির নাম 'বাথেক' (Vathek), রচয়িতা একজন ইংরেজ—উইলিয়ম বেকফোর্ড (William Beckford)। বইটি প্রথমে লিখিয়াছিলেন তিনি ফরাসী ভাষায়। প্রথম খসড়াটি লিখিতে সময় লাগিয়াছিল তিন দিন দুই রাত্ত। তখন তাঁহার বয়স বাইশ বছর (১৭৮২)। বই লেখা সম্পূর্ণ হইয়াছিল ১৭৮২ সালের জানুয়ারি হইতে মে মাসের মধ্যে। প্রকাশ হইয়াছিল প্রথমে ফরাসী ভাষায় (১৭৮৬), পরে ইংরেজী অনুবাদে (১৭৮৬, ১৮০৯, ১৮১৬) ও ফরাসী মূলে (১৭৮৭, ১৭৯১, ১৮১৫, ১৮১৯, ১৮৩৪)। ইংরেজী অনুবাদের কৃতিত্ব স্যামুয়েল হেনরির। পরে বেকফোর্ড নিজে এই অনুবাদ কিছু কিছু সংশোধন করিয়াছিলেন।

Vathek অর্থাৎ বেতিকের বাঙ্গালা অনুবাদক—নিজের নাম দেন নি। তবে অনুবাদের কাজে কত সময় লাগিয়াছিল তাহার উল্লেখ রহিয়াছে (৪ আষাঢ় ১৩১৩ আরম্ভ, ২০ আশ্বিন ১৩১৪ সালে শেষ)। বইটিতে প্রকাশকের নিবেদনের শেষে তারিখ রহিয়াছে "সৌর মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩১৪"। সুতরাং বইটি যদি বিক্রয়ার্থে বাহির হইয়া থাকে তো তাহা ১৯০৮ অব্দে। প্রকাশকের নাম স্পষ্টাস্পষ্টি নাই। এই ভাবে রহিয়াছে।

"বৈশ্যাক ও ফরজন্দশ্"

অনুমান করি এই প্রকাশক—বসাক অ্যান্ড সন্স। তখনকার দিনের দরজিপাড়ার (বটতলার অন্তর্গত) এক বড় গ্রন্থ-প্রকাশসংস্থা (বৈষ্ণবচরণ বসাক এন্ড সন্স)।

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২+৪+১১৯। বইটিতে একটি উৎকট উদ্ভট গল্প আরব্য উপন্যাসের ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। তবে গল্পটি কোন জনশ্রুত লোকগাথার পরিপুষ্ট সংস্করণ নয়, সোজাসুজি রূপকথাও নয়। গ্রন্থকারের পরিকল্পিত কাহিনী। যথার্থই নায়কের ঐতিহাসিক পুরো নাম ছিল বাথেক্-অল্-লাহ্। মানে, আল্লার তরোয়াল। বাত্তিক মানে তীক্ষ্ণ। আব্বাস-বংশীয় খলিফা। ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তবে উপন্যাসটিতে বর্ণিত তাঁহার আচরণ সর্বৈব কাল্পনিক।

'বেত্তিক' বইটি দুদিক দিয়া মূল্যবান্। প্রথমত মূল বিষয়ের অর্থাৎ গল্পটির জন্য, দ্বিতীয়ত বাঙ্গালা অনুবাদের অদ্ভুত রীতির জন্য। প্রথমে মূল কাহিনীর পরিচয় দিই।

বাথেক অল্প বয়সেই পিতার উত্তরাধিকার পাইয়াছিলেন। তাঁর এক ভাই ছিল। মা কারাথিস (Carathis, অনুবাদে কেরাতিস্) গ্রীসদেশের কন্যা ছিলেন। তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল অগ্নি-উপাসকদের তুকতাক আর কেরামতির দিকে। নিজেও ঐ বিষয়ে চর্চা করিতেন।

বাথেক খুব সুপুরুষ ছিলেন। প্রজারাও তাঁহার অনুরক্ত ছিল। তবে রাগিয়া গেলে তাঁহার মূর্তি এমন ভীষণ হইত যে তাঁহাকে দেখিলে লোকে মূর্ছা যাইত, কেহ কেহ প্রাণ হারাইত। এই কারণে বাথেক যথসাধ্য চেষ্টা করিতেন তাঁহার ক্রোধ দমন করিতে। অন্যথা খুব দয়ালু আর দানশীল ব্যক্তি ছিলেন বাথেক। তবে নিজে কিন্তু সংযম বলিয়া কিছু জানিতেন না। খলিফা ওমর বিন আবদল-আজিজ যেমন মনে করিতেন যে পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করিবার জন্যই ইহলোকে নরকোচিত দারুণ দুঃখ পাওয়া আবশ্যাক, বাথেক তেমন মনে করিতেন না। তাঁহার কাছে ইহসুখই সর্বস্ব।

রাজধানী সামারাতে (Samarah) তাঁহার বাবা মোতাসেম বিস্তর মাটি ফেলিয়া উঁচু পাহাড় বানাইয়া তাহার উপর 'চিত্রাশ্ব' নামে চমৎকার প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইনি আরও পাঁচটি উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। প্রথমটিতে ছিল একটানা চব্বিশ ঘন্টা পানভোজনের আয়োজন। তার নাম দেওয়া হইল 'অখণ্ড ভোজ' (দি ইটারনাল ব্যাঙ্কোয়েট)। দ্বিতীয় প্রাসাদে ব্যবস্থা হইল সর্বদা শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকা-নাচিয়েদের মজলিশের। এ প্রাসাদের নাম রাখা হইল 'সুরমন্দির' (দি টেম্পল অফ মেলডি) বা 'আত্মার অমৃত' (দি নেকটার অফ দি সোল)। তৃতীয় প্রাসাদ ভর্তি করা হইল ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নির্মিত বিচিত্র ছবি, মূর্তি এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের সমাবেশ দিয়া। এ প্রাসাদের নাম হইল নেত্রানন্দ (দি ডিলাইট অফ দি আইজ) বা 'স্মৃতিবোধন' (দি সাপোর্ট অফ মেমরি)। চতুর্থ প্রাসাদে পৃথিবীর যেখানে যা কিছু সুগন্ধি দ্রব্য পাওয়া যায় তাহার সমাবেশ। এ সৌধের নাম হইল 'সুগন্ধ প্রাসাদ' (দি প্যালেস অফ পারফিউম) বা 'আনন্দ-উদ্দীপক' (দি ইনসেনটিভ অফ প্লেজার)। পঞ্চম প্রাসাদে স্থান দেওয়া হইল অসংখ্য অল্পবয়সী সুন্দরী নারীদের, যাহারা রূপে গুণে হুরীদের হার মানায়। এ প্রাসাদের নাম হইল 'উল্লাসনিকুঞ্জ' (দি রিট্রিট অফ মার্থ) বা 'সাবধান' (দি ডেঞ্জারাস)।

বাপের আমল হইতে বাথেক যাহা খুশি তাহাই করিয়াছেন, যাহা খুশি তাহাই জানিতে চাহিয়াছেন। সেই কারণে তাঁহার মনের একটা বড়ো প্রবৃত্তি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল অজানা ব্যাপার জানিবার প্রচণ্ড কৌতূহল, এমনকি যাহার অস্তিত্ব নাই এমন বস্তু অথবা বিষয়েও। বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তর্ক করিতে বাথেক ভালোবাসিতেন। তবে তর্কে পরাস্ত হইতে চাহিতেন না। বেগতিক দেখিলে উপহার দিয়া বিরুদ্ধবাদীর মুখ বন্ধ করিয়া দিতেন।

ধর্মের বিষয়ে বাদপ্রতিবাদে বাথেকের খুব ঝোঁক ছিল। কিন্তু তিনি গোঁড়াদের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে অগ্রসর হইতেন না। তিনি যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া বিবাদ করিতেন। গোঁড়াদের অপদস্থ করিতে তাঁহার ভালো লাগিত না। তিনি যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া বিবাদ করিতেন। গোঁড়ারা বাড়াবাড়ি করিলে তাঁহাদের জেলে পুরিতেন।

নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া জ্যোতিষের সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করিবেন বলিয়া বাথেক পিতার নির্মিত পুরাতন প্রাসাদে খুব উঁচু গম্বুজ (টাওয়ার) তৈয়ারি করাইলেন। দেড় হাজার সিঁড়ি বাহিয়া সে গম্বুজে উঠিতে হইত। গম্বুজে উঠিয়া চারদিকে আকাশ পৃথিবী দেখিয়া বাথেকের মাথা ঘুরিয়া যাইত। আপনার ঐশ্বর্য অনুভব করিয়া ওইখানেই তিনি প্রায় সারাক্ষণ কাটাইতে লাগিলেন। নক্ষত্রতারার মালায় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী পড়িবার চেষ্টা করিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, সামারায় কোন নূতন জ্ঞানী লোক আসিলে তাঁহাকে যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার কাছে আনা হয়। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা এতই বাড়িয়া গিয়াছিল।

এই ঘোষণার অল্পকাল পরে বাথেকের দরবারে এক বীভৎসদর্শন বিদেশির আগমন হইল। সে বাথেককে দেখাইল একজোড়া চটি যা পায়ে দিলে গাড়ির মতো চালাইয়া লইয়া যায় ; আর একজোড়া তলোয়ার যাহা আপনা-আপনিই শত্রুকে কাটিয়া ফেলে। দুটি বস্তুই অমূল্যরত্নখচিত। তলোয়ারের ফলায় অপরিচিত অক্ষরে কিছু লেখা ছিল। তাহা পড়িবার জন্য বাথেকের খুব আগ্রহ হইল কিন্তু বিদেশি লোকটি চুপ করিয়া রহিল, কোন কথারই জবাব করিল না। কেবল কপালে তিনবার করিয়া হাত ঠেকাইল। অবশেষে সে হাসিতে লাগিল। তাহার মিশকালো মুখে সে ভীষণ হাসি।

বাথেক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে সেদিনের মতো কয়েদ করিবাব হুকুম দিলেন। পরের দিন সকালবেলায় দেখা গেল, কারাগারের প্রহরীরা সব মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কারাকক্ষ খালি। দেখিয়া বাথেক রাগের চোটে খেপিয়া গেলেন। মা কারাথিস তাঁহার মুখে জলটল দিয়া কিছু সুস্থ করিয়া তুলিয়া সান্ত্বনা দিলেন এই বলিয়া যে জ্যোতিষে বলিয়াছে বাথেকের ভবিষ্যৎ অসাধারণ উজ্জ্বল। তখন আশ্বস্ত হইয়া বাথেক মায়ের পরামর্শ অনুসারে রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি তলোয়ারের লেখা পড়িতে পারিবে তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে পঞ্চাশটি সুন্দরী বাঁদী আর পঞ্চাশ কলসী কিরমিথ দ্বীপের খোবানি। বাজে লোকের ভিড় বন্ধ করিবার জন্য এ-কথাও ঘোষণা করা হইল যে না পারিলে শাস্তিবিধান হইবে তাহাদের দাড়ি-পোড়ানো।

ঘোষণা বাহির হইবার কিছু দিন পরে এক ব্যক্তির আগমন হইল। তাঁহার দাড়ি সবার চেয়ে দীর্ঘ। তিনি তলোয়ারের লিপির পাঠ উদ্ধার করিলেন। তাহা এই,

"আমরা যেখানে তৈরি হইয়াছি সেইখানে সবই সুনিপুণভাবে প্রস্তুত হয় ; আমরা সেখানকার সবচেয়ে হীন বস্তু।"

বাথেক খুশি হইয়া বৃদ্ধকে পুরস্কার দিয়া দু-একদিন তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিতে বলিলেন। বৃদ্ধ রাজি হইলেন। পরের দিন দরবারে আবার তলোয়ারের লিপি পড়িবার অনুরোধ করা হইলে বৃদ্ধ যাহা পড়িলেন তাহা সম্পূর্ণ নূতন পাঠ,

"হতভাগ্য অবিমৃষ্যকারী সে মানব যে জানিতে চায় যাহা তাহার অজ্ঞাত থাকা উচিত, যে করিতে চায় যাহা তাহার ক্ষমতার বাহিরে।"

শুনিয়া বাথেক চটিয়া গিয়া বৃদ্ধের দাড়ি অর্ধেক পুড়াইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু বৃদ্ধকে তাড়াইয়া দিয়াই বাথেককে অনুতাপ করিতে হইল। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে তলোয়ারের লেখা যেন দিন দিনই পালটাইতেছে। বাথেকের মন খারাপ হইল, তাহার পর শরীর খারাপ হইল। তাঁহার ক্ষুধা রহিল না, তাহার বদলে তৃষ্ণা হইল অগাধ। মদ শরবত জল—কোন কিছু পান করিয়া তৃষ্ণা মিটিতেছে না। কারাথিস ভাবিলেন, পুত্র ইন্দ্রজালে পড়িয়াছে। তিনি উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সামারার কিছু দূরে এক রম্য উচ্চ পর্বত ছিল। তাহার উপরে নানারকম গাছপালা আর চারটি প্রস্রবণ ছিল। সেখানে বাথেককে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু তাঁহার দুর্জয় তৃষ্ণা কিছুতেই মিটিল না। তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি ঝরনার প্রপাতের খাদের কিনারে উপুড় হইয়া শুইয়া জিভ দিয়া চাটিয়া চাটিয়া জল খাইতে লাগিলেন। একদিন এইরকম করিতেছেন, এমন সময় জোর গম্ভীর গলায় অশরীরী বাণী বাথেককে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত হইল, 'খলিফা, কেন তুমি কুকুরের মতো আচরণ করিতেছ ?' এই আকাশবাণী শুনিয়া মাথা তুলিয়া বাথেক দেখিলেন যে সেই বিদেশি লোকটি দাঁড়াইয়া যে তাঁহার এই দুঃখের মূল কারণ। রাগে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হতচ্ছাড়া কাফের, এখানে তুই কী করতে এসেছিস ? দেখছিস না যে আমি অতিরিক্ত পানে আর তৃষ্ণায় মরতে বসেছি ?"

শুনিয়া আগন্তুক একটি শিশিতে লাল আর হলদে রঙের কিছু ঔষধ দিয়া বলিলেন, "খেয়ে নাও, তোমার আত্মার ও দেহের তৃপ্তি হবে। জেনো আমি ভারতীয়, সেখানকার এমন এক স্থান থেকে আসছি যা কেউ জানে না।" বাথেক সে ওষুধ খাইলেন, খাইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া আগাইয়া গিয়া আগন্তুককে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দ করিলেন। সকলে মিলিয়া লোকটিকে লইয়া আনন্দ করিতে করিতে সামারায় ফিরিয়া আসিল। মহাভোজ দেওয়া হইল। সে ভোজে বাথেকের খাদ্য পানীয় সব আগন্তুক একাই উজাড় করিয়া দিলেন। শুধু কি খাওয়া ! অট্টহাস্য করিয়া মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া, তাহা পড়িয়া গল্প বলিয়া হুল্লোড় ছুটাইয়া দিলেন একাই। বাথেক ভয় পাইয়া তাঁহার খোজা সর্দার বাবা বালুককে (অনুবাদে 'বাবালুক') চুপিচুপি বলিয়া দিলেন তাঁহার বেগমমহলের পাহারা জোরদার করিতে।

পরের দিন সকালবেলায় সভা ডাকা হইয়াছে। বাথেক ভোজনশালা হইতে সোজা আসিলেন দেওয়ানে। আগন্তুকও আসিলেন, আসিয়া বসিলেন সিংহাসনে উঠিবার সোপানে। তাহা দেখিয়া বাথেকের মাথা গরম হইয়া উঠিল। এমন সময় প্রধান উজীর তাঁহার কানে কানে বলিলেন, "রানীমা আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছেন। আপনি

আগন্তুকের কাছে জেনে নিন, ও আপনাকে কী ওষুধ খাইয়েছে, ও ওষুধ কোথাকার। তা ছাড়া, তলোয়ারের রহস্য জেনে নিতে ভুলবেন না।" এ কথা শুনিয়া বাথেক আগন্তুককে প্রকাশ্যে ওইসব প্রশ্ন করিলেন। কোনও উত্তর না দিয়া আগন্তুক যেখানে বসিয়াছিলেন সেইখানে বসিয়াই প্রচণ্ড হাসি হাসিতে লাগিলেন আর নানারকম মুখভঙ্গি করিতে লাগিলেন। বাথেক আর সহ্য করিতে পারিলেন না। লাথি মারিতে মারিতে বৃদ্ধকে সিংহাসনের সিঁড়ি হইতে নামাইলেন। সভার লোকে তখন সবাই আগন্তুক বিতাড়নে লাগিয়া গেল। সকলের লাথি খাইতে খাইতে লোকটি তালগোল পাকাইয়া গেল আর মারের চোটে গড়াইয়া গড়াইয়া চলিল। কারাথিস আর উজীর মোরাকানাবাদ বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাথেক আর তাঁহার লোকেরা তাহা শোনে নাই। সকলে ধাওয়া করিয়া চলিল পর্বতের দিকে। আগন্তুক গড়াইতে গড়াইতে গিয়া অবশেষে পড়িয়া গেলেন জলপ্রপাতের গভীর গর্তে। বাথেক আর অন্য সকলের দশাও তাহাই হইত যদি না কোন অদৃশ্য শক্তি তাহাদের গর্তের কিনারায় রুখিয়া না রাখিত।

তারপর অন্য সকলে সামারায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু বাথেক সেইখানেই রহিয়া গেলেন তাঁবু খাটাইয়া। মায়ের ও উজীরের নিষেধ তিনি মানিলেন না। তাহার পর হঠাৎ একদিন রাত্রিবেলায় তিনি আগন্তুকের স্বর শুনিতে পাইলেন। তাঁহাকেই যেন বলিতেছেন, "তুমি কি আমার শরণ নেবে? জড় জগতের ক্ষমতা স্বীকার করবে? তোমার ধর্ম পরিত্যাগ করবে? যদি এইসব শর্ত মান তবে তোমাকে ভূগর্ভের আগ্নেয় প্রাসাদে আনতে পারি। সেখানে তুমি দেখতে পাবে প্রচুর ধনরত্ন যা তোমাকে পাইয়ে দেবে বলেছিল তারানক্ষত্রের ভবিষ্যদ্‌বাণী। সেসব তোমাকে দেবেন সেইসব জ্ঞানী সত্ত্ব যাঁদের তুমি প্রসন্ন করবে। আমার সে তরোয়াল সেখান থেকে এনেছিলুম। সেখানে শুয়ে আছেন দাউদের পুত্র সোলেমান তাঁর সব তাবিজ নিয়ে, যে তাবিজ জগৎকে পরিচালিত করে।"

শুনিয়া বাথেক উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিলেন, "কে তুমি? আমার সামনে আবির্ভূত হও। আমার মনের অন্ধকার দূর করো। একবার তোমার মূর্তি দেখাও।' আগন্তুক বলিলেন, "তোমার ধর্ম প্রত্যাখ্যান করো। তোমার বিশ্বস্ততার পূর্ণ প্রমাণ দাও। তা না হলে আর কখনোই আমাকে দেখতে পাবে না।"

প্রবল কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া হতভাগ্য খলিফা গড়গড় করিয়া প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ কাটিয়া গেল। তারানক্ষত্রের উজ্জ্বল আলোতে বাথেক দেখিলেন তাঁহার সামনে ভূমি বিদীর্ণ হইল এবং সেই বিদীর্ণ ভূমিগর্ভের এক প্রান্তে দেখা গেল আবলুস-কাঠের এক বিরাট দরজা। দরজার সামনে সেই আগন্তুক দাঁড়াইয়া, তাহার হাতে একটি সোনার চাবি। সেই চাবি তিনি তালার গায়ে ঠুকিতেছেন। দেখিয়া বাথেক তখনি সেইখানে নামিয়া যাইতে চাহিলেন। আগন্তুক বলিলেন, "তার আগে তোমাকে আমার তৃষ্ণা মেটাতে হবে। পঞ্চাশটি শিশুর রক্ত আমাকে পান করাতে হবে। সেসব ছেলে সম্ভ্রান্ত ঘরের হওয়া চাই। পঞ্চাশটি ছেলে জোগাড় করে নিয়ে এসো। তাদের এই গর্তে ফেলে দাও। তাহলে আমার আবার দেখা পাবে।'

বাথেকের মাথা এখন কিছু ঠাণ্ডা হইয়াছে। সামারায় ফিরিয়া গিয়া পঞ্চাশটি ছেলে

জোগাড় করিয়া তাহাদের আনিয়া একে একে ফেলিয়া দেওয়া হইল চালাকি করিয়া সেই ফাটলে। শেষ ছেলেটি পড়িবার পর ফাটল বুজিয়া গেল। প্রজারা এইরূপ শিশুহত্যার জন্য বাথেককে দোষী করিতে লাগিল। তাহারা বিদ্রোহী হইল। বাথেক আর তাঁহার মা প্রাসাদের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া যেন লুকাইয়া রহিলেন। তাহার পর কারাথিস গম্বুজে গিয়া পুত্রের বাসনা পূরণের জন্য অভিচার অনুষ্ঠান শুরু করিলেন। সে যজ্ঞের আগুনের দীপ্তি দেখিয়া প্রাসাদে আগুন লাগিয়াছে মনে করিয়া প্রজারা দল বাঁধিয়া জল লইয়া ছুটিয়া আসিল আর প্রাসাদের দ্বার ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া পড়িল। তাহার পর গম্বুজের সিঁড়িতে উঠিতে গিয়া আগুনের উত্তাপে তাহারা মূর্ছিত হইয়া পড়িল। এই মূর্ছিত একশ চল্লিশ জন ব্যক্তিকে কারাথিসের কাফ্রি ক্রীতদাসীরা গলায় ফাঁস দিয়া মারিয়া ফেলিল। সেই দেহ পুড়াইয়া কারাথিস তাঁহার পৈশাচিক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিলেন। বাথেক এতক্ষণ দারুণ ক্ষুধায় পীড়িত হইতে ছিলেন। এখন তাঁহার ক্ষুধা মিটাইবার মতো প্রচুর খাদ্য আবির্ভূত হইল। তাহার পর কারাথিস পুত্রের সম্বন্ধে এই মর্মে অশরীরীর লেখন পাইলেন,

> পূর্ণিমারাত্রিতে তোমার লোকজন ও অন্তঃপুরিকাদের লইয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া আড়ম্বর করিয়া বাহির হইয়া যাও ইশতাখারের দিকে। সেখানে গিয়া তুমি আশ্চর্য-ভূমি পাইবে, সোলেমানের সব তাবিজ এবং প্রাক-আদমীয় রাজাদের সব ধনরত্ন পাইবে। আরও নানা সুখ সুবিধা পাইবে। কিন্তু দেখো, পথে কোন বাড়িতে আশ্রয় লইয়ো না। তাহা হইলে আমার রোষে পড়িবে।

বাথেকের বুভুক্ষা মিটিয়াছে। এখন মায়ের উৎসাহ পাইয়া এই বাণীর নির্দেশমতো তিনি ইশতাখার যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কারাথিস আর উজীর মোরাকানাবাদ সামারার প্রাসাদে রহিলেন। আর বাথেক তাঁহার দলবল লইয়া খুব চুপিচুপি বাহির হইলেন। তাইগ্রিসের তীরে পৌঁছাইয়া তাঁহারা বিশ্রাম লইলেন দু-চার দিনের জন্য। চতুর্থ দিনে খুব ঝড়জল বজ্রপাত হইল। ওলচিসার সহরের শাসনকর্তা আসিলেন বাথেককে স্বাগত করিতে। বাথেক সেখানে রহিলেন না, কেননা পথে কোথাও আশ্রয় লইতে নিষেধ ছিল। ঝড়জল সত্ত্বেও দলবল লইয়া বাথেক অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক দারুণ জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সকলের কষ্টের আর অবধি রহিল না। বন্যজন্তুরা তাঁহাদের উট, ভেড়া সব ধ্বংস করিয়া ফেলিতে লাগিল। বাঁচিয়া রহিল শুধু সেই সব উট 'যাহারা মূত্রত্যাগের দ্বারা এমোনিয়া নামক বাষ্পের জন্মদাতা।'[১৯ক]

পরের দিন সকালবেলায় খোজার সর্দার বাবালুক দুজন বামন ব্যক্তিকে খলিফার সামনে আনিয়া হাজির করিল। তাহারা আসিয়াছে প্রচুর সুস্বাদু ফল লইয়া। তাহারা আমীর ফকরুদ্দীনের প্রজা। ফলমূলসম্ভারসমেত বামনদের দেখিয়া বাথেকের মন নরম হইয়া পড়িয়াছিল, এমন সময় স্মরণ হইল তাঁহার মায়ের সাবধানবানী, "বৃদ্ধ জ্ঞানী ও তাদের খর্বকায় চেলাদের থেকে সাবধান থাকবে। তাদের পরামর্শ নিয়ো না, তাদের দেওয়া খাবার খেয়ো না।'"

বাথেক দলবল লইয়া ফকরুদ্দীনের শহরের দিকে চলিলেন। পাহাড় হইতে নামিয়া তাঁহারা বিরাট অতিথিশালায় উঠিলেন। ফকরুদ্দীন তাঁহাকে স্বাগত করিলেন।

ফকরুদ্দীনের একটিমাত্র সন্তান, অপূর্বসুন্দরী কিশোরী নূরনিহার। কিন্তু ইতিমধ্যেই

তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট তাহার খুড়তুতো ভাই অপূর্বসুন্দর বালক গুলচেনরোজের সঙ্গে। দুজনে খুব ভাব। পরস্পর সর্বদা ক্রীড়াসঙ্গী। বাথেক নূরনিহারকে দেখিয়া তাহার প্রেমে পড়িলেন। নূরনিহারও বাথেকের মহিমায় আকৃষ্ট হইল। বাথেক নূরনিহারকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। ও যে বিবাহিত সে কথা শুনিয়াও তিনি দাবি ছাড়িলেন না। অগত্যা ফকরুদ্দীনকে ছলনার আশ্রয় লইতে হইল। নূরনিহার আর গুলচেনরোজকে ওষুধ খাওয়াইয়া মৃতকল্প করিয়া দিয়া প্রচার করিয়া দেওয়া হইল যে তাহারা মরিয়াছে। সমাধি দিবার জন্য তাহাদের দেহ দূর দেশে পাঠানো হইল। এ কথা শুনিয়া বাথেক খুব কাতর হইয়া পড়িলেন। শেষে গেলেন নূরনিহারের কবরে সম্মান জানাতে। সেখানে গিয়া দেখিলেন, তাহারা দুজনেই বাঁচিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়াই গুলচেনরোজ পলাইয়া গেল।

বাথেক আর নূরনিহার মিলিত হইলেন। বাথেক বলিলেন, "তুমি গুলচেনরোজকে ভুলে যাও।" নূরনিহার প্রার্থনা করিলেন খলিফা যেন গুলচেনরোজের কোন অনিষ্ট না করেন। বাথেক তাহা স্বীকার করিলেন। সেইখানে তাঁবু খাটাইয়া বাথেক নূরনিহারকে লইয়া রহিয়া গেলেন। বাথেকের পূর্বতন প্রিয়তমা দিলেরা সঙ্গে ছিল। সে দুজন কাঠুরেকে দিয়া চিঠি পাঠাইয়া দিল শাশুড়িকে সামারায়, সব ঘটনা বিবৃত করিয়া। চিঠি পাইয়াই কারাথিস চার দিন চার রাত পথ অতিক্রম করিয়া বাথেকের তাঁবুতে পৌঁছিয়া উট হইতে নামিয়াই পুত্রকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কারাথিসের কথায় বাথেক সেখান হইতে তাঁবু উঠাইয়া আবার যাত্রা শুরু করিলেন।

মাঝে কারাথিস তুক করিয়া এক বড় বিলের নীল মাছের কাছে খবর লইলেন কোথায় গুলচেনরোজ লুকাইয়া আছে। গুলচেনরোজ কেবলই পলাইয়া পলাইযা বেড়াইতেছিল। অবশেষে আশ্রয় পাইয়াছিল সে এক সদাশয় বৃদ্ধ জিনের কাছে। এই বৃদ্ধ সদাশয় জিনই বাথেকের দ্বারা গর্তে ফেলা সেই পঞ্চাশজন বালককে রাক্ষস কাফেরের মুখ হইতে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইনি গুলচেনরোজকেও তাঁহার গুহার মধ্যে আশ্রয় দিলেন। সেখানে তাহারা চিরশিশুর রাজ্যে অনন্তকাল ধরিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এদিকে কারাথিসের কাছে খবর আসিতেছিল যে সামারায় প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে। শুনিয়া কারাথিস তখনি সামারার মুখে রওনা হইলেন। যাইবার পূর্বে ছেলেকে অভিযানে আর দেরি না করিতে আদেশ দিলেন। বাথেকের দল আবার রওনা হইল। চারি দিনের মধ্যে তাহারা পৌঁছিয়া গেল রোকানাবাদের বিস্তীর্ণ উপত্যকায়। দুদিন সেখানে কাটিল। তাহার পর পৌঁছানো গেল ইশ্‌তাখারের বিধ্বস্ত ভূমিতে। কয়েকজন দুর্বল অক্ষম বৃদ্ধ ছাড়া সে অঞ্চলে কোন বাসিন্দা ছিল না। তাহারা বাথেককে কাতরভাবে নিষেধ করিল ভিতর দিকে না যাইতে। কিন্তু খলিফা কোন কথাই শুনিলেন না। বাথেক আর নূরনিহার অবশেষে এক কালো পাথরের ভাঙ্গা পাহাড়েব তলায় পৌঁছিলেন। সামনে সিঁড়ি। তাঁহারা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় খোজা-সর্দার বাবালুক আসিয়া বলিল, "আলো জ্বালব কি ?' 'না' বলিয়া বাথেক নূরনিহারের হাত ধরিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। স্তূপের মাথায় উঠিলে পর দেখা গেল এক বিরাট প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। সামনে চারটি ভয়াবহ প্রাণীর বিরাট প্রস্তরমূর্তি (composed of leopard

and griffin)। চাঁদের আলোয় দেখা গেল সেই মূর্তির কাছে কিছু লেখা। সে অক্ষরগুলিও সেই তলোয়ারের লেখার মতো ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে অক্ষরের ধাঁচ বদলাইয়া শেষে আরবী অক্ষর হইয়া দাঁড়াইল। তখন বাথেক তাহা পড়িতে পারিলেন—

> বাথেক, তুমি আমার বাণীর শর্ত মান নি। উচিত তোমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু তোমার সঙ্গিনীর খাতিরে এবং তুমি তাকে পাবার জন্য যা করেছ তা বিবেচনা করে ইবলিস অনুমতি দিচ্ছেন যে তোমাকে প্রাসাদের দরজা খুলে দেওয়া হবে, এবং ভূগর্ভ অগ্নি তোমাকে উপাসকদের মধ্যে স্থান দেবেন।

পড়া শেষ হইতে না হইতে ভূমিকম্প হইল। পাহাড়ের গায়ে কিছু ফাঁক দেখা গেল। তাহার মধ্য দিয়া মার্বেলের সিঁড়ি নীচে চলিয়া গিয়াছে যেন পাতাল পর্যন্ত। কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দুজনে সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিলেন। এমন বেগে যেন তাঁহারা উপর হইতে গড়াইয়া পড়িতেছেন। অবশেষে পৌঁছিলেন তাঁহারা সেই আবলুস-কাঠের দরজায়। সেইখানে সেই কাফের চাবি হাতে দাঁড়াইয়া আছে। সে তাঁহাদের স্বাগত করিয়া দরজা খুলিয়া দিলে। দুজনে ঢুকিতেই দরজা বন্ধ হইয়া গেল। প্রথমে চোখে ধাঁধা লাগিয়াছিল। তারপর সব স্পষ্ট করিয়া দেখা যাইতে লাগিল। তাঁহারা স্তম্ভের পর স্তম্ভ, তোরণের পর তোরণ অতিক্রম করিয়া আগাইতে লাগিলেন। শেষে পৌঁছিলেন এমন একস্থানে যেস্থান অপরাহ্ণের সূর্যালোকে উদ্দীপ্ত, যেখানে ভূমিতে সোনার কণা ধূলার মতো ছড়াইয়া আছে। সেখানে নানারকম খাদ্য পানীয় থরে থরে সাজানো। একদল মেয়ে-পুরুষ জিন নাচিয়া বেড়াইতেছে ভূমিগর্ভ হইতে আসা সঙ্গীতের সুরে তালে। এই বিরাট হলের ভিতর দিয়া অনেক ব্যক্তি আসা-যাওয়া করিতেছে। তাহাদের সবারই ডান হাত বুকে রাখা। কোন দিকে তাহারা কিছু গ্রাহ্য করিতেছে না। চোখ তাহাদের গভীরভাবে বসা, মন তাহাদের চিন্তামগ্ন। কেউ কেউ দেহবেদনায় আর্ত চীৎকার করিতেছে। কেউ কেউ হিংস্র বাঘের মতো লাফালাফি করিতেছে। কেউ কেউ বিষবাণে আহত জন্তুর মতো ছটফট করিতেছে, কেউ কেউ বা ঘোর উন্মাদের মতো আচরণ করিতেছে। তাহাদের যেন কোন হুঁশ নাই পরস্পরের প্রতি। ইহারা কে তাহা কাফেরের কাছে জানিতে চাহিলে কাফের উত্তর এড়াইয়া গিয়া বলিল, "চলো চলো, তোমাদের নিয়ে যাই ইবলিসের কাছে।"

তারপর অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহারা পৌঁছিলেন আগাগোড়া-পরদা-ঘেরা এক স্থানে। কিছুক্ষণ পরে বাথেক আর নুরনিহারের বোধ হইল একস্থানে পরদার ভিতর হইতে যেন আলো ফুটিয়া উঠিতেছে। সেখানে একটা ঘর রহিয়াছে আগাগোড়া চিতাবাঘের ছালে ঘেরা। তাহার মধ্যে এক উঁচু সিংহাসনের তলায় অনেক অনেক দাড়িওয়ালা বুড়ো আর ছুরিকাটারি হাতে আশ্রিত ব্যক্তি দণ্ডবৎ করিয়া পড়িয়া আছে। সিংহাসনের উপরে এক আগুনের গোলায় বসিয়া আছেন ভয়ঙ্কর ইবলিস। শরীর তাঁহার যুবকের মতো। তবে তাঁহার সৌম্য সুন্দর গঠন যেন কোন দূষিত বাষ্পের চোটে কলঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার বিশাল নেত্রদ্বয়ে যেন যুগপৎ গর্ব এবং আশা অভিব্যক্ত। তাঁহার বিকীর্ণ কেশে যেন স্বর্গদূতের কেশাভাস লক্ষিত হয়। তাঁহার হাতে— যে হাত বজ্রে বিধ্বস্ত—দুলিতেছে

লোহার রাজদণ্ড, যাহা রাক্ষস (মনস্টার) ঔরানাবাদ আফ্রিতগণ ও পাতালের সব শক্তিকে ভয়ে কাঁপাইয়া দেয়। বাথেক ভয়ে মাটিতে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। তবে নূরনিহারের মন্দ লাগিল না ইবলিসকে। গলা একটু নরম করিয়া ইবলিস বাথেক আর নূরনিহারকে নিজের সেবকদলভুক্ত করিয়া লইয়া তাঁহাদের বাঞ্ছিত অধিকার দান করিলেন।

ইবলিসের কথায় খুশি হইয়া বাথেক আর নূরনিহার কাফেরকে বলিলেন, "এখনি আমাদের সোলেমানের তাবিজের কাছে লইয়া চলো।" "এসো" বলিয়া সে তাহাদের লইয়া গেল সেখানে, যেখানে আদমের পূর্বকালের রাজারা খাটে শুইয়া আছেন অস্থিচর্মাবশেষ হইয়া। তাঁহাদের কিছু সাড় আছে যাহাতে নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন। প্রত্যেকেরই ডান-হাত বুকের উপর রাখা। তাঁহাদের পায়ের দিকে খাটে উৎকীর্ণ আছে তাঁহাদের ক্ষমতার এবং কীর্তি-অকীর্তির বিবরণ।

দাউদ-পুত্র সোলেমান সবচেয়ে উঁচু মঞ্চে শুইয়া ছিলেন। হলের গম্বুজের ঠিক নীচে। তিনি অপর রাজাদের তুলনায় একটু বেশি প্রাণবান্ ছিলেন। তাঁহার হাতও বুকের উপর ছিল। বোধ হইতেছিল তিনি যেন জলপ্রপাতের শব্দ শুনিতেছেন যাহা ভিতর হইতে দেখা যাইতেছিল। তাঁহার মঞ্চের চার দিকে বড়ো বড়ো পিতলের জালা রাখা ছিল। কাফের বলিল, "এগুলোর ঢাকা খুলে ফেলো, তা হলেই এসব তোমাদের হবে এবং তোমরা এর রক্ষী ভূতদের মালিক হবে।" বাথেক যখন ঢাকা খুলিতে যাইতেছেন তখন শুনিতে পাইলেন সোলেমান তাঁহার জীবনকথা সব বলিয়া যাইতেছেন। শেষে বলিলেন, "আমার দুঃখ সেই দিন ঘুচিবে যেদিন হইতে এই জলপ্রপাত বন্ধ হইয়া যাইবে।" এই বলিয়া তিনি নমস্কারের ভঙ্গিতে ডান হাত তুলিলে খলিফা দেখিতে পাইলেন যে সোলেমানের হৃৎপিণ্ড জ্বলন্ত আগুনে পুড়িতেছে। দেখিয়া ভয় পাইয়া বাথেক ঈশ্বরের দয়া ভিক্ষা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন কাফের ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "তোমাদের এইরকম হবে। দু-চার দিন বাকি আছে, যা মজা লোটবার তা লুটে নাও। আমার প্রতিজ্ঞাপূরণ হয়েছে। তোমাদের আমি এখন ছেড়ে যাই তোমাদের নিজেদের কাছেই।' এই বলিয়া যেন অন্তর্হিত হইল।

চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে দুজনে সে হল ছাড়িয়া বাহির হইয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। যেদিকে যান সেদিকের সব দ্বারই তাঁহাদের কাছে মুক্ত হইয়া যায়, ভূতেরা দণ্ডবৎ করে। তাঁহারা সব ধনাগার দেখিয়া চলিলেন। কিন্তু কোন কিছুর উপর লোভ রহিল না। খাওয়া-দাওয়ার বিরাট আয়োজন সর্বত্র, কিন্তু কিছুই আর তাঁহাদের মন টানে না। ঘুরিতে ঘুরিতে হতাশ হইয়া নূরনিহার বলিয়া ওঠেন, "হায়, তোমার হাত থেকে আমার হাত টেনে নিতে হবে একদিন।" বাথেক উত্তর দিলেন, "তোমার মুখচন্দ্র থেকে আমি একদিন আর সুখ পাব না। তুমি তো আমাকে এখানে আনো নি, আনিয়েছে আমার মা, আমার যৌবন-চিন্তাকে বিকৃত করে দিয়ে। এখন উচিত হচ্ছে তারও এই নরকের ভাগ পাওয়া।" এই বলিয়া বাথেক এক আফ্রিত যে প্রদীপ উশকাইয়া দিতেছিল তাহাকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন সামারার প্রাসাদ হইতে তাঁহার মাকে সেইখানে লইয়া আসিতে।

তাহার পর আবার তাঁহারা এঘর ওঘর বেড়াইতে শুরু করিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে

এক গ্যালারির প্রান্ত হইতে বিলাপগুঞ্জন শুনিতে পাইলেন। ধ্বনি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা ঢুকিলেন একটি ছোট চৌকোনা ঘরে। সেখানে তাঁহারা দেখিলেন যে চার জন সুপুরুষ যুবক আর একটি সুন্দরী যুবতী একটি অনুজ্জ্বল প্রদীপকে ঘিরিয়া বসিয়া হতাশভাবে কথোপকথন করিতেছে। সকলেরই মুখ কালিমাড়া, হাবভাব হতাশার। দুজন পরস্পরকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। খলিফা আব ফকরুদ্দীনের কন্যাকে ঢুকিতে দেখিয়া তাঁহারা অভিবাদন করিয়া বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। তাহার পব তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি বাথেক আর নুরনিহারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখছি তোমরা আমাদের মতো এখনি শাস্তি ভোগ করতে শুরু করনি। এসো, আমরা নিজেদের কাহিনী পরস্পরকে শোনাই।" রাজি হইয়া বাথেক চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে নিজের সব কথা বলিলেন। তাহার পর তাঁহারা নিজেদের কাহিনী বলিতে লাগিলেন একে একে। তৃতীয়, ব্যক্তি যখন নিজের ইতিহাস বলিতেছেন এমন সময় প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বিবরের ফাটল খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রকাণ্ড একচাপ ঘন মেঘ নামিয়া আসিল। একটু পরে বোঝা গেল এক আফ্রিতের পিঠে চাপিয়া কারাথিস আসিয়াছেন। কারাথিসের ভারে আফ্রিত গোঙাইতেছিল। কারাথিস আফ্রিতের পিঠ হইতে লাফাইয়া নামিয়া ছেলের কাছে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ছোট ঘরে রয়েছ কেন? এখন দেওরা তো তোমার অধীন। তাই আমি প্রত্যাশা করেছিলুম। তুমি আদম-পূর্ব রাজাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছ।" বাথেক কারাথিসকে ভর্ৎসনা করিযা পাঠাইয়া দিতে চাহিলেন সলোমনেব গম্বুজে. সেখানে তাঁহাব অবস্থা দেখিতে। কারাথিস ভাবিলেন, সলোমনের ঐশ্বর্য পাইয়া ছেলের বুঝি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, "শোনো, তুমি আর আমি কেউই আর সামারায় ফিরব না। তাই আসবার আগে আমি সেখানে সব বন্দোবস্ত করে এসেছি। আমি গম্বুজ জ্বালিয়ে দিয়েছি। তার মধ্যে হাবাগোবা নিগ্রো সাপখোপ যা-কিছু ছিল সবই ভস্মসাৎ হয়েছে। মোরাকনাবাদেরও সেই গতি করতুম যদি না সে ইতিমধ্যে পালিয়ে তোমার ভাইয়ের কাছে যেত। বাবালুককে আমি ফাঁসি দিয়ে মেরেছি। তোমার ভার্যাদের আমি নিগ্রো মেয়েদের সাহায্যে মাটিতে পুঁতে দিয়েছি। পরে তাদেরও মেরে ফেলেছি। দিলেরাকে আমার ভালো লাগত। সে খুব বুদ্ধি করে এক অগ্নি-উপাসকের আশ্রয় নিয়েছে। আশা করছি যে শীঘ্রই আমাদের দলে এসে জুটবে।" এসব কথা কানে না তুলিয়া বাথেক তাঁহার মাকে সেখান হইতে সরাইয়া দিলেন। নিজে চুপচাপ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কারাথিস সলোমনের গম্বুজে গিয়া কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সলোমনের জালা খুলিয়া কবজগুলি হাত করিলেন। তাহাতে ইবলিসের সব ধনসম্পত্তি মায় পৃথিবীর গর্তমধ্যস্থিত হিমশীতল মৃত্যুবায়ু যার নাম সংসার (দি সনসার্) পর্যন্ত সব দেখিয়া লইলেন। সকলের বুকে হাতও দেখিলেন কিন্তু তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। কোন একটি গভীর গর্ত হইতে উঠিয়া আসিবার সময় তিনি ইবলিসকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু নিজের দৃঢ়তা আর ঠাট হারাইলেন না। তাঁহার আর বেশিদিন যথেচ্ছাচার চলিবে না— এই কথা জানাইয়া ইবলিস অন্তর্ধান করিলেন তাহার চামড়ার ঘেরার মধ্যে। কারাথিস অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর ইবলিসের ইঙ্গিত স্মরণ করিয়া সব

জিন গায়কদের আর দেওদের জড়ো করিয়া নিজের গৌরব-অনুষ্ঠান শুরু করিয়া দিলেন। তাহার পর গেলেন তিনি তিন সলোমনের[৭৯খ] মধ্যে এক সলোমনকে স্থানচ্যুত করিয়া সে স্থান অধিকার করিতে। তখন মৃত্যুর গর্ত হইতে শোনা গেল, "সবই করা হয়ে গেল।" অমনি যন্ত্রণায় কারাথিসের কপাল কুঞ্চিত হইল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ডান হাত বুকের উপর লাগিয়া রহিল। তাঁহার হৃদয় অনন্ত অগ্নিতে পুড়িতে লাগিল। তাহার পর তিনি সব সত্তার চারদিকে ছড়াইয়া দিয়া ঘুরনি হাওয়ায় পরিণত হইয়া অদৃশ্যভাবে চিরকালের জন্যে ঘুরিতে লাগিলেন।

ঠিক সেই সময়েই সেই অশরীরী বাণী বাথেক, নূরনিঁহার, চারজন রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে সেইরকম শাস্তি ঘটাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের হৃৎপিণ্ডে আগুন জ্বলিয়া উঠিল আর তাঁহারা তখনই চিরকালের জন্য হারাইলেন স্বর্গের সবচেয়ে মহার্ঘ দান— আশা। বাথেক লক্ষ্য করিলেন, নূরনিহারের চোখে শুধু ক্রোধ আর প্রতিহিংসা। নূরনিহার লক্ষ্য করিলেন, বাথেকের চোখে শুধু ঘৃণা আর হতাশার দীপ্তি। [৭৯গ] তাহার পর সকলে আলাদা আলাদা সেখানকার জনাবর্তের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

এইভাবে খলিফা বাথেক, অন্তঃসারশূন্য জাঁকজমক এবং নিষিদ্ধ ক্ষমতা পাওয়ার লোভে হাজারো পাপকর্ম কবিয়া অন্তহীন দুঃখের আর অক্ষুণ্ণ আত্মগ্লানির কবলে পড়িয়াছিলেন। অথচ বিনীত, অবজ্ঞাত গুলচেনরোজ যুগের পর যুগ কাটাইতে লাগিল অপবিচ্ছিন্ন শান্তিতে, চিরস্থায়ী শৈশবের নির্মল সুখে।

মূল (Vathck)-এর কাহিনী যেন উদ্ভট, অনুবাদ 'বেতিক'-এর ভাষাও তেমনি উৎকট। অনুবাদক হয়ত ভালো ফারসী জানিতেন, কিন্তু তাঁহার সে ভাষাজ্ঞানের আঁচ কোথাও তিনি একটুও ঢাকিয়া বাখিতে চেষ্টা করেন নাই। এমন কি, অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় এবং অনপেক্ষিত হইলেও অনুবাদক স্থানে স্থানে সহজ বাঙ্গালা শব্দের ফারসী প্রতিশব্দও যোগ করিয়া দিয়াছেন, অথবা নিতান্ত অনাবশ্যকভাবে ফারসী (অথবা আরবী) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ; যেমন, 'যে সব্ব্ (কারণ আ.[৭৯ঘ]) তাঁহার বদান্যতা অসীম ও তাঁহার প্রসাদ অসংযম ছিল'। 'পাপস নিচয় (পাপস—বিনামা ফা[৭৯ঙ])...কলমতরাশ নিচয (কলমতরাশ—ছুরিকা, আ.+ফা[৭৯চ])...তেষনিচয় (তেগ—তরবারি · ফা) মজকুর নিচয (মজকুর— যাহার বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে : আ.)।' 'কপোলদেশ তথা বদন্ (আন্দাম, তনু, শরীর : আ) বারত্রয় ঘর্ষণ করিল।' 'তুমি যতগুলি কথা বলিয়াছ ততগুলি খেলআত (অর্ধ 'এ'কার : বহুমূল্য পরিচ্ছদ যাহা বাদশাহ বা আমীরের 'তরফ' হইতে কাহাকে গুণের পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত হয় : আ.)'। 'মদকল পুংস্কোকিল-বিরুত মাধবীলতালিঙ্গিত সহকারতরুর পরিবর্তে আনারমণিবীজ (আনার— দাড়িম্ববৃক্ষ : ফা) তথা নয়লে খুর্মালিঙ্গিত দ্রাক্ষালতা (নয়ল—খর্জুরবৃক্ষ : আ.) নয়লেন (ফা) ফারসীতে (নয়লে বুন্) ফলভারাবনত কমলাদির মধ্যে বিরাজ করিতেছিল'। 'কামিনী-বেলা-চামেলি-চম্পক-সুরখ-চম্পক (সুরখ—লাল ; রক্তিমাভ : ফা। সুর্খ্-চম্পক বজবানে ইংলিস্থান মেগলোনিয়া জীগোয়েন্দ)—রক্তের প্রণয় (জিসকে ইংরিজিমে লভ্স্—লাইস—ব্লিডিং কহতেঁহেঁ)...দরগুলসান্দের=(মেঁ, তে মধ্যে ঃ গুলসন্—পুষ্পোদ্যান

(ফা) বুল্‌বুল্ (বুল্‌বুল্—আ. আনদলিফভি কহতে হৈঁ)'। অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

চলতি বাঙ্গালা শব্দকে বাদ দিয়া আরবী ফারসী শব্দকে ব্যবহার করিয়াছেন লেখক মাঝে মাঝে। যেমন, 'পরদহঁ উঠাইয়া'; 'বাদশাহঁকেও কঔাদ দেয় না'; 'খরবুজহঁ ও দাড়িম্ব আনয়নে প্রেরিত হইল'; 'সেই দরওয়েশ কর্তৃক'; 'কাজী'; 'মসজ্জিদ'; 'গম্বুজ'; 'বন্দ্‌বস্ত্' ইত্যাদি। অনুবাদক সংস্কৃতও জানিতেন। তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় দিবার জন্য মাঝে মাঝে ফুটনোট দিয়া কালিদাসের কবিতাছত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যেমন, সতেরোর পৃষ্ঠায় 'মরুতসখাভ' কথাটির ফুটনোট উদ্ধৃত করিয়াছেন "মরুৎপ্রযুক্তাশ্চমরুৎসখাভম্"। ওই পৃষ্ঠাতেই 'পবনের দ্বারা বীজ্যমান' কথাটির ফুটনোটেও রঘুবংশ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন পৃক্তস্তুষারৈব' ইত্যাদি সমগ্র শ্লোকটি। আটচল্লিশের পৃষ্ঠায় 'বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টি' লিখিয়া ফুটনোটে তুলিয়া দিয়াছেন মেঘদূতের ছত্রটি, 'খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং' ইত্যাদি।

আভিধানিক শব্দের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। যেমন, 'বর্ষবর' ও 'বণ্টশ্রেষ্ঠ' (=খোজাদের সর্দার); 'লজ্জালুক'; 'অধিরোহণী' (=সিঁড়ি); 'ইরম্মদ' (=বজ্র); 'ময়ূখমালা' ইত্যাদি। এইরকম কিছু শব্দ অনুবাদক নিজেও সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন, 'মধুবর্তিকা' (=মোমবাতি); 'করপক্ষ' (=চামচিকে, বাদুড়); 'ধরাপতি' (=রাজা); 'মনঃপ্রদ'; 'কাফূরীবর্তিকা' (=কর্পূরের বাতি); 'কাফ্রিনী' (=কাফ্রি নারী); নিগ্রিনী (=নিগ্রো নারী) ইত্যাদি। ভুল সংস্কৃত শব্দ সৃষ্টিও দু-একটা আছে। যেমন, 'প্রশ্নমালা' (=জিজ্ঞাসু); 'অধিশ্বরনী' (=অধীশ্বরী); ইত্যাদি। অত্যন্ত উৎকট ভুল একটি চোখে পড়িতেছে। "এই সময়ে দস্তান (গল্প : ফা) শ্রুয়ন্ ভর্ত্তৃদায়ক"। এখানে "শ্রুয়ন্"=সংস্কৃত "শৃন্বন্" অর্থাৎ শুনিতে শুনিতে।

কয়েক ছত্র লেখা আছে মিশ্র ফারসী-বাঙ্গালা-সংস্কৃতে। এটুকু উদ্ধৃত করিতেছি

> কথমিয়ং পরী হুর অথবা মানবী যদ্ভবনং বিরহখিন্নং পরিত্যজ্য ইথা গমনেন পর্বতশিখরং সমলঙ্করোতি ? নির্ব্বণ্য ববিন্। আকৃতিঃ কীদৃশী, সর্ব্বাঙ্গ-সুঠামশালিনী পর্বতপ্রান্তে শৃঙ্গবিনি ভূত্বা বিপদনপেক্ষা গতিমন্থররহিতা পল্লবিনীপুষ্পিনীলতেব সঞ্চালিতা হইতেছে এবং শিরশ্চালনপূর্বক ভ্রূভঙ্গির সহিত বেশভূষার প্রতি আবেচিত ভঙ্গি করিতেছে কথমিয়ং সা অজদস্তশ্ যূথিকামালম্ পরিভ্রষ্টম্ ?

[আরবী ফারসী শব্দ এই অংশে : পরী, ইয়া, হুর, ববিন্ (=এই বিষয়ে), অজ, দস্তশ্। বাঙ্গালা শব্দ : সুঠাম, হইতেছে, এবং ভ্রূভঙ্গির বেশভূষার করিতেছে। সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে ব্যাকরণদোষ আছে। 'কথমিয়ম্ ('অয়িম্' মুদ্রণভ্রম ?) সা...পরিভ্রষ্টা' হইবে। 'শৃঙ্গবিনি' সম্ভবত হইবে 'শৃঙ্গারিণী'। অনুবাদক সংস্কৃত লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন বেপরোয়া ভাবে।]

অনুবাদকের নিজস্ব স্টাইল যে অনেকটা তাঁহার অনুবাদের স্টাইলের মতোই জবড়জং গোছের, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবত এই রচনাটি লইয়া তাঁহার সাহিত্যজগতে প্রথম পদক্ষেপ। 'অবতরণিকা' হইতে লেখকের নিজস্ব স্টাইলের কিছু পরিচয় দিই।

> সৃষ্টির নিদানভূত সেই দেবাদিদেবের ও হাস্যময়ী জগতযোনি প্রকৃতির যথাবিধি বাঙ্‌মনের দ্বারা নমস্কার পুরঃসর বিঘ্নবিনাশার্থে স্বকর্মের উপরে নির্ভর করিয়া প্রবৃত্ত হইতেছি।

পুনরপি পরিধারণাতীত তর্কোত্তর স্বস্থ প্রত্যাধার সেই দেবের প্রাণ-প্রবণ প্রভাববিশেষ বাগদেবতার বশ্যাকাঙ্খী হইয়া বন্দনা করিতেছি ও সর্বোচ্চ মনোরথ প্রকাশের উৎপাতু— কামনায় আকৃষ্ট হইয়া প্রকৃষ্ট চপলতায় প্রণোদিত হইতেছি। অরিষ্টনেমির অভ্যাযাতা[৭৯৮], কৃষির অনন্যগতি, কৃষিকামিনীর নির্নিমেষপ্রেক্ষণীয়া, অতিমনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম বহিসৌন্দর্য তিরস্কারিণী মনোভাবের তুলিকাস্পর্শে সৌন্দর্যরাশি উথলিতা সুন্দরীর পুলকিতাঙ্গযষ্টির ন্যায়, প্রতীয়মানা, স্বচ্ছসলিলা, মনোরমবাপী পার্শ্বে নাহর্ম্যাবলী বিরাজিতা পুষ্পহাসা অশোক বনিকার অনুতোষিণী ও খাদ্যপ্রদানে জীবলোকের আনন্দ প্রদায়িনী মেঘমালার যথাসময়ে অভীষ্টরূপ বর্ষণের প্রার্থনা প্রকৃতির নিকট করিয়া—কথঞ্চিতাশান্বিত হইয়াও বর্বরোচিত হস্তার্পণের[৭৯৯] ভয়ে বিলোল সঙ্কোচচিত্ত হইয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছি।

লেখক সংস্কৃত শিখিয়াছেন, অথবা শিখিতেছেন, কিন্তু যেন স্কুল-কলেজের পড়ার ডিসিপ্লিন নাই তাঁহার।

অনুবাদকের ভালো ছন্দ-জ্ঞান ছিল। তাহার বিশেষ পরিচয় পাই এই যে, দুইটি স্থানে ছোট অংশে তিনি পদ্যে—বাঙ্গালায় অথবা ফারসী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত তিন ভাষাতেই অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। কখনো কখনো ছন্দের সংস্কৃত নামও করিয়াছেন। যেমন

১। মূলে—

They were singing in the sweetest tones the words that follow 'We dwelt on the top of these rocks, in a cabin of rushes and cones , the eagles carry us our nest , a small spring supplies us with water for the Abdest, and we daily repeat prayers, which the Prophet approves'

অনুবাদে তাহারা অতি সুমিষ্টস্বরে নিম্নলিখিত গানটি করিতেছিল।

বসি মোরা পবর্তশিখরে।
বেতসলতা-বেষ্টিত কুটীরে ॥
কুটীরে দৃষ্টি করে নসরে। (নসর—ঈগলপক্ষী আ)
হিংসা যেন তাহারোপরে ॥
সুশীতল বারি প্রদানে।
তোষে ক্ষুদ্রসরিতে প্রাণে ॥
সতত মোদেরও প্রাণে
ঈশ্বর-রত আরাধনে ॥[৮০০]

২। মূলে—

She began to parody some Persian verses and sang with an accent most demurely poignant 'Oh gentle white dove, as thou soar'st through the air, vouchsafe one kind glance on the mate of thy love melodious Philomel, I am thy rose, warble some couplet to ravish my heart '

অনুবাদে সমদনা মীর দুহিতা উদ্দামযৌবনপ্রকৃতিবশে রঙ্গিণী সঙ্গিনীদের অপেক্ষা অভিভূতা প্রকটবদনা, তীব্রশ্লেষব্যঞ্জক স্বরে নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করিতে লাগিল।

তরাধীনা মোর প্রতি।

কর (ও) হে দান প্রীতি ॥ ভূপাবলী ।
জানি না তোমা বিনা ।
এ জনে বাঁচাও না ॥ মধুমতী ।
পক্ষ যবে শূন্যে ।
উড়িছে সুধন্যে ॥ রসবতী ।
চাহ না প্রাণপ্রিয়ে ।
আমিই তব প্রিয়ে ॥ মধুমতী ।[৭৯ঝ]
গুলত্ মনম্ ।
রাবুলবুলম্ ॥ রসবতী ॥[৭৯ঞ]
অস্ত বতো ঔস্ক-প্রগাঢ়ম্ ।
নমনাসিব্ তম্ বিচ্ছেদয়িতুম্ ॥ মৃগনয়না ।[৭৯ট]
ন শঢ়ং[৭৯ঠ] শক্নোমি তব বিচ্ছেদজ্বালম্ ।
কৃপয়া দেহি তব পদপল্লবছায়াম্ ॥ মালতী ।[৭৯ড]
বরতে দিলখুস্ জত্তো দিলম্ ।
বওদ সুশীতলম্ কেবলম্ ॥ তোটক[৭৯ঢ]

অনুবাদের শেষে 'অথ পুষ্পিকা' বলিয়া এই শ্লোকটি আছে—

নবপল্লবরাজিরাজিতা কুসুমরাজিকা ।
সোফি—মানসমোহিনী পুষ্পিনীয়ম্ পুষ্পিকা ॥

তাহার পরে রহিয়াছে অনুবাদ-কাজের আরম্ভ ও সমাপনের তারিখ :

আষাঢ়স্য চতুর্থ দিবসে এক সহস্রশতত্রয় ত্রয়োদশ
সৌরবৎসরে আরম্ভকৃত্বা পরবৎসরে সৌরাশ্বিনস্য
বিংশদিবসে অমাবস্যায়াং তিথৌ সমাপ্তোনীতো ইয়ম্ ॥

প্রকাশক নিবেদনে (তারিখ "সৌর মাঘ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ") অনুবাদকের "রচনার পারিপার্ট্য, শব্দপ্রয়োগের সার্থকতা ও লিপিচাতুর্য্যের মনোহারিত্ব বাঙ্গালা ভাষায় ইহা সর্বপ্রথম" নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন

> অনুবাদক যেরূপ অর্থের উদ্যানে ভাষাসুন্দরীকে চালিত করিয়াছেন ও যেরূপ ভূষণে যথাস্থানে ভূষিত করিয়াছেন তাহা একান্তই অভিনব ও ভাষাসুন্দরীর পক্ষে সর্বপ্রথম। সুন্দরীকে যেরূপ আন্দোলনে আন্দোলিত করিয়াছেন তাহা বিচক্ষণ অভিজ্ঞ পাঠকদিগের উপর বিচারণের ভার অর্পিত হইল। ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে অনুবাদক সম্পূর্ণরূপেই অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রন্থের বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। পরন্তু কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হয়েন নাই। যেসকল ফারসী ও আরবী শব্দ ভাষার সুশ্রাবতাবিধানে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার বর্ণসংযোজন মূলেব সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রাখিতে ও যথাযথ উচ্চারণসৌকর্যার্থে যথোবিধ চেষ্টা করা গিয়াছে ও নূতন প্রথা অনুসৃত হইয়াছে। এই পরিকথা আরবীয় উপকথার গল্পমালার অন্তর্গত হইতে পারে এবং এইরূপ হইয়া চমৎকর্ষে চিত্তাকর্ষণে কাহার না বলবতী হইবে ?
>
> অনুবাদকের পরিচয় এক্ষণে নিশ্চিতই অপরিজ্ঞাত থাকিবে, ইচ্ছা নহে সাধারণ্যে নাম প্রচার করিতে। যেহেতু, উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া ভবিষ্যতে অনেক আশা রাখিয়া থাকেন। অতি-শীঘ্রই যে এই লেখনীর অন্য পুস্তক প্রসূত হইবে তাহা আশ্বাস না দিয়া

> থাকিতে পারি না, নিশ্চিন্ত থাকুন ইহা অপেক্ষা অনেক গুণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হইবে— প্রিয় পাঠকগণ এই আশাপথে প্রতীক্ষা করিবেন কি ?

অনুবাদক মহাশয়ের অপর যে গ্রন্থের জন্য প্রকাশক প্রিয় পাঠকগণকে আশাপথে দাঁড় করাইয়াছিলেন, তাহার নাম অনুবাদক মহাশয় তাঁহার অবতরণিকায়ই বলিয়া দিয়েছেন। [৭৯]সে বই দুটি হইল-- (১) জেমস মরিয়ারের 'হাজিবাবা' আর (২) টমাস হোপের 'এনস্টেনিয়ার্স'।

'বেতিক' বইটিতে লেখকের নাম নাই, প্রকাশকের নাম নাই, দামেরও উল্লেখ নাই। লেখকের এটি প্রথম গ্রন্থ। রচনার মধ্যে বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টা প্রকট। সুতরাং অনুমান করিতে পারা যায় যে বইটি বিক্রয়ের জন্য নয় ; প্রধানত প্রচারের জন্য ছাপা হইয়াছিল, যাহাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'প্রিনটেড অ্যানড পাবলিশড ফর প্রাইভেট সারকুলেশন'। বইটি যে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে সেই কারণেই এই অনুমান অযৌক্তিক নয়। (তবে ছাপা দুচার কপির বেশি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহার একটি অবান্তর প্রমাণ আছে ছাপিবার সময় প্রিন্টার দুটি পৃষ্ঠা বাদ দিয়া ফেলিয়াছিল। পরে একটি পৃষ্ঠা ছাপা হইয়াছিল দু পাতায় দু পৃষ্ঠায় বিয়ের পদ্যের কাগজে এবং সেইমতে অক্ষর ছাপা। এই পৃষ্ঠা দুটি ৮০ক, ৮০খ। তাহার পরে উঠে লেখকের—অনুবাদকের—প্রশ্ন। লেখক ফারসী জানিতেন, এই ভাষায় তাঁহার অনুরাগ ও জ্ঞান ছিল। তিনি বেশ সংস্কৃতও জানিতেন এবং কালিদাস তাঁহার প্রিয় কবি ছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে তিনি হিন্দু ও কাব্যপ্রিয় ব্যক্তি। সংস্কৃতের প্রয়োগে কিছু কিছু গলতি আছে। তাহা হইতে বুঝিয়া লইতে পারি যে তিনি টোলে সংস্কৃত পড়েননি এবং সংস্কৃতের ছাত্র অথবা শিক্ষক নন। 'বেতিক' তাঁহার প্রথম রচনা। আমার অনুমান অনুসারে, বর্সাক অ্যান্ড সন্স যদি বইটির প্রকাশক হন তবে তাঁহাদের কার্যালয় ছিল মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে। এই বিষয়গুলি যুগপৎ স্মরণ করিলে মনে হয় যে বেকফোর্ডের Vathek-এর অনুবাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, এবং এটি তাঁহার প্রথম দিকের গদ্যরচনা। ইংরেজী অথবা ফারসী মূল হইতে ইউরোপ-আমেরিকার কোন কোন বিশিষ্ট কবি ও লেখক-- যেমন বায়রন, ডিজরেলি, পো, হথর্ন, সুইনবার্ন, মালারমে ইত্যাদি-- বেকফোর্ডের রচনাটির অনুরাগী ছিলেন। ফরাসী কবি স্তেফান মালারমে Vathek-এর একটি এডিশনে (প্যারিস ১৮৭৬) ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে যে প্রথমে Vathek লেখা হইয়াছিল ফরাসীতে (১৭৮২, প্রকাশ ১৭৮৬)।

বেকফোর্ডের রচনাটি লইয়া মালারমে ও সুইনবার্নের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হইয়াছিল তাহা সুইনবার্নের পত্রাবলীর মধ্যে ছাপা হইয়াছিল। অনুমান করি, ইংরেজ ও ফরাসী কবির এই যোগসূত্রেই ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছিল বেকফোর্ডের রচনার দিকে। বেতিক অনুবাদক যে কাঁচা ছন্দপটু ছিলেন তাহার বিশেষ পরিচয় উপরে উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছি। ১৩১৩-১৪ সালের দিকে বাঙ্গালা ও ফারসী লইয়া ভাষাব্যবহারে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া আর কোন তরুণ প্রতিভার কথা মনে আসে না। সত্যেন্দ্রনাথ ফারসী-প্রিয় ছিলেন, ফারসী জানিতেন। সংস্কৃত-প্রিয় তো ছিলেনই।

আরবী-ফারসী শব্দের উচ্চারণনির্দেশে যে প্রযত্ন নেওয়া হইয়াছে তা তাঁহারই কাছ হইতে প্রত্যাশিত। আমি বলি 'বেথিক' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কৈশোরক রচনা।

১৩

রবীন্দ্র-অনুজাত ও নিষ্ঠাবান্ সমসাময়িক কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথেরই বুদ্ধিবিদ্যার আয়োজন ছিল সর্বাধিক। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল এবং বর্তমান ইতিহাসের তিনি নিপুণ পর্যবেক্ষক ছিলেন। ছন্দ এবং ভাষা দুইয়েতেই তাঁহার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় হৃদয়াবেগের প্রকাশ নিতান্তই বিরল তবুও যতটুকু আছে তাহাও নিরুদ্ধ। তাঁহার কবিমানসের যে আবেগ তাহা বুদ্ধির লাগামটানা ইমোশন, কদাপি প্যাশন নয়। ছন্দের প্রবাহে এই ইমোশনও প্রায়ই হারাইয়া গিয়াছে এবং সঙ্গীতের রেশ সমগ্র কবিতার মধ্যে নির্বাধে এবং অখণ্ডভাবে সঞ্চারিত হইয়া ফিরিতে পারে নাই। জীবনে সত্যেন্দ্রনাথের যে কৌতূহল ছিল তাহাও পুরাপুরি ভাবুকের ও ভোগীর নয়, অনেকটা কৌতূহলীর এবং খানিকটা তপস্বীর। সেই কারণে তাঁহার কবিতা প্রায়ই গভীর নয়, এবং যেটুকু গভীরতা লইয়া শুরু হইয়াছিল তাহাও ক্রমশ কমিয়া গিয়াছে॥

১৪ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সমসাময়িক কবিদের উপর তাঁহার প্রভাব ক্রমশ বাড়িতেই থাকে। (সমসাময়িক নবীন কবিতা লেখকেরা সত্যেন্দ্রনাথের রচনা সহজে অবলম্বন করিতে পারিতেন, তাহার পর রবীন্দ্রনাথকে ধরা সহজ হইত। রবীন্দ্রনাথকে তাঁহারা যতটুকু লইয়াছিলেন তাহার প্রায় বারো আনাই সত্যেন্দ্রনাথের চোলাই করা।) সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় ঘরোয়া ভাবের প্রবলতা ছিল কিন্তু তাঁহার সমসাময়িকেরা ঘরোয়া ভাবকেই বেশি করিয়া আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাব থাকিলেও তাহা গৌণ। তবে সত্যেন্দ্রনাথের কুহু-ও-কেকার কয়েকটি কবিতার প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য। রোমান্টিক ভাবের পল্লীগীতিও এই কবিদের রচনায় মুখ্য স্থান লইয়াছে। ইহার মূল মহাজন রবীন্দ্রনাথ এবং অব্যবহিত মহাজন সত্যেন্দ্রনাথ। বেশির ভাগ কবিতাই মক্‌শ ধরনের। তবে সবশুদ্ধ, সরলতা এবং খানিকটা অন্তরঙ্গ-আন্তরিকতা এইসব কবিদের বিশিষ্ট রচনায় উপলভ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব একজন কবি সম্পূর্ণভাবে এড়াইতে পারিয়াছিলেন। ইনি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী (১৮৭৩-১৯২৭), সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র-ভাবে ভাবিত এবং রবীন্দ্র-রসে মগ্ন। অবশ্য সমসাময়িক তরুণ কবিরা সকলেই রবীন্দ্র-অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের মতো রবীন্দ্র-নিষ্ঠ আর কেহই ছিলেন না, এমন কি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও নন। বর্তমান শতাব্দীতে সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্র-বিদ্বেষ বারে বারে জাগিয়াছিল। প্রত্যেকবারেই দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের প্রতিবাদই প্রথম, প্রবল এবং প্রচণ্ড। চিত্রাঙ্গদাকে উপলক্ষ্য করিয়া কাব্যে নীতি লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন 'সাহিত্য' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন প্রতিবাদগুঞ্জন যে উঠে নাই এমন নয়,

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের প্রতিবাদ সর্বাপেক্ষা যুক্তিনিষ্ঠ ও কার্যকর হইয়াছিল।[৮০] অনেক কাল পরে যখন সাহিত্যধর্মের সীমানা লইয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতির তর্ক বাধিয়াছিল তখনও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রবীন্দ্রনাথের পক্ষ সবেগে সমর্থন করিয়াছিলেন। নরেশচন্দ্রের প্রতিবাদে লেখা প্রবন্ধটিই ('সাহিত্য-ধর্মের সীমানা-বিচার' বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৪) বোধ করি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের শেষ রচনা।

দ্বিজেন্দ্রনাবায়ণের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এক সমসাময়িকের উক্তি স্মরণীয়।

> সংসারে থেকেও যেন সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন, পণ্ডিত হয়েও পাণ্ডিত্যের কোন অভিমান প্রকাশ করেন না, ব্যবসায়ী হয়েও ব্যবসায়ের কথার বদলে বলেন খালি রবীন্দ্রনাথ, ব্রাউনিং, শেলি, কীট্‌স্ ও হুইটম্যানের কথা, প্রবীণ হয়েও যৌবন-তারুণ্যে সদাই উচ্ছ্বসিত।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের গৃহে (ঠনঠনে কালীতলার কাছে) সাহিতিকদের রীতিমত বৈঠক বসিত এবং এ বৈঠকের সঙ্গে তুলনা করা চলে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বৈঠক (তখনকার সুকিয়া স্ট্রীটে ভারতী আপিসে)।

সত্যেন্দ্রনাথের মতোই দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ কবিতা লইয়া প্রথমে 'সাহিত্য' পত্রিকার আসরে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বেশি কবিতা লিখেন নাই তবে মাসিকপত্রে লিখিবার দিকে তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের প্রথমদিকের চতুর্দশপদী রচনা 'প্রদোষ' (সাহিত্য, ভাদ্র ১৩০৮) উদ্ধৃত করিতেছি।

> প্রদোষে যখন সখি ! বিষাদের ভরে
> উদাস অন্তর ক্লান্ত পড়িবে নোয়ায়ে,
> এইখানে এসে বস' একা এই ঘরে,
> ঢেলে দিয়ো তনুখানি সায়াহ্নের বায়ে।
> অই যে কোমল সুধারস সঞ্চার
> করুণ সান্ত্বনা সম শান্ত সমীরণ,
> মনে করো আসে যেন নিশ্বাস কাহার
> প্রেমের বেদনাতপ্ত পরশ সেচন।
> ওই সন্ধ্যাতারা সখি ! আকাশের পরে
> মৃদুল কিরণ-কম্পে ঈষৎ চঞ্চল,
> ভাল করে চেয়ে দেখো যদি ক্ষণ তরে
> মনে হয় ও কাহারো আঁখি ছল-ছল ;
> গৃহকর্ম অবসরে যদি কোন দিন
> মধুব মোহেতে চিত্ত হয় উদাসীন ॥

'মানসী'তেও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের কবিতা দুইচারটি বাহির হইয়াছিল। যেমন 'প্রেমের রাজ্যবিস্তার' (অগ্রহায়ণ ১৩১৭)।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ একখানি মাত্র কবিতার বই বাহির করিয়াছিলেন, নাম 'একতারা' (১৯১৭)। বইটি "বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শ্রীচরণে" উৎসর্গিত। ইহাতে এক শ নয়টি কবিতা আছে। ৩০ জুন ১৯১৫ হইতে ২৩ মে ১৯১৬— এই সময়ের মধ্যে কবিতাগুলি লেখা। কেবল শেষ কবিতাটির রচনাকাল ১৪ বৈশাখ ১৩২৪।

নামপৃষ্ঠার পূর্বপৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ হইতে এই সার্থক উদ্ধৃতিটুকু আছে

"একতারাতে একটি যে তার
আপন মনে সেইটি বাজা।"

সমস্ত কবিতাগুলির মধ্যে একটি সুর একটানা বহিয়া গিয়াছে। সে সুর মুগ্ধ, তৃপ্ত, ভাবৈকরস প্রেমের। এ প্রেম পত্নীর সান্নিধ্য ও স্মৃতি ঘিরিয়া গুঞ্জরিত, তবে ঘরোয়া পটভূমিকা ও পুরোভূমিকা বর্জিত। এই প্রেমই কবির রচনার একমাত্র প্রেরণা।

এই যে আমার কাব্য লেখা, এই যে গো গান গাওয়া :
নিপুণ করে যতন ভরে মনের মণি মানিক থরে
ভাষার সোনা-সুতায় শুধু হারটি গেঁথে যাওয়া ?
নয়তো তাহা নয়গো !
নানান সুরে গানে গানে প্রিয়া আমার কানে কানে
গোপন প্রাণের কথাটি তার,
বারে বারেই কয় গো !.. ...
আপন মনে গান গেয়ে যাই কোন্‌খানে হয় কি যে !
প্রিয়ার পরম পরশখানি ছাওয়া যেন সকল বাণী
গভীর প্রাণের বেদন-রসে সুরগুলি সব ভিজে।[৮১]

একটি প্রেমেই সকল প্রেমের পর্যবসান।

ধরণীর সব ভালোবাসা রূপ ধরেছে একটিখানে,
তোমার দেহে মনে প্রাণে ;
সকল রস আর সকল পরশ সকল গতির বিপুল হরষ
মিলে বরণ গন্ধ গানে।[৮২]

এই জীবনের প্রেমের ডোর কবিহৃদয়কে পূর্বাপর জন্মের প্রেমের মালায় গাঁথিয়া চলিয়াছে।

সকল কথাই কথায় বলা যায় কি প্রিয়ে ?
সকল ব্যথাই নয়নজলে দেয় জানিয়ে ?
সকল সুখ কি অধরপুটে হাসির আভায় উজল ফুটে ?
সকল প্রেম কি কেবল একটি জীবন নিয়ে ?[৮৩]

সব পরশের পরশমণি নিবিড় পরশ তব,
সেদিন আমি অঙ্গ ভ'রেই লবো ;
সেই পরশের অসীম সুখে সব বুঝি মোর যাবে চুকে
একটি কথাও রইবে না যা কানে কানেই কবো।[৮৪]

বহিঃসংসারের ও বিশ্বভাবনার সঙ্গে কবিমানসের যোগাযোগ হৃদয় দিয়া, বুদ্ধি দিয়া একেবারেই নয়। এইখানে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের অত্যন্ত তফাৎ।

হায় ! কুমারী স্ফটিকরচা, হায় ! কুমারী তুষাররুচি,
শুভ্র শারদ-জ্যোৎস্না শুচি,
মোদের প্রাণ যে তৃষায় দহে কতই স্বপন গোপন রহে,

মুখে জাগাই হাসির লেখা, আড়ালেতে নয়ন মুছি। [৮৫]

সানাইয়ের তানের মতো টানা সুর 'একতারা'য়, তাই কবিতায় ছন্দোবৈচিত্র্যের আবশ্যকতা কবি অনুভব করেন নাই। কবিতার ভাষার জন্যও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ মাথা ঘামান নাই। সে ভাষা তিনি পাইয়াছিলেন হাতের কাছেই, রবীন্দ্রনাথের রচনায়। স্বভাবতই 'একতারা'র কবিতাগুলিতে 'ক্ষণিকার' ঝলক উঁকি দিয়াছে। কিন্তু যেখানে ক্ষণিকার অনুসরণ খুব স্পষ্ট সেখানেও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের রচনা অনুজ্জ্বল নয়। যেমন

যৌবন-ঢেউ নিত্য দোদুল প্রাণে,
শান্তিশতক পালান মানে মানে,
অশান্তি যে হাজার রূপে হাসে ;
মোহের জোয়ার খেল্‌ছে কোটাল বানে
মুদ্‌গর যান ভেসেই অকূল পানে,
অবোধ হর্ষ প্রবোধচন্দ্রে গ্রাসে। [৮৬]

প্রেমভাবুকতার প্রকাশ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের কবিতায় নূতন রস সঞ্চার করিয়াছে। সহজ গার্হস্থ্য প্রেমসম্বন্ধকে আত্মমগ্ন কবি বাস্তবতার ঊর্ধ্বে তুলিয়া দিয়াছেন,

স্বামীর সেবায় রমণীর যেই পরম পুণ্য,
জানি আমি বেশ তোমার চিত্ত সে-লোভশূন্য।
পুণ্যের দানে স্বর্গের জমি বন্দোবস্ত
তারো তরে তোরে দেখিনি তো কভু বিশেষ ব্যস্ত।

নিঃশ্বাস বহে, রক্ত চলিছে, হৃদয় স্পন্দে,
তোমার সেবাটি চলিছে সহজ স্বভাব ছন্দে।

দক্ষিণ হাওয়ার মরমের মাঝে যে সেবা বহে।
স্নিগ্ধ জ্যোছনা-পরশের রসে যে সেবা বহে,
দেহ মন প্রাণ সবখানি মোর নিত্য চুমি
আমার পরম সেবা যে জাগিছ আমার তুমি। [৮৭]

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ দীর্ঘকাল ধরিয়া কবিতা রচনা করেন নাই, দীর্ঘকাল বাঁচেনও নাই, এবং তাঁহার একখানির বেশি কবিতার বইও নাই। এইসব কারণে তাঁহার কবিখ্যাতির প্রসার খুব সঙ্কীর্ণ। এখনকার দিনে তিনি তো প্রায় অজ্ঞাত ও উপেক্ষিত। কিন্তু তাঁহার রচনায় স্থায়িত্বের পরিচয় যথেষ্ট আছে। অতএব সে কাব্যের অনাদর সুচির হইবে না।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর কবি-হৃদয়ের অকুণ্ঠ পরিচয় পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত 'ভরা প্রাণে' কবিতাটিতে,

ভেবেছিলাম তোমার কথা বলবো নাকো জনে জনে,
রইবে ঢাকা চিরদিন তা মনে মনে।
মন যে এমন উঠবে ভরে' জান্‌বো তখন কেমন করে' ?
ছাপিয়ে উঠে পড়বে সে যে ক্ষণে ক্ষণে!
যেদিন মধু সঞ্চারিল মরম ফুলে সঙ্গোপনে,

ভেবেছিলাম জানবে না কেউ বিশ্বজনে।
তখন কেবা জানতো আগে মধুর সনে গন্ধ জাগে,—
এমন করে ছড়ায় পাগল সমীরণে ?
ভেবেছিলাম সাঁঝের ঘোরে যমুনাতে জল ভরিয়ে
ফিরবো ঘরে একা বিজন পথ ধরিয়ে ;
সোনার কুম্ভে কাঁকণ লেগে মধুর ধ্বনি উঠল জেগে,
ভরা কলস চলার বেগে ছল-ছলিয়ে।
ভেবেছিলাম জীবন-ভরা মোদের চুমা গোপন ঘরে,
জান্‌বে না তা আর তো কেহ্ ঘরে পরে ;
আঁধারের ওই বুকের মাঝে ধ্বনি তাহার এমন বাজে,
উঠল জ্বলে তারার হাসি আকাশ ভরে' ॥

একতারার পরে যে কবিতাগুলি লেখা হইয়াছিল তাহা এখনও গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয় নাই ॥

১৫ করুণানিধন বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭-১৯৫৫) প্রথম কবিতার বই ক্ষুদ্রকায় 'বঙ্গ মঙ্গল' (১৯০১) স্বদেশি আন্দোলনের দেশপ্রীতি-পর্বের সৃষ্টি। অপরিপক্ক রচনা হইলেও ইহাতে লেখকের শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল, অতএব সাধারণ পাঠকের সমাদর পাইয়াছিল। ১৩১২ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। রচনার একটু পরিচয় দিই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি সহজেই শোনা যায়।

কিরণে শিশিরে কুসুমে ধান্যে তরুণি,
অয়ি মা ভরণি, অমৃতস্তনি ধরণি,
ত্রিভুবন-মনোহারিণি,
অয়ি সুরধুনী-ধারিণি,
শোভন-শান্ত-উজ্জ্বল-শ্যাম-ভূষণা,
গগন-প্রান্তে লুণ্ঠিত নীল-বসনা,—
নমো নমো মম জননী।

তাহার পর যথাক্রমে প্রকাশিত হয় 'প্রসাদী' (১৩১১ সাল), 'ঝরাফুল' (১৩১৮ সাল), 'শান্তিজল' (১৩২০ সাল), 'ধানদুর্বা' (১৩২৮ সাল) ও 'রবীন্দ্র-আরতি' (১৩৪৪ সাল)। 'শতনরী' (১৩৩৭ সাল) চয়নিকা বই। করুণানিধানের কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতা (যেমন 'সুদূর স্মৃতি', 'দুষ্টু', 'বাসনা') মানসীতে বাহির হইয়াছিল (১৩১৬-১৭ সাল)।

করুণানিধানের কবিপ্রকৃতির গঠন কতকটা দেবেন্দ্রনাথ সেনের মতোই। কবিতার মধ্যে ভক্তিরস অন্তর্বাহী, এবং কবিহৃদয় গৃহবাসী। তবে দেবেন্দ্রনাথ যেমন প্রকৃতিকে ঘরোয়া মানুষের দৃষ্টিতে দেখিতেন, করুণানিধান তেমন দেখিতেন না। ইনি প্রকৃতিকে মানবসংসারের বাহিরেই রাখিয়াছেন। আর করুণানিধানের ভক্তিরস দেবেন্দ্রনাথের মতো অতটা স্পষ্ট না হইলেও বেশ বৈষ্ণবতা-ঘেঁষা। (তাঁহার জন্মস্থান ছিল শান্তিপুর)। করুণানিধানের কবিতা সংখ্যায় খুব বেশি নয়, এবং অনেক বিষয় লইয়া তিনি নাড়াচাড়া

করেন নাই। তাঁহার কবিতা আবেগময়, এবং নিজস্ব হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে রচনারীতি অনায়াসসবল এবং চিত্র-উজ্জ্বল। যেমন

পিচকারিতে ঝরল রঙের মেলা,
গানের ঢেউয়ে বিহান-হোরি খেলা,
সেইত রাজা আমার চির যৌবনের,
অন্তরঙ্গ-মন্ত্র গুরু মোর
পরিয়ে দিল মুক্তাফলের মুক্ত-করা ডোর।
কণ্ঠ তাহার বীণার মত শুনি,
করলে যাদু, কি গুণ জানে গুণী। [৮৮]

না জানি কোথায় অতল-পরশে
অরুণ-প্রবাল-হর্ম্যে,
বারুণী-রূপসী বেণী-রচনায়,
শঙ্খ ধবল কঙ্কতিকায়
ভাঙ্গে অর্ব্বুদ জলবুদ্বুদ,
বিলাস-মুকুর-নর্মে। [৮৯]

করুণানিধানের রচনারীতির ভালো উদাহরণ 'শতনরী' (১৯৩০) হইতে

কানে কানে

হের, সখি, আঁখি ভরি শুভ্র-নীরবতা,
পাহাড়ের দুটি পার্শ্ব জ্যোৎস্না আর মসী।
নিথর নিশার কণ্ঠে কি দিব্য বারতা,
কান পেতে শোন হেথা বালুতটে বসি।

নীরবে নদীর জল চলে সাবধানে
সুর মিলাইয়া ওই তারকার সাথে।
পথ চেয়ে চেয়ে বায়ু মগ্ন কার ধ্যানে—
সন্তর্পণে হাতখানি বা'খ মোর হাতে।

যাদুকর চন্দ্রকর তালের বাকলে—
হেথা হোথা তুলিয়াছে রূপার ফলক,
মাধবীলতার ফাঁকে বকুলের তলে,
কে তরুণী মুঠি ভরি ধরে চন্দ্রালোক।

পাখি লুকায়েছে আঁখি পালক শিথানে—
আজিকার কথা বঁধু কহ কানে কানে।

করুণানিধান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ পরিদর্শকের পদে চাকুরি করিতেন।

১৬ যতীন্দ্রমোহন বাগচী

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর (১৮৭৮-১৯৪৮) কবিতা-অনুশীলন দীর্ঘদিনের। ১৩০৬ সাল হইতে ইঁহার কবিতা 'সাহিত্য' ও অন্য মাসিকপত্রে বাহির হইতে থাকে। তবে (১৩১৬ সাল হইতে) 'মানসী'তেই ইঁহার বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ। ইঁহার প্রথম কবিতার বই 'লেখা' (১৯০৬)। তাহার পর 'রেখা' (১৯১০),[২০] 'অপরাজিতা' (১৯১৩), 'নাগকেশর' (১৯১৭), 'বন্ধুর দান' (১৯১৮), 'জাগরণী' (১৯২২), 'নীহারিকা' (১৯২৭), 'মহাভারতী' (১৯৩৬) ইত্যাদি। 'পথের সাথী' (১৯২০) উপন্যাস।

প্রথম হইতেই যতীন্দ্রমোহন ছন্দে ও ভাষায় রবীন্দ্র-পন্থী। যেমন

অয়ি মম-হৃদয়কুঞ্জ অভিসারিকা
আজি রজনী-তিমির অবগুণ্ঠিতা
ত্রাসে নিখিল পৌরবধূকুণ্ঠিতা
এস ত্রস্ত বিশদবাস-লুণ্ঠিতা
মম তৃষিত-হৃদয়মনোহারিকা।[২১]

পল্লীপ্রকৃতির প্রতি টান আর মুখের ভাষার প্রতি ঝোঁকও প্রায় গোড়া থেকেই। যেমন

ঐ যে গাঁটি যাচ্চে দেখা আইরি খেতের আড়ে,
প্রান্তটি যার আঁধার করা সবুজ কেয়া ঝাড়ে,—
পূবের দিকে আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা,
জটলা করে যাহার তলে পাড়ার বালকেরা ;—
ঐটি আমার দেশ— আমার কাম্য স্বর্ণপুরী,—
ঐখানেতে হৃদয় আমার সবটা গেছে চুরি।
বাঁশবাগানের পাশটি দিয়ে পাড়ার পথটি বাঁকা,
পথের ধারে গলাগলি সজনে গাছের শাখা,
গোরুর গাড়ীর চাকায় পথে শুকোয় না ক কাদা,
কোথাও বা তার বেড়ায় গায়ে ঘুঁটে ছায়ের গাদা।
ঐটি আমার জন্মভূমি—সাধের স্বর্ণপুরী,—
বিশ্বশোভা ঐখানেতে যত গেছে চুরি। ..
পানায় মরা ডোবায় ভরা সিদ্ধি গাছে ছাওয়া,
ভাট-পিঠিলির জঙ্গলেতে হাঁপিয়ে ওঠে হাওয়া ;...[২২]

কবিতাটির মধ্যে ছেলেমানুষির গন্ধ থাকিলেও মন্দ নয়।

কবিতায় যতীন্দ্রমোহনের প্রধান গুণ চিত্রলিপিকুশলতা। ছন্দে ও শব্দে তাঁহার অধিকার নির্বাধ। বিষয়েও বিচিত্রতা আছে। সমসাময়িক কবিদের মতো তাঁহারও রচনায় পল্লীপ্রীতির প্রকাশ এবং ভাগ্যহত, নিপীড়িত নারীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশিত। যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় আবেগ খুব স্পষ্ট নয়, যেটুকু আছে তাহাতে রচনায় বেগের সঞ্চার করিয়াছে। জীবন বা জগৎ সম্বন্ধে কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ নাই। ইঁহার কবিতার সৌন্দর্য প্রসন্ন সরলতায়।

রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা'র কবিতাগুলি বাহির হইলে যাঁহারা এই ধরনের কবিতার পথে ধাবিত হইয়াছিলেন যতীন্দ্রমোহন তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার এই ধরনের কবিতার

সংগ্রহ 'বন্ধুর-দান'।

যতীন্দ্রমোহনের কবিতার আরও কিছু পরিচয় দিই।

বৃদ্ধা পৌষ— শীত-জর্জর, শিরে কুহেলির জটা,
মিট্ মিট্ করি' মেলিয়া আকাশে ঝাপ্সা, দৃষ্টি কটা :
প্রভাতে প্রদোষে লতা-পাতা-ঘাসে শিশিরের জাল বোনে—
কভু উদাসীন, রোদে পীঠ দিয়া বসি' রয় আন্মনে।

বিড় বিড় বকি' লাঠি ঠক্‌ঠকি' কভু ঘন নাড়ে মাথা,
খস্খস্ করি' অমনি খসিয়া পড়ে সে গাছের পাতা ;
কভু ক্রোধে সারা যেন জ্ঞানহারা, নাসিকায় শ্বাস পড়ে—
বিশ্বজগৎ উত্তরবায়ে থরথর করি' নড়ে।[৯৩]

আমি রূপের দিশা পাইনা খুঁজে'—
কোথায় যে তার বাসা,
এক মুখে সে এক-এক সময়
বলে এক-এক ভাষা !
কালো কেশের ঝর্ণা পাশে
কভু বা সে লুকিয়ে হাসে
আঁখির কোণে কভু দেখি
ঝলক সর্ব্বনাশা !
সারা অঙ্গ ভরি' যখন-তখন
গোপন যাওয়া-আসা ;
ঠিক-ঠিকানা পাইনা ত তাই
কোথায় যে তার বাসা।[৯৪]

হায় কবি হায় ! এমনি করিয়া মিথ্যার ঠুলি পরি'
ভরা দুপুরেতে ঘনায়ে তুলিছ তমিস্রা শর্ব্বরী !
দিনও যেমন রাত্রিও তাই, সমান আঁধার আলো,
দুই আছে বলে' সুখে ও দুঃখে জগতে বেসেছি ভালো ;
হাল্কা বলিয়া ফুৎকারে তব উড়াতে যেয়ো না সুখে,
আছে বলে' জীবে জীবনতৃষ্ণা জাগে তাই বুকে বুকে।
সুখ আছে বলে' সার্থক দুখ, সুখ আছে বলে' আছি,
মরণপন্থী—সেও বলে ভাই মরিতে পারিলে 'বাঁচি' !
মোটের উপরে সুখেরই মাত্রা বেশী না রহিত যদি,
কোথা হ'তে এই কাব্যের স্রোত কল্লোলে নিরবধি ?[৯৬]

১৭ কুমুদরঞ্জন, কালিদাস ও যতীন্দ্রপ্রসাদ

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০) করুণানিধান-যতীন্দ্রমোহন হইতে কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। কুমুদরঞ্জন শুধু পল্লীপ্রিয় নহেন, তিনি পল্লীনিষ্ঠ। এদিক দিয়া তাঁহার প্রীতি ও নিষ্ঠা

প্রগাঢ়। কুমুদরঞ্জনও দীর্ঘদিন হইতে কবিতা লিখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার কবিতার আয়তন সাধারণত ছোট, সংখ্যায়ও সেগুলি খুব বেশি নয়, কিন্তু তাঁহার কবিতাসাধনায় কখনো বিরতি যায় নাই।

কুমুদরঞ্জন পুরাপুরি ভক্ত ও বৈষ্ণব। (জন্মস্থান—কোগ্রাম, সম্ভবত লোচন দাসের বংশধর)। বাহিরের বস্তু ও ঘটনা তাঁহার কবি-চেতনায় যে আঘাত হানে তাহা প্রীতি ও স্নিগ্ধ ভক্তিরসের নম্রতায় বিগলিত; সৌন্দর্যের অনুভূতি আবেগের আন্দোলন জাগায় না। কুমুদরঞ্জনের কাব্যশিল্প অত্যন্ত সরল ও নিরাড়ম্বর, কলাকৌশলের প্রচেষ্টাবিহীন। "আমার এ যে বাঁশের বাঁশি, মাঠের সুরে আমার সাধন"— রবীন্দ্রনাথের এই কথা আক্ষরিক অর্থে কুমুদরঞ্জনের কবিতার পক্ষে সত্য। দেশের মাটির উপর কবির গভীর মায়া কবিতার বিষয়ে ও ভাবে এবং কাব্যের নামে অভিব্যক্ত। পুরাণকাহিনীর ইঙ্গিত প্রায় প্রত্যেক কবিতায়ই আছে। কুমুদরঞ্জন আজীবন শিক্ষকতা করিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষক জীবনের শুষ্কতা তাঁহার কবিতাকে একটুও স্পর্শ করে নাই।

কুমুদরঞ্জনের কবিতার বই— 'উজানী' (১৯১১), 'বনতুলসী' (১৯১১), 'শতদল' (১৯১১), 'একতারা' (১৯১৪), 'বীথি' (১৯১৫), 'বনমল্লিকা' (১৯১৮), 'নূপুর' (১৯২০), 'রজনীগন্ধা' (১৯২১), 'অজয়' (১৯২৭), 'তূণীর' (১৯২৮), 'স্বর্ণসন্ধ্যা' (১৯৪৮) ইত্যাদি। নাটক—'দ্বারাবতী' (১৯২০)।

প্রথম দিকের রচনার একটু নিদর্শন দিই।

বৈশাখী প্রাতে চম্পক হাসে
উজলিয়া দশদিশি,
বকুলবালিকা খেলে কত খেলা
ধূলি-পাতা সনে মিশি।
আবছায়ে বসি যূথীজাতিগুলি
কত উপকথা বলে,
সুন্দরী উষা পরাইয়া দেয়
নীহারমালিকা গলে।[৯৬]

কুমুদরঞ্জনের পরিপুষ্ট রচনারীতির নিদর্শন দিই।

সলিল থেকে উঠলো যেন
মুখটী ধুয়ে বরুণ-রাণী,
গীত থেকে আজ তুললে মাথা
কোন্ রাগিণীর মূর্তিখানি!
বর্ষারাণীর মিষ্টি হাসি
জমাট হয়ে জমলো আসি,
তুলোট পুঁথির মলাট ভাঙি
শকুন্তলা বেরিয়ে এলো।[৯৭]

কুমুদরঞ্জনের এই কবিতাটির ('নৌকাপথে' একতারা ১৯১৪) গীতরূপ বহুদিন ধরিয়া অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

মাঝি ভিড়াযোনা চলুক তবী
নদীব মাঝে,
তরী এ ঘাটেতে বাঁধব নাকো
আজকে সাঁজে ।
ওই ঘাটে ওই বকুল গাছে,
জলটি যেথা ছুঁযেই আছে,
এখনো যে ওই ঘাটেতে
পল্লীবালাব কাঁকণ মাঝে ।
তবী সেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে ।

২

ডুবছে ববি নীল গগনে,
যদিই আঁধাব হয়ে এসে,
তবু নদীব মাঝে মাঝে
তবী মোদেব চলুক ভেসে ।
ওই গাঁযেব ভাই নামটি শুনে,
প্রাণটি এমন কবে কেনে,
ঘুমপাড়ানো কোন বেদনা
জেগে উঠে হৃদয মাঝে ,
তবী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে ।

৩

মৌন সাঁজেব ম্লান মধুব
কতই ব্যথা আনছে ডেকে,
গ্রামেব সাঁজেব দীপটি ছোট,
বিদায ছবি দিচ্ছে এঁকে ।
একটি গৃহ হোথায় কি না
ছিল আমাব বডই চেনা,
ছবিটি যাব আজও আমাব
হৃদয় কোণে সদাই রাজে
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে ।

৪

এই নদীবই এই ঘাটেতে
এমনি সাঁজে আমার প্রিয়া
যেত ছোট কলসীখানি
কোমল তাহাব বক্ষে নিয়া ।
সোহাগে জল উথলে উঠি
বক্ষে তাহার পডল লুটি,

পথের মাঝে আমায় দেখে
ঘোমটা দিত হর্ষে লাজে,
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে

৫
ওই ঘাটের ওই গাছের পাশে
তটিনীর ওই শ্যামল কূলে,
দিয়েছি সেই স্বর্ণ-লতায়
আপন হাতে চিতায় তুলে।
আজকে ও সেই চিতার 'পরে
শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে
আজও মধুর মুখখানি তার
দেয় গো বাধা সকল কাজে
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

এই কুমুদরঞ্জনের কিছু বড় আর এক কুমুদ (বিহারী) মল্লিক ছিলেন। তিনি সিউড়ী নিবাসী। টলস্টয় ও বৈষ্ণবকবিতার ভক্ত ছিলেন। তিনি কীর্তনের ছাঁদে কবিতা লিখিতেন। সিউড়ীর একটি স্থানীয় পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন।

কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) যতীন্দ্রমোহনের সমানধর্মা এবং তাঁহার মতোই নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সাহিত্য-গোষ্ঠীর সভাসদ্ ছিলেন। সুতরাং কালিদাস রায়ের কবিতায় অগ্রজাত কবিভ্রাতাদের প্রভাব খানিকটা পড়িয়াছিল। প্রথম হইতেই ইঁহার রচনায় ছন্দে সুভগতা ও ভাষার প্রসন্নতা পরিস্ফুট। অর্থ ও ভাবের কোন জটিলতা নাই। পল্লীপ্রীতি প্রগাঢ়, তবে তাহার মধ্যে রোমান্টিক রঙ জোগালো। অতীত ও বর্তমান জীবনের রোমান্টিক রসকল্পনা কালিদাস রায়ের বিশিষ্ট রচনার প্রধান গুণ।

কালিদাস রায়ের রচনা অজস্র না হইলেও পর্যাপ্ত। ইঁহার কবিতার বই 'কুন্দ' (১৯০৮), 'কিসলয়' (১৯১১), 'পর্ণপুট' (১৯১৪), 'ব্রজবেণু' (১৯১৫), 'বল্লরী' (১৯১৫)[৯৮], 'ঋতুমঙ্গল' (১৯১৬), 'ক্ষুদকুঁড়া' (১৯২২), 'রসকদম্ব' (১৯২৩), 'লাজাঞ্জলি' (১৯২৪), 'হৈমন্তী' (১৯৩৪), 'বৈকালী' (১৯৪০) ইত্যাদি। পরবর্তী কালে কালিদাসবাবু তাঁহার রচনায় অল্পস্বল্প কলম চালাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সব সময় কবিতার উন্নতি হইয়াছে এমন বলা চলে না। 'কুড়ানী' কবিতা হইতে দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রথম প্রকাশের পাঠ[৯৯]

নালার জলেতে জালিটী পাতিয়া বসে থাকি আমি ঠায়
চুনোপুঁটী দুটা আঁচলে বাঁধিয়া, ফিরি কাদামাখা গায়।...

পঞ্চম সংস্করণ পর্ণপুটের পাঠ

নালীর 'পাউষে' জালিটি পাতিয়ে ব'সে থাকি আমি ঠায়,
চুনোপুঁটী দুটা আঁচলে গিঁঠিয়ে ফিরি কাদামাখা গায়।...

বোধ করি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাবেই "নালার জলেতে" "নালীর পাউষে" হইয়াছে, এবং শিক্ষক কবি সাধুভাষার মর্যাদা রাখিতে গিয়া "বাঁধিয়া"কে "গিঁঠিয়ে" করিয়াছেন। এ

পরিবর্তনে উপভাষা কতটা রক্ষা হইয়াছে জানি না তবে দুর্বোধ্যতার জন্য কবিত্বের হানি হইয়াছে।

সরল সহৃদয়তা কালিদাস রায়ের কবিতার বিশিষ্টতা। যেমন

> একরাশি এঁটো বাসনের মাঝে একলা পা দুটি মেলে,
> খিড়কির ঘাটে নূতন বৌটি নয়নের জল ফেলে।
> বাসনের ভার সামলানো দায়, নামিতে পিছল ঘাটে
> পাথর-বাটিটি পড়ে ভেঙে গেছে ঠেকিয়া তালের কাঠে।
> হেরিছে অভাগী জমা লাঞ্ছনা বাটির মুকুরপুটে,
> অম্ল খাবার বাটিটি ক্রমেই লোনা জলে ভ'রে উঠে।
> ভাবে ব'সে হায় লাগে না কি জোড়া কোন মন্ত্রের বলে!
> কোন গুণী এসে সহসা যদি বা জুড়ে দেয় কৌশলে।
> শ্বশুরবাড়ীতে আসিবার আগে কেন লয় নাই শিখে,
> কি দিয়ে জুড়িলে জোড়া যায় ভাঙা পাথরের বাটিটিকে।
> দেবতার ডাকে অভ্যাস-বশে—দেবতা বাঁচাবে যেন,
> বাটিটি ভাঙিল, পড়িয়া তাহার মাথা ভাঙিল না কেন?[১০০]

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৮৯০-১৯৭৫) পরিহাসময় এবং গম্ভীর দুই ধরনেরই কবিতা লিখিয়াছেন। ইঁহার কাব্যগ্রন্থ 'মর্মগাথা' (১৯১৪), 'ছায়াপথ' (১৯২৫), 'রামধনু' (১৯২৬), 'নভোরেণু' (১৯২৭), ও 'হাসির হল্লা'। (পরে বাহির হইয়াছে 'কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৬৩)।) 'মর্মগাথা' রবীন্দ্রনাথকে উপহৃত। উপহার-কবিতাটি চতুর্দশপদী। শেষ স্তবকটি এই

> স্বদেশ-আত্মা গৌরবে তব সম্মান লভে চৌদিকে
> কত না ছন্দে সুর-ঝঙ্কারে কীর্তি তোমার ঝঙ্কৃত!
> প্রাচ্য প্রতীচী দিয়েছে অর্ঘ্য বাঙালীর কবি-তৈর্থিকে,
> দীন ভক্তের হৃদয়ে তোমার অরূপ স্বরূপ অঙ্কিত!
> দিতে উপহার 'মর্মগাথার' কোথা উপচার, বন্দনা!
> তবু সম্ভ্রমে সঁপিনু তোমায়, নাহি থাক্ তাতে মূর্চ্ছনা।

মর্মগাথার কবিতাগুলি ১৩১৭ সালের কার্তিক হইতে ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মধ্যে রচিত। কয়েকটি কবিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনার প্যারডি। মর্মগাথার কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল একটি। সেটির নাম 'দেশের দাবী' (রচনাকাল ২৭ পৌষ ১৩২০)। সমসাময়িক তরুণ বাঙ্গালীর উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রচণ্ড আবেগে উচ্ছল। কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

> 'দেশ' কারে বলে জানে না দেশের গরীব নিঃস্ব চাষারা,
> 'দান' কারে বলে এখনো বোঝে না মাংসল ধনী দাতারা।
> কবিরা বাজাতে চাহে না দামামা, বাজায় বেণু ও বীণাটি;
> গান্ধীর কথা শোনে না শ্রোতারা পাছে লাগে দাঁত-কপাটী।
> পৃথিবীর শত বিভিন্ন জাতি ছুটিয়া চলেছে গরবে;
> ভারত যেন রে গোযানে চড়িয়া যেতেছে জীবন আহবে।

চীনের টুটেছে আফিমের নেশা, জাপান জেগেছে পুলকে ;
ইউরোপ হাঁকে "চল, ছুটে চল্, নহিলে মরণ পলকে।"
আমেরিকা ডাকে "আয় ছুটে আয়" বাজায়ে নবীন বাজনা ;
জাগরণী গীতি গাহে বিজ্ঞান একি রে নূতন সাধনা।
মোরা পড়ে আছি তাজা নরনারী অন্ধকূপের মাঝারে ;
ব্যবসা করিছে সচল জাতিরা বিশ্বের বড় বাজারে।
তোরা প্রেমের পুলকে আয়,
যুগের সঙ্গে যুবক ব্যতীত কে আর যুঝতে চায় ?

যতীন্দ্রপ্রসাদের শেষের দিকের কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুকরণ বেশি স্পষ্ট। যেমন

ওলো আমার বুলবুলি,
আজ কেন তুই অমন কোরে তুল্‌লি এ প্রাণ চুলবুলি !
ডাগর চোখের রগড় দেখে, বন্যা বুকে উঠল ডেকে,
সুখের ব্যথায় কাঁপছে শরীর, চেয়ে আছি চোখ তুলি'—
বুলবুলি লো বুলবুলি।[১০১]

অথবা সৌরভ পত্রিকা হইতে নেওয়া 'নাস্তে সুখমস্তি' কবিতাটি,

সুধার ধারা যাচ্ছে বয়ে, তৃষ্ণা মেটাও প্রাণ ভরে !
দুঃখ'শোকের চিন্তাকে আজ জয় করে নাও গান করে।
গাইছে পাখি কুঞ্জবনে, সে গান শোনো আপন মনে
চাঁদের আলোয় একলা বেড়াও রাত-দুপুরের প্রান্তরে।

বনে বনে যে ফুল ফোটে, ভোগীর সে যে মন তোষে।
ভোগের তরে জীবন পেলে, সম্ভোগে রও সন্তোষে।
মুক্ত গায়ে গাছের ছায়ে, জাড়াও জীবন মলয় বায়ে,
সময় গেলে মরবে ভেবে, কাঁদবে শেষে আপ্‌সোসে।

দিন চলে যায়, আঁধার আসে, তাতে তোমার ভাবনা কি ?
যা হবার তা হচ্ছে হবে, জীবনটা, ভাই, নয় ফাঁকি।
বিশ্ব বিরাট অর্থে ভরা, ব্যর্থ নহে সৃষ্ট ধরা।
শাস্ত্র পুঁথি আউড়ে তবু তর্ক করা চাই নাকি ?

শাসন্‌-শেকল সেধে পরে যে সব মানুষ মন্‌-মরা !
তাই সকলে টিট্‌কারী দেয়, করছে হাসি মস্করা !
আর কি তবে পুরুষ নারী পিয়াস মিটাও তাড়াতাড়ি,
পরের কথা ভাবব পরে, চলুক জীবন ভোগ করা।

১৮ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য

মানসীর অন্যতম সম্পাদক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৫৯) মানসী-ও-মর্মবাণীর

বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। গদ্যেপদ্যে ইনি প্রচুর লিখিয়াছেন। কবিতার বই— 'মন্দিরা' (১৯১৩), 'খঞ্জনী' (১৯১৪), 'সপ্তস্বরা' (১৯১৪), 'পত্রচিত্র' (১৯২২), 'চিত্র ও চিত্ত' (১৯৩১), 'হবিত্রী' (১৯৩৭), 'রূপ ও ধূপ' (১৯৩৮), 'সুরধুনী' (১৯৪১), 'পঞ্চপতি', 'কায়া ও ছায়া' (১৯৪১), 'আলো-আঁধারি' (১৯৪২), 'মণি ও দীপ' (১৯৪২ ?),[১০২] 'নামাবলী' (১৯৪৪), 'ভবন্তী' (১৯৪৫), 'বেলাবালুকা' (১৯৪৫)[১০৩] ; গল্পের বই— 'গল্পমাল্য' (১৯১৭), 'শাপমুক্তি' (১৯২৫), 'অবশেষে' (১৯২৮), 'পঙ্কজিনী' (১৯২৮) ইত্যাদি ; উপন্যাস— 'সুনীতি' (১৯১১), 'সুরেশের শিক্ষা' (১৯১২), 'দিবাস্বপ্ন' (১৯২৫), 'মায়ামৃগ' (১৯২৭), 'জয়ন্তী' (১৯৩২) ইত্যাদি ; নাট্যগ্রন্থ— 'মীরাবাই' (১৯১১), 'সতী' (১৯২৯)[১০৪], 'চ্যারিটি শো' (১৯৪১) ইত্যাদি। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' (১৯১৩) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মকাহিনী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে শুনিয়া লেখা, মূল্যবান্ রচনা। গদ্য প্রবন্ধাবলী— 'সাহিত্য-কথা' দুই ভাগ (১৯৪২-৪৩) ও 'সাহিত্যিকা' (১৯৪৫)।

'কায়া' ও 'ছায়া' হইতে নেওয়া একটি সনেট উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা হইতে তাঁহার কাব্যরচনাশৈলীর ঈষৎ পরিচয় পাওয়া যাইব।

নারী

বিশ্ব যদি নাহি দিত ভিক্ষা সেই দিন
তা হলে হয়ত মহী হত নারী হীন।
চন্দ্র দিল কান্তিকণা ভুজঙ্গ ভঙ্গিমা,
মৃগ দিল নেত্রশোভা, পুষ্প মধুরিমা,
নবতৃণদল দিল মরকত জ্যোতি,
লতা দিল রমণীয় নমনীয় মতি।
পালক লঘুতা দিল, বর্ণ সূর্যকর,
মেঘ দিল অশ্রুরাশি, শশ দিল ভর,
শিখী দিল রূপগর্ব, বায়ু চঞ্চলতা,
মধু দিল বিন্দু মধু, হীরা কঠোরতা।
ব্যাঘ্র দিল জিঘাংসা ও হিংসার আগুন,
তুষার দানিল চিত্তে হিম নিদারুণ,
বহ্নি দিল হৃৎপিণ্ড, মিথ্যা অঙ্গ রাগ,
নভ দিল নির্লজ্জতা, প্রেম বিষ ভাগ।

বিংশ শতাব্দী যখন শুরু হয় তখন ভারতী এবং সাহিত্য— এই দুইখানি মাসিকপত্রই প্রধান। দুইটিতে প্রবীণ ও নবীন কবিদের লেখা স্থান পাইত, তবে প্রবীণের স্থান ভারতীর আসরে বেশি, সাহিত্যের আসরে কম। সাহিত্যের আসরে প্রবীণ কবি বলিতে দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং অক্ষয়কুমার বড়াল। তরুণ কবিতা-রচয়িতাদের রচনা সাহিত্যের "কবিতাকুঞ্জ"-এ স্থান পাইত। পরবর্তী কালে কবিতা লিখিয়া যাঁহারা অল্পবিস্তর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই প্রথমে 'সাহিত্য' দরবারী ছিলেন,— সরোজকুমারী দেবী, প্রমীলা নাগ, বিনয়কুমারী বসু, সরলাবালা দাসী, রমণীমোহন ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ

দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, যতীন্দ্রনাথ বাগচী, বেনোয়ারীলাল গোস্বামী, মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ সোম ইত্যাদি।

কেহ কেহ কবিতা ও গল্প দুইই লিখিতেন, পরে কবিতা ছাড়িয়া গল্পলেখায় মন দেন। ইঁহাদের মধ্যে পড়েন সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬) (সরোজকুমারী দেবী নামে আরও একজন লেখিকা ছিলেন।) ও তাঁহার ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সরলাবালা দাসী (১৮৭৫-১৯৬১)[১০৫], হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬-১৯৬২)[১০৬], প্রকাশচন্দ্র দত্ত, মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ইত্যাদি। জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত সিভিলিয়ান ছিলেন, রমেশচন্দ্র দত্তের জামাতা এবং সাহিত্য-সম্পাদকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সাহিত্যে ইঁহার কবিতা ও গল্প কিছু বাহির হইয়াছিল। নাট্যগ্রন্থ 'মনীষা' (১৯১৯) ছাড়া ইনি সমসাময়িক নরম-গরম রাষ্ট্রীয় আন্দোলন লইয়া দুই অঙ্কেব 'পাষাণ প্রতিমা' (১৯৩১) নাটক লিখিয়াছিলেন। ঘটনাস্থল নিউদিল্লী। ভালো রচনা। তৃতীয় নাট্যরচনা 'কষ্টিপাথর'। 'স্মৃতি ও চিন্তা' (রচনাকাল ১৯৪২-৪৩) জীবনস্মৃতিব মতো। প্রকাশচন্দ্র দত্ত কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর স্বামী। ইনি কিছু গল্প লিখিয়াছিলেন। তাহা 'পঞ্চমুখী' (১৯০৪) বইটিতে সঙ্কলিত আছে। মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। যেমন, 'বঙ্গবধূ' (১৯২৩), 'বিয়ের বাঁধন' (১৯২৩), 'নারীর রূপ' (১৯২৭), 'মনের খেলা' (১৯২১) ইত্যাদি।

গিবিজাকুমার বসুর (১৮৮২-১৯৪৫) কবিতা ভারতী ও সাহিত্য ইত্যাদিতে বাহির হইত। ইনি দীর্ঘদিন ধবিয়া, জীবনের শেষ অবধি কবিতা লিখিয়াছিলেন। সে সবই প্রেমের কবিতা। স্বীয় বচনাসঙ্কলনে ইঁহার অত্যন্ত নিঃস্পৃহতা ছিল। সেইজন্য নিতান্ত ক্ষুদ্রকায় 'ধূলি' (১৯১০) ছাড়া আর কোন বই ইঁহার নাই। গিরিজাকুমার ১৩১৩ সালে 'বেণু' পত্রিকা বাহিব করিয়াছিলেন। নীচে প্রবাসী পত্রিকা হইতে গিরিজাকুমারের রচনার নিদর্শন দিতেছি।

ফাল্গুনে

এত কলি, এত মধু, এ গুঞ্জরণ
এত কেন বিচিত্র বরণ
আমাব দুয়াবে আজি আনিলে বল্লভ।
নিশিদিন নবীন পল্লব
দক্ষিণেব মৃদু বায়ে শিহরি সঞ্চরি
এই মোর মুগ্ধ হিয়া ভরি
এত কথা কেন কহে ? হে প্রিয় আমার
আনন্দের এত উপহার
সহিতে যে পারে না পরাণ ; গেছ ভুলি
কি ব্যথায় গেছে দিনগুলি

* * *

রাগ করিয়ো না, প্রিয়। এতদিন পরে
হে বাঞ্ছিত, এলে তুমি ঘরে
মোর তরে নিয়ে এলে করি আহরণ
কত বেশ, কত আভরণ

মরমের বীণাখানি যতনে সাধিয়া
কত সুরে আনিলে বাঁধিয়া
নাই মনে অপ্রশংসা তার ; সমারোহ
চিত্তে মোর জাগায়ো না দ্রোহ
শুধু ভয়, পাছে গুরু নৈবেদ্যের ভারে
হারাইয়া ফেলি দেবতারে। [১০৭]

বেনোয়ারীলাল গোস্বামীর (১৮৬০-১৯৩৮) কবিতা প্রথমে নব্যভারতে, পরে সাহিত্যে বেশি প্রকাশিত হইত। গোড়ার দিকে ইনি গম্ভীর কবিতাই লিখিতেন। পরে প্রধানত সরস কবিতা। তাহার পরিচয় কাব্যনামেই প্রকট—'খিচুড়ী' ও 'পোলাও' (১৯২৩)। অপর কাব্যগ্রন্থ 'কাব্যহার' (১৮৮১), 'বেণুবন' (১৯২৯) ইত্যাদি।

কিরণচাঁদ দরবেশের (১৮৭৮-১৯৪৬) কবিতা অনেক পত্রিকায় স্থান পাইত। ইঁহার কবিতার বই— 'গানের খাতা' (১৯১৪), 'সুসোমা' (১৯২০), 'মন্দির' (১৯২৫), 'রেবা' (১৯২৯) ইত্যাদি।

মানসী-ও-মর্মবাণীর গোষ্ঠীপতি নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৮-১৯২৫) সঙ্গীতে ও সাহিত্যে বিশারদ ছিলেন। ইঁহার পত্রিকায় ইঁহার গদ্যপদ্য রচনা প্রায় নিয়মিতভাবে বাহির হইত। কাব্যগ্রন্থ একটিমাত্র— 'সন্ধ্যাতারা' (১৯১৬)। গদ্যরচনা— 'নূরজাহান' (১৯১৭) ও 'শ্রুতিস্মৃতি' (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত)। নীচের কবিতাটি মানসী পত্রিকা হইতে নেওয়া।

ধরার উর্বশী ওগো মোর হৃদি-নন্দনের নারী,
বিচ্ছেদ বেদনা তোর চিরন্তন সহিতে কি পারি ?
ওগো মোর হৃদি কল্পলতা,
তোর চির বিরহের সুকঠিন ব্যথা,
সেই জানে।
মর্মবিদ্ধ কর যার দুর্নিবার আঁখির সন্ধানে।

* * *

মিলন-বাসর-শয্যা পাতি,
রত্নবাতি
জ্বালাইয়া, রয়েছি বসিয়া।
এস গো উর্বশী লক্ষ্মী, এস রতি, এস মোর প্রিয়া।
এস মোর প্রাণাধিক প্রিয়া,
জীবনের সব শূন্য নিজহাতে তুমি ভরে দিও। [১০৮]

নিরুপমা দেবী (১৮৯৫-১৯৮৪) কুচবিহার হইতে নবপর্যায় 'পরিচারিকা' পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন (১৩২৩-৩১ সাল)। ইঁহার কবিতার বই তিনটি— 'বসন্তমালিকা' (১৯১৬), 'ধূপ' (১৯১৮), ও 'গোধূলি' (১৯২৮)। গোধূলি নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। 'মানসী' হইতে নেওয়া একটি কবিতা হইতে রচনার নমুনা দিই।

দিবসের শ্রান্ত আলো বিধবার হাসি সম ম্লান,
নীড়ে ফেরা বিহগের বন্ধ হল আনন্দের গান।

মুমূর্ষুর আশা সম শেষ আলো পড়িয়াছে হেলি
সন্ধ্যাসতী নামে ধীরে অন্ধকারে অঞ্চলটি মেলি।
বিরহীর দীর্ঘশ্বাস কাঁপাইল স্থির তরু শির
বহিল সমীর।

* * *

যে কেঁদেছে সারাদিন সন্ধ্যাদেবী মুছাবে সে আঁখি
তাহার লেগেছে ধূলা সে ধূলা আপনি লবে মাখি,
শান্তিহারা হৃদয়ের ঝিল্লীরবে বলিবেরে 'ঘুমা'!
শোক-পাণ্ডু অধরেতে দিবে আঁকি কি নিবিড় চুমা,
আশ্রয়হীনেরে লবে কোলে তুলি, দিবে দোল ধীরে
স্নেহাঞ্চল ঘিরে।[১০৯]

ঠাকুর-বাড়ির লেখকদের মধ্যে দুইজনের নাম উল্লেখযোগা— হেমলতা (ঠাকুর) দেবী (১৮৭৪-১৯৪৫) এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫)। হেমলতা দেবী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া পত্নী। হেমলতা দেবীর কাব্যগ্রন্থ— 'জ্যোতি' (১৯১০) ও 'অকল্পিতা' (১৯১২); নাট্যপুস্তিকা 'শ্রীনিবাসের ভিটা' (১৯২৯); গল্পের বই 'দুনিয়ার দেনা' (১৯২০) ও 'দেহলী' (১৯৪০)। গদ্যরচনা 'মেয়েদের কথা' (১৯১৯) ও 'কল্পনা' (১৯৩৫)[১১০]।

একটি কবিতা হইতে হেমলতার রচনার কিছু নিদর্শন দিই।

দেয়ালী

ভালবেসে হাতে তুলি দিয়েছিলে কাজ
চুকায়ে যেতেছি তার সবটুকু আজ
মুহূর্তের তরে তারে করি নাই হেলা
পথে বসে করি নাই বিপথের খেলা।
কি হারাল কি খোয়াল কি হল সঞ্চয়,
পৃথিবীর পথে তার রবে পরিচয়।
পৃথিবী ছবিটি তার যতনে আঁকিবে
গগনে গগনে শুভ সংবাদ বহিবে।
বায়ু ছড়াইবে তারে দেশ হতে দেশে
পুষ্পিত ফলিত হবে ফুলে ফলে শেষে।
নিরন্তর বহি চলে চিরন্তন সুর
মাটির অন্তর ভেদি উঠাবে অঙ্কুর।
ছুঁয়ে যাব সুন্দরের নন্দন দেয়ালি
সুন্দরে অন্তরে ধরি প্রেম-দীপ জ্বালি।[১১০ক]

দিনেন্দ্রনাথের পরিচয় সঙ্গীতজ্ঞ, সুগায়ক এবং রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের ভাণ্ডারী রূপেই। ইনি গদ্য ও পদ্য দুই-ই লিখিয়াছিলেন। তবে পরিমাণে খুব অল্প। মৃত্যুর পরে ইঁহার কিছু কিছু রচনা গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। 'দিনেন্দ্র রচনাবলী' হইতে তাঁহার কবিতা-রচনাশৈলীর নমুনা দিতেছি।

সংগীত

ধরণীর মর্মে মর্মে রসের যে গোপন সঞ্চয়
সঞ্চারে পল্লবে পত্রে, নাহি অন্ত, নাহি তার ক্ষয়।
কুসুমে কুসুমে তাই কেঁদে মরে সুরভিত শ্বাস,
অন্তরের রসরূপ গন্ধে তাই করিছে প্রকাশ।
হৃদয়-অরণ্য মাঝে পথহারা শুধু ঘুরে মরে
বাসনা কামনা কত তাই, বেদনায় আঁখি ঝরে,
মহানন্দে হৃদয়ের মরা গাঙে দুই কূল ছাপি,'
নানা বাণী নানা বর্ণে তরঙ্গিয়া উঠিতেছে কাঁপি',
কত কাব্য কত ছন্দে সে আনন্দ ধরিছে মুরতি,
মন্দিরে মন্দিরে তাই বন্দনায় ধ্বনিছে আরতি ;
কত কথা বলা হল সৃজনের সেই আদি হতে
তবু যেন মনে হয় বলা নাহি হল কোনমতে,
ক্ষণে ক্ষণে তাই সুরে অর্থহীন বেদনায় ভরি
সেই কথা বলি যাহা বলা নাহি হল যুগ ধরি।

কুমুদনাথ লাহিড়ী দুইখানি কবিতা পুস্তিকার রচয়িতা— 'পাপ ও পুণ্য' (১৯০৯) ও 'বিল্বদল' (১৯১৩)।

কুমুদনাথের নীচের 'প্রেমভিক্ষা' কবিতাটি প্রবাসী পত্রিকা হইতে নেওয়া।

যে বেণু বাজায়ে রবি
খোলে দ্বার কমল-হিয়ার
সে বেণু বাজায়ে সখা
খোল মোর মবম-দুয়ার।

আঁধারের লীলা শেষ
যেন আজি দেখিবারে পাই,
আলোর রাগিণী দিয়ে
পরিপূর্ণ কর সব ঠাঁই।

আনন্দ—আনন্দ সব,
মুক্তিভরা যত অনুরেণু,
বুঝাও, বুঝাও, সখা,
বাজাইতে তব প্রেম বেণু।

সুধাকৃষ্ণ বাগচী 'জ্যোৎস্না'র রচয়িতা।

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ (১৮৮৭-১৯৬১) একখানি মাত্র কবিতাগ্রন্থ লিখিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের নাম 'অশ্রু' (১৯০৮)। 'আর্যাবর্ত' পত্রিকা হইতে তাঁহার কবিতা রচনার একটা নমুনা দিতেছি। কবিতাটির নাম 'তীর্থে'।

ভরপুর আজি গঙ্গার কূল ফুল চন্দন গন্ধে
পুণ্য লোলুপ বঙ্গনিবাসী চলিয়াছে মহানন্দে।

ঐ যে সূর্যে লেগেছে গ্রহণ চূড়ামণি যোগ আজ,
দলে দলে দলে চলে নরনারী ফেলিয়া শতেক কাজ।
সংসার ভেসে পড়িয়াছে এসে গঙ্গার দুটি কূলে,
ভরিয়া উঠেছে জাহ্নবীজল প্রদীপে পথে ফুলে ;
ডাকে ব্রাহ্মণ— "কে আছ কোথায় কর গো গঙ্গাস্নান,
আজ দানধ্যানে হও মুক্তহস্ত, লভিবে পরিত্রাণ।

* * *

সন্ধ্যা উষার মিলন বাসরে সজ্জিত করি কায়া
প্রীতি করুণায় মহা গরিমায় দাঁড়ায়েছে মহামায়া।
নামিয়াছ এসে, বালিকার বেশে, আঁধার করিতে দূর—
আজ, গঙ্গার জলে খুঁজিয়া মিলেছে তীর্থের কোহিনূর।

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কণা' (১৯১১) কবিতার বই। তাঁহার 'উৎসব' (বরিশাল, ১৯১২) রূপক নাটক। "ঘুমের দেশ, আমির দেশ, অন্ধকারের দেশ, যাত্রা, আলোকের দেশ— এই পাঁচটি দৃশ্যে নাটকটি সমাপ্ত।" রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। কয়েকটি গান আছে, ভালো রচনা। মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর কবিতার বই 'মানসকুঞ্জ' (১৯১২) ও 'কবিতাবাধনা' (১৯১৭) ; গল্প-উপন্যাসের বই 'হালদার-বাড়ী', 'নবীনের সংসার' (দ্বি-স ১৯২৮), 'দেশের বড়দা' (১৯১৭), 'শুভেন্দুর কলঙ্ক', 'জল প্লাবন', 'মিলনতীর্থ', 'সোনার বাঁধন' ইত্যাদি।

দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা মূল ফারসী হইতে সাদীর কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা অনুবাদ করিয়াছিলেন।[১১১] এগুলি প্রবাসীতে (১৩১৮-১৯ সাল) বাহির হইয়াছিল। সতীশচন্দ্র ঘটক (১৮৮৫-১৯৩২) কিছু সরস কবিতা লিখিয়াছিলেন, সেগুলি 'ঝলক' (১৯২৩) ও 'লালিকাগুচ্ছ' (১৯৩০) নামে প্রকাশিত। ইনি গল্পগ্রন্থ, সরস প্রবন্ধ ইত্যাদিও লিখিয়াছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী-লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৪-১৯২৭) দুইখানি "মহাকাব্য" লিখিয়াছিলেন— 'পৃথ্বীরাজ' (১৩২২) ও 'শিবাজী' (১৩২৮)। বাঙ্গালায় মহাকাব্য রচনায় ইহাই উল্লেখযোগ্য শেষ প্রচেষ্টা। যোগীন্দ্রনাথ একটি নাটকও লিখিয়াছিলেন, নাম 'দেববালা' (১৯১৫)।

ভারতীয় দর্শনে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫২) একদা রীতিমত কবিতার চর্চা করিতেন। ইঁহার প্রথম কবিতার বই 'নিবেদন' (১৯১১)। ইনি অলঙ্কার ও সাহিত্যবিচার বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

দেবকণ্ঠ বাগচী সুকণ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। ইনি কিছু গান ও সরস কবিতা লিখিয়াছিলেন, সেগুলি 'দেববীণা' (১৯১১) ও 'খেয়াল' (১৯১৩) নামে সঙ্কলিত। খেয়ালের সরস কবিতাগুলি মন্দ নয়। 'মুখবন্ধ' কবিতাটি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মনে যদি ভাব উঠে কে রাখে তা চেপে।
যে রাখে সে বোবা হয়— নয় যায় ক্ষেপে।
ভাষার পোষাক দিয়ে কেতাবের শেপে।

প্রকাশ করিনু তাই ভাবগুলা ছেপে ॥

দেবকণ্ঠ কয়েকখানি কৌতুক-গীতিনাট্যও রচনা করিয়াছিলেন— 'উজ্জ্বলে-মধুরে' (১৯১২), 'হেস্তনেস্ত' (১৯১৪), 'হুলুস্থুল' (১৯১৫) ও 'ছবির বাজার' (১৯১৮)। অত্যন্ত হালকা ধরনের রচনা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুসরণে হাসির গানে পরিপূর্ণ। বইগুলি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'তুষার' (এলাহাবাদ, ১৯১৮) সুমুদ্রিত কবিতার বই,—শীর্ষকহীন, ধারাবাহিক চতুর্দশপদীর সমষ্টি। পঞ্চাশ পাতায় পঞ্চাশটি কবিতা। কবিতার উপান্ত্য কবিতাটি উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত হইল।

ওগো আমি সেই গান,—সেই গান চাই
—উথলিল যে রাগিণী "এভনের" কূলে।
যে সঙ্গীতে সারা গৌড় মাতাল নিমাই—
—যে গান মথিত হ'ল ব্রজের গোকুলে!
ট্রয়ের পতন কথা ঘোষিতে জগতে
হুঙ্কারে উঠিল গান কাঁপায়ে "গিরীশ"
'নিঙাড়িয়া ভালবাসা' প্রতি জনপদে
উথলিল কবি-কুঞ্জে দোয়েলের শিস্,
যে গান শুনিল বঙ্গ মেঘের ঝঙ্কারে
প্লাবিয়া মিথিলা ভূমি করিল উর্ব্বর,
পাঞ্চালে উঠিল গান—ওঙ্কারে ওঙ্কারে
যে গানের 'গীতাঞ্জলি' অনন্ত নির্ঝর!—
সে গানের দু'টি ছত্র আজি সুপ্রভাতে—
দিতে যদি পারিতাম অনন্তের পাতে!

টীকা

১ অনুবাদ, উপন্যাস।
২ অনুবাদ, প্রবন্ধ।
৩ অনুবাদ, ছোট ছোট নাটা।
৪ নাটিকা।
৫ "পরমারাধ্যা মাতৃদেবী শ্রীমতী মহামায়া দত্ত পূজনীয়াসু"।
৬ 'সবিতা' হোমশিখার প্রথম কবিতারূপে অন্তর্ভুক্ত।
৭ 'সন্ধিক্ষণ' বেণু-ও-বীণার দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত।
৮ 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' (রচনাকাল আষাঢ়, ১৩০০), 'অক্ষয় বট', 'আলোকলতা', 'চিত্রার্পিতা', 'উল্কা', 'স্বর্ণগোধা', 'প্রবালদ্বীপ', 'আগ্নেয়দ্বীপ', 'ঝড় ও চারাগাছ' ইত্যাদি।
৮ক অক্ষয়-বট'।
৮খ 'হাসি-চেনা'।
৮গ 'দ্বিতীয় চন্দ্রমা'।
৮ঘ 'আলেয়া'।

৮ঙ 'দুর্যোগে'।
৮চ 'বর্ষায়'।
৮ছ 'কোন্ দেশে' ("বাউলের সুর")।
৮জ 'জ্যোৎস্নালোকে'।
৮ঝ 'মেঘের কাহিনী'।
৮ঞ'শিশুহীন পুরী'।

৯ হোমশিখার ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই কবিতাগুলি ১৩০৫ হইতে ১৩১৩ সালের মধ্যে রচিত।" 'সাম্য-সাম' সর্বশেষে লেখা বলিয়া মনে করি। সবিতার রচনাকাল ১৩০৫, সন্ধিক্ষণের ১৩১২। সন্ধিক্ষণ বিক্রয়ার্থ ছাপা হইয়াছিল। সবিতা আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে বিতরণের জন্য ছাপা হইয়াছিল। সেই কারণেই বোধহয় সন্ধিক্ষণ হোমশিখায় সঙ্কলিত হয় নাই।

১০ আটের কম ছত্রের স্তবকও আছে।
১১ পৃ ৪০-৪১।
১২ পৃ ৬১।
১৩ পৃ ১৪১-৪২।
১৪ তীর্থসলিলে ১৮০, তীর্থরেণুতে ২০৪, মণিমঞ্জুষায় ১৫৭।
১৫ "প্রাচীন বেদীর, পরে, নূতন সমিধ্ সাজাইয়া,—তীর্থজলে রচিয়া পরিখা,—"।
১৬ 'সমাপ্তে'।
১৭ 'জাতীয় সঙ্গীত (ভারতবর্ষ)'।

১৮ তীর্থসলিলে আছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের, স্বামী বিবেকানন্দের এবং সরোজিনী নাইডুর ; তীর্থরেণুতে আছে অরবিন্দ ঘোষের, তরু দত্তের ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের , মণি-মঞ্জুষায় আছে অরবিন্দ ঘোষের, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং তরু দত্তের কবিতা।

১৯ তানকা দুই রকমের। এক রকমে—তিন ভাগ, অক্ষরসংখ্যা পাঁচ, সাত, পাঁচ। আর এক রকমে—পাঁচ ভাগ, অক্ষরসংখ্যা পাঁচ, সাত, পাঁচ, সাত, সাত।

২০ পান্তুমে পূর্ববর্তী স্তবকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্র পরবর্তী স্তবকের যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় ছত্ররূপে পুনরাবৃত্ত।
২১ তীর্থ-রেণু।
২২ তীর্থ-রেণু।
২৩ মণি-মঞ্জুষা, 'জলটুঙি' (প্রথম প্রকাশ প্রবাসী আশ্বিন ১৩১৯)।
২৪ তীর্থ-রেণু।
২৫ মণি-মঞ্জুষা।

২৬ বইয়ে রচনাকালের উল্লেখ নাই। ইহাতে সত্যেন্দ্রনাথের অপর যে সব বইয়ের বিজ্ঞাপন আছে তাহা হইতে বোঝা যায় যে চীনের-ধূপ জন্মদুঃখীর পরেই বাহির হইয়াছিল। পুস্তিকাটি "কবি-বন্ধু ভাবসঙ্গী পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে" উৎসর্গিত।

২৭ তুলনীয় হাফেজ, "কায় বেখবর আজ ফস্ল্-ই গুল্ ও তবকে শরাব্" ; প্রথম চৌধুরী, "জীবনে ক'দিন আসে বসন্তের ঋতু ? ফস্‌লে গুল্‌মে ছি ছি ময়্‌সে তৌবা ?" (রচনাকাল ২৭ অক্টোবর ১৯১২)।

২৮ 'গান' (পৃ ২১)।
২৯ 'লতার প্রতি'।
৩০ 'হেমন্তে'।
৩১ 'কিশোরী'।
৩২ প্রথম প্রকাশ প্রবাসী আশ্বিন ১৩১৮।
৩৩ ফুলের-ফসলের 'ধারা' কবিতায় ইহার আভাস আছে।

৩৪ 'আবার', 'প্রভাতের নিবেদন', 'পরীক্ষা', 'পথের পঙ্কে', 'যথার্থ সার্থকতা', 'পিপাসী', 'সফল', 'অশ্রু', 'প্রার্থনা', 'ভিক্ষা', 'আকিঞ্চন' ইত্যাদি।

৩৫ প্রথম প্রকাশ প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।
৩৬ 'শূদ্র', 'মেথর', 'পথের স্মৃতি', 'দুর্ভিক্ষে', 'হাহাকার', 'নফর কুণ্ডু', ইত্যাদি।
৩৭ 'ঝোড়ো হাওয়ায়', 'বন্দরে', 'ছেলের দল', 'আমরা'।
৩৮ 'আমরা' (প্রথম প্রকাশ 'বাণী' জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮)।
৩৯ 'লব্ধ-দুর্লভ', 'প্রিয়-প্রদক্ষিণ', 'তুমি ও আমি', 'অকারণ', 'মুগ্ধা', 'কনক-ধুতুরা' ইত্যাদি।

৪০ 'সাড়ে চুয়াত্তর'।

৪১ 'সাড়ে চুয়াত্তর'।

৪২ 'যক্ষের নিবেদন' ১৩১৫ সালের ভারতী আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত, 'মেঘের প্রতি' ভাদ্র সংখ্যায়।

৪৩ 'ঝুলন' (সোনার তরী)।

৪৪ গীতাঞ্জলি (কবিতাসংখ্যা ৮)।

৪৫ 'তাজ', 'কবর-ই নূরজাহান্', 'ইমৎমদ্-উদ্দৌলা', 'বিশ্রাম-ঘাটে', 'বৃন্দাবনে' 'যমুনার জল', 'গুরু-দরবার', 'জাফরানের ফুল'।

৪৬ 'ইজ্জতের জন্য', 'মৃত্যু-স্বয়ম্বর'।

৪৭ 'ইজ্জতের জন্য'।

৪৮ 'সুধা ও ক্ষুধা'।

৪৯ 'সবুজ পরী'।

৫০ তুলনীয় ঋগ্‌বেদ ৫. ২৭. ৩।

৫১ মানসী কার্তিক ১৩১৬।

৫২ ইহার আগে কোন কোন প্রবন্ধে "নবকুমার দত্ত" নাম দেখিয়াছি। ইহাও সত্যেন্দ্রনাথের ছদ্মস্বাক্ষর।

৫৩ আসল মানে 'হাপব', তাহা হইতে ব্যঙ্গার্থ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

৫৪ 'হবফ-রিপাব্লিক'। তুলনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রেখাক্ষর বর্ণমালা'।

৫৫ 'কুক্কুটপাদমিশ্রের প্রশস্তি' ইত্যাদি।

৫৬ 'আদর্শ বিয়ের কবিতা' ইত্যাদি।

৫৭ প্রথম প্রকাশ প্রবাসী আষাঢ় ১৩২০।

৫৮ ভারতী চৈত্র ১৩১৬।

৫৯ প্রথম প্রকাশ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২।

৬০ প্রথম প্রকাশ ভারতী চৈত্র ১৩২৬।

৬১ সত্যেন্দ্রনাথ সুযোগমত প্রচলিত ছড়ার অংশ কবিতায় বুনিয়া দিতেন। এই ছত্রটি তাহার একটি ভালো উদাহরণ। চলিত ছড়ায় পাই

আতা গাছে তোতাপাখী ডালিম গাছে মৌ
কথা কওনা কেন বৌ।

৬২ বিদায় আরতি' (প্রথম প্রকাশ প্রবাসী কার্তিক ১৩২৩)।

৬৩ প্রথম প্রকাশ প্রবাসী চৈত্র ১৩২৭।

৬৪ প্রথম প্রকাশ ঐ ১৩২৮।

৬৫ 'হিন্দোল-বিলাস' (বিদায়-আরতি)।

৬৬ 'ময়ূর-মাতন' (বেলাশেষের গান)।

৬৭ 'বৈশাখের গান' (বিদায়-আরতি)। কবিতাটির ছন্দ রবীন্দ্রনাথের এই গান হইতে নেওয়া "মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।"

৬৮ '়ভারাই' (বেলাশেষের গান)।

৬৯ ভারতী বৈশাখ ১৩২৫।

৭০ অর্থাৎ (১) "গাঙ্গিনীতরণ পদ্ধতি" (গড়ানে, পয়ার), (২) "গঙ্গাযমুনা পদ্ধতি" (নাচুনে, নাচাড়ি), এবং (৩) "ঝর্ণা-ঝামর পদ্ধতি" (গড়ানে ও নাচুনে, ছড়ানে)।

৭১ সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' স্মরণ করিয়া এ কথা বলিয়াছিলেন।

৭২ ১৩৩৬ সালের কথা।

৭৩ কোন গ্রন্থে সঙ্কলিত হয় নাই এমন রচনা, যেমন—পীয়ার্সের (P. H Pearse) দি কিং : 'এ ময়্যালিটি'র অনুবাদ 'রাজা' (প্রবাসী আশ্বিন ১৩২২)।

৭৪ প্রথম প্রকাশ প্রবাসী কার্তিক ১৩১৯।

৭৫ ঐ প্রবাসী আশ্বিন ১৩২০।

৭৬ প্রথম প্রকাশ ভারতী ফাল্গুন ১৩৩৬ ; পুস্তকাকারে ১৯২৯।

৭৭ প্রথম প্রকাশ প্রবাসী কার্তিক ১৩১৯।

৭৮ অসম্পূর্ণ অংশটুকু (দশ পরিচ্ছেদ) সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রবাসীতে (আষাঢ়-কার্তিক ১৩৩০) বাহির হইয়াছিল।

৭৯ক ইংরেজীতে, "The camels, which had been left unmolested to make sal ammoniae."
৭৯খ সোলেমান দাকি, সোলেমান নিআন বিন গিআন, সেলেমান বিন দাউদ।
৭৯গ এই পর্যন্ত বেতিক-এ অনূদিত হয়েছে।
৭৯ঘ আ = আরব।
৭৯ঙ ফ = ফারসী।
৭৯চ আ. + ফ = আরবী-ফারসী।
৭৯ছ এখানে মুদ্রণাশুদ্ধি আছে। 'অভ্যুদ্‌যাত্রা' অবে?
৭৯জ হাত-পা ধোওয়া।
৭৯ঝ এই পর্যন্ত বাঙ্গালা।
৭৯ঞ ফারসী।
৭৯ট ফারসী ও সংস্কৃত।
৭৯ঠ সোঢ়ং।
৭৯ড সংস্কৃত।
৭৯ঢ ফারসী ও সংস্কৃত।
৭৯ণ "এই উভয় গ্রন্থই অনুবাদ করিবার ইচ্ছা আছে।"
৮০ 'বিরহ-কাব্য' (মানসী আষাঢ় ১৩১৭)। পূর্বে দ্রষ্টব্য।
৮১ 'আমার গান'।
৮২ 'ধরণীর প্রেম'।
৮৩ 'চরম প্রকাশ'।
৮৪ 'বিশ্বপরশ'।
৮৫ 'বীণাপাণি'।
৮৬ 'বিপর্যয়'। মুদ্‌গর = 'মোহমুদ্‌গর'; প্রবোধচন্দ্র = 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'।
৮৭ 'সেবা'।
৮৮ 'মায়া-বাসর' (প্রথম প্রকাশ ভারতী অগ্রহায়ণ ১৩২৬)।
৮৯ 'শ্রীক্ষেত্রে' (প্রথম প্রকাশ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৯)।

৯০ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গিত। "পরিপাটি ছাপা, গরদেব বাঁধাই" এই বইটি 'ভারতী'তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬) প্রশংসিত হইয়াছিল।

৯১ গান (প্রথম প্রকাশ প্রদীপ ভাদ্র ১৩০৭)।
৯২ "জন্মভূমি (পল্লীর ছবি)' ভারতী আষাঢ় ১৩১৬।
৯৩ 'মঞ্জুর' (বক্কুর-দান)।
৯৪ 'উদাসী' (নীহারিকা)।

৯৫ 'দুঃখবিবাদী' ("কবিবন্ধু-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখবাদী কবিতার ব্যঙ্গোত্তর"), নীহারিকা। যতীন্দ্রনাথের কবিতাটি 'মরুশিখা'র (১৩৩৪ সাল) অন্তর্গত। নীহারিকা যতীন্দ্রনাথকে উৎসর্গিত, মরুশিখা যতীন্দ্রমোহনকে।

৯৬ চিত্রকরের খেদ (প্রথম প্রকাশ সমালোচনী ১৩০৯ নবম সংখ্যা)।
৯৭ 'ভুঁই-চাপা' (প্রথম প্রকাশ ভারতী ফাল্গুন ১৩২৬)।
৯৮ কুন্দের কতকগুলি ও কিশলয়ের প্রায় সকলগুলি লইয়া 'বল্লরী' কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল।
৯৯ ভারতী ফাল্গুন ১৩১৮।
১০০ 'পল্লীব ঘাটে' (পর্ণপুট)।
১০১ 'বুলবুলি, (ভারতী শ্রাবণ ১৩২৬)।
১০২ শিশুকবিতা।
১০৩ অটোগ্রাফ রূপে দেওয়া কবিতা।
১০৪ ছেলেমেয়েদের অভিনয় উপযোগী।
১০৫ কাব্যগ্রন্থ 'প্রবাহ' (১৯০৪) ও 'অর্ঘ্য' (১৯১৫), গল্পের বই 'চিত্রপট' (১৯১৭) ইত্যাদি।

১০৬ ইনি ছিলেন, দাসী ও 'আর্যাবর্ত'এর সম্পাদক. সাহিত্য-সম্পাদকের বন্ধু ও সাহিত্যগোষ্ঠীর যোদ্ধা-লেখক, প্রায় পঁচিশখানি উপন্যাস-গল্পগ্রন্থের প্রণেতা।

১০৭ প্রবাসী পত্রিকা হইতে।

১০৮ 'এস' ।
১০৯ সন্ধ্যা ।
১১০ নেপালে বঙ্গনারী' (১৯১১) সুপাঠ্য ভ্রমণবৃত্তান্ত, অপর এক হেমলতা দেবীর মৃত্যু (১৯৪৩) রচনা ।
১১০ক প্রবাসী পত্রিকা হইতে ।
১১১ পরে শেখ হবিবর রহমান অনুবাদ করিয়াছিলেন 'বুস্তা' (১৯৩২) ও 'গুলিস্তাঁ' (১৯৩৩) ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ
অভিনব—'ভারতী'

১ উপক্রম : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩১৫ সালে ভারতীর সম্পাদন ভার স্বর্ণকুমারী দেবী কন্যার হাত হইতে গ্রহণ করিলেন এবং পত্রিকাব আকার পূর্বের মতো বড় (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভার নেওয়ার আগে যেমন ছিল) করিলেন। এখন আবার ঝোঁক পড়িল গম্ভীর রচনার দিকে।

প্রথম প্রকাশের দিন হইতেই 'ভারতী' পত্রিকা নূতন ও তরুণ গদ্যলেখকদের প্রতি আনকূল্য কবিয়া আসিয়াছিল। বর্তমান শতাব্দীর বহু শ্রেষ্ঠ ও কৃতী লেখক ভারতীর আসবে ভব কবিয়াই সৃষ্টিসার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)। ইনিই ছিলেন ভারতীর আসরে উপান্ত্য পালার মূল অধিকারী। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে ভারতীকে আশ্রয় করিযা যে-সাহিত্য-গোষ্ঠী জমিয়াছিল তাহার চৈত্ত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং দীক্ষাগুরু অবনীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ যেমন অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে লেখ্যকর্ম হইতে চিত্রকর্মে পৌঁছিয়াছিলেন অবনীন্দ্রনাথও অনেকটা তেমনি ভাবেই চিত্রকর্ম হইতে লেখ্যকর্মে পৌঁছান। চিত্র ও লেখ্য দ্বিবিধ কর্মেই অবনীন্দ্রনাথের রূপদক্ষতার নিজস্ব, অসাধারণ পরিচয় পরিস্ফুট। রূপচিত্র এবং রূপকথা দুই-ই অবনীন্দ্রনাথ প্রায় একই সময়ে শুরু করিয়াছিলেন, এবং রূপচিত্রে সিদ্ধিলাভ করিবার আগেই রূপকথায় তাঁহার সিদ্ধি লব্ধ হইয়াছিল।

অবনীন্দ্রনাথ রাজপুত-কাহিনীতে যে নূতন রস সঞ্চারিত করিলেন সে হইল চিত্রশিল্পীর তুলির টানে উপজাত রেখা ও রঙের রূপরস। মোগল ও রাজপুত মিনিয়েচার চিত্র হইতেই বোধকরি অবনীন্দ্রনাথ রাজপুত-কাহিনীতে কৌতূহলী হইয়াছিলেন। রাজপুত-নারীর বিচিত্র বেশ, রাজপুত-পুরুষের ধৈর্য ও বীর্য এবং পূর্বাগত দেশপ্রেমের উদ্দীপনা ত ছিলই। অবনীন্দ্রনাথ ইহার আগে ভারতমাতার ও বঙ্গমাতার চিত্র

আঁকিয়াছিলেন। সে চিত্র সেন্টিমেন্টাল ও অবান্তর। এখন তিনি ভারতীয় শিল্পরসের সূত্রে ভারতবর্ষকে অতীত ইতিহাসের মধ্যে খুঁজিতে লাগিলেন। সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন তেমন ঘটে নাই যেমন ঘটিয়াছিল শিল্পে—চিত্রকলায় ও স্থাপত্যে। অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সত্যপথেরই সন্ধান পাইয়াছিল।

মেয়েলি ছড়া ও ব্রতকথার সংগ্রহে ও সৌন্দর্যবিশ্লেষণে আদিকর্মিক রবীন্দ্রনাথ। তাঁহারই প্রদর্শিত এই পথ অবনীন্দ্রনাথ অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রূপশিল্পী মন এই পথে নব নব সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ ও প্রদর্শন করিয়া চলিয়াছিল। (অবনীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়গ্রাহ্য বিদ্যায় মোটেই অনুরাগী ছিলেন না। ছেলেবেলায় ঘরে শোনা গল্পে ও ছড়ায় তাঁহার মন অভিষিক্ত ছিল। তাঁহার অঙ্কন-শিল্পপ্রতিভার সহযোগী ছিল তাঁহার সাহিত্য প্রতিভা।) পুরানো রূপকথা-কাহিনীকে নূতন রঙে রঞ্জিত করিয়া অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যের দরবারে প্রথম দেখা দিলেন 'শকুন্তলা' লইয়া (১৮৯৫)। শীঘ্রই 'ক্ষীরের পুতুল' বাহির হইল (১৮৯৬)। একালের ও সেকালের রূপকথা দুইটির নবজন্ম হইল। মেয়েলি আলপনা চিত্রের সন্ধানে অবনীন্দ্রনাথ ব্রতকথার অন্দরমহলে হানা দিলেন এবং তাহার ফলে পাওয়া গেল 'বাংলার ব্রত' (১৯১৯)। তাহার পর মোগল-রাজপুত চিত্রকলার অনুশীলনসূত্রে আধুনিক ভারতীয় শিল্পের আদি সিদ্ধাচার্য রাজপুত-কাহিনীতে পৌঁছিলেন।[১] অল্পবয়সীদের উপলক্ষ্য করিয়া লেখা তাঁহার 'রাজকাহিনী'র (১৯০৯)[২] গল্পগুলি নূতনতর মাধুর্যের প্রবাহপথ খুলিয়া দিল।

অবনীন্দ্রনাথের লেখায় চলিত ভাষার সহজ ভঙ্গির সরল প্রকাশ। তবে গোড়ার দিকে তাঁহার গম্ভীর রচনায়, বিশেষ করিয়া শিল্পতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধে, অনেক সময় সাধুভাষা অবলম্বিত হইয়াছে। এই ধরনের রচনার মধ্যে প্রথম হইতেছে 'দেবী প্রতিমা'।[৩] প্রবন্ধটির ভাষায় যেন বাণভট্টের মুরজনির্ঘোষ প্রতিধ্বনিত। যেমন

> যে রাত্রে আমার গৃহদ্বারে, মুকুলিত রসালের সুরভিত পল্লবশয়নে, মধুমত্ত বধূসহায় পরভৃৎ, তাহার মধুকষায় পঞ্চমস্বর সুপ্তজগতে বারম্বার কুহরিত করিল ;—যে রাত্রে, তোমার নববিরহে অতিবিকল আমার নিদ্রাহীন নেত্রদ্বয় নববসন্তের মলয়চুম্বনে সুখালসে নিমীলিত হইল, সেই রাত্রে হে বঞ্চনা, হে তরুণী তন্বঙ্গী, আমার শিশিরকাতরা ভীরু বিহঙ্গী, তুমি দেশান্তরে, নীলাম্বুচুম্বিত সিন্ধুতীরে, তোমার সেই উত্তরে রোপিত তমালশ্রেণী, দক্ষিণে বিস্তৃত পুষ্পকুঞ্জের মধ্যস্থলে, অগুরুবাসিত আতপগৃহে, শিশিরভয়ে নিবিড়বিলম্বিত স্থূল যবনিকার পটান্তরে বাতায়নশ্রেণী অবিচ্ছেদে রুদ্ধ করিয়া এবং অবিরলবিস্তৃত লোম-কোমল আস্তরণে গৃহতলের তুহিনতা হরণ করিয়া দিবারাত্রি কখন সঙ্গীতচর্চায়, কখন কাব্যালাপে কখন বা মৃগচর্মনির্মিত তপ্তশয্যায় অলসলুণ্ঠিত দেহে কনকপাত্রে অনলোজ্জ্বল মদিরা পানে সমস্ত শিশিরকাল বঞ্চনা করিয়া আমাদের দেবদারুচ্ছায় নিবিড় উত্তর জনপদে তোমার জলরাশিবেষ্টিত কুঞ্জভবনে আরবার ফিরিয়া আসিবে।

সে বছর ভারতীর সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার লেখনীস্পর্শ রচনাটিতে অবশ্যই আছে। তবে সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্রের পক্ষে রচনার এমন রীতি সুসঙ্গত।

অবনীন্দ্রনাথের যে নিজস্ব রচনারীতি তাহার মূল কথ্যভাষার নিতান্ত সরল মেয়েলি ঢঙে, কিন্তু তাহার সমস্ত শক্তি ও সৌন্দর্য লেখকের শিল্পী-মানসের সংবেদনশীল সূক্ষ্ম ও

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভব হইতেই আসিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের রচনার বিষয় ও ভাষা পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া এমন অখণ্ড রূপ পাইয়াছে যে বিশ্লেষণ করিয়া রচনার অবয়ব দুটিকে পৃথক করিয়া দেখানো যায় না। অবনীন্দ্রনাথের লেখাকে সত্যসত্যই বলিতে পারি "তুলির লিখন"।

২ শিল্প-অনুশীলন

অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা স্বয়ংগৃহীত। বাল্যে নর্মাল ইস্কুলে কিছুদিন পড়িয়া অবনীন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সেখানে উনিশ বছর বয়স অবধি পড়েন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বেই তাঁহার পাঠ সাঙ্গ হয়। সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগের কাহিনী অবনীন্দ্রনাথের নিজের কথায় বলি।

> ...কলেজের গায়ে অমন যে গোলদীঘির সবুজ ঘাস, ফুলগাছ-দেওয়া বাগান, সেটার দিকের প্রবেশ-পথের জানলাগুলো, গরাদ-আঁটা ফাটকের তালা কাউকে খুলে দিতে দেখিনি, কাজেই কাঁচা বয়সেই কলম-সরস্বতীর একটা চমৎকার বন্দনা লিখে বিদ্যামন্দিরের এনট্রানস থেকেই সরে পড়তে আমি একটুকুও লজ্জাবোধ করিনি। বরং উৎসাহই দেখিয়েছিলেম। বন্দনাটা সব মনে নেই ; কিন্তু মনে আছে হেড-মাষ্টারের কাছে সেজন্যে খুব তারিফ পেয়েছিলেম।
>
> "এসো মা হৃদয়ে বসো,
হৃদি আঁধার নাশো।
দয়া কর আমারে মা, আমি ক্ষুদ্র প্রাণী !!"
>
> এটা আমার উনিশ বছরের original composition,...উনিশ বছরে নিজেকে ক্ষুদ্র প্রাণী বোলে জ্ঞান করছি জেনে তোমরা মনে-মনে নিশ্চয় হাস্‌ছ। কিন্তু ভেবে দেখো ক্ষুদ্রপ্রাণী না হ'লে বিদ্যার জাঁতিকলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়া আমার পক্ষে কতটা শক্ত হতো ![৪]

সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া দিয়া অবনীন্দ্রনাথ যন্ত্র-সঙ্গীতের চর্চায় রত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথায়

> কলমের চারা বাগানের Glass House ছেড়েই আমার সঙ্গীতের তালগাছের দিকে নজর পড়ল। আমি তারি ছায়ায় যতটা তালগাছের দেওয়া সম্ভব, সেইখানেই বোসে তাল-সরস্বতীর ঢোলের পিঠে আর-একবার তাঁর বীণার তারেও বাঁ-হাত বোলাতে সুরু করলেম। উনত্রিশ পর্যন্ত এইভাবে বাঁ-হাতে তানসেনের তাল-সরস্বতীর সেবা চলেছিল। ফল কিন্তু পাইনি।

ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার ঝোঁক ছিল চিত্রাঙ্কনের দিকে।[৫] সঙ্গীত-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্কনেরও অনুশীলন হইতে লাগিল। তখনকার রীতি অনুযায়ী তিনি আর্টের অনুশীলন করিতে লাগিলেন ইংরেজ শিল্পী-শিক্ষকের কাছে। এই সময়ে আঁকা ছবিগুলিতে বিলাতী ঢঙের অনুসরণ দেখি। তাঁহার বয়স যখন পঁচিশ বছর (১৮৯৮) তখন দৈবক্রমে তাঁহার হাতে আসে তাঁহাদেরই পৈতৃক সংগ্রহের একখানি গ্রন্থ যাহাতে মোগল বাদশাহের আমলে আঁকা অনেক ছবি ছিল। এই ছবিগুলি দেখিয়াই তিনি পাশ্চাত্য রীতি পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় চিত্রাঙ্কনরীতি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন। সেই ইচ্ছার অনুসরণ ক্রমেই আধুনিক ভারতীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। অবনীন্দ্রনাথের নূতন শিল্পসৃষ্টি গভর্নমেন্ট শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হ্যাভেল-এর (E. B. Havell) নজরে পড়ে। তিনি অবনীন্দ্রনাথকে আর্ট কলেজে ভারতীয় শিল্পের শিক্ষকরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার এবং

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু, বেঙ্কটাপ্পা প্রমুখ তাঁহার আদি শিষ্যবর্গের সাধনায় ভারতীয় চিত্রকলার মর্যাদা অচিরে সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

শিল্পানুরাগ, ফারসী-প্রিয়তা, ও আধুনিকতার উপর রোমান্‌সের ছোঁয়া—ভারতী-আসরের লেখকদের এই তিনটি মূলসূত্র অবনীন্দ্রনাথেরই দেওয়া।

৩ রচনাবলী

মোগল-রাজপুত চিত্রের অনুধাবনপথে অবনীন্দ্রনাথ পৌঁছিয়াছিলেন রাজপুত-কাহিনীতে। রূপকথার স্বতঃস্ফূর্তির সঙ্গে কথকতার মনোহারিতা জড়িত হইয়া কাহিনীগুলি নূতন রসেব স্বাদ বহন করিয়া আনিল। (দুই খণ্ড রাজকাহিনীতে সঙ্কলিত। বুদ্ধের সমযকার কাহিনী নালকও এই পর্যায়ের রচনা।) অবনীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্যিক রচনার মতো এগুলিও শিশুপাঠের ভঙ্গিতে লেখা, তবে এগুলির রসগ্রহণও পাঠকের বয়সের উপর নির্ভরশীল নয়।

রাজপুত-কাহিনী হইতে অবনীন্দ্রনাথ অচিরে পৌঁছিলেন ইতিহাসের ঝালব-দেওযা রোমান্‌স-রূপকথার মায়ামণ্ডপে। ১৯১১ অব্দে অবনীন্দ্রনাথ একবার পুরী হইতে কোনাবকে গিয়াছিলেন। বছর তিন-চার পরে সেই নৈশ নিরুদ্দেশযাত্রাব স্মৃতি-সূত্র অবলম্বনে[৬] মেয়েলি আলাপ ছেলেমি প্রলাপ ছড়ার বাক্‌ছন্দ ও রূপকথার রঙ মিশাইয়া অদ্ভুত-কৌতুকবসের, স্বপ্ন-জাগরণের, সম্ভব-অসম্ভবেব, অতীত-বর্তমানের বহু-আযতন ও বিচিত্রবর্ণ মায়াপট (ইংরাজীতে যাহাকে বলে fantasy) বুনিলেন—'ভূতপত্‌রীর দেশ' (১৯১৫)[৭]। এই অসামান্য অসাধারণতার জন্যই বোধ কবি বইটি উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। তাই বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া এখানে সঙ্গত মনে করিতেছি।

'ভূতপত্‌রীর দেশ'-এর কাহিনীর নায়ক—অর্থাৎ লেখক—মাসিপিসি দুজনেরই নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। আগে বনগাঁ-বাসিনী মাসির বাড়ি গিয়া সেখানে যথেচ্ছ মোয়া খাইয়া পেট ধামা করিয়া তাহার পর পাল্‌কিতে শুইয়া চলিয়াছেন পিসির দেশে যেখানে তিনি আগে কখনো যান নাই—"তেপান্তর মাঠের ওপারে সুমুদ্দুরের ধারে, বালির ঘরে"। যাইবার সময় "মাসি চাদরের খুঁটে খই বেঁধে দিয়েছেন—পথে জল খেতে; হাতে একগাছা ভূতপত্‌রীর লাঠি দিয়েছেন—ভূত তাড়াতে, এক লণ্ঠন দিয়েছেন—আলোয় আলোয় যেতে।" রাত দুপুরে ভূতপত্‌রীর মাঠ দিয়া পাল্‌কি চলিয়াছে। মাঠের মধ্যে শেওড়া গাছের ঝোপ ও ঘোড়ার গোর পার হইলেই তেপান্তর মাঠ শুরু; "তারপরে আর হাটও নেই বাটও নেই,—কেবল মাঠ ধু ধু করছে।" শেওড়াতলায় ঘোড়া ভূতের উপদ্রবে নায়ক নাস্তানাবুদ হইলেন। বীর-বাতাসের চোটে পাল্‌কি আপনি উড়িয়া চলিল, বেহারাদের সন্ধান রহিল না। পাল্‌কি আটকাইল গিয়া বুড়ো মনসা গাছের তলায়। বুড়ো মনসা গাছ, "মাথায় তার হলদে চুল, বড় বড় কাঁটার বঁড়শী ফেলে বালির উপরে মাছ ধরছিল। মনসা বুড়োর ছিপে মাছতো পড়ছিল কত! কেবল রাজ্যের খড়কুটো আর পাখীর পালক হাওয়ায় ভেসে এসে বুড়োর বঁড়শীতে আটকা পড়ছিল।" মনসা বুড়ো প্রথমে মনে করিয়াছিল তাহার বঁড়শীতে বুঝি মাছ গাঁথা পড়িয়াছে। তাহার উল্লাস থামিল ভূতপত্‌রীর লাঠির খোঁচা খাইয়া। পাল্‌কিটা সোজা করিয়া জিনিসপত্র গোছাইয়া নায়ক অপেক্ষা করিতেছেন

বেহারাদের জন্য, সেই অবসরে মনসা বুড়োর কথাবার্তাও চলিতেছে। মনসা বুড়ো নিজের ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল।

> আমরা মনসাদেবীর বরে চিরকাল নানা রকম স্বপ্ন দেখি। এইখানটিতে কতকাল যে বসে আছি তার ঠিক নেই। ছিপ নিয়ে মাছ ধরছিলুম জলের ধারে—আজ সে কতকালের কথা ; সে নদী শুকিয়ে, জল সরে, চড়া পড়ে গেছে কিন্তু এখনও ঝোঁক কাটেনি ; মনে হচ্ছে নদীর ধারেই বসে মাছ ধরছি! আমার বেশ মনে পড়েছে এইখানেই একঘর গয়লা থাকত আর ঠিক তাদের ঘরের কোণে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ ছিল, এখন তবে সেগুলো গেছে ?

কথা কহিতে কহিতে বেহারারা আসিয়া পড়িল। পাল্‌কি চলিল। হঠাৎ নায়কের সন্দেহ হইল ইহারা মানুষ নয় ভূত। অমনি ভূতপত্‌রীর লাঠির কথা তাঁহার মনে পড়িল। মনে পড়িতেই বেহারারা পাল্‌কি ফেলিয়া পলাইল। নায়ক অগত্যা পাল্‌কির ভিতরে চাদরমুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ঘুমাইয়া পড়িয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন পাল্‌কিসুদ্ধ চাঁদের দেশে চলিয়া গিয়াছেন। ঘুম ভাঙ্গিতে দেখিলেন এক হাঁটুজল নদীর ধারে পৌঁছিয়াছেন। কাজেই ছিল জনমানবশূন্য গাঁ। সেখানে একটা ঘরের দাওয়ায় চাদর মুড়ি দিয়া নায়ক শুইয়া পড়িলেন। বেহারারা আসিয়া ঘুম ভাঙ্গাইল। তাহার পর আবার যাত্রা—"বেশ আরামে পাল্‌কিতে দরজা খুলে ঘুম দিতে দিতে"। "চার ভূতে চার সুরে চিঁচিঁ, পিঁপিঁ, খিট্‌খিট্‌, টিক্‌টিক্‌, করে গান গাইতে গাইতে চলেছে,—ঠিক যেন কতদূর থেকে চিল ডাক্‌ছে, আর কোলা-ব্যাং কট্‌কট্‌ করছে।" ভোর তিনটার সময় পাল্‌কি পৌঁছিল খেজুরতলায়। "এই খেজুরতলা পর্যন্ত ভূত আসতে পারে, তার ওদিকে বামচণ্ডীতলা, সেখানে রামসীতা বসে আছেন, হনুমান, জাম্ববান পাহারা দিচ্ছে, ভূতের আর সেখানে যাবার জো নেই। ভূতপত্‌রীর লাঠিরও জোর সেখানে খাটবে না।" রামচণ্ডীতলা একেলা হাঁটিয়া গিয়া অনেক কষ্টের পর মন্দিরে রামসীতা দর্শন করিয়া একটা কাঁটাবন পার হইয়া নায়ক সমুদ্রে গিয়া পৌঁছিলেন। দেখা গেল সেখানে ছয়টা বেহারা সেই পাল্‌কি লইয়া বসিয়া আছে,—"দেখতে কালো কিচ্‌কিন্দে"। ইহারা নায়কের পিসির চাকর—কিচ্‌কিন্দে, কাসুন্দে, বাসুন্দে, ঝালুন্দে, মালুন্দে ও হারুন্দে। চারিজন পাল্‌কি বহিয়া চলিল, পাল্‌কির দুইধারে দরজা ধরিয়া চলিল হারুন্দে ও কিচ্‌কিন্দে তাঁহাকে নিজেদের কাহিনী শুনাইতে শুনাইতে।

> হারুন্দের মাথায় কালো চুলের উঁচু ঝুঁটি আর কিচ্‌কিন্দের মাথায় পাকাচুলের শণের নুটি। হারুন্দে ফরসা, কিচ্‌কিন্দে কালো মীস,—যেন বাংলা কালি! হারুন্দের চুল যেন বালির উপরে মনসা গাছ—খাড়া খাড়া, খোঁচা খোঁচা, আর কিচ্‌কিন্দের চুল যেন সমুদ্দুরের সাদা ঢেউ—হাওয়ায় লটপট করছে—কিচ্‌কিন্দের মাঠটাও দেখছি খানিক সাদা, খানিক কালো—খানিক আলো,—খানিক অন্ধকার, একদিকে ধপ্‌ধপ্‌ করছে শুকনো বালি আর একদিকে টলমল্‌ করছে কালো জল—নুনে গোলা। মাঠ দিয়ে চলেছি, না সাদা-কালো মস্ত একখানা সতরঞ্চির উপর দিয়েই চলেছি।
>
> আমার বাঁদিকে কেবল বালি—সাদা ধপ্‌ধপ্‌ করছে বালি, আমার ডানদিকে রয়েছে কালি-গোলা সমুদ্দুর—কালো—কাজলের মত কালো,—বাঁয়ে চলেছে হারুন্দে—ডাঙার খবর দিতে দিতে, ডাইনে চলেছে কিচ্‌কিন্দে—জলের আদি-অন্ত কইতে কইতে ; আমি চলেছি পালকিতে শুয়ে মনে মনে দুজনের দুটো গল্প সাদা একটা শেলেটের উপর কালো পেনসিল

দিয়ে লিখে নিতে নিতে। কিচ্‌কিন্দের গল্পটা জলের কিনা তাই সেটা লিখে নিতে নিতেই ধুয়ে মুছে গেছে, একটুও পড়া যাচ্ছে না। কিন্তু হারুন্দের গল্পটা বালির আঁচড়ের মতো একেবারে শেলেটে কেটে বসে গেছে,—ধুলেও ওঠে না, মুছলেও যায় না,—বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে।

হারুন্দে আর কেউ নয়, ছদ্মবেশী হারুন-অল্‌-রশীদ্‌, বোগদাদের নবাব খাঞ্জা খাঁ জাহান্দার শা বাদশা—যাঁহার কাহিনী আরব্য-উপন্যাসে সকলের পড়া আছে, যাঁহাকে আবুহোসেনের থিয়েটারে সকলের দেখা আছে, যিনি কখনো সদাগর সাজিয়া বেড়ান, কখনো ফকির সাজিয়া, কখনো কাফ্রি ভৃত্য সাজিয়া। এখানে তিনি দেখা দিয়াছিলেন পাল্‌কি-বেহারার সাজ পরিয়া। হারুন্দের মুখে নায়ক যাহা শুনিলেন তাহা আরব্য-উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনা সুতরাং আরব্য-উপন্যাসে তাহা নাই। এবারেও তাঁহার এড্‌ভেঞ্চার সিন্দবাদের এক জাহাজডুবির উপসংহাররূপে শুরু।

সিন্দবাদ এক-সিন্দুক হীরা-জহরত লইয়া জাহাজে করিয়া আসিতেছিল বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষিয়া। কোনারকের কাছাকাছি আসিলে মন্দিরচূড়ায় যে চুম্বক পাথর ছিল তাহার আকর্ষণে জাহাজের লোহার পেরেক সব ছুটিয়া গেল, জাহাজও খণ্ড খণ্ড হইয়া ডুবিয়া গেল। লোহার সিন্দুক গিয়া ঠেকিল মন্দিরচূড়ায়। সিন্দবাদ কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে ফিরিল।

গল্প শুনিয়া হারুন-অল্‌ রশীদ লোহার সিন্দুকের খোঁজে মসুরকে সঙ্গে লইয়া ম্যাজিক সতরঞ্চিতে বসিয়া নানা দেশ দেখিতে দেখিতে চলিলেন হিন্দুস্থানে। দিল্লীতে তাঁহাকে একটু সামান্য লড়াই করিতে হইয়াছিল। লাহোরে ঔরঙ্গজেবের পাগ্‌ড়ির হীরা ছিটকাইয়া পড়িয়া নিদ্রিত রণজিত সিংহের একটা চোখ নষ্ট করিয়া দিল।

> এদিকে ঔরঙ্গজেবটা তার খালি মাথায় হাত বোলাচ্ছে, ওদিকে রণজিত সিং একগাল হাসতে হাসতে কোহিনুর হীরেটার দিকে একচোখে চেয়ে আছে, আর আমরা সতরঞ্চি চালিয়ে একেবারে আগ্রায় এসে হাজির। দেখি তাজবিবির কবরটায় চারিদিকে বুড়ো সাজাহানটা কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সেখান থেকে সোজা ফতেপুরশিক্‌রির দিকে সতরঞ্চ চালিয়ে দিলুম। আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু আকবর সেখানে পঞ্চমহলের উপরে বসে চতুরং খেলায় মত্ত ছিলো। আমাকে দেখে ভাবি খুসি। "এসো ভাই বোগদাদি।"—বলে আমাকে পাশে বসালো! তার সঙ্গে এক-পাঠশালায় পড়া, তাই সে আমাকে বলে বোগদাদি, আমি তাকে বলি আগরওয়ালা।

আকবরের অনুরোধমত হারুন-অল্‌-রশীদ এলাহাবাদে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা করিলেন। নুরজাহানকে ঠেকাইয়া দিয়া জাহাঙ্গীর গা-ঢাকা দিলেন। নুরজাহানকে হারুন সাবধান করিয়া দিলেন জাহাঙ্গীরকে সামলাইয়া চালাইতে হইবে।

এলাহাবাদ হইতে কলিকাতা। সেখান থেকে পুরী এবং সিন্দুকের অন্বেষণ। দেখা গেল সিন্দবাদও সিন্দুকের খোঁজে সেখানে হাজির। কিন্তু সিন্দুক যেখানে পোঁতা আছে সে নামটা আর কিছুতে মনে পড়ে না।

> এমন সময় কিচ্‌কিন্দে হারুন্দের মুখ বন্ধ করিয়া দিল, শোনো কেন বাবু ও পাগলের কথা। ও চিরকালই হারুন্দে, কোনো কালে হারুন-আল্‌-রশীদ নয়। ওর বাপ ওকে লেখাপড়া শেখাতে কলকাতায় পাঠিয়েছিল। সেখানে পৃথিবীর ইতিহাস, পারস্য-উপন্যাস আর ডিটেক্‌টিভের গল্প

পড়ে পড়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। খেয়াল চাপলেই সেই পড়াগুলো আওড়ায়। কখনো একটুক্‌রো ইতিহাস, কখনো উপন্যাস, দু'ছত্তর বা কবিতা, দুটো বা সত্যি কথা, দশটা বা মিছে কথা।

হারুন্দেকে টেক্কা দিয়া কিচ্‌কিন্দে শুরু করিল সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই চার যুগের গল্প, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কাহিনী। তাহার সঙ্গে উড়িয়া কবিতা আবৃত্তি ও গান এবং বাঁশি বাজানো। কিচ্‌কিন্দের বাঁশি শুনিতে শুনিতে নায়ক ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। পাল্‌কি সমুদ্রের জলে পড়িতে ঘুম ভাঙিল। সাত সুমুদ্দুর পারে পিসির বাড়ি। জাহাজ-নৌকায় যাওয়া যায় না। "জলের উপর দিয়ে, পিসির বাড়ি যাবার রাস্তা নেই, যেতে হবে জলের নীচে দিয়ে,—ডুব-সাঁতার মেরে, সাতঘাটের জল খেতে খেতে।" জলের তলার দেশের মধ্য দিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে করিতে নায়ক পৌঁছিলেন পিসির দেশে। সেখানের সবকিছু মাসির দেশের ঠিক উল্টা। কিচ্‌কিন্দে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিল, "জলের উপরে তোমার মাসির বাড়িতে যা করতে জলের নীচে পিসির বাড়িতে এসে ঠিক তার উল্টোটা না করলে মুস্কিলে পড়বে" ; "ডাঙার উপর মাসির বাড়িতে খাও তোমরা শুক্‌নো ভাত আর জলের নীচে পিসির বাড়িতে সবাই খায় ভিজে ভাত। তোমাদের কলায়ের ডাল পাত্‌লা—যেন জল, আর এখানকার কলায়ের ডাল যেন মুক্তোর মত ঝুরঝুরে।"

পিসির দেশের অভিজ্ঞতা যেমন বিচিত্রতর তাহার বর্ণনাও তেমনি সমুজ্জ্বল ও কৌতুকাবহ, যেন ছেলে-ভুলানো ছড়ার চিত্রমালা। যেমন, সুবুদ্ধি তাঁতীর ছেলে কুবুদ্ধি ব্যাঙ মারিয়াছে, রামসিংহ দোষে কনেস্টবল আসিয়া তাহার হাতে দড়ি দিল। ফলে রামসিঙের এই ঘটিল—

> ব্যাঙের দিষ্টিতে তার মুখ পুড়ে গেল,—মুখে আর তার কিছু রোচে না—
>
> নিম লাগে মিষ্টি !
> সন্দেশ লাগে তেতো !
> মুড়কী লাগে ঝাল !
>
> সে কেবল ঘুস খেয়ে খেয়ে ধমক খেয়ে খেয়ে ছিষ্টি ব্যাঙের গালাগালি খেয়ে খেয়ে বেড়াতে লাগলো।

মাসির বাড়ির শেষ দৃশ্যে গুরুমহাশয় ও তাঁহার জোড়া বেত দেখা গেল। গুরু লিখিতে আদেশ করিলেন, "অবু তবু গিরিসুতা" ইত্যাদি।

> আমি জানি সব উল্‌টো লিখতে হবে, না হলে বেত, কাজেই আমি মাটিতে খড়ি দিয়ে একটা চৌকো ঘর কেটে লিখছি—প্যাঁচা পেঁচি দুই ভৃত্য! কিন্তু যেমন লিখছি—মায়ে বলে পড় পুতা—অমনি আমার মাকে মনে পড়ে গেছে, আমি খড়ি ফেলে দিয়ে একেবারে পাঠশালা থেকে দৌড়! এক-দৌড়ে ষষ্ঠীতলার হাজির। সেখান থেকে দেখচি—গঙ্গার ওপারে তুলসীগাছের পাতা ঝুর-ঝুর করেছে, তারি তলায় মা-আমার দুগ্‌গো পিদিম্‌ জ্বালছেন। ওদিকে দেখছি গুরুমশায় ঠেঙ্গার গুঁতি-হাতে, সঙ্গে হারুন্দে কিচ্‌কিন্দে আর সেই মনসা-বুড়ো আর আংলা কাংলা বাংলা যত ভূত-পেরেত! যেমন গুরুকে দেখা আর—মা!—বলে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছি, অমনি দেখি আমাদের বাড়িতে হাজির।

ভূতপত্‌রীর দেশের পরেই বাহির হইল সচিত্র 'খাতাঞ্চির খাতা' (১৩২৩ সাল)। এ বইটিও ছেলেদের জন্যে লেখা, এবং ইহার উপভোগ্যতা বয়স্কদের কাছেও কিছুমাত্র কম নয়। কর্তা (খাতাঞ্চি), গিন্নি, এক মেয়ে (সোনা), দুই যমজ ছেলে (আণ্ডুটি-পাণ্ডুটি), ভৃত্য (সোনাতন), তাহার বিড়াল-বৌ, কুকুর (বোহিন) ও এক পরী শিশু (পুতু) এবং বাল্যস্মৃতি লইয়া পিটার প্যানের আদর্শে এই শিশুমানসিক উপন্যাসটি রচিত।

খাতাঞ্চি প্রতিদিনের ঘরসংসারের অনুদারতার, কৃপণতার, কঠিনতার, গতানুগতিকতার প্রতিমূর্তি। তাঁহার কাছে কড়ির বাড়া কিছু নাই। কড়িতে সব আনন্দের সব প্রয়োজনের দাবি মিটে। তাঁহার খাতা খেরো বাঁধানো জাব্‌দা, তাহাতে হিসাব লিখিতেছেন, "গোলাবাড়ির কোন্ কোণে কি জমা হ'ল, কোন্ ঘরে কি খরচ হ'ল।" খাতাঞ্চি মহাশয়ের প্রথম সন্তান সোনা জন্মিলে ভৃত্য সোনাতন হাসিমুখে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল

> "কর্তার মেয়ে হ'ল, এবার বখসিস্ চাই।" খাতাঞ্চি তাকে ধমকে বল্লেন,—"বাজে বকচিস্ ফের।" তারপর সোনাতনের হাতে একটি আধলা পয়সা দিয়ে খরচের ঘরে খাতায় লিখলেন—"প্রথম কন্যার জন্মোপলক্ষে বখসিস্ বাবত বাজে খরচ আধ পয়সা" অমনি মনটা ছাৎ করে উঠলো। একটু ভেবে খাতাঞ্চি খরচের পাতায় জের টান্‌লেন—"সোনাতনেব হাওলাত বাদ তাহার গত বৎসরের মাহিনা দেওয়া যায় আধ পয়সা।" কিন্তু এতেও বাজে খরচ বন্ধ হওয়া দায়, এবার খাতাঞ্চি মশায় বেশ বুঝলেন।

পুতু জগৎ-সংসারের নিকড়িয়া রসের, শিশুচিত্তের স্বপ্নজাগরণের ভাবনা-কল্পনার প্রতীক। তাহার খাতা রাঙা ফিতায় বাঁধা সবুজ পাতা। সে খাতা সব ছেলেরই আছে—কেউ জানে কেউ জানে না।

> সব ছেলেব মনের সিন্দুকে একটি-কোরে লুকানো দেরাজ আছে। চাবি ছেলেবা হাবিয়ে ফেল্লে মুস্কিল হবে, তাই এই লুকানো দেরাজের চাবি নেই ; একটা কোরে কীল আছে, সেইটে সরিয়ে দিলেই দেরাজটি আপনি খুলে যায়। সেইখেনে সবার সবুজ পাতায় বাঁধানো এতটুকু খেলার খাতাখানি। সারাদিন যে যা খেলেছে, যা দেখেছে, যা পেয়েছে, যা হারিয়েছে, আর যা পেতে চায়, খুঁজে বেড়ায়, এমন কি রাতের স্বপ্নের ছবিও, এই ছোট্ট খাতায় রোজ-রোজ নতুন-নতুন করে লেখা হয়ে যাচ্ছে।...যতদিন না নিজের মনের সিন্দুক তারা নিজেরা গোছাতে পারে ততদিন কোন ছেলেমেয়ে এই লুকোনো খাতার সন্ধান পায় না।
>
> অনেক ছেলে দেখেছি বুড়ো হয়ে মরে গেল তবু এই সবুজখাতা-লুকোনো দেরাজের সন্ধানই পেলে না ; আবার অনেক ছেলে দেখেছি আগেই ওই খাতার সন্ধান পেয়ে গেছে। আমাকে ছবি আঁকতে দেখে আমার মা আমাকে আমার সবুজখাতাখানি দিয়েছিলেন। আমি কি তখন জানি সে খাতার গুণ ? আর একটু হলেই একটা বিলিতি খবরের কাগজের ছবির সঙ্গে সেটা বদল করেছিলুম আর কি ! ভাগ্যি মায়ের চোখে পড়েছিল, তিনি আমায় কোলে বসিয়ে যখন সেই খাতা থেকে একটির পর একটি ছবি দেখাতে লাগলেন তখন আমি অবাক হয়ে গেলুম। কি রং দিয়েই সে সব ছবি লেখা ! বাজারে সে রং পাবার জো নেই।

পুতুর সঙ্গে সোনার ও আণ্ডুটি-পাণ্ডুটির ভাব জমিবার পরে একদিন সোনার মায়ের সঙ্গে তাহার পরোক্ষ পরিচয় হইল। সেদিন

> বাইরে দুপুর-রোদ ঝাঁঝাঁ করছে—এমন গরম যে কেউ আর বাইরে নেই। "কালবোশেখি আগুন ঝরে, কালবোশেখি রোদে পোড়ে, গঙ্গা শুকুশুকু, আকাশে ছাই!" কুকুরটা পর্যন্ত

দাওয়ার উপর ছায়ায় পড়ে ঘুমোচ্ছে। গাছের পাতাটি নড়ছে না। "ঘুমতা ঘুমায় ঘাটের পাতরা, ঘুমতা ঘুমায় গাছের বাকলা !" সেই সময় অন্ধকার-করা ঘরটিতে ছেলেমেয়ে-তিনটিকে ঘুম পাড়িয়ে সোনার মা মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে কাঁথা সেলাই করছেন ! ঠাণ্ডা ঘরখানি, জানালার নীচেই আতাগাছের আগডালের দুটি-চারটি সবুজ পাতায় রোদ লেগেছে। দূরে মাঠের মাঝে একটুখানি জল ঝিক্‌ঝিক্ করছে। কোন্‌খানে একটা ঘুঘু সুর করে বল্‌তে লাগল—"পুতুর ঘুম্‌ঘুম্‌ঘুম্—দুপুর ঘুম্‌ঘুম্‌ঘুম্।" সোনার মা তাই শুনতে-শুনতে কখন আস্তে-আস্তে হাতের সেলাই কোলে রেখে জানালার ধারটিতে ঘুমিয়ে পড়লেন—আর একটি ছোট মেয়ের মতো, অমনি আস্তে-আস্তে সোনার মায়ের মনের মধ্যেকার সবুজখাতায় একটি ছবি পড়ল :—

আতাগাছের বাসায় ঘুঘু পুতুকে ঘুম পাড়িয়ে নদীতে চান করতে গেল। পুতু এতক্ষণ মট্‌কা-মেরে চোখ বুজে ছিল। সে অমনি আস্তে আস্তে উঠে বাসা ছেড়ে আতাগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে একটা বাঁশী বাজাতে লাগল। মানুষ হয়ে পুতু ঘুঘুর বাসায় ঘুমোচ্ছে,—সে পাখীর মতো আতার ডালে উড়ে বসল—এ সব সোনার মায়ের কাছে কিছুই আশ্চর্য বোধ হলো না ; মনে হলো পুতু যেন কতদিনের চেনা ! তিনি দেখলেন, সোনা আর আণ্ডুটি-পাণ্ডুটি জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে ডাকলে—"আয় পুতু—উ—উ !" অমনি 'পুতু' হিজুলিপাতার জামা বাতাসে মেলে দিয়ে ঘরের মধ্যে উড়ে এলো, সঙ্গে তার জোনাকপোকার মতো একটুখানি আলো। আলোটি ঘরের মধ্যে এসে ঝুম্‌ঝুম্ কোরে ঘুঙুর বাজিয়ে খেলাঘরের কোণটিতে গিয়ে বসলো।

সোনার মার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পুতু পলাইল, ফেলিয়া গেল তাহার সবুজ খাতা। সে খাতার মধ্যে কলিকাতার পুরানো ম্যাপ আছে, বড় মজার।

'আলোর ফুলকি' কাব্য-গল্প (প্রথম প্রকাশ ভারতী বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৩২৬ সাল, পুস্তিকাকারে ১৯৪৭।) পাত্র-পাত্রী মোরগ-মুরগি, চড়ুই, টিয়া, পেঁচা ইত্যাদি বহু পাখি ও কুকুর ইত্যাদি দুই-একটি জন্তু। আসলে পঞ্চতন্ত্রের মতো এরা পশুপক্ষীর সাজে মানবের ভূমিকাই লইয়াছে। নায়ক কুঁকড়ো ও নায়িকা বনটিয়া সোনালিয়া যথাক্রমে সৌন্দর্য-দ্রষ্টার (এবং সৌন্দর্য-আবিষ্কর্তার) ও সৌন্দর্যের প্রতীক বলা যাইতে পারে। অন্য কথায় কবি-চিত্রকরের ও তাঁহার চিরদিনের ভালোবাসার। বইটি আগাগোড়া যেন একটি নিটোল কাব্য—রঙে, রসে, ভাবে, ভাষায়। দুইটি নিদর্শন উদ্ধৃত করি।

হুতুম পেঁচীর আঁধারের স্তুতি, যেন অথর্ববেদের মন্ত্র।

> নিঝুম রাত, দুপুর রাত, নিশুতি রাত।
> কেষ্টপক্ষের কষ্টিপাথর কালো আকাশের কালো রাত।
> বর্ষাকালের কাজলমাখা পিছল রাত।
> নিখুঁত রাত।
> কালোর পরে একটি নিখুঁত তারার টিপ।
> ভয়ঙ্করী নিশীথিনী, বিরূপা ঘোর ছায়ার মায়া, থাকুন, তিনি রাখুন।
> নিশাচর নিশাচরী রক্তপাত করি, আচম্বিতে নিঝুম রাতে, দুপুর রাতে।
> নষ্টচন্দ্র, ভ্রষ্টতারা, ভিতর বার অন্ধকার-রাত, সারা রাত।
> নিঝুম দুপুর, নিখুঁত দুপুর, অফুর রাত।[৮]

স্বপনপাখির সুর উঠিয়াছে নিশীথে বনের মধ্যে। সে সুর আকাশ ছাপাইয়া তারায় তারায় ঝঙ্কার তুলিয়াছে।

> বনের সবাই চাঁদের আলোয় বেরিয়ে দাঁড়াল সে সুর শুনে। গাছের তলায় আলোছায়া বিছানো, তারি উপর হরিণ দাঁড়িয়ে শুনছে; কোটরের মধ্যে চাঁদের আলো পড়েছে, সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে বাচ্চারা সব শুনছে, বনের পোকামাকড় পশুপাখি সবার মনের কথা এক ক'রে নিয়ে স্বপনপাখি মনের শিয়রে গাইছে, জোনাকির ফুলকি, তারার প্রদীপ, চাঁদের আলোর মাঝে নীল আকাশের চাঁদোয়ার তলায়। ব্যাঙের কড়া সুর থেকে আরম্ভ করে ঝিঁঝির ঝিমে সুরটি পর্যন্ত সবই গান হয়ে এক তানে বাজছে যেন এই স্বপনপাখির মিষ্টি গলায়।
>
> কুঁকড়ো অবাক হয়ে ব'লে উঠলেন, "এ যে জগৎজোড়া গান, এর তো জুড়ি নেই। স্বপনপাখি কার কানে তুমি কী কথা ব'লে যাচ্ছ কে তা জানে।"
>
> অমনি কাঠবেড়ালি বললে, "আমি শুনছি 'ছুটি হল, খেলা করো'।"
>
> খরগোস বললে, "আমি শুনছি 'শিশিরে ভেজা সবুজ মাঠে চলো'।"
>
> বনবেড়াল বললে, "শুনছি 'চাঁদের আলো এল'।"
>
> মাটি বললে, "বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে যেন।"
>
> জোনাক বললে, "তারা আর তারা।"
>
> কুঁকড়ো তারার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমরা কী শুনছ, আকাশের তারা।"
>
> তারা সব উত্তর করল, "আমরা নয়নতারার নয়নতারা।"

পাখির সাজের ভিতর থেকে মানুষের পরিচিত রূপটুকু মাঝে মাঝে বাহির হইয়া পড়িতেছে। যেমন, চিনে-মুরগির চা-পার্টি প্রসঙ্গে।

> চিনিদিদি ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে ঘুরছেন—খাতির যত্ন ক'রে; আর তাঁর ছেলেটিও মায়ের সঙ্গে ঘুরঘুর করছেন আর মাঝে মাঝে মায়ের দু-একটা ইংরিজি উচ্চারণের আর আদব-কায়দার ভুল হলেই চমকে তাঁকে কানে কানে ধমকাচ্ছেন। ছেলেটি বিলেতে ভাষাতত্ত্ব পড়তে গিয়েছিলেন, কিন্তু সাঁতার মোটেই না জানায় তিন-তিনবার প্লাকট্ হয়ে এসেছেন।

নিম্নে উদ্ধৃত অংশে লেখক ব্যাঙের সাজ পরাইয়া কাহাদের ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহা বোধকরি না বলিলেও চলে।

> ঘাসের মধ্যে থেকে ব্যাঙ আওয়াজ দিলে, "কর্তা ঘরে আছেন? কর্তা?" সোনালি "ও মাগো ব্যাং।" বলে একলাফে একটা গাছের কোটরে গিয়ে লুকল। ছ' ছ'টা কোলা ব্যাঙ এসে উপস্থিত। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ব্যাঙ এসে হাত নেড়ে কুঁকড়োকে বললে, "বনে চিন্তাশীল যাঁরা, তাঁদের হয়ে আমরা এসেছি ধন্যবাদ জানাতে গানের ওস্তাদ আপনাকে···ওর নাম কী, অনেক গানের আবিষ্কর্তাকে," আর একজন থপ্ করে বললে, "জলের মত সহজ গানের," অমনি তৃতীয় ব্যাং থপ্-থপ্ করে বললে, "যত সব ছোটো গানের," অমনি অন্যে বললে, "মজার গানের।"
>
> পঞ্চম, ষষ্ঠ, তারাও থপ থপ ছপ ছপ করে এগিয়ে বললে, "সব বড়ো বড়ো গানের···সব পবিত্র গানের।"

'বুড়ো আংলা' (প্রথম প্রকাশ 'মৌচাক' পত্রিকায়, পুস্তকাকারে ১৩৪১ সাল) হাঁস-সারস ইত্যাদির মানসযাত্রী-সহচর বুড়ো-আঙুলের আকার প্রাপ্ত (Tom Thumb) একটি বালকের

উত্তর-প্রয়াণের রূপকথা। সুইডেনের লেখিকা সেল্‌মা লাগের্‌লফের একটি বই হইতে অবনীন্দ্রনাথ রচনার প্রেরণা পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের উত্তর ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলের ভূগোল এবং নাম অবলম্বন করিয়া কাহিনী আগাইয়া গিয়াছে। প্রধান প্রধান প্রসঙ্গের নাম হইতেই তাহা বোঝা যাইবে—"আমতলি", "চলন বিল", "টুং-সোন্নাটা-ঘুম", "যোগী-গোফা", "আসামী বুরুঞ্জি"।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অবনীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্যের অনুরোধে কিছুকাল সকালে বিকালে স্টীমারে বেড়াইতেন—বড়বাজার ঘাট হইতে বরাহনগর কুঠিঘাট অথবা বালিঘাট এবং সেখান হইতে বড়বাজার ঘাটে প্রত্যাবর্তন। স্টীমারে ভ্রমণকালে তাঁহাদের একটি বিচিত্র দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই স্টীমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে পুরোভূমিকা করিয়া অবনীন্দ্রনাথ ভারতীতে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি অভিনব গল্প ও চিত্র লিখিয়াছিলেন। এই গল্পচিত্রগুলি 'পথে-বিপথে' (১৯১৯,[৯] দ্বি-স ১৯৪৭) বইটির 'নদীনীরে' অংশে সঙ্কলিত আছে।

ভাষায় বর্ণনায় এবং কাহিনীতে এই গল্পচিত্রগুলি বেশ একটু নূতন স্বাদ আনিয়া দিয়াছে। কয়েকটিতে যেন কবিশিল্পীর মানসস্বপ্নাভিসার। অপরগুলিতে প্রতিদিনের বিবর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে অভিনব দীপ্তিব ও সজীবতার বঙ লাগানো। নদীনীরের গল্পগুলিতে লেখক নিজেকে দ্বিধাভিন্ন করিয়াছেন—বক্তা এবং অবিন। অবিন বক্তারই বহির্নিক্ষিপ্ত মনোময় দ্বিতীয় স্বরূপ।

অতীন্দ্রিয় অতিলৌকিক, চলিত কথায় ভৌতিক, কাহিনীর চমৎকার নিদর্শন 'মোহিনী'। গল্পটির তুলনা চলে এম. আর. জেম্‌সের শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গেই। 'গুরুজী'তে আধুনিক ছোটগল্পের সঙ্গে আরব্য-উপন্যাসেব ধারা বেমালুম মিলিয়া গিয়াছে। 'মাতু' গল্পে বাস্তব ও কল্পনা, চিত্র ও চরিত্র এক হইয়া যেন কাব্যরসবাহী নিটোল মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়াছে।

গল্পগুলির ভাষায় লেখকের অদ্ভুত শিল্পদক্ষতাব পরিচয় ও দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র কোন কোন কথিকা ইতিমধ্যেই রচিত হইয়াছিল। সেগুলির এবং ঘরে-বাইরের প্রভাবও কিঞ্চিৎ আছে। সে প্রভাব অবনীন্দ্রনাথের রচনাকে উদ্দীপিত করিযাছে, নিজস্ব পরিণতিব দিকে আগাইযা দিয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে যেন চিত্রপ্রদর্শনী বসিযা গিযাছে,—এমনি অবনীন্দ্রনাথের উপমা-উৎপ্রেক্ষা-কবিকল্পনার সম্ভার। কিছু উদাহবণ দিই।

> 'মাতু'-জাহাজের পাশ দিয়েই আমাদের জাহাজ বেরিয়ে গেল। দেখলেম মীর-সাহেবের জাহাজেব তিনটে চোঙা দিয়ে পাখীব বুকের পালকের মতো হাল্কা সাদা ধোঁয়া আকাশে উঠচে।[১০]

> নদীব মাঝে কুয়াশা গত শীতের ছেড়া-কাঁথার একটা কোণের মতো এখনো ঝুলে রয়েছে।[১০ক]

> ওপাবে মুচিখোলার নবাবী নিলেমে চড়েছে, এপারে সবুজ ঘাসেব ঢালুর উপরে দুই বন্ধুতে

পা-ছড়িয়ে চড়ুই-ভাতির পর একটু গড়িয়ে নিচ্ছি—ঠিকে-গাড়ির ঘোড়াগুলো হঠাৎ কাজের অবসরে এক-এক-বার যেমন ধুলোয় লুটোপুটি খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে নেয়। [১০খ]

অবনীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি গল্প ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। তাহার মধ্যে সাদাসিধা ছোট ও বড় গল্পও আছে। (যেমন, 'কোট্‌রা [আশ্বিন ১৩২৬] ও 'আলো-আঁধারে' [কার্তিক ১৩২৬])। 'কোট্‌রা'র মতো কোন কোন গল্পের বস্তু "বাস্তব ও আধুনিক", অর্থাৎ শ্রমজীবীর জীবনঘটিত। পিতামাতা-পরিত্যক্ত শিশু নোটোর পালনভার লইবার সময় মাচারু থানার দারোগাকে এই যে আত্মপরিচয় দিয়াছিল তাহা হইতে গল্পটির রস খানিকটা পাওয়া যাইবে।

"হুজুর আমি নৌকার মালিক, মাল্লা, কর্তা। একদাঁড়ি কিস্তি, কাঠ চালান দিই। নৌকার নাম—কোট্‌রা। এখান থেকে আসামের জঙ্গল পর্যন্ত দুপারের লোক কোট্‌রা আর মাচারু মাঝিকে চেনে।

"নাম মাচারু, মশয়! আমার বিয়ে হয়েছে; সে খুব চালাক মেয়েমানুষ, আমিই বরং তার কাছে বোকা বনে যাই। আর হুজুর যদি তাকে দেখতেন তবে বুঝতেন সে পাক্কা মেয়েমানুষ বটে।"

একেই আরক খেয়েছে, তার উপর দাঁও মাফিক সওদা শেষ করে, আর এই ছেলেটাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে মাচারু একেবারে বে-পরোয়া।

মেয়েমানুষটি যে কেমন পাক্কা তাহার পরিচয় পাই গল্পে তাহার প্রথম দর্শনেই। মাচারু যখন নোটোকে লইয়া নৌকায় আসিল তখন জুম্‌নী পেঁয়াজ-ফুলুরী ভাজিতেছিল।

আগুনের তাত আর ফুলুরীর গন্ধ পেয়ে নোটো বলে উঠলো—"বেশ গরম।" জুম্‌নী ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের মধ্যে নোটোকে দেখিয়ে মাচারু শুধোলে—"এ কে?" মাচারু খানিক ঢোক্ গিলে বল্লে—"তোমার জন্যে একটা নূতন সামিগ্রি এনেছি।" বলেই মাচারু একমুখ কাষ্ঠহাসি হাসলে; কিন্তু তার মন বলতে লাগলো নৌকোতে পা না দিলেই ভালো ছিল। ওদিকে জুম্‌নী হাতা-হাতে কটমট করে চেয়ে আছে!

শিল্প ও চিত্রকলা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোটখাট প্রবন্ধ ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। কখন এবং কেন যে তিনি শিল্প-প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা তাঁহার প্রথম প্রবন্ধে প্রাপ্তব্য ('কি ও কেন' [ভারতী ১৩১৫ সাল পৃ ৩২৯-৩৩৫])। কতকগুলি প্রবন্ধ 'ভারত-শিল্প' নামে পুস্তিকাকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৯০৯) (হিতবাদী লাইব্রেরি প্রকাশিত)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগেশ্বরী অধ্যাপকরূপে (১৯২২-২৭) যে প্রবন্ধগুলি অবনীন্দ্রনাথ রচনা ও পাঠ করিয়াছিলেন সেগুলি দীর্ঘকাল পরে 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৯৪১)[১১]। শিল্পচিন্তাঘটিত রচনার মধ্যে 'বাংলার ব্রত' (১৩২৬ সাল) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি আলোচনার জন্য যে "বিচিত্রা" আলোচনা সভা করিয়াছিলেন তাহার তরফে অবনীন্দ্রনাথ দুই তিন বছর ধরিয়া মেয়েলি আলপনার নক্‌শা সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। এইরূপ শতাধিক আলপনা নক্‌শার ছবি লইয়া বাংলার-ব্রত বাহির হয়। নক্‌শাগুলির ভূমিকা হিসাবে তিনি শিল্পসৃষ্টির মৌলিক প্রেরণা এবং মেয়েলি লোকসাহিত্য-ব্রতকথা লইয়া বিস্তৃত ও মনোজ্ঞ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ এই কথা বলিয়াছেন

শিল্পের সৃষ্টির মূলে মানুষের মনের তীব্র আবেগ আছে সত্য, কিন্তু আবেগের বশে যাই করি তাইতো শিল্প হয় না। অনেকদিনের পরে বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা, আনন্দের উচ্ছ্বাসে তার গলা-জড়িয়ে কত কথাই বলা হল, কিন্তু সেটা কাব্যকলা কি নৃত্যকলা দুয়ের একটাও হল না। কিন্তু বন্ধু আসবার আশায় ভাবে ডগমগ হয়ে যেন মন নৃত্য করছে, তার জন্যে ফুলের মালা গাঁথছি, নিজে সাজছি, ঘর সাজাচ্ছি—নিজের আনন্দ নানা খুঁটিনাটি কাজে, এটা-ওটা জিনিষে ছড়িয়ে যাচ্ছে—এই হল শিল্পের দেখা দেবার অবসর। অতৃপ্তির মাঝে মন দুলছে—এই দোলাতেই শিল্পের উৎপত্তি। কামনায় তীব্র আবেগ এবং তার চরিতার্থতা—এ দুয়ের মাঝে যে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদের শূন্য ভরে উঠছে নানা কল্পনায়, নানা ক্রীড়ায়, নানা ভাবে, নানা রসে। মনের আবেগ সেখানে ঘনীভূত হয়ে প্রতীক্ষা করছে প্রকাশকে। মনের এই উন্মুখ অথচ উৎক্ষিপ্ত নয় অবস্থাটিই হচ্ছে শিল্পের জন্মাবার অনুকূল অবস্থা।

শেষজীবনে অবনীন্দ্রনাথ তিনখানি আত্মকাহিনী-ঘটিত বই রচনা করিয়াছিলেন। পারিবারিক স্মৃতিকথা লইয়া 'ঘরোয়া' (১৯৪১) ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৯৪৪) শ্রীমতী রাণী চন্দের সহযোগিতায় লেখা। বই দুইখানি অত্যন্ত উপাদেয়। 'আপন কথা' (১৯৪৬) শৈশবস্মৃতি অবলম্বনে বিরচিত। রচনার সরল মনোহারিত্বে, কল্পনার সহজ কারিগরিতে এবং চিত্রের সুষমায় বইখানি রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলার সহযোগী॥

৪ ভারতী-গোষ্ঠী

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশদ্‌বর্ষ জয়ন্তীর বছর হইতে ভারতীর পরিচালনায় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, চারুচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণ লেখক ও শিল্পীদের প্রভাব বাড়িতে থাকে, এবং তিন-চার বছরের মধ্যেই পত্রিকাটির ভার সম্পূর্ণরূপে ইঁহাদের হাতে আসে। "ভারতীর বৈঠক"-এর এইভাবে শুরু হয়।[১২] এই বৈঠকের নায়ক হইলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতীর বৈঠকের পরিসর বৃহৎ ছিল না, কিন্তু ইহা কখনো সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীতে বা দলে পরিণত হয় নাই। এই বৈঠকে যাঁহারা সমবেত হইতেন তাঁহারা সকলেই রবীন্দ্র-অনুরাগী। সুতরাং রবীন্দ্র-নিষ্ঠা ভারতীর বৈঠকের মূল সংঘনীতি বলিয়া ধরিতে পারি। অপর সংঘসূত্রগুলি, অর্থাৎ Article of Association, খুব সুব্যক্ত না হইলেও সহজে বোঝা যায়। সেগুলি হইল এই,—(১) সাহিত্যদৃষ্টিতে গতানুগতিকতার ঠুলি পরিত্যাগ, (২) রচনারীতিকে সরল ও সরস করা ও কথ্যভাষার কাছাকাছি আনা, (৩) আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় ঘটানো, (৪) সমসাময়িক সমাজের গ্লানির প্রতি—বিশেষ করিয়া পতিত নারীর দুর্দশার প্রতি—গল্প-উপন্যাসে সমবেদনা আকর্ষণ, (৫) শিল্প অনুরাগ এবং জীবনচর্যায় শিল্পানুরাগের অভিব্যক্তি, আর (৬) মোগল চিত্রকলার অনুশীলনের আনুষঙ্গিকরূপে ফারসী হস্তলিপির মতো মোলায়েম ফারসী শব্দের প্রতি ঝোঁক।

ভারতীর বৈঠকে কাব্যের আসর জাঁকাইয়া তুলিয়াছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, আর গল্পের আসর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথও গদ্যরচনায় মণিলালের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাহার সাক্ষী তাঁহার অসমাপ্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস ডঙ্কানিশান॥

৫ বারোয়ারি গল্প-উপন্যাস

১২৯৯ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী কোন বিলাতি পত্রিকায় একাধিক লেখকের সমবায়ে ধারাবাহিকভাবে উপন্যাস রচনা দেখিয়া ভারতীতে এমনি যৌথ উপন্যাস রচনার একটু চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'নববর্ষের স্বপ্ন' নামে এই ক্ষুদ্র "নূতন ধরনের উপন্যাস" পাঁচটি পরিচ্ছেদে পাঁচ সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। প্রথম পরিচ্ছেদে (আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত) লিখিয়াছিলেন সরলা দেবী। প্রথম পরিচ্ছেদ পড়িয়া যিনি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ লিখিয়াছিলেন (অগ্রহায়ণ সংখ্যা) তাঁহার নাম বাহির হয় নাই ("শ্রী অঃ")।[১৩] তৃতীয় পরিচ্ছেদ দুইজনের লেখা মিলাইয়া সম্পাদিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের একজন দীনেন্দ্রকুমার রায় আর একজন শশিভূষণ বসু। চতুর্থ পরিচ্ছেদ লিখিয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। পঞ্চম পরিচ্ছেদ সরলাবালা দাসীর রচনা। যাঁহাদের রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাঁহারা সকলেই যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

সুদীর্ঘকাল পরে ভারতীর সম্পাদকমণ্ডলী আবার এই ধরনের উপন্যাস লেখাইলেন। এবারে নাম হইল 'বারোয়ারি উপন্যাস' (পুস্তকাকারে ১৯২১, দ্বি-স ১৯২৪)। প্রত্যেক মাসে, এক একজনের লেখা, এক কিস্তি করিয়া বাহির হইত। এক বছরে বইটি সম্পূর্ণ হয়। লেখক ছিলেন যথাক্রমে—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং প্রমথ চৌধুরী।

বারোয়ারি উপন্যাসের অনুকরণে অবিলম্বে বাহির হইয়াছিল 'ভাগের পূজা' (১৯২৩)। উপন্যাসটির লেখক-লেখিকা এই ষোল জন—শৈলবালা ঘোষজায়া, বিজয়রত্ন মজুমদার, সরলাবালা বসু, বিশ্বপতি চৌধুরী, চারুবালা বসু,[১৪] অজয়কুমার সেন, লীলা দেবী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রভাবতী দেবী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, গিরিবালা দাসী, জলধর সেন, স্নেহশীলা বসু চৌধুরানী, শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত॥

৬ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীর আসরকে তরুণ সাহিত্যিকদের আড্ডায় জমাইয়া তুলিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯)। ইনি অবনীন্দ্রনাথের জামাতা। সেই সূত্রে লেখক রূপে ভারতীতে ইঁহার আবির্ভাব (১৩১৫ সাল)। ভারতীর শেষের দিকে আট নয় বছর (১৩২২-২৯ সাল) মণিলাল পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক এবং পরিচালক ছিলেন। প্রথমে ২০ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে এবং পরে ২২ সুকিয়া স্ট্রীটে ইঁহারই কান্তিক প্রেসে ভারতী ছাপা হইত এবং শেষেব বাড়িরই তেতলায় ভারতীর আড্ডা বসিত। এই আসরে সমবেত হইতেন দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, ভূপতি চৌধুরী প্রভৃতি তদানীন্তন 'নব্য' শিল্পী ও বিদগ্ধজন এবং সাহিত্যিকেরা। তখন আরও কয়েকটি

সাহিত্যিক-গোষ্ঠী ছিল কলিকাতায়। (রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা সভাকে বাদ দিতে হইবে এই তালিকা হইতে, কেননা সেখানে সংঘবদ্ধ সাহিত্য ও শিল্পচিন্তার স্থান ছিল না)। তাহার মধ্যে যেটি বেশি পুরাতন সেই সুরেশচন্দ্র সমাজপতি শাসিত রবীন্দ্র-বিবাদী 'সাহিত্য'-গোষ্ঠী তখন ভগ্নপ্রায়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হইল (১৩২৭ সাল)। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ছিলেন 'মানসী'র গোষ্ঠীপতি। এখানে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রবীন্দ্র-অনুরাগীর একাধিপত্য ছিল। জগদিন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন। তাই মানসী-গোষ্ঠী কখনো রবীন্দ্র-বিসংবাদী হয় নাই। তবে মানসীর সাহিত্য-চিন্তা পুরাতন ধারাই অনুসরণ করিয়াছিল। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের নূতনতর সাহিত্য-সৃষ্টিতে মানসী-গোষ্ঠী সর্বদা খুব উৎসাহ বোধ করেন নাই। প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া যে ছোট ও সঙ্কীর্ণ মজলিস গড়িলেন তাহাতে অল্প দুই-চারজন শিক্ষিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ বড় আকৃষ্ট হয় নাই। সবুজপত্রের বিরোধী রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল চিত্তরঞ্জন দাশ-পুষ্ট ও বিপিনচন্দ্র পাল-সেবিত 'নারায়ণ'। কোন কোন প্রাচীনপন্থীকে দলে টানিয়া লইয়া নারায়ণ-গোষ্ঠী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথের তথৈব নূতন সাহিত্যের নিন্দায় লাগিয়া গেল। তবে সে চেষ্টা বেশি দিন চলে নাই। নারায়ণের লেখকেরা আসর জমাইতে পারিলেন না। দল শীঘ্রই ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে পরের কথা।

ভারতী-গোষ্ঠীর অনুপ্রেরণা আসিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা সভা হইতে। সাহিত্যে শিল্পে নাট্যাভিনয়ে এবং মানব-সংস্কৃতির অন্যান্য দিকে ভারতী-গোষ্ঠীর কৌতূহল এই সূত্রেই জাগ্রত। বিচিত্রা ও ভারতীর মধ্যে গুপ্ত অথচ প্রধান যোগাযোগকর্তা ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। অপ্রধান সংযোগ-পাত্র ছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও অসিতকুমার হালদাব।

ইউরোপীয (কন্টিনেন্টাল) উপন্যাস-কাহিনী—অবশ্য ইংরেজী অনুবাদ হইতে—বাঙ্গালায় প্রকাশ করা ভারতী-গোষ্ঠীর একটা প্রচেষ্টা ছিল। এই কাজের ভার লইয়াছিলেন ভারতীর চারজন প্রধান লেখক। মণিলাল অনুবাদ করিলেন 'ভাগ্যচক্র' ওলন্দাজ ভাষা হইতে, সৌরীন্দ্রমোহন লিখিলেন, 'মাতৃঋণ' ফরাসী হইতে, সত্যেন্দ্রনাথ লিখিলেন 'জন্ম-দুঃখী' নরউইজীয় হইতে, আর চারুচন্দ্র লিখিলেন, 'আগুনের ফুলকি' জার্মানি ভাষা হইতে। অবশ্য এসব অনুবাদই ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে। মূল ফরাসী হইতে চাবটি গল্প অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন সতীশচন্দ্র বাগচী (গণিতজ্ঞ ও আইনজ্ঞ পণ্ডিত) 'ফরাসী গল্প' (১৯১৫) নামে।

গদ্যরচনায় মণিলালের স্বাভাবিক নিপুণতা ছিল। এই নিপুণতায় তাঁহার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। অবনীন্দ্রনাথের রচনারীতি এবং ভাবুকতা দুই-ই ইঁহার লেখায় যথাসম্ভব প্রতিফলিত হইয়াছে। তবে অভিজ্ঞতা কম, এবং রোমান্টিক কল্পনার রঙ কিছু চড়া। ভারতী-গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের রচনাভঙ্গির আদর্শ মণিলালের লেখায় প্রতিবিম্বিত। সুপরিচিত শব্দ, কথ্যভাষাশ্রিত সহজ বাক্য-রীতি আর পরিচ্ছন্নতা এবং ছোট আয়তন—মোটামুটি ইহাই ভারতীর তরুণ-গোষ্ঠীর রচনারীতির প্রধান লক্ষণ।

সাহিত্যকর্মে হাত দিবার আগে মণিলাল মিডিয়াম, প্ল্যানচেট ইত্যাদি প্রেততাত্ত্বিক

ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। (হয়ত অল্প বয়সে পত্নীহারা হইয়াছিলেন বলিয়া পরলোকের বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ জন্মিয়াছিল।) এ বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা লইয়াই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'ভুতুড়ে কাণ্ড' বাহির হইয়াছিল (১৯০৮)। সাহিত্যের আসরে নামিয়া তিনি হাত দিলেন অনুবাদে—বেশির ভাগ গদ্য, অল্প কিছু পদ্য। ছেলেদের জন্য ইংরেজী হইতে যে কয়টি জাপানী গল্পের অনুবাদ করিলেন তাহা লইয়া বাহির হইল 'জাপানী ফানুস' (১৯০৯) ও 'কল্পকথা' (১৯০৯)। 'আলপনা'র (১৯১০) কয়েকটি গল্পের মূলও বিদেশি। মণিলালের অপর গল্পের বই হইতেছে 'ঝাঁপি' (১৯১২), 'মহুয়া' (১৯১৩), 'পাপ্‌ড়ি' (১৯১৬), 'জলছবি' (১৯১৮) ও 'খেয়ালের খেসারত' (১৯২২)। 'মনে মনে' (১৯১৯) বড় গল্প। ওলন্দাজ লেখক লুই কুপার্স-এর একটি উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ করেন মণিলাল 'ভাগ্যচক্র' (১৯১১) নামে।[১৫]

মণিলাল শৌখিন ব্যক্তি ছিলেন। সঙ্গীত ও নাট্যকলায় তাঁহার কৌতূহল বরাবর ছিল। শেষে একটি অত্যন্ত লিরিক ধরনেব নাটিকাও লিখিয়াছিলেন, 'মুক্তার মুক্তি' (১৯২২)।[১৬] পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ও অভিনয়ের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন (১৯২৪) তখন মণিলাল নৃত্যছন্দের পরিকল্পনায় তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন।

মণিলালের গল্পের রস যতটা বাস্তব তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি রোমান্টিক। সেই কারণে গল্পগুলিতে কাব্যধর্ম বেশি মাত্রায় প্রকট। 'তুরুপ', 'টাকার থলি', 'বিন্দু', 'দুই সন্ধ্যা' ইত্যাদি গল্পে মণিলালের দক্ষতার প্রকাশ। 'মুক্তি'[১৭] সর্বাপেক্ষা "বাস্তব" গল্প। বিস্ময়ের বিষয়, এই ধরনের "বাস্তব" গল্প যাহা মণিলালের 'মুক্তি'তে শুরু হইল বলা যায় তাহা অনেক কাল আগে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গচ্ছলে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছিলেন ভারতীতেই এক প্রবন্ধে[১৮]।

> বাড়ির গলির মোড়ে একটা প্রৌঢ়া পানওয়ালী বসিয়া থাকে। সকালেও দেখিতে পাই, বিকালেও দেখিতে পাই, এবং নিমন্ত্রণ খাইয়া অনেক বাত্রে বাড়ি ফিবিবাব সময় স্তিমিত দীপালোকে তাহার ক্লান্ত মুখচ্ছবি দৃষ্টিপথে পড়ে। মনে করা দুঃসাধ্য নয় যে, সে নিশিদিন যেন কাহাব জন্য, যেন কিসেব জন্য, যেন কোন্ অপরিচিত স্মৃতির জন্য, যেন কোন্ অপরিচিত বিস্মৃতির জন্য প্রতীক্ষা কবিয়া প্রত্যেক পথিকের মুখের দিকে চাহিতেছে। কিন্তু সেরূপ কল্পনা করিয়াও কোন ফল হয় না। বিস্তর চেষ্টা করি, তবু কিছুতেই তাহাকে দেখিয়া হৃদয়ের মধ্যে জ্যোৎস্নার সুগন্ধ, বাঁশির আলিঙ্গন, নিস্তব্ধতার সঙ্গীত জাগ্রত হইয়া উঠে না। তাহার স্বহস্তরচিত অনেক পান কিনিয়া খাইয়াছি কিন্তু তাহার মধ্যে চুন খয়ের এবং গুটিদুয়েক খণ্ড সুপারি ছাড়া একদিনের জন্যও বাসনা, স্মৃতি, আশা অথবা স্বপ্নের লেশমাত্রও পাই নাই।

এই সঙ্গে প্রকাশিত তাঁহার আর একটি অধিক ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধও পঠিতব্য ('সফলতার দৃষ্টান্ত')।

> কিছুদিন হইতে প্রত্যহ আমার ডেস্কের উপর একটি করিয়া ফুলের তোড়া কে রাখিয়া যায়?
>
> হায়! কে বলিবে কে রাখিয়া যায়! তোমরা জান কি, কাহার কোমল চম্পক অঙ্গুলি এই চাঁপাগুলি চয়ন করিয়াছিল? বলিতে পার কি, এই গোলাপে কাহার লজ্জা, এই বেলফুলে কাহার হাসি, এই দোপাটিফুলে কাহার দুটি বিন্দু অশ্রু-জল এখনো লাগিয়া আছে?

৭ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬) দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীর পরিচালনায় সংসৃষ্ট ছিলেন। ভারতীর শেষ কয় বছর প্রথমে স্বর্ণকুমারীর সহকারী রূপে (১৩১৫-২২ সাল) পরে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিরূপে (১৩২১-৩০ সাল) ইনি ভারতী সম্পাদন করিয়াছিলেন। যে বছর ইনি বি-এ পাস করেন সেই বছরে (১৩১১ সাল) ইঁহার লেখা গল্প কুন্তলীন প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিল। সৌরীন্দ্রমোহনের আরও অনেক গল্প কুন্তলীন পুরস্কারের সম্মান লাভ করিয়াছিল। গল্পলেখক হিসাবে সৌরীন্দ্রমোহনকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শিষ্য বলিতে পারা যায়। তবে গল্পের বিষয়ে খুব বৈচিত্র্য নাই। ইঁহার অধিকাংশ গল্পের বিষয় হইতেছে অবিবাহিত প্রেমপ্রত্যাশা কিংবা নববিবাহিতের লাজুক প্রেমপিপাসা। করুণ রস জমাইবার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায়। (এটা অবশ্য তখনকার দিনের কোন কোন গল্প-লেখকের একটা বিশেষ কায়দা ছিল)। সৌরীন্দ্রমোহনের কয়েকটি গল্প বাঙ্গালা ছোটগল্পের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রচনারীতি সাদাসিধা ও সরস, ফেনাইবার প্রবল চেষ্টা নাই, বুদ্ধিবিদ্যা-প্রকাশের আগ্রহও নাই। অনেক গল্পের প্লটই বিদেশি মূল হইতে অল্পবিস্তর নেওয়া। সৌরীন্দ্রমোহনের ছোটগল্পের বই এইগুলি,—'শেফালি' (১৯০৯, দ্বি-স ১৯১৩), 'নির্ঝর' (১৯১১), 'পুষ্পক' (১৯১৩), 'মৃণাল' (১৯২২), 'যৌবরাজ্য' (১৯২২), 'পিয়াসী' (১৯২২) ইত্যাদি। 'পরদেশী' (১৯১০) বিদেশি গল্পের অনুবাদ। ইঁহার গ্রন্থসংখ্যা শতাবধি।

গল্প লিখিতে আরম্ভ করিবার অল্প কিছুকাল পরেই সৌরীন্দ্রমোহন ব্যঙ্গ ও কৌতুক নাট্য রচনায় মন দিয়াছিলেন। এগুলির কাহিনী স্বরচিত নয়, বিদেশি নাট্য অথবা দেশি গল্প অবলম্বনে লেখা। নাট্যরচনাগুলিতে যেসব গান আছে সেগুলি সুরচিত। সংলাপও উজ্জ্বল। কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এগুলির অভিনয় ব্যর্থ হয় নাই। 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৯০৮) মলিয়েরের নাটক অবলম্বনে লেখা, 'দরিয়া'র (১৯১২) মহাজন গোল্ডস্‌স্মিথ, 'গ্রহের ফের' (১৯১১) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বলবান্ জামাতা' গল্প অবলম্বনে লেখা; 'মৃত্যু-মোচন' ও 'রূপসী' যথাক্রমে টলস্টয় ও মেটারলিঙ্কের নাটক-কাহিনী অবলম্বনে লেখা। অন্যান্য প্রহসন—'দশচক্র' (১৯১০), 'রুমেলা' (১৯১৪), 'হাতের পাঁচ' (১৯১৫), 'শেষবেশ' (১৯১৭), 'পঞ্চশর' (১৯২০), 'লাখ টাকা' (১৯২৬) ও 'হারানো রতন' (১৯২৯)। 'স্বয়ংবরা' (১৯৩১) নাটক সাবিত্রীকাহিনী লইয়া লেখা।

সৌরীন্দ্রমোহন বহু বহু উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, সেগুলির অধিকাংশই অনুবাদ, আক্ষরিক অথবা ভাবাশ্রিত। যেমন, 'বন্দী' (১৯১১; উগো), 'মাতৃঋণ'[১৯] (দোদে), 'নবাব' (ঐ), 'অবন্ধনা' ও 'নতুন আলো' (গর্কি), 'অসাধারণ' (তুর্গেনিভ), 'জনৈকা' (মোপাসাঁ) ইত্যাদি। কতকগুলি অনুবাদ-গল্প কিশোরপাঠ্য। ইঁহার মৌলিক উপন্যাসের মধ্যেও ক্বচিৎ বিদেশি ছায়া অলক্ষ্য নয়। মৌলিক উপন্যাসের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—'কাজরী' (প্রথম প্রকাশ ভারতী ১৩২৬ সাল), 'আঁধি' (ঐ, ১৩২৮-২৯ সাল), 'বাবলা' (ঐ, ১৩৩০-৩১ সাল) ইত্যাদি। সৌরীন্দ্রমোহনের উপন্যাসের ভাষা প্রসাদগুণসম্পন্ন এবং ভাবাতিশয্যবর্জিত। কোন কোনটি কথ্যভাষায় লেখা।

ভাবতীর প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহনের রচনার আলোচনা করা হইল। ভাগলপুরের প্রসঙ্গে এ আলোচনা স্মর্তব্য ॥

৮ চারুচন্দ্র (পরে চারু) বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী পত্রিকার প্রায় আরম্ভ হইতেই (বৈশাখ ১৩০৮) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) উহার সম্পাদনা কার্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯২৪ অব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ভারতী-গোষ্ঠীর সহিত চারুচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, এবং ভারতীতে তাঁহার রচনা বাহির হইত।[২০] অল্প কিছুদিন প্রবন্ধ (সঙ্কলন) ও কবিতা লেখার পর চারুচন্দ্র ছোটগল্প লিখিতে শুরু করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষীণ বস্তুর উপর করুণ ভাবাবেগের রঙ ফলাইয়া চারুচন্দ্রের প্রথম ছোটগল্প ও চিত্রগুলি রচিত। সৌরীন্দ্রমোহন যেমন স্পষ্টত প্রভাতকুমারকে অনুসরণ করিয়াছিলেন চারুচন্দ্র তেমনি রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। মণিলালের রচনারীতির প্রভাব চারুচন্দ্রের রচনায় বেশি করিয়া পড়িয়াছে। তাহার ফল ভালো হয় নাই। ভাষার চটকে ও ভাবরসাতিশয্যের টানে কয়েকটি ভালো গল্পের প্লট উতরাইতে পারে নাই। আসলে চারুচন্দ্রের রচনাকৌশলের পরিচয় 'চটির পাটি'র মতো গল্পচিত্রগুলিতেই বিশেষভাবে প্রকটিত।

চারুচন্দ্রের ছোটগল্পের সংখ্যা কম নয়। সেগুলি সঙ্কলিত আছে প্রধানত এই বইগুলিতে,—'ববণডালা' (১৯১০), 'পুষ্পপাত্র' (ঐ), 'সওগাত' (১৯১১), 'ধূপছায়া' (১৯১২), 'চাঁদমালা' (১৯১৫), 'মণিমঞ্জীর' (১৯১৭), 'কনকচূর' (১৯১৮), 'পঞ্চদশী' (১৯২৭), 'বনজ্যোৎস্না' (১৯৩৮), 'শমীশাখা' (ঐ), 'দেউলিয়ার জমাখরচ' (১৯৩৯)। 'বজ্রাহত বনস্পতি'তে (১৯৩৫) পুষ্পপাত্র, সওগাত ও চাঁদমালার গল্পগুলি সঙ্কলিত। ধূপছায়ার গল্পগুলির সঙ্গে একটি নূতন গল্প যোগ করিয়া 'যাত্রাসহচরী' (১৯৩৭) সঙ্কলিত।

প্রথম উপন্যাস—আসলে বড় গল্প—'আগুনের ফুলকি' (১৩২১)[২১] জার্মান লেখক হাউফের গল্পের রূপান্তর। 'যমুনাপুলিনের ভিখারিণী' (১৩৩০ সাল), 'চোরকাঁটা' (১৩২৬ সাল), 'সর্বনাশের নেশা' (১৯২৩), 'জোড়বিজোড়' (১৯২৪), 'নোঙর ছেঁড়া নৌকা' (১৯২৪), 'অদর্শনা' (১৯২৫), 'সদানন্দের বৈরাগ্য' (১৯৩৫), 'বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ' (১৯৩৫), 'ব্যবধান' (১৯৩৬),—এই কয়টি উপন্যাসের বস্তুও বিদেশি।

চারুচন্দ্রের প্রথম মৌলিক উপন্যাস 'স্রোতের ফুল'-এর (১৩২২, দ্বি-স ১৩২৬, তৃ-স ১৩৪৫)[২২] কাহিনী রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া বলিয়া মনে করি। এই কাহিনী-সূত্র লইয়াই রবীন্দ্রনাথ অল্প কিছু কাল পূর্বে 'চতুরঙ্গ' (প্রথম প্রকাশ সবুজপত্রে অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩২১) রচনা করিয়াছিলেন। স্রোতের-ফুলের বিপিন চতুরঙ্গের শ্রীবিলাস ও শচীশ একাধারে, নবকিশোরের প্রতিবিম্বও খানিকটা শচীশের উপর পড়িয়াছে। চারুচন্দ্রের স্মৃতিরত্ন হরিবিহারী কালীতারা প্রেমানন্দ ও মালতী যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের জ্যেঠামশায় হরিমোহন হরিমতী লীলানন্দ ও দামিনী। চারুচন্দ্রের ভূমিকাগুলির পরিকল্পনা স্বভাব-সঙ্গত নয়, হয় রঙচড়া নয় রঙচটা। প্রেমানন্দের চরিত্র একেবারে ব্যর্থ। বিপিন

দুর্বল ও ছিচকাঁদুনে-গোছের। যৌন আবেদনের উপর ঝোঁক একটু বেশি পড়িয়াছে। এদিক দিয়া বইটিকে আধুনিকত্বের দিকে অগ্রসর বলা যায়। উপসংহার অসমঞ্জস ও গতানুগতিক। চোখের-বালির ছায়াপাত ইহাতে দুর্লক্ষ্য নয়।

দ্বিতীয় মৌলিক উপন্যাস 'পরগাছা' (১৯১৭, দ্বি-স ১৯২০)[২৩] চারুচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা এবং ভারতী-গোষ্ঠীর বোধ করি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সহজ সরল বাহুল্যবর্জিত বাস্তব কাহিনীটি মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী। ভূমিকা-রচনায় ও আখ্যান-উদ্ভাবনায় কল্পনা খাটাইবার প্রয়োজন হয় নাই। তাই এই বইটিতে চারুচন্দ্রের সাধারণ রচনা-দৌর্বল্য প্রকটিত নয়। যে-কোন কারণে হোক চারুচন্দ্র আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে পরগাছার কাহিনী সাধারণ পাঠক সত্যঘটনা-নির্ভর বলিয়া মনে করিতে পারে। তাই প্রবাসীতে বইটির যখন শেষ দুই কিস্তি বাহির হয় তখন এই মন্তব্যটি গোড়ায় দেওয়া হইয়াছিল।

> পরগাছা উপন্যাস ; উপন্যাস কল্পনার ফল ; কাল্পনিক ব্যাপার হইলেও উপন্যাসে বর্ণিত স্থান ও পাত্রের নাম কোথাও না কোথাও কাহারো না কাহারো থাকিতে পারে, ঘটনাও কোথাও না কোথাও কখনো না কখনো বর্ণনার কিয়দংশের অনুরূপ ঘটিয়া থাকিতে পারে ; তাহা মিলাইয়া কেহ যেন ইহাকে ইতিহাস, জীবনচরিত বা ব্যক্তিবিশেষের বর্ণনা বলিয়া ধরিয়া না লন ; মিলের সঙ্গে অমিল হিসাব করিয়া দেখিলেই তাঁহাদের ভ্রম ধরা পড়িবে যে যাহা সত্যের আভাস বলিয়া মনে হইতেছে তাহা কল্পনারই সৃষ্টি।

পরগাছার পরে বাহির হইল 'দুই তার' (১৯১৮)[২৪]। বইটির কাহিনী-সূত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া। চারুচন্দ্র লিখিয়াছেন

> এই বইএর প্রথম ও শেষ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার আভায পূজনীয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মুখে মুখে আমায় বলিয়াছিলেন। সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আমি মধ্যের ঘটনাগুলি গাঁথিয়াছি।

গল্পটি ভালো। ঘরে-বাইরের অনুরূপ পলিটিক্যাল পরিবেশ। নায়ক-নায়িকা কতকটা মেঘ-ও-রৌদ্রের শশিভূষণ-গিরিবালার ছাঁচে ঢালা। নায়কের উপর চতুরঙ্গের শচীশের প্রভাব আছে। প্রতিনায়ক হংসেশ্বর ভালোমন্দে মিশানো সাধারণ মানুষ, কিন্তু চরিত্রটির অঙ্কনে ভালোমন্দের মশলা ঠিক মিশ খায় নাই। চারুচন্দ্রের রচনারীতির বিশেষ দোষ অতিভাষণ এই বইটিতে খুব স্পষ্ট নয়।

'হেরফের'এর (১৯১৮, দ্বি-স ১৯২০) প্লটও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। লেখকের মন্তব্য

> এই গল্পের প্লটের মূল ধারাটি পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্নেহের দান।

'পঙ্কতিলক' (১৯১৯) চারুচন্দ্রের বোধ করি সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত উপন্যাস। কাহিনী মার্কিন লেখক হথর্নের (Nathaniel Hawthorne) *The Scarlet Letters* উপন্যাসের ছায়ায় রচিত। পরিকল্পনায় যৌন আবেদনের অভ্রান্ত ইঙ্গিত দিয়া লেখক যে অভিনব দুঃসাহিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার লেখক-যশ খানিকটা আহত হইয়াছিল। প্লটে সাহসের পরিচয় আছে, কিন্তু কাহিনী সুসংবদ্ধ নয় এবং ঘটনায় প্রাসঙ্গিকতার এবং চরিত্র-অঙ্কনে সম্ভাব্যতার অভাব আছে। নায়িকা আভাকে বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে বলিয়া মনে করা দুরূহ। অধিকাংশ চরিত্র হয় অবাস্তব নয় ক্যারিকেচার।

'দোটানা'র (১৯২০) কাহিনীও কতকটা পঙ্কতিলকের মতো। কিন্তু এখানেও

ঘটনা-পরিকল্পনায় ও চরিত্রচিত্রণে বিজাতীয়ত্বের ছাপ আছে। রচনারীতিতে কাব্যের ঢঙ প্রকট। দোটানার কাহিনীও কি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া?

চারুচন্দ্রের অপর উপন্যাস—'আলোকলতা' (১৯২০), 'বিয়ের ফুল' (১৯২০), 'মুক্তিস্নান' (১৯২১), 'পারণ' (১৯২৩), 'নষ্টচন্দ্র' (১৯২৪), 'রূপের ফাঁদ' (১৯২৫), 'মন না মতি' (১৯২৬), 'হাইফেন' (১৯২৬), 'যা নয় তাই' (১৯২৭), 'ধোঁকার টাটি' (১৯২৯), 'পথভোলা পথিক' (১৯৩৩), 'সুরবাঁধা' (১৯৩৭) ও 'অগ্নিহোত্রী' (১৯৩৮)।

চারুচন্দ্র একটি ছোট নাটিকাও লিখিয়াছিলেন—'জয়শ্রী' (১৯২৬)।

বন্ধু কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো চারুচন্দ্রও জ্ঞানান্বেষণে, বিশেষ করিয়া ভাষাঘটিত ও ইতিহাসবিষয়ক অনুসন্ধানে, বরাবর কৌতূহলী ছিলেন। এ বিষয়ে ইঁহার সঙ্কলন-প্রচেষ্টার পরিচয় প্রধানত ভারতী ও প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত বিবিধ প্রবন্ধে এবং কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের বোধিনীতে (১৯২৫, ১৯২৮) আর রবীন্দ্র-কবিতার ভাষ্য দুইখণ্ড 'রবিরশ্মি'তে (১৯৩৮) মিলিবে।

ছেলেদের জন্য চারুচন্দ্র যে কয়খানি বই লিখিয়াছিলেন অথবা সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে, 'কাদম্বরী' (১৯০৯), 'পারস্য উপন্যাস' (১৯১০), 'বিষ্ণুপুরাণ' (১৯১০), 'রবিনসন ক্রুসো' (১৯১০) এবং 'ভাতের জন্মকথা' (১৯১১)॥

৯ অসিতকুমার হালদার

অবনীন্দ্রনাথের একজন প্রধান ছাত্র, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদার (১৮৯০-১৯৬৪) ভারতীতে শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতেন। ইঁহার রচনারীতি সহজ সরল ও স্পষ্ট। অজন্তা, বাগ ও রামগড়ের গুহাচিত্রগুলি কডরিংটন প্রণীত গ্রন্থের জন্য ইনি এবং ইঁহার সহকর্মী নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতি আঁকিয়া লইয়াছিলেন। তাহার ফলে ইঁহার 'অজন্তা' (১৯১৩) ও 'বাগগুহা ও রামগড়' (১৯২১), লেখা হয়। অসিতকুমার ছেলেদের জন্য কতকগুলি ছোট ছোট বই লিখিয়াছেন—গল্প, নাটক, কবিতা।

ছেলেদের জন্য লেখা গল্পের বইয়ের মধ্যে দুইখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'হো-দের গল্প' (১৯২১) ও 'বুনো গপ্‌প' (১৯২২)। গল্পগুলি সংগ্রহ করিয়া ইংরেজীতে প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন লেখকের পিতা সুকুমার হালদার। শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি গল্পের রস ও বইয়ের মর্যাদা বাড়াইয়াছে॥

১০ হেমেন্দ্রকুমার রায় ও হেমেন্দ্রলাল রায়

হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) ভারতীর পরিচালনায় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ডান হাতের মতো ছিলেন। গল্প-উপন্যাস ছাড়া হেমেন্দ্রকুমার প্রবন্ধ এবং কবিতাও লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধগুলি সাধারণত তথ্যপূর্ণ সঙ্কলনের মতো। কবিতার বই একটিমাত্র—'যৌবনের গান' (১৯২৪)। ইহাতে আটষট্টিটি কবিতা সঙ্কলিত আছে। হেমেন্দ্রকুমারের কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুসরণ অত্যন্ত স্পষ্ট। কয়েকটি কবিতায় নিজস্বতার পরিচয় আছে। হেমেন্দ্রকুমারের 'কাপালিকের উদ্বোধন'-এ মোহিতলাল

মজুমদারের 'কালাপাহাড়' পূর্বাভাসিত। কবিতাটির প্রথম স্তবক

কালাপাহাড় !...ঘুমিয়ে নাকি ?...পাশ ফেরো ভাই
চোখ খোলো,
আঁৎ-চাপা ঐ আংরাটিতে জ্বালিয়ে আগুন ফের তোলো !
পথ-বিপথে, তাল-বেতালে ঝড়-ঝাপটে শাঁখ বাজাও,
লক্ষযুগের অন্ধকারে রক্ত শিখার দীপ সাজাও !
মন-বুড়োদের পাঁজরা ছিঁড়ে খেল্‌তে থাকো ডাংগুলি
বেরিয়ে পড় ধ্বংস-নদে বান-ক্ষ্যাপানো তান তুলি !
বেরিয়ে পড় বেপরোয়া !
পথের তুমি — নও ঘরোয়া !
চণ্ড মরুর উষ্ণ তৃষায় শান্তি-স্বপন আজ ভোলো
মৃত্যু-সখা, চোখ খোলো।

যৌবনের-গানের একটি বিশিষ্ট কবিতা 'পূর্ণিমার সাধ' (প্রথম প্রকাশ, ভারতী ১৩২৬ সাল)। প্রথম স্তবকটি এই,

তমাল বনে চাঁদ উঠেচে, ধানের খেতে আলো,
কে পরেছে গলায় মালা, কে বেসেচে ভালো।
মনের কথা মূর্তি ধরে
বেরিয়েচে আজ বিশ্ব ভ'রে
চাঁদের আলোর শিখাতে আজ মনের পিদিম জ্বালো।

হেমেন্দ্রকুমার ওমর খয়্যামের কবিতার অনুবাদ করিয়াছিলেন ইংরেজী হইতে।

কবিতা-ছড়া রচনায় হেমেন্দ্রকুমার ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শিষ্য। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার যোগও ঘটিয়াছিল ভারতী-গোষ্ঠীর মাধ্যমে। কবিতা-ছড়া রচনায় তাঁহার সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় রহিয়াছে মৌচাক পত্রিকায় (?) প্রকাশিত এই ছড়ার মালায়।

কে সদরে নাড়ছে কড়া এখন দুপুরে ?
কে ধরে রে ইলিশ-ছানা উনিশ-বিঘে পুকুরে ?

অশোকবাবু ? আসুন আসুন। আসন পেতে আসুন দি,
অমন করে গোসলখানায় খাবেন না আর কাসুন্দি।

রস গোল্লার গোল্লা খতম, রস যে পড়ে চল্‌কে।
বটুক বাবু গুড়ক টানেন, নেই যদিও কলকে।

কে নাচেরে মৌমাছি-নাচ সুধীর বাবুর আসরে ?
কে বাজায় রে ওস্তাদি-সুর ভাঙা ফাটা কাঁসরে ?...

গদাই ভায়া গদ্য লিখে সদ্য পাঠায় 'মৌচাকে',
তাই পড়ে ধরল মাথা, তাই ঘোষেদের উ-হাঁকে।...

হাবু বাবুর হাস্যে কাঁপে হোগল-কুড়িয়া,
হেথায় করে হাতাহাতি মোগল-উড়িয়া।

বাদলা গেল পাগলা হয়ে দেখে নতুন জোছনা,
ডাকছে খালি—'আয় মেঘ আয় আলোর লিখন মোছ্না।...'

মশার জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে কলের কামান দাগ্‌চি।
শব্দ শুনে ভিরমি গেল শ্রীঅপূর্ব বাগচী।...

বেড়াল দেখে মাসী বলে চিনতে পারে শার্দূলরা ?
লম্বা লোকের বুদ্ধি বেশী ? কিংবা চালাক বাঁটকুলরা ?

মা-কালীকে চমকে দিয়ে ধমকে ওঠে পট্‌কা,
'সোনার পাথরবাটিতে আজ কাঁচা কলার চটকা।'

একটাকাতে একটি মুড়ি অনেক খুঁজেও পেলুম না,
এই শনিবার তাইতে আমি মামার বাড়ি গেলুম না।

সর্বজনীন পূজার ভিড়ে সর্বজনের প্রাণান্ত,
শিঙে-ফোঁকার ইংরেজি কি ? জানিনে তার বানান তো ?

আমার লেখা পড়ে তোমরা ভাবছো কি তাই বল তো।
রাঁচীর মানুষ হচ্ছে মনে, বেশ সেখানেই চল তো।

আমার হয়ে দাও যদি কেউ রাঁচীর ভাড়া চুকিয়ে,
গারদখানায় যেতে বললেও পড়বে নাকো লুকিয়ে।

ছড়াগুলি ছেলে-বুড়ো দুইকেই ভোলায়।

গদ্যে হেমেন্দ্রকুমার মণিলালের অনুসারী। এবং সেইহেতু ভাবালুতার আতিশয্য স্থানে স্থানে অত্যন্ত স্পষ্ট। হেমেন্দ্রকুমার প্রধানত গল্পই লিখিয়াছেন। ইঁহার উপন্যাস প্রায়ই বড় গল্প ছাড়া আর কিছু নয়।

হেমেন্দ্রকুমারের গল্পের বই হইতেছে,—'পসরা' (১৩২২ সাল), 'মধুপর্ক' (১৩২৪ সাল), 'সিঁদুর চুপড়ী' (১৩২৮ সাল), 'মালা-চন্দন' (১৩২৯ সাল), 'বেনোজল' (১৩৩১ সাল), 'শূন্যতার প্রেম' (১৩৩৯ সাল) ইত্যাদি। বড় গল্প বা উপন্যাস,—'জলের আল্‌পনা' (১৩২৬ সাল), 'কাল-বৈশাখী' (১৯২১), 'পায়ের ধুলো' (১৩২৮ সাল), 'ঝড়ের যাত্রী' (১৩৩০ সাল), 'পদ্মকাঁটা' (১৯২৪) ইত্যাদি। 'রসকলি' (১৩২৯ সাল) সরস উপন্যাস। 'সুচরিতা' (১৩২৮ সাল) এবং 'ভোরের পূরবী' (১৩২৮ সাল) অনুবাদাত্মক। হেমেন্দ্রকুমারের 'আলেয়ার-আলো' (১৩২৫ সাল), চারুচন্দ্রের 'আলোকলতা' (১৩২৭ সাল) আর নিরুপমা দেবীর 'বন্ধু' (১৩২৮ সাল) প্রায় একই বিষয় লইয়া লেখা।

কাল-বৈশাখীর প্লটে রোমাঞ্চক উপন্যাসের বীজ আছে। নায়ক বিনোদ বিলাতি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের পাষণ্ডের মতো। পায়ের-ধূলোর কাহিনী বাস্তব ঘটনামূলক। সমাজ-পরিত্যক্ত নারীর সদ্‌গতির প্রচেষ্টা গল্পটিকে প্রচারলক্ষ্য করিয়াছে। ঝড়ের-যাত্রীতে এ প্রচেষ্টা প্রকটতর।

মণিলালের মতো হেমেন্দ্রকুমারেরও নাট্যশিল্পে অনুরাগ ছিল। মণিলালের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নাচঘর' বাহির হইয়াছিল (১৯২৫) তাহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী রচিত ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী অভিনীত 'সীতা' নাটকের কয়েকটি জনমনোহর গান ইঁহারই রচনা। হেমেন্দ্রকুমার যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা' উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দিয়াছিলেন (১৯৩১)। এটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীতও হইয়াছিল। ইহার অনেক আগে তিনি একটি প্রহসন লিখিয়াছিলেন—'প্রেমের প্রেমারা' (১৯২০)। বইটি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

অধুনা ছেলেদের রোমাঞ্চক গল্প-উপন্যাসের লেখক হিসাবেই হেমেন্দ্রকুমারের জনপ্রিয়তা। যতদূর জানি, পাঁচকড়ি দে'র শিষ্যরূপেই হেমেন্দ্রকুমারের হাতেখড়ি বাঙ্গালা সাহিত্যে।

হেমেন্দ্রকুমারেব প্রথম রচিত ডিটেক্‌টিভ কাহিনী 'হীরার কণ্ঠী' বাহির হইয়াছিল অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল সঙ্কলিত 'উপন্যাস সঙ্কলন' (১৯০৯) গ্রন্থখানিতে। অপর লেখকের মধ্যে ছিলেন পাঁচকড়ি দে। গল্পটির মূল হেমেন্দ্রকুমারের নিজস্ব সংগ্রহ হওয়া অসম্ভব নয়। বড়বাজারের ধনী হিন্দুস্থানী ব্যবসায়ীদের সহিত হেমেন্দ্রকুমারদের কাজ-কারবার চলিত। সেই সূত্রে গল্পটি পাইয়া থাকিতে পারেন। ইংরেজী অবলম্বনে কয়েকটি ভালো ভূতের গল্পও ইনি লিখিয়াছিলেন।

হেমেন্দ্রকুমার রচিত ভৌতিক গল্পের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল 'কে ?'। গল্পটি এইরূপ ·

উড়িষ্যায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। আমি আর রূপলাল। এদেশে-সেদেশে ঘুরে ভুবনেশ্বরে গিয়ে হাজির হলুম।

এক দুপুরবেলায় খণ্ডগিরি আর উদয়গিরি দেখতে গেলুম। যাওয়ার সময় পাণ্ডা সাবধান করে দিলে, আমরা যেন সন্ধ্যা হবার আগেই ফিরে আসি, কারণ খণ্ডগিরিতে নাকি নরখাদক বাঘের বিষম উপদ্রব হয়েছে। বাঘের কবলে পড়ে একমাসের মধ্যে পাঁচজনের প্রাণ গিয়েছে।

একথা শুনে ভয় পেলুম না, কারণ আমাদের সঙ্গে বন্দুক ছিল।

খণ্ডগিরি আর উদয়গিরি দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এল, এবং বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সারা আকাশ কালো করে শুরু হল ঝড় ও বৃষ্টি।

তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ডাকবাংলোর ভিতরে আশ্রয় নিলুম।...

বেয়ারা বললে, "...একে এই ঝড়জল, তার ওপরে—শুনছেন তো ?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, বাঘের উপদ্রবের কথা বলছ তো ? শুনেছি।"

বেয়ারা বললে, "খালি বাঘ নয়, পেত্নীর ভয়ও আছে।"

রূপলাল বললে, "তা হলে আজ আমরা এই বাংলোতেই রাত কাটাব। জীবনে কখনো পেত্নী দেখিনি। আজ তাকে দেখব। আর, যদি পছন্দ হয়, তাহলে পেত্নীকে বিয়ে করে দেশে

ফিরব।"

রাত্রে খেতে বসেছি, এমন সময় বাংলোর দরজায় ঘনঘন করাঘাত হ'তে লাগল।...

বেয়ারা চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কে ?"

বাহির থেকে ভীত-কাতর নারীকণ্ঠে সাড়া এল, "শীগ্‌গির দরজা খুলে দাও। নইলে প্রাণে মারা গেলুম।"

...বেয়ারা বললে, "পায়ে পড়ি বাবু, দরজা খুলবেন না। ও মানুষ নয়।"

বাহির থেকে আবার আর্তস্বর শোনা গেল, "বাঘ, বাঘ। রক্ষা কর। রক্ষা কর।"

রূপলাল... এক টানে দরজার খিলটা খুলে দিলে।

একটা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে দরজা ঠেলে তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করলে একটা স্ত্রীমূর্তি।...বাতাসের ঝাপটে ঘরের আলোটা নিভে গেল।...

আলোটা জ্বাললুম।...দেখলুম ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে একটি অসীম রূপসী মেয়ে, ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।...মেয়েটি বললে,...'বড় বিপদ থেকেই আপনারা আমায় উদ্ধার করলেন।"

...সে খণ্ডগিরি দেখতে এসেছে।... হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি আসাতে এতক্ষণ সে একটা গুহার ভিতরে ঢুকে আত্মরক্ষা করছিল।... গুহার খুব কাছেই বাঘের ভীষণ গর্জন শুনে প্রাণের ভয়ে সে এখানে পালিয়ে এসেছে।...

...পাশের ঘরে যেতে যেতে বলল, 'এক রাত না খেলে কেউ মরে না।"...

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না। হঠাৎ কি একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে ধড়মড় করে জেগে উঠলুম। ...দেখলুম...পাশের ঘরে যাবার দরজার দিকে পিছন করে মাটির উপরে স্থিরভাবে বসে আছে প্রকাণ্ড একটা বাঘ।...তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লুম।... বাঘটা পাশের ঘরে গিয়ে পড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকণ্ঠে বারবার ভীষণ আর্তনাদ। দড়াম করে একটা দরজা খোলার শব্দ। দ্রুত পদধ্বনি। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ।...

পাশের ঘরে ছুটলুম।...কেউ নেই। ...ঘরের ভিতর থেকে একটা একটানা রক্তের রেখা বাহিরের দিকে সোজা চলে গিয়েছে। পরে পরে একখানা করে রক্তাক্ত পায়ের ছাপ। মানুষের পা।...

...বাইরে বেরিয়ে...দেখলুম কাদার উপর দিয়ে একজোড়া মানুষের পায়ের ছাপ বরাবর বনের দিকে চলে গেছে।...

"স্বপ্নো নু মায়া নু মতির্ভ্রমো নু" টাইপের এই গল্পটির বস্তু ইংরেজী থেকে নেওয়া হইতে পারে। আমাদের দেশে ঋক্‌বেদের কাল থেকে সেদিন পর্যন্ত নরসিংহ বা নরব্যাঘ্র উপাখ্যানের ধারাবাহিকতা আছে। এ ধারাবাহিকতা উপরের দিকে টানিলে ইন্দো-ইউরোপীয় ঐতিহ্য পর্যন্ত পৌঁছান যায়। ইংরেজীতে যে Werewolf-এর কথা আছে তা ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ হইতে আগত। সংস্কৃত রূপান্তর হইবে 'বীরবৃক'। ইহাই আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে নরসিংহ বা নৃসিংহ, বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। ছেলেবেলায় আমিও আমাদের দেশে প্রচলিত এমনি একটি গল্প শুনিয়াছিলাম।

হেমেন্দ্রকুমার বহু মাসিক পত্রিকার সহিত অল্পবিস্তর সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং প্রায় সব পত্রিকাতেই তাঁহার গল্প, কবিতা অথবা সঙ্কলন প্রবন্ধ বাহির হইত। সঙ্কলন প্রবন্ধগুলি একদা 'প্রসাদ রায়' এই ছদ্মনামে বাহির হইত। এই নাম নেওয়া সার্থক হইয়াছিল। হেমেন্দ্রকুমারের রচনারীতি সহজ সরল ও প্রসন্ন।

হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে আর একজন লেখকের নাম আসিয়া পড়ে,—হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৯২-১৯৩৫)। হেমেন্দ্রলাল গদ্য-পদ্য দুই-ই সমতালে লিখিতেন। 'ফুলের ব্যথা' (১৩২৯ সাল) কবিতার বই। প্রমথ চৌধুরী বইটির কবিতাগুলি বাছাই করিয়া দিয়াছিলেন। 'মণিদীপা'য় (১৯৩২) অন্য ভারতীয় ভাষায় লেখা কতকগুলি কবিতার বঙ্গানুবাদ আছে। 'মায়ামৃগ' (১৩৩২ সাল) গল্পের বই। 'ঝড়ের দোলা' (১৩৩২ সাল) ও 'মায়া-কাজল' (১৩৩৭ সাল) উপন্যাস বা বড় গল্প। 'গল্পের আল্‌পনা' (দ্বি-স ১৩৪৪ সাল) ছোটদের গল্প-সঙ্কলন। ঝড়ের দোলায় শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের প্রভাব আছে। সংস্কার-প্রচেষ্টার চিহ্নও সুস্পষ্ট ॥

১১ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর (১৮৯০-১৯৬৪) রচনাগুলি সাধারণত ছোট অথবা বড় গল্প কিংবা আত্মকথা। কাহিনী প্রায়ই অভিজ্ঞতাশ্রিত, বস্তুনিষ্ঠ অথবা বাস্তবঘেঁষা। রচনারীতি বিশেষভাবে কথ্যভাষাশ্রিত এবং ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক। ইঁহার গল্প ও বড়গল্পের বই—'বাজীকর' (১৯২২), 'অচলপথের যাত্রী' (১৯৩২), 'ঝড়ের পাখী' (১৩২৪ সাল), 'চাষার মেয়ে' (১৯২৪), 'অরুণা' (১৯২৫), 'দুই রাত্রি' (১৯২৭), 'কল্পনা দেবী' (১৯৩১) ও 'স্বর্গের চাবি' (১৯২৪, দ্বি-স ১৯৪৬), ইত্যাদি। দুই-রাত্রির রচনায় শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' গল্পের ছায়া পড়িয়াছে। ইঁহার বোধ করি বিশিষ্টতম রচনা জীবনস্মৃতিমূলক 'মহাস্থবির জাতক' তিন খণ্ড (১৯৪৪)। লেখকের জীবনভাবনায় কিছু তিক্ততা ছিল তাহা তাঁহার রচনায় ব্যঙ্গ রসের তিক্ততা বাড়াইয়া রচনারীতিকে ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ করিয়াছে। কলিকাতার সামাজিক ইতিহাসের উপাদানও ইহাতে কিছু আছে।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী 'নাচঘর' পত্রিকার প্রথম বছরে সহযোগী সম্পাদক ছিলেন ॥

১২ রূপকথা ও ছেলেমি রচনা

রবীন্দ্রনাথ ছেলে-ভুলানো গল্পকে অন্তঃপুরের নিরালা কোণ হইতে টানিয়া আনিয়া সাহিত্যের গোচর করাইয়াছিলেন। তাহার পর অবনীন্দ্রনাথ সে রীতিকে নিজের পথে চালাইলেন। সেকথা পূর্বে বলিয়াছি। সেই সঙ্গে মেয়েলি ছেলে-ভুলানো গল্পকে তাহার নিজস্ব রস বজায় রাখিয়া অর্থাৎ মুখের ভাষায় কাব্যের রস ঢালিয়া দিয়া পাঠক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭)। ইঁহার বহুকাল পূর্বে একাজে ব্রতী এবং সার্থক হইয়াছিলেন লালবিহারী দে। কিন্তু তিনি গল্পগুলিকে ইংরেজীতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ('পশ্চিমোদয়' দ্রষ্টব্য)

রূপকথা-ব্রতকথা সংগ্রহ কাজে প্রথম উদ্যোগ দেখা দিয়াছিল সাধনায়, তাহার পর ভারতীতে। ১৩০২ সালের ভারতীতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি ব্রতকথা কাহিনী লিখিয়াছিলেন। পরেও অনেকে লিখিয়াছিলেন। দক্ষিণারঞ্জনের লেখাও প্রথম ভারতীতেই বাহির হইয়াছিল (১৩১৫)।

১৩ দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭) ব্রতকথা ও ছেলে-ভুলানো গল্প সংগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব গল্প-বলিয়ের ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন কবিতা লিখিতে পারিতেন, ছবি আঁকিতে পারিতেন। সেজন্য তাঁহার বর্ণনা যথাসম্ভব স্বাভাবিক। কাঁচা হাতের ছবিগুলিও শিশুর কৌতূহলবর্দ্ধক। দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থ অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল এবং সেই সমাদর এখনও অব্যাহত।

ইঁহার প্রথম সংগ্রহ 'ঠাকুরমার ঝুলি' (প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩১৪ সাল, ১৯০৮)। রবীন্দ্রনাথ বইটির পাণ্ডুলিপি পড়িয়া এই কথা লিখিয়াছিলেন ·

> ঠাকুবমার ঝুলির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে ? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেস্টারের কল হইতে তৈরি হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের "Fairy Tales" আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে। তাঁদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোন কোন স্থলে মার্টিনের এথিকস্ এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোটবই বাহির হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কোথায় গেল—রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র, কোথায় বেঙ্গমা বেঙ্গমী, কোথায়—সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মাণিক।...
>
> কিন্তু দক্ষিণাবাবুকে ধন্য ! তিনি ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে ; রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।
>
> এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলা দেশের আধুনিক দিদিমাদের জন্য অবিলম্বে একটা স্কুল খোলা হউক এবং দক্ষিণাবাবুর এই বইখানি অবলম্বন করিয়া শিশু-শয়ন-রাজ্যে পুনর্ব্বার 'তাঁহারা নিজেদের গৌরবের স্থান কধিকার করিয়া বিরাজ করিতে থাকুন।

গল্পগুলি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ 'দুধের সাগর', গল্পগুলি হইল—কলাবতী রাজকন্যা, ঘুমন্ত পরী, কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা, সাত ভাই চম্পা, শীত-বসন্ত ও কিরণমালা। দ্বিতীয় ভাগ 'রূপ-তরাসী', গল্পগুলি হইল—নীলকমল আর লালকমল, ডালিমকুমার, পাতাল-কন্যা মণিমালা ও সোনার কাটী রূপার কাটী। তৃতীয় ভাগ 'চ্যাং-ব্যাং', গল্পগুলি হইল—শিয়াল পণ্ডিত, সুখু আর দুখু, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী এবং দেড় আঙ্গুলে। চতুর্থ ভাগ 'আম-সন্দেশ', গল্পগুলি হইল—সোণা ঘুমাল, শেষ ও ফুরাল। মোট সতেরটি গল্প।

অধিকাংশ ভাগেব গোড়ায় দক্ষিণারঞ্জন গল্পটির মর্ম ছড়ায় কবিতায় দিয়াছেন। যেমন, দুধের সাগরে

> হাজার যুগের রাজপুত্র রাজকন্যা সবে
> রূপসাগরে সাঁতার দিয়ে আবার এল ভবে।...
> বিজন দেশে কোথায় যে সে ভাসালে' ভাই-বোন
> গড়লো অবাক্ অতুল পুরী পরম মনোরম !
> সোনার পাখী ভাঙ্গলে স্বপন কবে কি গান গেয়ে—
> লুকিয়ে ছিল এসব কথা 'দুধ-সাগরের' ঢেউয়ে।

তাহার পর গল্পগুলি যথাক্রমে বলা হইয়াছে।

ঠাকুরদাদার ঝুলি (১৯০৯)[২৫]একটু বয়স্কদের জন্য লেখা। ইহাতে পাঁচটি গল্প পাঁচ নায়িকার নামে—মধুমালা, পুষ্পমালা, মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা ও শঙ্খমালা। কাহিনীগুলি, বিশেষ করিয়া মধুমালা মধুমালতী নামে অযোধ্যা বিহার উড়িষ্যায় বহুকাল পূর্বে প্রচলিত ছিল। পূর্ববঙ্গেও এইগুলি রোমান্টিক লৌকিক কাহিনী রূপে সেদিন পর্যন্ত খুব জনপ্রিয় ছিল। (গল্পগুলির "নেটো"রূপ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় সংগৃহীত আছে।) প্রত্যেক গল্পের আরম্ভে দক্ষিণারঞ্জনের লেখা একটি ছড়া আছে। যেমন, 'মধুমালা'য়

> একহি কুমার ছিল নামেতে মদন।
> বারো হি বৎসর থাকে পাথর ভবন।
> থাকিতে রে তিন দিন বিধি হ'ল বাম।
> পাতাল পাথর ভেঙ্গে' বাহির হ'ল চাঁদ।...
> এতেক দুঃখের পর পূর্ণ ষোল কলা
> স্বপ্নেতে স্বরগ এনে' দিল মধুমালা—
> আহা,—উজানীনগরে!

দক্ষিণারঞ্জনের তৃতীয় মূল্যবান্ সঙ্কলন 'দাদামশায়ের থলে' (১৯১৩)। এই গ্রন্থে সঙ্কলিত সরস গল্পগুলি মাতামহেরই উপযুক্ত হাসি-তামাশায় ভরা। বইটিতে আটটি গল্প আছে, আরম্ভে ছড়ায় গল্পকথা, শেষে ছড়ায় 'উপদেশ'। যেমন প্রথম গল্প 'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী'র আরম্ভ ছড়া 'রসগোল্লা'—

> ঝরছে হাসি, ছুটছে হাসি, ফুটছে হাসি মুখে,
> লাল টুক্‌টুক মুখগুলি সব হাস্‌ছে মধুর সুখে!
> যেমন রাজা তেমন মন্ত্রী, কে বা কাহার কম?
> করে' ফেল্লে মস্ত বিচার—অদ্ভুত রকম!...
> নূতন জামাই কবে প্রথম গেলেন শ্বশুরবাড়ী,
> রান্নাঘরে খুঁজতে গেলেন মিষ্টান্নের হাঁড়ি!
> মিষ্টান্ন খেলেন জামাই কেমন চমৎকার?
> রসগোল্লার হাঁড়ির মাঝে খোঁজটি লেখা তার।

উপদেশ ছড়া :

> মূর্খ-সনে স্বর্গ সুখেও কেউ ক'রো না বাস।
> একদিন ঘটিতে পারে, মহা সর্বনাশ...

দক্ষিণারঞ্জনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য চতুর্থ গ্রন্থ হইল স্বাধীন গদ্যরচনা—কিশোর উপন্যাস 'চারু ও হারু' (১৯১২)। একই গ্রামের দুই সমবয়স্ক বালক চারু ও হারু। উভয়েরই মা নাই, চারুর পিতা জমিদার। হারুর পিতা জমিদারের প্রজা, দরিদ্র। দুইজনেই এক পাঠশালায় পড়িত। চারু উদ্ধত, দুষ্ট, পড়াশোনায় মন নাই। হারু বিনীত, শিষ্ট, মন দিয়া পড়াশোনা করে। বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হইয়া হারু সোনার পদক লাভ করিল, চারু অপদস্থ হইয়া গাধার টুপি পরিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভালোমন্দ দুই বালকের

সহজ সরল চিত্র।

দক্ষিণারঞ্জন অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন জীবনের শেষ পর্যন্ত। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ হইল সাধারণ কবিতা পুস্তক 'উত্থান' (১৯০২), আর শেষ গ্রন্থ হইল 'আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী' (১৯৪৮)। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা হইল বিশ ॥

১৪ শ্যামাচরণ দে প্রভৃতি

অতঃপর উল্লেখযোগ্য ছেলে-ভুলানো গল্পের সংগ্রাহক ছিলেন শ্যামাচরণ দে, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও সত্যচরণ চক্রবর্তী। তাহা ছাড়া বটতলার বহু প্রকাশক স্বনামে, বেনামে ও অনামে অনেক রূপকথাসংগ্রহ পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ দে'র উল্লেখযোগ্য বই হইল 'খোকার হাসি' (১৯০৪), 'অনার্যের উপকথা' (১৯১৪) ও 'কাশ্মীরী উপকথা' (১৯২৪)। সৌরীন্দ্রমোহনের উল্লেখযোগ্য প্রথম বই হইল 'সাঁঝের বাতি' (১৯১২)। সত্যচরণ চক্রবর্তীর উল্লেখযোগ্য বই হইল 'সোনার চাঁদ' (১৯১৩), 'দৈত্যপুরী' (১৯১৫), 'ঠাকুরমার ঝোলা' (১৯১৮), 'ঠাকুরদাদার ঝোলা' (১৯২০), 'মজার গল্প' (১৯২২), 'ডাইনী-মাসী' (১৯২২), 'ঠানদিদির গল্প' (১৯২৮) এবং 'দাদুর দপ্তর' (১৯২৮) ॥

১৫ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সুখলতা রাও

ভারতবর্ষে হাফটোন-ব্লক শিল্পের প্রবর্তক, চিত্রশিল্পী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯১৫) 'টুনটুনির বই' (১৯১০) ছেলে-ভুলানো গল্পের একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। গল্পগুলি যেন মুখ হইতে টাটকা টাটকা সঙ্কলিত। লাইন-চিত্রগুলি গল্পের আকর্ষণীয়তা বাড়াইয়া দিয়াছে। উপেন্দ্রকিশোবের সন্তানেরাও ছোটদেব রচনায় সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন।

সুখলতা রাওয়ের (১৮৮৬-১৯৬৯) 'গল্পের বই' (১৯১৩) এবং 'আরো গল্প' বই দুটি টুনটুনির-বইয়ের মতো ঝরঝরে লেখা ॥

১৬ সুকুমার রায় (চৌধুরী)

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র সুকুমার রায় (চৌধুরী) (১৮৮৭-১৯২৩) ভারতীর বৈঠকের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। চিত্রশিল্পে—ফটোগ্রাফিতে—এবং ছোটদের জন্য গদ্য-পদ্য রচনায় ইঁহার অত্যন্ত নিপুণতা ছিল।

যে "ছেলে-ভুলানো" (—'বুড়োনাচানো'ও বটে—) রচনার জন্য সুকুমার রায় আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে অনন্য বলে পরিগণিত তার কিছু আদর্শ সংগৃহীত হইয়াছিল বাঙ্গালা ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে। বাঙ্গালা আদর্শ পাইয়াছিলেন তিনি পূর্বাপর প্রচলিত অপৌরুষেয় ছড়া, গান ও গল্প হইতে আর ইংরেজী আদর্শ মিলিয়াছিল প্রধানত এডোয়ার্ড লীয়রের ছড়া আর লুইস ক্যারলের (আসল নাম চার্লস লুইস ডবসন [১৮২৩-৯৮]) গল্প, ছড়া ও ছবি হইতে। এছাড়াও আরেকটি প্রবলতর আদর্শ ছিল, তাহা হইল রবীন্দ্রনাথের বিশেষ

কতকগুলি রচনা। যথা—"হাস্যকৌতুক" পুস্তিকায় সঙ্কলিত নাট্যখণ্ডগুলি, "বৈকুণ্ঠের খাতা" প্রহসন, "চিরকুমার সভা" নামে ভারতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত "প্রজাপতির নির্বন্ধ" নামক গ্রন্থটি এবং "হিং টিং ছট"-এর মতো কবিতা।

ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে পিতার সযত্নলালিত সুকুমার রায় পিতৃগুণের যথার্থ উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। পিতা উপেন্দ্রকিশোর (১৮৬৩-১৯১৫) নানা গুণের অধিকারী বিদগ্ধ পুরুষ ছিলেন। ছবি আঁকায়, গানবাজনায়, গান রচনায়, অল্পবয়সীদের জন্য গল্পরচনায়, ফটোগ্রাফিতে, ফটোগ্রাফি মুদ্রণে, ছাপার কাজে ইনি সবিশেষ নিপুণ ছিলেন। গানবাজনা বাদে (?) পিতার সব গুণই সুকুমার রায় যেন উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। এক ধবনেব ছেলেমি রচনায় তাঁর উৎকর্ষ অবিসম্বাদিত।

১৯০৬ অব্দে বি. এস-সি পরীক্ষায় পাস করার পর সুকুমার রায় ভাইবোন ও আত্মীয়স্বজনদের লইয়া গঠিত 'ননসেন্স ক্লাবে'র নাট্যাভিনয়ের জন্য দুইটি কৌতুকনাট্য—'ঝালাপালা' ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' রচনা করিয়াছিলেন। রচনা দুইটি লেখকের মৃত্যুর পরে সন্দেশ পত্রিকায় ১৩৩১ সালে যথাক্রমে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ঝালাপালা'র ঠাট লেখক পাইয়াছিলেন ববীন্দ্রনাথের 'একান্নবর্তী' রচনা (রচনাকাল বৈশাখ ১২৯৪, 'হাস্যকৌতুক' গ্রন্থে সঙ্কলিত) হইতে।

১৯১১ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন ঘোষ এনডাওমেন্টের একটি বৃত্তিলাভ করিয়া চিত্রমুদ্রণশিল্পের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষালাভের জন্য বিলাত গিয়াছিলেন। ১৯১৩ অব্দে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইতিমধ্যে পিতা উপেন্দ্রকিশোর প্রবর্তিত (১৩১৮ সাল) সন্দেশ পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন। সন্দেশ-এ তাঁহার নূতন ধরনের ছড়া 'ননসেন্স ভার্স' এবং ব্যঙ্গ ছবি বাহির হইতে থাকে। অতঃপর আরও দুইটি কৌতুকনাট্য লিখিলেন : 'চলচিত্তচঞ্চরি' (প্রকাশ বিচিত্রা, ১৩১৪ সাল) এবং 'শব্দকল্পদ্রুম' (প্রকাশ অলকা, মাঘ ১৩৬৪)। ভগিনী পুণ্যলতা চক্রবর্তীর সাক্ষ্য অনুসারে ১৯১৭ অব্দে শান্তিনিকেতনে শারদোৎসব উপলক্ষ্যে শব্দকল্পদ্রুম অভিনীত হইয়াছিল। অনুমান হয় এই দুইটি কৌতুকনাট্য লেখা হইয়াছিল ১৯১৫-র শেষার্ধ হইতে ১৯১৭ অব্দের প্রথমার্ধের মধ্যে। ১৯১৫ অব্দে পিতার মৃত্যুর পর সুকুমার রায় তাঁর বিশিষ্ট বিদগ্ধ বন্ধুদের—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বৈজ্ঞানিক প্রশান্তকুমার মহলানবীশ প্রভৃতি—লইয়া মান্ডে ক্লাব ("মণ্ডা" ক্লাব) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মাণ্ডে ক্লাবের বৈশিষ্ট্য প্রকট করিবার জন্যই কি 'চলচিত্তচঞ্চরী' বইটি লেখা হইয়াছিল ? সুকুমার রায় অত্যন্ত সমাজসচেতন ছিলেন। তাঁর সময়ে ব্রাহ্মসমাজে ও ব্রাহ্মপ্রভাবিত হিন্দুসমাজে যেসব ছোটখাটো গোষ্ঠী ও দল দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল সে বিষয়ে তাঁর নিপুণ দৃষ্টিতে এই কৌতুকনাট্যটি নির্মিত। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে ব্রাহ্মসমাজে আদি, সাধারণ (ভারতবর্ষীয়) ও নববিধান এই তিনটি প্রধান শাখা ছাড়াও কয়েকটি উপশাখা গজাইয়াছিল। এই উপশাখাগুলির উদ্‌গমের বেশ কিছু কারণও ছিল। এক) আদি সমাজের হিন্দুত্বের পক্ষপাতিত্ব ; দুই) সাধারণ সমাজে

গুরুবাদের ছোঁয়াচ, এবং তিন) নববিধান সমাজের ক্রমাবসাদের ভাব। এই দল-বেদলের কোলাহল—মোহ নয়—প্রতিবিম্বিত হইয়াছে চলচিত্তচঞ্চরিতে। এই কাহিনীর মধ্যে বাস্তব মানুষগুলি ধরা পড়ে না তবে আভাসে জানা যায়।

সুকুমার রায়ের কৌতুকনাট্যগুলির মধ্যে সব দিক দিয়া দেখিলে শব্দকল্পদ্রুম শ্রেষ্ঠ (রিপ্রেজেন্টেটিভ)। নাটকটির মধ্যে লেখকের রচনাশক্তির সব্যসাচিত্বের পরিচয় আছে : কৌতুকনাট্য ও নন্‌সেন্স কাব্য। বিষয়—হিন্দুদের আধ্যাত্মিক বিবাদ-বিসম্বাদ। এই ছড়া অংশটিতে লেখক তাঁর শব্দভাণ্ডার ঘটিত নন্‌সেন্স শিল্পের তত্ত্বকথাটুকু চমৎকারভাবে বলিয়াছেন। যেমন

শব্দ পিছে শব্দ জুড়ি চক্রে গাঁথি মায়া
বাক্য ফিরে ছদ্মদেহে বিশ্ব তারি ছায়া
যাঁহা স্বর্গ তাঁহা মর্ত্য তাঁহা পাতালপুরী
সত্য মিথ্যা একই মূর্তি খেলছে লুকোচুরি।
ভালোমন্দ বিষম ধন্দ কিছু না যায় বোঝা
সহজ কথায় মোচড় দিয়ে বাঁকিয়ে করে সোজা।
ভক্ত বলেন, "আদ্যিকালের সাদার নামই কালো
আঁধার ঘন জমাট হলে তারেই বলে আলো।"
শাস্ত্রে বলে "সৃষ্টি মূলে শব্দ ছিল আদি
জগৎস্রোতে জড়ের বাঁধন শব্দে রাখে বাঁধি।"

উপসংহারে গুরুবাক্যটুকু চমৎকার,

গুরুজি। শব্দকে যে অর্থ দিয়ে ভোলায়—সে অর্থপিশাচ। শব্দকে আটকাতে গিয়ে সে নিজেই আট্‌কা পড়ে। নিজেকেও ঠকায়, শব্দকেও বঞ্চিত করে।...

সন্দেশ-এ প্রকাশিত "নন্‌সেন্স" পদ্যগুলি সুকুমার রায় 'আবোল তাবোল' নাম দিয়া গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করিয়াছিলেন। (প্রকাশিত হইবার কয়েকদিন পূর্বে তাঁর মৃত্যু ঘটে।) 'আবোল তাবোল' নামটি 'নন্‌সেন্স ভার্স'-এর খাঁটি বাঙ্গালা প্রতিশব্দ। সুকুমার রায়ের যশ যে বাঙ্গালী সমাজে প্রধানত আবোল-তাবোল-এর উপর প্রতিষ্ঠিত তা বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। আবোল-তাবোল-এর পদ্যগুলির মধ্যে এমন দু'একটি রচনা আছে যার মর্ম বেশ গভীর অথচ বাহিরের আবরণ অত্যন্ত লঘু। শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হইল 'রামগরুড়ের ছানা'।

রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে,
"হাস্‌ব না-না, না-না।"

সদাই মরে ত্রাসে— ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।

ঘুম নাহি তার চোখে   আপনি ব'কে ব'কে
আপনারে কয়, "হাসিস্ যদি
মারব কিন্তু তোকে !"

যায় না বনের কাছে,   কিম্বা গাছে গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে।

সোয়াস্তি নেই মনে—   মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে।

ঝোপের ধারে ধারে   রাতের অন্ধকারে
জোনাক্ জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।

হাসতে হাসতে যারা   হচ্ছে কেবল সারা
রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা ?

রামগরুড়ের বাসা   ধমক দিয়ে ঠাসা,
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা। [২৬]

'আবোল তাবোল' নামে দুইটি কবিতা আছে। একটি (প্রকাশ সন্দেশ, মাঘ ১৩২২) 'আবোল তাবোল' গ্রন্থে সঙ্কলিত, দ্বিতীয়টি (প্রকাশ সন্দেশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪) "সুকুমার সাহিত্য সমগ্র"[২৭] প্রথম খণ্ডে "অন্যান্য কবিতা"-র অন্তর্গত। কবিতা দুইটিতে নামটির দুইটি বিভিন্ন অর্থ প্রতিফলিত। প্রথমটির অর্থ বিচ্ছিন্ন (অনুলোম) উক্তি, দ্বিতীয়টির অর্থ বিরুদ্ধ (প্রতিলোম) উক্তি। কবিতা দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম কবিতা :

আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।
আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর।
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন্ সুদুর।

আয় খ্যাপা-মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন্ ধিন্,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাবহীন।
আজগুবি চাল্ বেঠিক বেতাল
মাত্‌বি মাতাল রঙ্গেতে—
আয়রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে॥

দ্বিতীয় কবিতা :

এক যে ছিল রাজা—(থুড়ি
রাজা নয় সে ডাইনি বুড়ি)।
তার যে ছিল ময়ূর—(না না,
ময়ুর কিসের ? ছাগল ছানা)।
উঠানে তার থাক্‌ত পোঁতা—
—(বাড়িই নেই, তার উঠান কোথা) ?
শুনেছি তার পিশ্‌তুতো ভাই—
—(ভাই নয়ত, মামা-গোঁসাই)।
বল্‌ত সে তাব শিষ্যটিরে—
—(জন্ম-বোবা, বল্‌বে কিরে)।
যা হোক, তারা তিনটি প্রাণী—
—(পাঁচটি তারা, সবাই জানি !)
থও না বাপু খ্যাঁচাখেঁচি
—(আচ্ছা বল, চুপ করেছি)॥
তারপরে যেই সন্ধ্যাবেলা,
যেম্নি না তার ওষুধ গেলা,
অম্‌নি তেড়ে জটায় ধরা—
—(কোথায় জটা ? টাক যে ভরা !)
হোক্ না টেকো তোর তাতে কি ?
গোম্‌রামুখো মুখ্যু ঢেঁকি !
ধরব ঠেসে টুঁটির পরে
পিট্‌ব তোমার মুণ্ডু ধরে।
এখন বাছা পালাও কোথা ?
গল্প বলা সহজ কথা ?

সুকুমার রায়ের একটি দীর্ঘ কবিতা 'অতীতের ছবি' পুস্তিকারূপে মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়াছিল ১৯২২ অব্দের জানুয়ারি মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'মাঘোৎসব' সপ্তাহের বালক-বালিকা সম্মেলন উপলক্ষ্যে। লেখকের জীবৎকালে প্রকাশিত একমাত্র গ্রন্থ এই কবিতাটিতে তিরোভূত মহৎ ব্রাহ্ম নেতাদের—যেমন, রামমোহন রায়, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ

গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ রায়, কান্তিচন্দ্র মিত্র, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, বঙ্গচন্দ্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও কালীনারায়ণ গুপ্ত—গুণাবলী সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে।

আরম্ভ :

ছিল এ-ভারতে এমন দিন
মানুষের মন ছিল স্বাধীন ;
সহজ উদার সরল প্রাণে
বিস্ময়ে চাহিত জগত পানে।...

সমাপ্তি :

ফুরাল কি সব হেথায় আসি ?
আসিবে না প্রেম জড়তা নাশি ?
জাগিবে না প্রাণ ব্যাকুল হয়ে,
নব নব বাণী জীবনে লয়ে ?
জ্বলিবে না নব সাধন শিখা ?
নব ইতিহাসে হবে না লিখা ?
চিররুদ্ধ রবে পূজার দ্বার ?
আসিবে না নব পূজারী আর ?
কোথাও আশার আলো কি নাহি ?
শুধাই সবার বদন চাহি ॥

এই তালিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংস, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুল্লেখ অত্যন্ত বিস্ময়াবহ।[২৪]

১৭ পশ্চিমোদয়

বাঙ্গালা রূপকথার নিছক মালা গাঁথার গৌরব পাদরী লালবিহারী দে-র প্রাপ্য। তবে ইনি গল্পগুলি বাঙ্গালায় প্রকাশ করেন নাই, করিয়াছিলেন ইংরেজীতে : Folk-Tales of Bengal (প্রথম প্রকাশ লন্ডনে ১৮৮৩ অব্দে)। ইউরোপ-আমেরিকায় গল্পগুলি সঙ্গে সঙ্গে সমাদৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালায় পৌঁছিতেও বিলম্ব হয় নাই।

১৮ রেভারেন্ড লালবিহারী দে

পাদরী লালবিহারী দে কালনা মিশনারী স্কুল ছাড়িয়া যখন বহরমপুরের ইংরেজী স্কুলের হেডমাস্টারের কর্মভার লইয়া আসেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও 'মৃণালিনী' উপন্যাসের প্রকাশের পর বদলী হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে বহরমপুরে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী মনীষীদের জমায়েত ঘটিয়াছিল। লালবিহারী ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে কিছু ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ঘটিয়াছিল। তাহার ফলে উভয়ের রচনায় কিছু ক্রিয়া-প্রক্রিয়াও ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র ও লালবিহারী 'Bengal Magazine'-এর

প্রকাশ কল্পনাও করিয়াছিলেন।

ইংরেজী ১৮৭১ অব্দের জানুয়ারি মাসে উত্তরপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেন যে ইংরেজী অথবা বাংলায় শ্রেষ্ঠ গল্প-উপন্যাস লেখককে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিবেন। এই পুরস্কারের জন্য লালবিহারী ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন 'বিষবৃক্ষ', আর লালবিহারী অম্বিকা-কালনা হইতে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা 'অরুণোদয়'-এ তাঁহার যে 'চন্দ্রসখী' উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার জের টানিয়া নিজের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে একটি চিত্র-চরিত্র জাতীয় অ-রোমান্টিক বাস্তব উপন্যাস লিখিয়া প্রকাশিত করিতে থাকেন। উভয়ের রচনাগুলি পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছিল ১৮৭২ অব্দে। লালবিহারীর বইটির নাম ছিল 'Govinda Samanta'।

লালবিহারী তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ এই

১৮৭১ অব্দের গোড়ার দিকে উত্তরপাড়ার জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাংলায় অথবা ইংরেজীতে বাংলার গ্রামীণ চাষী মজুর অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের সাধারণ গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বনে একটি উপন্যাস লেখার জন্য ৫০ পাউন্ড শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৮৭২ অব্দে রচনাগুলি বিচারক মণ্ডলীর নিকট পাঠানো হয়। কিন্তু দুইজন বিচারকের অনুপস্থিতিতে ও অন্য কিছু কারণে ১৮৭৪ অব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত যতক্ষণ না শেষের পাতাগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয় পুরস্কার প্রদান করা হয় নাই। একথা ঠিক যে মূল গ্রন্থটির জন্য পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল তাহাতে শেষের তিনটি পরিচ্ছেদ ছিল প্রয়োজনীয়। এইগুলিতে ছিল সমসাময়িক সময়ের বর্ণনা।

যে কয়েকজন ইংরাজ ভদ্রলোক এই পুস্তকটির প্রকাশনায় সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদের উল্লেখ না করিয়া পারি না। সর্বপ্রথমে কলিকাতার মেসার্স জি. সি. হে. এন্ড কোং (Messers G. C Hey and Co)-এর মিস্টার গর্ডন রব (Mr. Gordon Robb)-কে ধন্যবাদ জানাইতেছি বইটিকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করা এবং আমাকে প্রকাশকদের নিকট উপস্থিত করাইবার জন্য। পাণ্ডুলিপি পাঠ এবং পুস্তকটির বিষয়ে অনুকূল মতামত জ্ঞাপনের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি এডিনবরা ডেইলি রিভিউ (Edinburgh Daily Review)-র বর্তমান সম্পাদক এবং পরবর্তী কালে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' (Friend of India)-র সম্পাদক ডঃ জর্জ স্মিথ (Dr. George Smith)-কে। ধন্যবাদ জানাই কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি জে. বি. ফেয়ার (Honourable J B. Phear)-কে কেবল পাণ্ডুলিপি পাঠ নয় সহৃদয়ভাবে কিছু কিছু বিষয়ের প্রকাশভঙ্গিমার পরিবর্তনে তাঁহার পরামর্শ দানের জন্য। সর্বশেষে প্রুফ সংশোধন, পরিণত প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং রুচিশীলতার জন্য ধন্যবাদ জানাই কেমব্রিজের অধ্যাপক ই. বি. কাওয়েল (Professor E. B. Cowell)-কে।

হুগলী কলেজ, চুঁচুড়া — লালবিহারী দে
২৭ নভেম্বর ১৮৭৪

"গোবিন্দ সামন্ত" বইটিতে গোবিন্দ অন্যতম চরিত্র হইলেও নায়ক নহেন। এই বিবেচনায় লালবিহারী পরবর্তী সংস্করণে (১৮৭৮) কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া "বেঙ্গল পেজেন্ট লাইফ" ("Bengal Peasant Life") অর্থাৎ "বাঙালী কৃষক পরিবার" নামকরণ করেন। বেঙ্গল পেজেন্ট লাইফ পুস্তকটি ৬১টি পরিচ্ছেদ (Chapter)-এ

বিভক্ত। এগুলির নাম যথাক্রমে :

১. পাঠকের সঠিক প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত বিষয়, ২. এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের পরিচয়, ৩. বাঙ্গালার একটি গ্রামের রূপ, ৪. একটি গ্রাম্য দৃশ্যের বর্ণনা ও একটি নায়ক পুরুষের প্রবেশ, ৫-৬. এক প্রজা-গৃহস্থের সংসার-চিত্র, ৭. সন্তান পালন, ৮. গ্রামের জ্যোতিষী, ৯. একটি বিশেষ বিচার, ১০. পঞ্চায়েৎ, ১১. সাংসারিক ব্যাপার, ১২. গ্রামের পণ্ডিতমশাই, ১৩. ঘটকঠাকুর, ১৪. মালতীর বিবাহ, ১৫. বাসরঘর, ১৬. গ্রামের ভূত, ১৭. গোবিন্দ, ইস্কুলের পড়ুয়া, ১৮. সতী, ১৯. সন্ধ্যাবেলায় ঘরে, ২০.হিন্দু ঘরের বিধবা, ২১. নানা রকম, ২২. গ্রাম্য দৃশ্য, ২৩. গোবিন্দের সঙ্গীরা, ২৪. অদ্ভুত ঘটনা, ২৫. গ্রামের হাট, ২৬. মেয়েলি ঘোঁট, ২৭. শাশুড়ির মিষ্ট কথা, ২৮. দুর্গানগরের ঘটনা, ২৯. ধানের কথা, ৩০. নবান্ন, ৩১. ফসল তোলা, ৩২. আনুষ্ঠানিক ব্যাপার, ৩৩. আখের চাষ, ৩৪. আদুরী বৈষ্ণবী হইল, ৩৫. অলঙ্গ তীর্থযাত্রায়, ৩৬. রথযাত্রা উৎসব, ৩৭. বাঙ্গালার জ্বর ও জোঁক, (এইখানে প্রথম খণ্ড শেষ), ৩৮. অবস্থাগতিক, ৩৯. কাঞ্চনপুরের জমিদার, ৪০. কামারশালায় পলিটিক্‌স্‌, ৪১. জমিদারের কাছে, ৪২. অভিযোগ, ৪৩. আগুন! আগুন! ৪৪. মহাজনের দাপট, ৪৫. গ্রামের মদভাঁটি, ৪৬. দুর্গানগরের নীলচাষী, ৪৭. সুবিধা, ৪৮. দুর্গানগরের জমিদার, ৪৯. নীলের ব্যাপার, ৫০. বাঙ্গালীর বীরত্ব, ৫১. বিবাদ, ৫২. শ্বশুরবাড়ির ঘটনা, ৫৩. পুলিশের তদ্‌বির, ৫৪. মাধবের জীবনাবসান, ৫৫. গৃহদেবতা, ৫৬. উল্লাসের দিন, ৫৭. কালামাণিক, ৫৮. পঞ্চম সুর, ৫৯. প্রজা, ৬০. মহামারী, ৬১. সমাপ্তি ; দেশিশব্দের তালিকা।

সংক্ষেপে গোবিন্দ সামন্ত কাহিনীটি হইল নিম্নরূপ :

বর্ধমান শহর থেকে প্রায় ছ' মাইল উত্তর-পূর্বের একটা গ্রাম কাঞ্চনপুর। এপ্রিল মাসের গুমোট গরমে একদিন মধ্যরাত পার হইয়া যখন ভোর হইতে আর বাকী নেই তখন একটি লোককে দেখা গেল কাঞ্চনপুরের রাস্তায়। গায়ে জামা নেই, কোমরে জড়ানো ধুতিটা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিতেছে। হাতে মোটা বাঁশের লাঠি। মোড় ঘুরিবার সময় গ্রামের চৌকিদার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এত রাতে কে যায় ?" সে উত্তর দিল—"আমি রায়ত মাণিক সামন্ত, রূপার মাকে আনিতে যাইতেছি।" "একটু তাড়া আছে" বলিয়া সে হনহন করিয়া চলিয়া গেল। তারপর যখন রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হইয়াছে তখন সেই মাণিক সামন্ত রূপা ও তাহার মাকে লইয়া একটি বাড়িতে ঢুকিল।

কাঞ্চনপুর গ্রামে ছত্রিশ জাতি সমেত প্রায় পনেরশো লোকের বাস। উত্তর দক্ষিণে কায়স্থ আর বণিকদের অনেকগুলি পাকা বাড়ি। হিমসাগর আর কৃষ্ণসাগর নামে দুটি বড় পুকুর আছে। সারা গ্রামে তিনটি আশ্চর্য জিনিস আছে : এক—গ্রামের দক্ষিণে দুডজন পলাশগাছের একটা সারি, দুই—একটি ঝাঁকড়া বকুল গাছ আর তিন—একটি দেখিবার মতো বিশাল বট গাছ, যার পুরোনো ঝুরিতে অনেকটা জায়গা ঢাকা পড়িয়াছে।

বাঙ্গালাদেশে লাঙলের চেহারার সঙ্গে গ্রীস বা রোমের লাঙলের সাদৃশ্য আছে। মাণিক এ রকমের লাঙল লইয়া চাষ করিতেছে। দিনের শেষে মাণিক, বদন, গয়ারাম তিন ভাই হুঁকা-তামাক সেবন করিল। তামাক বাঙ্গালী রায়তের প্রাণ।

বদন বড় ভাই। তাহার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। বদন সামান্য চাষী। একান্নবর্তী পরিবার তাহাদের।

অন্নপ্রাশনের দিন নবজাতকের নামকরণ হইল : গোবিন্দ সামন্ত।

ইতিমধ্যে গোবিন্দর একটি কোষ্ঠী তৈরী করানো হইল।

গোবিন্দর হাতেখড়ির ব্যবস্থাও হইল, যদিও বদনের মায়ের প্রথমে অমত ছিল। কারণ মায়ের জ্যেষ্ঠ ছেলে পাঠশালায় যাওয়ার এক বছরের মধ্যেই মারা যায়। আগুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার চল ছিল না।

বদনের চাপে মা গোবিন্দর পাঠশালায় ভর্তির ব্যাপারে আপত্তি করিলেন না। লেখাপড়া একটু না জানিলে চাষীকে পদে পদে জমিদার, মহাজন সবার হাতে ঠকিতে হয়। এ হইল বদনের যুক্তি।

ছ' বছর বযসে গোবিন্দ হঠাৎ মৃগীরোগে আক্রান্ত হইল। জানা যায সুস্থ হইতে পঞ্চাননের দোরে মানসিক করিতে হয়।

গ্রামে দুটি পাঠশালা। একটির গুরুমশায় ব্রাহ্মণ, অপরটির কায়স্থ। দ্বিতীয়টির পরিচিতি অঙ্কশিক্ষণের। বদন অঙ্কশিক্ষার পাঠশালায় গোবিন্দকে ভর্তি করিল। জমিদার-মহাজনদের হাত থেকে ছেলেকে বাঁচানো বদনের একমাত্র অভিপ্রায়। যদিও এ পাঠশালার শাসন বড় কড়া।

বদনের মেয়ে মালতী গ্রামের রীতিতে বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। মা অলঙ্গ বিবাহ দিবার জন্য খুবই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বদনের অর্থাভাব। বিবাহ দিতে হইলে যে টাকা প্রয়োজন বদনের তাহা না থাকায় মহাজনের কাছ হইতে ধার করিতে হইবে। সুদের হার একশোয় একশো অথবা একশো পঞ্চাশও হইতে পারে। যাহা হউক, বাড়িতে ঘটক আসিয়াছে। ঘটকের সঙ্গে কথাবার্তা চলিতেছে।

দুর্গানগবে কেশব সেনের ছেলে মাধবের সঙ্গে মালতীর বিবাহের ব্যবস্থা করিল ঘটক। আয়োজন পাকা হইয়া গেল। বিবাহের দিন স্থির হইল। গায়ে-হলুদ, আইবড় ভাত এবং বিয়ের দিন বরযাত্রসহ কাঞ্চনপুরে বর আসিল। কন্যা মালতীর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল। বদন তাহার সাধ্যমতো সবাইকে উত্তম ভোজনে আপ্যায়িত করিল।

বাসরঘরে মাধব-মালতীর বসার ব্যবস্থা হইল। অল্পবয়সী মেয়েরা নানা ধরনেব ঠাট্টা-তামাশা শুরু করিয়া দিল। এইভাবে সারারাত কাটিয়া গেল।

বাড়িতে এক বৈরাগী আসে। গয়ারাম তাহার স্ত্রী আদুরীকে তাহাকে ভিক্ষা দিতে দেখিযাছিল। গয়ারামের মনে সন্দেহ জাগে আদুরী নিশ্চয়ই পরপুরুষের মুখের পানে তাকায় ও হাসে। সন্দেহবশে আদুরীকে প্রচণ্ড মারধর করে। এর ফলে আদুরীর সাময়িক মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দেয়। সে অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় হাসিতে থাকে। সবার ধারণা তাহাকে ভূতে পাইয়াছে। ওঝা ডাকা হইল। ওঝা ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি করণীয় সবকিছুই করিল। আদুরীকে ওঝার হাতে প্রচণ্ড মারধোর সহ্য করিতে হইল। তবে যেভাবেই হোক আদুরী সুস্থ হইয়া উঠিল।

গোবিন্দর পাঠশালায় তালপাতা, কলাপাতা ইত্যাদি নানা পত্র ব্যবহারের ভিতর দিয়া অক্ষর-জ্ঞান এবং শুভঙ্করী, সুদ-কষা, যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা বেশ চলিতে লাগিল। গোবিন্দর বয়স যখন সাত-আট বৎসর হইবে সেই সময় গ্রামে অকস্মাৎ এক বিপদ ঘটিল। পরিবারের কুলপুরোহিত মারা গেলেন। গোবিন্দ পাঠশালায় না গিয়া শ্মশানযাত্রী

হইল।

গোবিন্দদের বাড়ির পুরোহিত মারা গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী সতীবেশ ধারণ করিল অর্থাৎ যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল তাহা পরিধান করিল। মাথায় সিঁদুর লেপন করিল, এবং স্বামীর সঙ্গে শ্মশানের পথে যাত্রা করিল। শ্মশানে পৌঁছাইয়া স্বামীর চিতায় যখন আগুন প্রজ্জ্বলন করা হইল, তখন রামধন মিশ্রের মাকে প্রায় চিতায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল। যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে চীৎকার করিয়া উঠিয়া আসিতে চাহিল। জোর ঢাকের বাজনা ও চীৎকারে সতীর আর্তনাদ চাপা পড়িয়া গেল। একই চিতায় স্বামী-স্ত্রীর সহমরণ এবং দাহ সমাপ্ত হইল। কাঞ্চনপুরে এটি শেষ সতীদাহ। কারণ লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন করিয়া সতীদাহ বন্ধ করিয়া দেন। গোবিন্দ এই বিয়োগান্ত ঘটনার সাক্ষী ছিল।

পাঠশালা ফেরত গোবিন্দ বাড়ি ফিরিলে ডাল-ভাত খাইয়া একটু লেখাপড়া করিয়া লয়। বদন তাহাকে মুখে মুখে আঁক কষায়। তারপর গোবিন্দ প্রতিবেশী এক বৃদ্ধার ঘরে গিয়া গল্প শুনিতে থাকে। সাধারণত রূপকথার গল্প শোনে। এই জাতীয় গল্প গোবিন্দকে খুবই আনন্দ দেয়।

হঠাৎ গয়ারামকে একদিন কেউটে সাপ কামড় দিল। তাহাতেই গয়ারামের মৃত্যু ঘটিল। গয়ারামের স্ত্রী আদুরী অল্পবয়সেই বৈধব্যযোগের শিকার হইল। বদন, কালামাণিক আর গয়ারাম তিন ভাই ভাগ করিয়া কাজ করিত। গয়ারামের কাজ এখন কে করিবে? গোবিন্দর পাঠশালায় শেখা যোগ, বিয়োগ ইত্যাদির সঙ্গে নিজের নামটি সহি করিতে পারা এখানেই থামাইয়া দেওয়া হইল। তাহাকে মাঠে গরু চরানোর কাজ দেওয়া হইল।

গোবিন্দর কৈশোর জীবনে কয়েকটি ছেলের সঙ্গে তাহার খুবই বন্ধুত্ব হইয়াছিল। এরা কেউ কর্মকার, ছুতোর, মুদি, নাপিত, ময়রা এবং তাঁতীর ঘরের ছেলে। সবাই একই গ্রামের বাসিন্দা। গোবিন্দর সঙ্গে ছেলেগুলির বন্ধুত্ব খুবই ঘনিষ্ঠ।

গ্রামের পদ্মপালের মেয়ে যদুমণিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বেজা বাগদী রূপোর গহনার লোভে যদুমণিকে খুন করিয়া পুকুরে ফেলিয়া দেয়। গোবিন্দ গরু লইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে ঘটনাটি আবিষ্কার করে। কালামাণিক জল হইতে মৃতদেহ তুলিয়া আনে। ফাঁড়িদারকে ঘুষ দিয়া সৎকার করা হইল। গ্রামবাসীরা বেজা ও তাহার বোনকে প্রচণ্ড প্রহার করিল।

গ্রামে হাট বসে দুদিন। হাটে সমস্ত কিছুই পাওয়া যায়। লোকে সবকিছুই কেনাকাটা করিতে পারে। হাটে যাহারা তোলা তোলে তাহারা হইল জমিদার, ফাঁড়িদার, গ্রামের গুরুমশায়ের জন্য ছেলেরা তোলা তোলে তাছাড়া বারোয়ারি পূজার জন্য তোলা তোলা হয়। হাটের এক জায়গায় খ্রীস্টান মিশনারী যাজক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাইতেছে।

গ্রামের মেয়েদের মিলিত হইবার একমাত্র জায়গা হইল পুকুরঘাট। পুকুরঘাটে সুখদুঃখের নানা কথা, পরনিন্দা-পরচর্চা কিছুই বাকী থাকে না। কার ঘরে কি রান্না হইল, কার কি গয়না তৈরী করানো হইল সেই সূত্রে জানা গেল গোবিন্দর সঙ্গে পদ্মপালের বড় মেয়ে ধনমণির বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে।

মালতীর কথা আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। শ্বশুরবাড়িতে সে সুখে নেই। স্বামী মাধবের

ব্যবহার খুবই সঙ্গত। তবে শাশুড়ীর ব্যবহার বড়ই নক্কারজনক। মালতীকে সর্বদাই মনোকষ্টে থাকিতে হয়।

মালতী গর্ভবতী। তথাপি শাশুড়ীর বাক্যযন্ত্রণা, এমনকি চড়চাপড় বন্ধ থাকে না। মাধবের মাকে এসব বুঝাইয়া কোন ফল হয় না। ইতিমধ্যে মালতী একটি সুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করিল।

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে অজস্র জাতের ধান জন্মায়। রাধাকান্ত দেববাহাদুরের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ হইতে জানা যায় বাংলাদেশের চব্বিশ-পরগণা জেলায় ১১৯টি জাতের ধান জন্মায়।

গ্রামে নানারকম উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। তাহার মধ্যে নবান্ন একটি বড় উৎসব। নবান্নয় নতুন ধানের ভাত রান্না করা হয়। সঙ্গে নানারকম তরকারী, মিষ্টান্ন ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে।

নবান্নর মাসখানেক পর চাষীদের ফসল কাটার সময় হইল। কালামাণিক ও পদ্মপালের সাহায্যে বদন তাহার খেতের ফসল কাটিয়া ফেলিল। ফসল ঘরে-লইয়া যাওয়ার ভার ছিল গোবিন্দর ওপর। শস্য ঝাড়াই বা পেষাই করিবার কোনপ্রকার যন্ত্রের ব্যবস্থা বর্ধমান জেলায় ছিল না। চাষীরা কাঠের তক্তার ওপর আঁটি বাঁধা খড় সর্বশক্তি দিয়া আছড়াইয়া মারিত। তারপর গোলায় ধান জমা করা হইত। পৌষ মাসের শেষ দিকে তিনদিনের পিঠা উৎসব পালিত হইত।

অলঙ্গ এখন বৃদ্ধ হইয়াছে। তাহার একান্ত ইচ্ছা পৃথিবী ছাড়িয়া যাওয়ার আগে সে যেন নাতির বিবাহ দেখিয়া যাইতে পারে। পদ্মপালের মেয়ে ধনমণি গোবিন্দর উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচিত হইয়াছে। ফাল্গুন মাসে দিন স্থির হইল। গোবিন্দর সব বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনরা আসিয়া উপস্থিত হইল।

গোবিন্দর বিয়ের পর অলঙ্গ স্থির করিল সে তীর্থস্থান ভ্রমণে যাইবে। বিধবা আদুরী শাশুড়ীর সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহারা গ্রামের আরো দুইজন মহিলার সঙ্গে যাত্রা শুরু করিল। ঘুরিতে ঘুরিতে নবদ্বীপের এক জায়গায় আসিয়া দেখিল একদল বৈষ্ণব ভিক্ষু প্রচণ্ড চীৎকার করিয়া নাচিতে নাচিতে গান করিতেছে। দলের মধ্যে তাহারা তাহাদের পূর্বপরিচিত প্রেমভক্ত বৈরাগীকে দেখিতে পাইল। বৈরাগীর হঠাৎ চোখ পড়িল আদুরীর ওপর। তাহার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলিয়া গেল। সে বলিল স্বয়ং গোপীনাথ তাহাকে জানাইয়াছেন যে তিনি আদুরীকে ডাকিয়াছেন। বৈষ্ণবদের পাণ্ডা তখন তাহাদের রীতি অনুযায়ী আদুরীকে বৈষ্ণব ভিক্ষুণীর বেশ পরাইয়া দিল। সরল-হৃদয়া অলঙ্গর কাছে এই প্রতারণা অজানা রহিয়া গেল।

অলঙ্গ পুরীধামে তীর্থ করিবার সঙ্কল্প করিল। বর্ধমান জেলা হইতে এটি প্রায় চার মাসের দীর্ঘ পথ।

পুরীতে পৌঁছাইয়া অলঙ্গ প্রথমে দেখিল স্নানযাত্রা উৎসব। পাণ্ডারা মন্দির হইতে জগন্নাথদেবের মূর্তি বার করিয়া আনিয়া মাথায় জল ঢালিয়া স্নান করাইয়া দেয়। চারদিক 'জয়-জগন্নাথ' ধ্বনিতে ভরিয়া যায়। পরপর সে দেখিল রথযাত্রা উৎসব।

পুরী ঘুরিতে ঘুরিতে অলঙ্গ অসুস্থ হইয়া পড়িল। সে মারাত্মক কলেরা রোগে আক্রান্ত

হইল। কাঞ্চনপুরের প্রতিবেশী মহিলারা যাঁহারা তাহার তীর্থভ্রমণে সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহার আশ্রয়ের জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থাও করিতে পারিলেন না। সেখানে ডাক্তারও ছিল না, ওষুধও না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিনা চিকিৎসায় অলঙ্গ মারা গেল।

গত দুদিন ধরিয়া বদন প্রচণ্ড জ্বরে বেহুঁশ। চারদিনের দিনও জ্বরের উপশম না হওয়াতে কালামাণিক গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারকে খবর দিল। কিন্তু তাহার চিকিৎসাপদ্ধতি বদনকে সুস্থ করিতে পারিল না। তাহার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিল এবং এক সন্ধ্যায় সে প্রাণত্যাগ করিল।

পিতার আকস্মিক মৃত্যু গোবিন্দর জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন আনিল। সংসারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাহার কাঁধে আসিয়া পড়িল। শুরুতে সে একটি কঠিন বাধার সম্মুখীন হইল। উত্তরাধিকারসূত্রে সে পিতার সামান্য ঋণের অংশীদার ছিল। কিন্তু ঠাকুমা ও পিতার মৃত্যুতে তাহার ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এর ওপর অত্যন্ত চড়া হারে সুদ দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়—প্রতি মাসে টাকায় দু পয়সা।

একদিন সকালে জমিদারবাড়ি হইতে লোক আসিয়া খবর দিল সামনের ফেব্রুয়ারি মাসে জমিদারের ছেলের বিবাহ উপলক্ষ্যে কাঞ্চনপুরের প্রতিটি রায়তকে টাকায় দু-আনা হারে অতিরিক্ত খাজনা তালুকদারকে দিতে হইবে। গোবিন্দর তখন অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থা চলিতেছিল। সে তাহার খাজনা মকুব করিতে কাতর আবেদন জানাইল। কিন্তু তাহার আবেদনে কোন ফল হইল না। পেয়াদা হনুমান সিং তাহাকে জমিদারের কাছে ধরিয়া লইয়া গেল। হনুমান সিং জমিদার জয়চাঁদ রায়চৌধুরীকে জানাইল যে গোবিন্দ অতিরিক্ত খাজনা দিতে অস্বীকার করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া জমিদার ক্রুদ্ধ হইয়া তিনদিনের মধ্যে খাজনা সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলেন।

তিনদিনের মধ্যে খাজনা দিতে না পারিলে জমিদারের পেয়াদা আসিয়া গোবিন্দকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। এই খবর শুনিয়া গোবিন্দ ও তাহার বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িল। তাহারা জমিদারের এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে লাগিল।

গত দুদিন ধরিয়া ক্রমাগত চিন্তা-ভাবনা করিয়াও গোবিন্দ মনোস্থির করিতে পারিল না। তাহার মা ও শ্বশুর তাহাকে খাজনা দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করিতে লাগিল। কিন্তু কাকা কালামাণিক তাহাকে জমিদারের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিতে লাগিল। নির্দিষ্ট দিনে হনুমান সিং গোবিন্দকে জমিদারের সামনে হাজির করিল। গোবিন্দ আরেকবার সবিনয়ে আবেদন জানাইল। কিন্তু জমিদার তাহার সনির্বন্ধ অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না। গোবিন্দ তখন বলিল জমিদারের এই কাজ কোম্পানীর আইনের বিরুদ্ধে যাইতেছে। এই কথা শুনিয়া জমিদার আর রাগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি পায়ের চটি খুলিয়া গোবিন্দর মুখে মারিলেন এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন। সে আর কোন উত্তর দিল না। খাজনা রাখিয়া দিয়া কাছারীঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল। জমিদার ও দেওয়ান তখন পরস্পর আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিলেন যে কালামাণিকই আসল লোক যে জনমতকে জমিদারের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং তাহাকে শাস্তি দেওয়া দরকার। জমিদারের সঙ্গে দেখা করিবার আদেশ দিয়া হনুমান সিংকে

কালামাণিকের কাছে পাঠানো হইল।

একদিন রাতে অসহ্য গুমোট গরমে যখন কালামাণিক অর্ধজাগ্রত অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া আছে, তখন হঠাৎ বাড়ির পোষা কুকুর বাঘার ডাক শুনিতে পাইল। সে চোর আসিয়াছে ভাবিয়া হাতে বাঁশের লাঠি লইয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে সে দুজন লোককে ছুটিয়া পলাইতে দেখিল। অন্ধকারে তাহাদের মধ্যে একজনকে সে চিনিতে পারিল, সে হইল জমিদারের লেঠেল ভীম কোটাল। সে দেখিল বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে খড়ের চালে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। সে প্রাণপণ চীৎকার করিয়া গোবিন্দ ও তাহার স্ত্রীর ঘুম ভাঙাইল। তাহার চীৎকারে নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের ঘুমও ভাঙিয়া গেল। সকলে মিলিয়া পুকুর হইতে কলসী কবিয়া জল লইয়া আগুন নিভাইয়া ফেলার চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু সারা বাড়িতে আগুন দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কালামাণিক, গোবিন্দ ও তাহার পরিবারের সকলকে মাঠের মাঝখানে বসিয়া সারা রাত কাটাইতে হইল। পরদিন সকালে কালামাণিক ভীমের বিরুদ্ধে ফাঁড়িদারকে নালিশ করিয়া এল। ফাঁড়িদার অনুসন্ধান চালাইয়া খোঁজ পাইল ভীম গত তিন দিন ধরিয়া পাঁচ মাইল দূরে তাহার শ্বশুরবাড়িতে আছে। এর ফলে ফাঁড়িদার কেস ডিসমিস করিয়া দিল। জমিদারের নির্দেশে ভীম-ই যে গোবিন্দর বাড়িতে আগুন লাগায় একথা গ্রামের প্রায় সব লোকেরই জানা ছিল।

গোবিন্দর মহাজন গোলোক পোদ্দার জাতিতে সুবর্ণবণিক। সে একজন সৎ ও অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। গোবিন্দ মহাজনের কাছ থেকে টাকায় দু পয়সা সুদে ষাট টাকা ধার করিল। এই টাকায় কালামাণিক ও গোবিন্দ তাহাদের বাড়ি মেরামতের কাজ শুরু করিল।

তখন বাংলাদেশের সর্বত্র নীলচাষ প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে করানো হইত। ধান চাষের জমিতে চাষীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীলের চাষ করানোর রেওয়াজ ছিল। এইভাবে চাষের সমূহ ক্ষতি হইতে লাগিল আর নীলকরসাহেবরা নীলের ব্যবসা করিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল। জমিদার বড়-মাঝারি বা ছোট, যেমন হোক, থানার দারোগা, নীলকর সাহেব—তিনের মধ্যে ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের চাষীসমাজের সমূহ ক্ষতিসাধন করে।

বিশ্বকর্মা পুজো গ্রামের বড় উৎসব। কৃষিপ্রধান গ্রামাঞ্চলকে কামারশালাব ওপব নির্ভব করিতে হয় যাবতীয় যন্ত্রপাতি তৈরী করানো এবং মেরামত করানোর প্রয়োজনে।

কালামাণিক গোবিন্দকে জমিদারের ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে বিশেষ খাজনা দিতে বারণ করে। তা আক্রোশ হইয়া দাঁড়াইল কালামাণিকের বিরুদ্ধে। সেজন্য তাহাকে একদিন জমিদারের লেঠেলের হাতে প্রাণ দিতে হইল।

গোবিন্দর বাড়ি পোড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারকে খাজনা দেওয়ার রসিদগুলি পোড়াইয়া দেওয়া। তারপর নতুন করিয়া আবার খাজনা চাওয়া। গোবিন্দকে সেই ঘৃণ্য ফাঁদে ফেলা হইল। তাহার নতুন করিয়া খাজনা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তাহার সমস্ত ধান, আখ, যাবতীয় ফসল, মরাই, গরু, লাঙল, তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমস্ত কিছুই জমিদার দখল করিয়া লইল।

অসহায় গোবিন্দ মহাজন গোলোক পোদ্দারের কাছে ছুটিল স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের

ভরণপোষণের তাগিদে। মহাজন মোটা সুদে টাকা ধার দিল। এই দেনা শোধ করিতে গোবিন্দর নয়-দশ বছর লাগিয়া গেল। এইভাবে তাহার জীবনে দুঃখের অবসান হইল। ইতিমধ্যে কাঞ্চনপুরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। গ্রামের মানুষের কষ্ট বৃদ্ধি পাইল। বর্ধমানের মহারাজা দুর্ভিক্ষে গ্রামবাসীদের যথেষ্ট সাহায্য করেন।

'গোবিন্দ সামন্তে'র শেষ কালে যে দুর্ভিক্ষের ইঙ্গিত আছে তাহা সমসাময়িক এক কবিওয়ালার লেখনীতে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। রচনাটি ক্ষুদ্র (পুথিটিতে পত্রসংখ্যা ৩৮, প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা ১৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা পুথিশালায় রক্ষিত এই পুথিটির সংখ্যা ৪৮৭০)। পুথিটির নাম—'আকাল চরিত্র', রচনাকারের নাম দ্বিজ শ্রীনফর। তাঁহার রচনার নমুনা এই,

গত সনে মহারাণি সর্ব্বজ্ঞাত য়ন্তর্জ্জামি
জেন্যেছিলে এ সব কারণ।
দুভিক্ষি আকাল হবে লোকে দুষ্‌খু পাবে
অতেব কর্য়ে পরয়ানা লিখন।

ভাষা নিরপেক্ষ সাহিত্যশিল্প বিচারে বর্ণনাত্মক মনোহারী গদ্য রচনা দুই থাকে পড়ে। এক থাকে পাই ব্যক্তি অথবা বস্তু অথবা ভাব অবলম্বনে সমগ্র পরিবেশ ও পরিস্থিতির পটচিত্র চিত্র পরম্পরা, অপর থাক হইল কোন ব্যক্তি বস্তু অথবা ভাব লইয়া মনোরঞ্জক সত্য-মিথ্যা কাহিনী ধারাবাহিক গ্রন্থন "চলচিত্র উপন্যস্ত"। দ্বিতীয় থাক হইল "চিত্তচমক উপন্যাস"। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলিত করিয়াছেন দ্বিতীয় থাকের বই। প্রথম থাকের বই প্রথম লিখিয়াছিলেন রেভারেন্ড লালবিহারী ইংরেজী ভাষায়। এই বইই 'গোবিন্দ সামন্ত'। ইংরেজী ভাষায় লেখা বলিয়া 'গোবিন্দ সামন্ত' বেশকিছু কাল বাঙ্গালী মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। সেই কাজ করিয়াছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার 'সংসার' ও 'সমাজ' বই দুইখানি লিখিয়া। (এখানে উল্লেখযোগ্য রমেশচন্দ্র দত্তের উদ্ভব বর্ধমান জেলার জামালপুর পরগণায়। এই পরগণাটি লালবিহারীর সাহাবাজ পরগণারই পাশে)। বঙ্কিমচন্দ্র লালবিহারীর বইটির বিষয়ে অনেকদিন পর্যন্ত উচ্চবাচ্য করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু দীনবন্ধু মিত্র কখনই ইংরেজী লেখক বাঙ্গালী খ্রীস্টান লালবিহারীকে ভাল চোখে দেখেন নাই। তিনি ইঁহাকে 'তোতারাম ভাট' তারপরে 'ঘটীরাম ডেপুটি' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। 'গোবিন্দ সামন্ত' গ্রন্থটির সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হইলে পর দীনবন্ধু বইটির শেষাংশ বঙ্কিমচন্দ্রের গোচরে আনেন। পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ব্যঙ্গ কাহিনী "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত" লিখিয়াছিলেন। (পূর্ব খণ্ডে আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

'Bengal Peasant Life' ব্রিটেনে সবিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। রাজকবি Tennyson ও জগৎখ্যাত বৈজ্ঞানিক Darwin বইটির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

'Bengal Pesant Life'-এর সমাদর লালবিহারীকে আরও উৎসাহ যোগাইয়াছিল বাঙ্গালাদেশের আরও নিবিড় অর্থাৎ পূর্ণপরিচয় দিতে। তিনি ছেলেবেলায় শোনা

কতকগুলি 'অপরূপকথা'কে নূতন করিয়া রূপ দিতে লাগিয়া গেলেন। ফল ফলিল "Folk Tales of Bengal"-এ (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৩)। বইটি ব্রিটেনে অত্যন্ত সুগৃহীত হইয়াছিল এবং সেই সূত্রে এ দেশেও কিছু সমাদৃত হইয়াছিল। লালবিহারীর ভূমিকার যথাযথ অনুবাদ দিই :

> আমার 'Peasant Life in Bengal' বইটিতে আমি উল্লেখ করিয়াছি যে চাষীর সন্তান গোবিন্দ প্রতিদিন সন্ধ্যায় গ্রামের শ্রেষ্ঠ গল্প-কথক শম্ভুর মাতার নিকট গল্প শুনিয়া কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া দিত। সেই কাহিনী পাঠ করিয়া ভারতীয় শাসন বিভাগের বিশিষ্ট পদাধিকারী স্যার রিচার্ড টেম্পল (Sir Richard Temple)-এর পুত্র উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ক্যাপ্টেন আর. সি. টেম্পল (Captain R. C. Temple) আমাকে লিখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছোটছোট ছেলেমেয়েদের নিকট যে সমস্ত গল্প কাহিনী পরিবেশন করিয়া থাকেন তাহা খুবই আকর্ষণীয়। কেন আমি সেইগুলি সংগ্রহ করিতেছি না। যেহেতু আমার কাছে গ্রীমভ্রাতৃদ্বয়ের 'রূপকথার গল্প' (Maerchen), ডেস্যান্ট (Dasent)-এর 'নর্সের রূপকথা' (Norse Tales) এ্যারনাসন্ (Arnason)-এর 'আইসল্যান্ডের গল্পে'র (Icelandic Stories)-এর অনুবাদ, ক্যাম্পবেল-এর 'হাইল্যান্ডের গল্পে'র (Highland Stories) ইংরেজী অনুবাদ এবং অন্যান্য বহু লেখকের রূপকথার গল্পসংগ্রহ অপরিচিত ছিল না এবং যেহেতু আমার ইহাও বিশ্বাস ছিল যে ভারতীয় অলিখিত এই কাহিনীগুলির সঙ্কলন ক্রমবর্ধমান লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারে একটি সংযোজন এবং comparative philosophy-র মতোই comparative mythology হিসেবে প্রমাণ করে গঙ্গাতীরস্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন, অর্ধনগ্ন ভারতীয় কৃষক সন্তানেরা, বহুদূরে টেমস্ নদীর তীরে অবস্থিত শুভ্রবর্ণ ও সুবেশিত ইংরাজ সন্তানেরই পরমাত্মীয়, তাই অতি দ্রুতই আমি এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়াছিলাম। কিন্তু কোথায় পাইব এরূপ একজন গল্প-কথক প্রাচীনা স্ত্রীলোক ? আমি যখন শিশু ছিলাম ঠিক 'শম্ভুর মায়ের' মতোই এক বৃদ্ধার নিকট হইতে কয়েক শত সুন্দর সুন্দর রূপকথার গল্প শুনিয়াছিলাম। সংখ্যায় কয়েক হাজার বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তিনি কোন কাল্পনিক স্ত্রীলোক ছিলেন না। প্রকৃত রক্তমাংসের শরীর লইয়াছিলেন এবং ঐ নামের জন্ম দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি ঐ সমস্ত গল্প প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। যে ভাবেই হউক ঐগুলির কিছু আমার মনের মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করিতেছে, কখনও হয়ত একটির প্রারম্ভিক অংশ অন্যটির শেষাংশের সহিত, কখনও বা তৃতীয়টির প্রারম্ভিক অংশ চতুর্থটির শেষাংশের সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে। কি করিয়া সেই হতভাগিনী শম্ভুর মাকে পাইব ! সে তো বহুদিন পূর্বে সেই লোকে চলিয়া গিয়াছে যেখান হইতে কোন পথিক আর ফিরিয়া আসে না। এমনকি তাঁহার সন্তান শম্ভুও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছে। বহু অনুসন্ধানের পর আমি দেখা পাইলাম এক বাঙ্গালী খ্রীস্টান মহিলার কাছে আমার গ্যামার গ্রেথেল (Gammer Grethel)-কে যাঁহার বয়স হেসেকাসেলের ফ্রউ ভিয়েমনিনের (The Frau Viehmannin of Hessecassel) বয়সের অর্দ্ধেকও ছিল না। তিনি যখন তাঁহার গৃহে খুবই ছোট ছিলেন তখন তাঁহার পিতামহীর কাছে এই রকম অনেক গল্প শুনিয়াছিলেন। তিনি ভালো গল্প বলিতে পারিতেন না, সংগ্রহের ভাণ্ডারও বিশাল ছিল না। তাঁহার নিকট দশটি গল্প শুনিবার পর নতুন বক্তার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুইটি, এক বৃদ্ধ নাপিত তিনটি এবং আমার এক পুরাতন ভৃত্য আমাকে দুইটি গল্প বলিয়াছিলেন। অবশিষ্ট আর একটি শুনিয়াছিলাম অপর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট। তাঁহারা কেহই ইংরেজী জানিতেন না। বাঙ্গালাতেই বলিয়াছিলেন। বাড়িতে আসিয়া সেইগুলি

ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলাম। আমি যাহা লিখিয়াছি, শুনিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি। শৈশবে শোনা অনেকগুলি গল্পে অবান্তর বিষয় থাকার জন্য আমি সেগুলি বাতিল করিয়াছিলাম। আমার একটি বিশ্বাস রহিয়াছে যে এই বই-এর গল্পগুলি হইল হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া বংশানুক্রমে বৃদ্ধা বাঙ্গালী মহিলার শোনানো গল্পের নমুনা।

শম্ভুর মা এবং অন্যান্য গতানুগতিক গল্পকথকেরা সর্বদাই সমস্ত গল্পগুলি বলিবার শেষে এই অংশটি বার বার আবৃত্তি করিত—

আমার কথাটি ফুরলো,
নটে গাছটি মুড়লো।
কেনরে নটে মুড়লি ?
গরু কেন দুধ দেয় না।

এই ছত্রগুলির অর্থ কি ? কেন এই ছত্রগুলি এইভাবে উচ্চারিত হইত বা ছত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক কি, তাহা আমি জানি না। সম্ভবত সমগ্র বিষয়টি ছোট ছোট শিশুদিগকে আনন্দ দিবার জন্য "আবোল তাবোল" প্রস্তুনা।

হুগলী কলেজ — লালবিহারী দে
২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩।

Folk-Tales of Bengal-এ গল্পসংখ্যা বাইশ। অবয়ব বড়, মাঝারি ও ছোট। গল্পগুলি এই·

১ Life's Secret (অর্থাৎ "জীবনের রহস্য") ;
২. Phakir Chand (অর্থাৎ "চাঁদ ফকির") ;
৩ The Indigent Brahman (অর্থাৎ "দরিদ্র ব্রাহ্মণ") ;
৪. The Story of Rakshasas (অর্থাৎ "রাক্ষসদের গল্প") ;
৫. The Story of Swet-Basanta (অর্থাৎ "শ্বেত-বসন্ত") ;
৬. The Evil Eye of Sani (অর্থাৎ "শনির কুদৃষ্টি") ;
৭. The Boy Whom Seven Mothers Suckled (অর্থাৎ "সাত সতীনের এক ছেলে") ;
৮ The Story of Prince Sobur (অর্থাৎ "যুবরাজ সবুরের গল্প") ;
৯. The Origin of Opium (অর্থাৎ "আফিং-এর উৎপত্তি") ;
১০. Strike But Hear (অর্থাৎ, "মারছো মারো, শোনো") ;
১১. The Adventures of Two Thieves and of Their Sons (অর্থাৎ "দুই চোর ও তাহাদের পুত্রদের অভিজ্ঞতা") ;
১২. The Ghost-Brahman (অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ-ভূত") ,
১৩. The Man Who Wished to be Perfect (অর্থাৎ "চাই যে হতে সবার বড়ো") ;
১৪. The Ghostly Wife (অর্থাৎ "পেত্নী-পত্নী") ;
১৫. The Story of a Brahmadaitya (অর্থাৎ "ব্রহ্মদৈত্যের কাহিনী") ;
১৬. The Story of a Hiraman (অর্থাৎ "এক হীরামনের গল্প") ;
১৭. The Origin of Rubies (অর্থাৎ "চুনির উৎপত্তি") ;

১৮. The Match-Making Jackal (অর্থাৎ "শিয়ালের ঘটকালি") ;
১৯. The Boy with the Moon on His Forehead (অর্থাৎ "কপালচাঁদা ছেলে") ;
২০. The Ghost who was Afraid of Being Bagged (অর্থাৎ "ভূতের ভয় বন্দী হইবার) ;
২১. The Field of Bones (অর্থাৎ "গো-ভাগাড়") ;
২২. The Bald Wife (অর্থাৎ "টেকো বৌ") ।

বড় ও মাঝারি সাইজের গল্পগুলির বিষয় যেমন ব্যাপক তেমনি বহু বিচিত্র। ছোট সাইজের গল্পগুলির বিষয় বাঙ্গালী সংসার—ঘরোয়া, মেয়েলি। ছোট বড় মাঝারি সব গল্পেরই বিষয় পুরানো তবে বয়ন অর্থাৎ রচনা নৈপুণ্য লালবিহারীর নিজস্ব। এই কারণে লালবিহারীর ইংরেজী গল্পগুলির মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের রসসঞ্চার গুপ্ত হইয়া আছে। সর্বাপেক্ষা ছোট গল্পটি যথাযথ অনুবাদ দিয়া আমার বক্তব্যের প্রমাণ দিই।

ভূত-পেত্নী

একদা এক বিবাহিত বামুন মাকে লইয়া সংসার করিত। তাহাদের বাড়ির নিকটে ছিল একটি পুকুর। পুকুরের পাড়ে ছিল একটি গাছ। সেখানে এক শাঁকচুন্নী বাস করিত। একদিন রাত্রিবেলায় কোন কারণে বামুন-বৌকে পুকুরে যাইতে হইয়াছিল, পথে শাঁকচুন্নীর গায়ে ধাক্কা লাগিল। শাঁকচুন্নী ক্রুদ্ধ হইয়া বামুন-বৌ-এর গলা টিপিয়া ধরে এবং গাছের উপর লইয়া গিয়া কোটরে বন্দী করিয়া রাখে। বামুন-বৌ ভয়ে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। শাঁকচুন্নী তখন তাহার কাপড় পরিয়া বামুনের ঘরে প্রবেশ করিল। বামুন বা তাহার মা এই ঘটনার কিছুই জানিতে পারিল না। বামুন ভাবিল তাহার বউই ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তাহার মা ভাবিল মেয়েটি তাহাব বৌ। পরের দিন সকালে শাশুড়ী বৌ-এর কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করিল। কারণ সে জানিত তাহার বৌ দুর্বল এবং অলস প্রকৃতির। ঘরের কাজকর্ম সমাধা করিতে তাহার অনেক সময় লাগিত। কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। হঠাৎ বৌ যেন চটপটে হইয়াছে। মুহুর্তের মধ্যেই সে ঘরের কাজকর্মগুলি সারিয়া ফেলিল। বুড়িমা কিছুই সন্দেহ করিল না। এ বিষয়ে বৌ বা বেটাকেও কিছুই বলিল না। বরং বৌ-এর এই নতুন পরিবর্তন দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইল। কিন্তু দিনের পর দিন তাহাব বিস্ময় বাড়িতে লাগিল। ঘরের রান্নাবান্না অতি অল্প সময়ে শেষ হইতে লাগিল। শাশুড়ী যখন অন্য ঘরের কোন জিনিস চাহিত বৌ তখনই তাহা উপস্থিত করিত। এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইবার সময়টুকুও লাগিত না। শাঁকচুন্নী অন্য ঘরে যাইত না, হাত বাড়াইয়াই জিনিসটি আনিত। কারণ তাহারা দেহের যে কোন অংশকে বড় বা ছোট করিতে পারিত। একদিন বুড়িমা এইভাবে হাত বাড়াইতে দেখিল। সে তাহাকে খানিকটা দূর হইতে একটি পাত্র আনিতে বলিল। শাকচুন্নী অসতর্কভাবে হাত বাড়াইয়া কয়েক গজ দূর হইতে মুহূর্তের মধ্যে আনিয়া দিল। এই দৃশ্য দেখিয়া বুড়ি বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। সে তাহাকে কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার বেটাকে বলিল। মা ও ছেলে উভয়েই চুপিসারে বউকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। অন্য একদিন বুড়িমা জানিত যে ঘরে কোন আগুন নেই এবং তাহার বৌ আগুন আনিবার জন্য ঘরের বাহিরও হয় নাই, অথচ রান্না ঘরে উনানে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। সে সেখানে গেল এবং দেখিল যে তাহার বৌ উনানে কোন জ্বালানি ব্যবহার করে নাই, কিন্তু তাহার পা দুইখানি উনানের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছে, তাহাই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। বুড়িমা যাহা দেখিয়াছিল তাহা সমস্তই বেটাকে বলিল এবং সে বুঝিতে পারিল যে এই বৌ তাহার প্রকৃত স্ত্রী নয়, সে এক শাঁকচুন্নী। তাই একজন রোজা ডাকিয়া আনিল। রোজা আসিয়া প্রথমে জানিতে চাহিল বউটি

শাঁকচুন্নী না আসলে কোন মেয়ে। এই উদ্দেশ্যে সে এক মস্ত হলুদ জ্বালাইয়া বৌ-এর নাকের নীচে ধরিল। এটা ছিল অব্যর্থ ঔষধ। কারণ মেয়ে বা পুরুষ ভূতেরা কিছুতেই হলুদ পোড়ানোর গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। তাই সেই মুহূর্তে জ্বালানো হলুদের খণ্ডটি তাহার কাছে লইয়া গেলে সে চীৎকার করিয়া দৌড়াইয়া ঘর হইতে পলাইয়া গেল। ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে হয় বৌকে ভূতে পাইয়াছে অথবা ভূতই বৌ সাজিয়াছে। তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল যে সে কে। প্রথমে সে কিছুতেই মুখ খুলিল না, তখন রোজা তাহার পায়ের চটিজুতা খুলিয়া বেদম পিটিতে লাগিল। অন্যান্য ভূতের মতোই ভূত-বৌ নাকি সুরে বলিতে লাগিল যে সে এক শাঁকচুন্নী, পুকুর পাড়ের গাছে বাস করিত। একদিন রাতে বামুন-বৌ-এর ধাক্কা পাইয়া সে ব্রাহ্মণীকে ধরিয়া গাছের কোটরের মধ্যে রাখিয়াছে। এখন কেউ সেই কোটরে গেলে বামুন বৌকে দেখিতে পাইবে। এই কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া মৃতপ্রায় বামুন-বৌকে গাছের কোটর হইতে আনা হইল। অন্যদিকে শাঁকচুন্নীকে রোজা পুনরায় জুতা পিটিতে লাগিল। যখন শাঁকচুন্নী কাতরভাবে বলিতে লাগিল যে সে কোনদিন ব্রাহ্মণ বা তা সংসারের কোন ক্ষতি করিবে না তখন রোজা তাহাকে মুক্তি দিল। বামুন-বৌ ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিল। এরপর বামুন এবং তার বৌ দীর্ঘদিন সুখে বসবাস করিতে লাগিল। তাহাদের অনেক ছেলেপুলে হইয়াছিল।

আমার কথাটি ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়লো। ইত্যাদি।

লালবিহারীর গল্পগুলি কোন রকমের বাঙ্গালা খেই কিছু মাত্র না হারাইয়া ইংরেজীর হাটে নূতন গল্পরসের সৃষ্টি করিয়াছে। এই কারণে গল্পগুলির উপাদেয়তা যেমন বাঙ্গালায় তেমনি ইংরাজীতেও ॥

১৯ শোভনা (সুন্দরী) দেবী

সুখলতার সঙ্গে সঙ্গে রূপকথা সঙ্কলনে লালবিহারীকে অনুসরণ করিয়া—অর্থাৎ ইংরেজীতে লিখিয়া—আবির্ভূত হইতে দেখা গেল রবীন্দ্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় বিখ্যাত প্রতিভাসুন্দরীর অন্যতম অনুজা শোভনাসুন্দরীকে। বইটি বিলাত হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল *The Orient Pearls* নামে (১৯১৫)। পিতা হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনেককাল পরে, রবীন্দ্রনাথের সাধনা পত্রিকা লুপ্ত হইবার বছর দেড়েক পরে রবীন্দ্রনাথের সেজোদাদার পুত্রকন্যারা পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন 'পুণ্য' নামে (১৩০৩-১৩০৪ সাল)। এই পত্রিকাব সম্পাদিকা ছিলেন শোভনাসুন্দরী। শোভনার বিবাহ হইয়াছিল নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত। তিনি জয়পুরে মহারাজা কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। বাল্যকালে ঘরে বাহিবে এবং যৌবনাবস্থায় রাজপুতানা-আগ্রা-অযোধ্যায় লোকজনের কাছে যেসব রূপকথা শুনিয়াছিলেন সেইগুলি মিলাইয়া শোভনাদেবী এই গল্পগুলি লিখিয়াছিলেন। এ বিষয়ে লেখিকার ভূমিকার অনুবাদ করিয়া দিই।

> আমার খুল্লতাত স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গল্প সঙ্কলন পড়িয়া আমার এই গল্পগুলি লিখিবার প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু আমার তাঁহার স্বাধীন কল্পনাশক্তির লেশমাত্র নাই আমি লাগিয়াছিলাম রূপকথা সঙ্কলনে এবং সেগুলিকে বিদেশি রূপ দিতে। সংগৃহীত গল্পগুলি অনেক নিরক্ষর গাঁয়ের মানুষের কাছে শোনা, অল্প কয়েকটি আমার এক অন্ধ ভৃত্যের কাছে শোনা (সে এখনও আমার কাজ করে)। ইহার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর এবং বলবার ধরনও নিখুঁত।

The Orient Perals (অর্থাৎ "প্রাচ্য-মুক্তাবলী") বইটিতে আটাশটি গল্প আছে। গল্পগুলির গঠন ও বর্ণনাভঙ্গি বেশ ভালো। লেখিকা নিজস্বতাও দেখাইয়াছেন। রচনার নিদর্শন হিসাবে প্রথম গল্পটি মর্মানুবাদ দিতেছি। গল্পটির নানা স্থানে প্রচলিত আছে। নাম 'কিলচড়ের ভোজ' (A Feast of Fists)।

এক ছিল তরুণ দম্পতি। তাহারা ছিল খুব সৎ ও সদাচারী। তাহারা দরিদ্র ছিল, সংসার চলিত খুব কষ্টে। দারিদ্র্য দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন ব্রাহ্মণ বনে চলিয়া গেল। সেখানে সে শিবদুর্গাকে ডাকিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া শিবদুর্গা ব্রাহ্মণ দম্পতির দারিদ্র্য দুঃখ চিরতরে দূর করিবার জন্য ব্রাহ্মণকে একটি কৌটা দিলেন। এই কৌটাটির ঢাকনা খুলিলেই যত ইচ্ছা মনোমত প্রস্তুত খাদ্য পাওয়া যাইবে। কৌটাটি লইয়া ফিরিবার পথে এক গৃহস্থের বাড়ি আশ্রয় নেয়। সে কৌটাটির গুণ বুঝিতে পারিয়া কৌটাটি বদলাইয়া লয়। গৃহে ফিরিয়া ব্রাহ্মণ হতাশ হয এবং সে আবার বনে যায়। একমনে সে দুর্গাশিবকে ডাকিতে থাকে। এবারে দুর্গা প্রসন্ন হইলেন কিন্তু শিব হইলেন না। দুর্গার পীড়াপীড়িতে অবশ্য শিব প্রসন্ন হইয়া ব্রাহ্মণকে আর একটি কৌটা দিলেন। এটির ঢাকনি খুলিলেই অদৃশ্য হাতের কিলচড় খাইতে হইবে। ব্রাহ্মণ এবার সেই গৃহস্থের বাড়ি গেল। সেই গৃহস্থ এই কৌটাটি চুরি করিয়া কিলচড খাইতে থাকে। সে তখন দুটি কৌটাই ব্রাহ্মণকে ফেবৎ দিল।

গল্পটি আরও প্রসারিত তবে এই পর্যন্তই মূল কথা।

শোভনাদেবীর সঙ্কলনের কিছু গল্প বাঙ্গালা দেশেই প্রচলিত ছিল। কতকগুলি গল্প উত্তরাপথের সর্বত্র প্রচলিত ছিল এবং কতকগুলি রাজস্থান দিল্লী অঞ্চলে নিবদ্ধ ছিল। এই শেষ শ্রেণীর বিশিষ্টতম গল্প হইতেছে 'ভাজা জনারের ফসল' (The Crop of Fried Maize)।

একদা এক আধ-পাগলা চাষী ভাবিয়া স্থির করিল যে সে ভাজা জনারের চাষ করিবে। সে নিজমনে বলিল, "ফসল যদি ভাজা জনার হয় তাহলে কেমন চমৎকার হয়। তাহা হইলে ফসল তুলিয়াই খাইতে পারিব, ভাজিবার জন্য উনান বা কাঠ কিছুরই দরকার হইবে না।"

সে তখন মতলব অনুযায়ী কাজে হাত দিল। প্রথমে সে কিছু জনার ভাজিয়া জমিতে চাষ দিয়া বীজ রূপে বুনিল। দেখা গেল একটি মাত্র বীজ যাহা ভাজা পড়ে নাই সেটি ছাড়া জমিতে কিছুই ফলে নাই।

মধ্যরাত্রে দৈত্যহন্তা এবং দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের ঐরাবত স্বর্গ হইতে নামিয়া ঐ ক্ষেত এবং কাছাকাছি ক্ষেতের ফসল খাইয়া যাইত। পাথর-ভাঙ্গা চাকির মতো গোলাকার পায়ের ছাপ রহিয়া থাকিত। বোকা চাষী ভাবিল প্রতিবেশীদের সব পাথরের চাকি রাত্রে আসিয়া তাহার জনার খাইয়া গিয়াছে। একদিন রাত্রে সে পাহারায় থাকিয়া দেখিল, এ কি! আকাশ হইতে এক প্রকাণ্ড হাতি আসিয়া মাটিতে নামিল। কিছুক্ষণ পরে হাতি যেমনি আকাশে উড়িয়া যাইবে অমনি চাষী তাহার লেজ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল। এইভাবে সে স্বর্গে পৌছিল।

ইন্দ্র তখন তাঁহার অপ্সরা ও গন্ধর্বদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আমোদ-প্রমোদ ও খানাপিনায় রত ছিলেন। চাষীটি গিয়া তাহাদের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। চাষীর মাথায় একটি প্রকাণ্ড পাগড়ি জড়ানো ছিল, যেন সাপের কুণ্ডলী। সেই পাগড়ির প্রতি সব দেবদেবীর নজর পড়িল।

স্বর্গে মানুষকে দেখিয়া ইন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল কে তাহাকে এখানে আনিয়াছে। হাতির লেজ ধরিয়া কিভাবে সে স্বর্গে আসিয়াছে চাষী তাহা বলিল। তাহার কথা শুনিয়া এবং

তাহার পাগড়িটি ভাল লাগায় ঐ পাগড়ির বদলে ইন্দ্র তাহাকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। ইহার পর চাষী যেমনভাবে উঠিয়াছিল সেইভাবে নামিয়া আসিল। সে স্বর্ণমুদ্রাগুলি প্রতিবেশীদের বিস্মিত চোখের সামনে মেলিয়া ধরিল।

একই উপায়ে রাতারাতি বড়লোক হইবার ইচ্ছায় তাহার বন্ধুরা ইন্দ্রের কাছে তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য চাষীকে ধরাধরি করিল। চাষী রাজি হইল। তাহার কথামতো বন্ধুরা নিজেদের মাথায় বড় বড় পাগড়ি চড়াইয়া স্বর্গে যাইবার বাসনায় মধ্যরাত্রে জড়ো হইল। মধ্যরাত্রে ঐরাবত যথারীতি তার প্রিয় মাঠে নামিয়া আসিল এবং শস্য খাইয়া যথাপূর্ব স্বর্গে উঠিতে লাগিল। ঠিক সময়ে সেই আধ-পাগলা চাষী ঐরাবতের লেজ ধরিল, এবং তাহার প্রতিবেশীরা পরপর তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

আকাশে উঠিতে উঠিতে একজন প্রতিবেশী স্বর্ণপ্রাপ্তির স্বপ্নে বিভোর হইয়া চাষীকে জিজ্ঞাসা করিল ইন্দ্রের কাছে যে পাগড়ি সে বিক্রয় করিয়াছে তা কত লম্বা ছিল। পাগড়ির মাপ দেখাইবার জন্য লেজ ছাড়িয়া দিয়া চাষী নিজের হাত বিস্তার করিল। ফলে সকলেই মাটিতে পড়িয়া গেল। চাষী সবার উপরে থাকায় বাঁচিয়া গেল। সে ছাড়া সবাই মারা পড়িল।

চাষীর প্রভূত অর্থ প্রাপ্তির স্বপ্ন এইভাবে ঘুচিয়া গেল। তারপর হইতে সে আরও শান্ত ও বিবেচক হইয়া যায়।

শোভনাদেবীর বর্ণিত গল্পটির প্রতিরূপ পাই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'রাক্ষস খোক্কোশ' বইটির লেজকাটা খোক্কস গল্পে। এই দুটি গল্পেরই আপাত নীতিকথা হইল : "অতিলোভে তাঁতী নষ্ট"। তবে শোভনাদেবীর গল্পটিতে একটি সুগভীর তাৎপর্য আছে। আসলে এ গল্পটি আমাদেব পৌরাণিক ঐতিহ্যে ভগীরথের গঙ্গাবতারণ কাহিনীরই "উলটপুরাণ" রূপান্তর। ভগীরথ গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছিলেন, আব এই গল্পে বোকা চাষী গঙ্গাকে পৃথিবী হইতে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিল ॥

২০ সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ

আমাদেব দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বিষয়বস্তু ইংরাজীতে প্রথম প্রকাশ করিবার কৃতিত্ব শশীচন্দ্র দত্তের। ইঁহার সম্বন্ধে আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে করা হইয়াছে। লালবিহারী দে প্রভৃতি ইঁহারই অনুগামী। তবে বিশেষভাবে অনুগামী হইতেছেন সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৯৯-১৯৬৫)। সুধীন্দ্রনাথ ১৯২০ অব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এস-সি. পাস করিয়া ইংলন্ডে প্রেরিত হন বিজ্ঞান পড়িতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত বিখ্যাত আইনজ্ঞ রাসবিহারী ঘোষের দ্বারা। লণ্ডনে কয়েক মাস থাকিয়া তিনি ফ্রান্সে যান পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউটে। সেখান হইতে পুনরায় লন্ডনে ফিরিয়া আসেন। বিজ্ঞানচর্চায় সুধীন্দ্রনাথের মন বসে নাই। তিনি সাহিত্য ও চিত্রশিল্পে মনোযোগ দিলেন। স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'প্রির‍্যাফেলাইট ব্রাদারহুড' বিষয়ে গবেষণা করেন এবং ডি. লিট. পান। ১৯২৮ অব্দে জেনেভায় লীগ অব নেশনস্‌-এর ভারতীয় বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন। বিবাহ করেন এক ফরাসী মহিলাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন এবং কিছুকাল নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া স্থায়ী চাকুরি গ্রহণ করেন "লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল ইন্‌স্টিটিউট অফ অ্যাডাল্ট এডুকেশনে"। এর পর ১৯৫৭ অব্দে শান্তিনিকেতনে ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ অব্দে বিলাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেন নাই। কিন্তু তাঁহার মন কবিত্ব রসে ভরপুর ছিল, ইহা তাঁহার উপন্যাসগুলির নামকরণ হইতে বোঝা যায়। তাঁহার উপন্যাসগুলি হইল : And Gazelles Leaping (অর্থাৎ "হরিণীর ঝাঁপান", ১৯৪৯), Cradle of the Clouds (অর্থাৎ "মেঘের কোলে", ১৯৫১), The Vermilion Boat (অর্থাৎ "সিঁদুরে খেয়াতরী", ১৯৫৩) ; এবং The Flame of the Forest (অর্থাৎ "দাবানল", ১৯৫৫)। তিনি অনেকগুলি লৌকিক গল্পেরও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেগুলি ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রকাশ পাইয়াছিল।

সম্প্রতি সুধীন্দ্রবাবুর লেখা Folk Tales and Fairy Stories from India এবং Folk Tales and Fairy Stories from Farther India গ্রন্থ দুইটির অনুবাদ "ভারতীয় রূপকথা ও লোককথা" (জানুয়ারি ১৯৯২, একত্র গ্রথিত দু'খানি গ্রন্থ) নামে প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদক সরিৎশেখর মজুমদার এবং প্রকাশক রূপা অ্যান্ড কোম্পানী।

২১ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীর বৈঠকে পুরাতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিক পণ্ডিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ-র (১৮৮৫-১৯৩০) আনাগোনা ছিল। ইতিহাসের খুঁট-আঁখরিয়া হইয়াও রাখালদাস সাহিত্যশিল্পীর কল্পনাশক্তি হইতে বঞ্চিত হন নাই। অবনীন্দ্রনাথের লেখায় রাজপুত ইতিহাসের যে মনোরম চিত্রধারা দেখা গিয়াছিল তাহারই যেন প্রতিলোম অনুসরণ চলিল রাখালদাসের রোমান্টিক-ঐতিহাসিক উপন্যাসে ও বড় গল্পে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের গঙ্গাধারা অবতরণ করিয়াছিল তাহার সহিত রাখালদাসের রচনার প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গেও মিল নাই। বরং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের রচনার সঙ্গে কিছু আছে, যদিও অক্ষয়কুমার গল্প-উপন্যাস লিখেন নাই। রাখালদাস নিজে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে ও প্রাচীন ইতিহাসে গভীর গবেষণা করিয়াছিলেন এবং প্রত্নতত্ত্বে ও প্রাচীন ইতিহাসে তাঁহার একরকম বিশেষ বোধ (যাহাকে ইংরেজীতে বলে flair) ছিল। (এ বিষয়ে তিনি বিদেশি পণ্ডিতের কাছে তালিম পাইয়াছিলেন।) মোহেন্‌জো-দড়ো ও হড়প্পার আবিষ্কার তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রাখালদাসের গবেষণায় গুপ্ত ও পাল রাজাদের সময়ের ইতিহাসের অনেক জটই ছাড়ানো সম্ভব হইয়াছিল। অন্বীক্ষায় এবং কল্পনায় রাখালদাস আমাদের দেশের পুরানো ইতিহাসকে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেই উপলব্ধির উষ্ণতা তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসে ও চিত্রে সঞ্চারিত আছে। এবং ইহাই তাঁহার রচনার স্থায়ী মূল্য। অন্যথা এগুলিতে বঙ্কিমী পদ্ধতির নকল মাত্র। রাখালদাসের উপন্যাস এবং রাখালদাসের গুরু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে' (১৯১৭)[২৮] বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাসে দৃক্‌পরিবর্তন-প্রয়াস সূচিত করে।

'পক্ষান্তর' (১৯২৪), 'ব্যতিক্রম' (১৯২৪) ও 'অনুক্রম' (১৯৩১) এই তিনটি সাধারণ উপন্যাস ছাড়া রাখালদাস দুইখানি ঐতিহাসিক চিত্র ও সাতখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক চিত্র দুইটিই পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত এবং একটি ('হেমকণা' প্রবাসীতে [১৩১৮-১৯ সাল] প্রকাশিত) অসমাপ্ত। 'পাষাণের কথা'য় (আর্যাবর্তে [১৩১৮

সাল] প্রকাশিত) শক-কুষাণ আমলে উত্তরাপথের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা আছে। উপন্যাস সাতটির মধ্যে তিনটি শেষ গুপ্ত আমলের। 'শশাঙ্ক' (১৯১৪)[২৯] গুপ্তযুগের শেষ অবস্থার ছবি। 'করুণা'য় (১৯১৭) গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সূত্রপাত চিত্রিত। পুস্তিকাকারে অপ্রকাশিত এবং অন্যতম শেষ রচনা 'ধ্রুবা'য়[৩০] গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদয়ের দিনের কাহিনী। পাল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবের দিনের আলেখ্য পাই 'ধর্মপাল' (১৯১৫)[৩১] উপন্যাসে। শাহজাহানের আমলে বাঙ্গালায় পোর্তুগীজ অত্যাচারকালের ছবি আঁকা হইয়াছে 'ময়ূখ'এ (১৯১৬, দ্বি-স ১৯১৯)। (ধর্মপাল ও ময়ূখ রাখালদাসের সর্বাপেক্ষা ছোট উপন্যাস।) বাদশা ফর্‌রুখশিয়রের আমলে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা চিত্রণ উদ্দেশ্যে 'অসীম' (১৯২৪)[৩২] লেখা। এটি রাখালদাসের বৃহত্তম উপন্যাস এবং ইহাতে ইতিহাসের মালমশলা সর্বাপেক্ষা কম ব্যবহৃত। 'লুৎফুল্লা' (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত)[৩৩] রাখালদাসের শেষ উপন্যাস। ইহাতে নাদির শাহের দিল্লী অধিকারের সময়কার ছবি আঁকা হইয়াছে। রচনাকালের সমসাময়িক পোলিটিক্যাল চিন্তাধারার ছাপ পাই নাদির শাহের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধতার প্রচেষ্টায়।

উপন্যাস ছাড়া বাঙ্গালায় রাখালদাসের উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে দুইখণ্ড 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৩২১, ১৩২৪ সাল)। বইটির মূল্য সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদেশি ঐতিহাসিকের মতে এই বইখানি পড়িবার জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বাঙ্গালা শেখা আবশ্যক।

রাখালদাসের পত্নী কাঞ্চনমালা দেবীও (১৮৯১-১৯৩১) সুলেখিকা ছিলেন। ইনি অনেকগুলি ছোটগল্প লিখিয়াছিলেন। সেগুলি অধিকাংশ মানসী ও সাহিত্য পত্রিকায় বাহির হইয়া পরে পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল—'গুচ্ছ' (১৯১৪), 'স্তবক' (১৯১৫), 'রসির ডায়ারী' (১৯১৮) ও 'শনির দশা' (১৯১৯)॥

২২ বিনয়কুমার সরকার

আমাদের ইতিহাস গবেষণায় বিনয়কুমার সরকারের (১৮৮৭-১৯৪৯) কৃতিত্ব অ-সামান্য—চিন্তাধারায় ও বাক্‌ব্যবহারে। ইনি পাঠ্যাবস্থা হইতেই অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও স্বদেশভক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া বিনয়কুমার জাতীয় শিক্ষা পরিষদে (National Council of Education) শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। সেই সময়ে ইনি শিক্ষা-ও-সমাজ-চিন্তা ঘটিত কিছু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রথমে 'গৃহস্থ' পত্রিকায় ও পরে এগুলি কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, যেমন 'সাধনা' (১৯১৩)। তাহার পর ইনি আমেরিকায় চলিয়া যান এবং প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিয়া ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসাধনের চেষ্টা করিতে থাকেন। শেষে দেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বিনয়কুমারের লিপিভঙ্গি নিজস্ব, নিজ বাগ্‌ব্যবহারের অনুরূপ।

ইঁহার অন্যান্য বাঙ্গালা রচনা 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ' (১৯১২), 'বাংলায় দেশী বিদেশী'

(১৯৪২), 'ইটালীতে বার কয়েক' (১৯৩২), 'বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র', ছয় খণ্ডে 'বর্তমান জগৎ' (১৯১৪) ইত্যাদি॥

টীকা

১। ১৩১৬ সালের ভারতীতে অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনূদিত হাফেজের কবিতা তিন কিস্তি বাহির হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের রোমান্টিক গল্প ও জেবুন্নিসার রোমান্‌স এবং 'শিল্পের ত্রিধারা' প্রবন্ধও এই বছরেই ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২। প্রথম প্রকাশিত ভারতীতে (১৩১১ সাল হইতে)। দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩১।

৩। ভারতী শ্রাবণ ১৩০৫।

৪। হাইল্যান্ড ডিবেটিং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে সভাপতির ভাষণ (ভারতী ফাল্গুন ১৩২৬ পৃ ৮১১)।

৫। অসিতকুমার হালদার লিখিয়াছেন "শুনিয়াছি, প্রসিদ্ধ চিত্রকর রাজা রবিবর্মা কোন সময়ে তাঁহাদের জোড়াসাঁকো ভবনে তাঁহার স্বর্গীয় পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে আসেন। সেই সময়ে বালক অবনীন্দ্রনাথের কতকগুলি পৌরাণিক গল্প অবলম্বনে রচিত রেখাঙ্কন চিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'বালকের সাহস ত কম নয়?—এখন হইতেই এরূপ গুরুতর বিষয় আঁকিবার চেষ্টা।'" (ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ পৃ ১৫১)।

৬। লেখকের আঁকা ছবিগুলি রচনার মূল্য বাড়াইয়াছে।

৭। গমনাগমন' (পথে-বিপথে) দ্রষ্টব্য।

৮। মূলে টানা গদ্যের মতো ছাপা।

৯। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স এই সময়ে আট আনা গ্রন্থমালার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বইখানি সেই সিরিজে বাহির হইয়াছিল।

১০। মাতু'।

১০ক। 'অরোরা'।

১০খ। 'পব ঈ-তাউস'।

১১। 'শিল্পায়ন' (১৯৫৫) কয়েকটি প্রবন্ধের সংশোধিত সংস্করণ।

১২। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত 'মণিলালের আসর' (মানসী ও মর্মবাণী বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬) দ্রষ্টব্য।

১৩। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী কি?

১৪। বোধকরি ইনিই 'সতুর মা' (১৯১৮, দ্বি-স ১৯৩৫, গল্পের বই) এবং 'নূতন উপনিবেশ' (১৯১৯, বড় গল্প) বই দুইটির রচয়িত্রী চারুবালা সরস্বতী।

১৫। প্রথম প্রকাশ প্রবাসী ১৩১৭ সাল।

১৬। কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে অভিনীত (১৬ অগ্রহায়ণ ১৩২৯)।

১৭। প্রথম প্রকাশ ভারতী আশ্বিন ১৩২১।

১৮। 'নিষ্ফল চেষ্টা' ভারতী আশ্বিন ১২৯৯।

১৯। প্রথম প্রকাশ ভারতী ১৩১৮ সাল।

২০। ১৩০৩ সালের ভারতীতে ইঁহার একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। ১৩১৫ সালের চৈত্র সংখ্যায় মার্ক টোয়েনের একটি গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল ('রূপার কাটির জয়')। ঐ সালের চৈত্রসংখ্যা মানসীতে 'হতাশ' গল্প বাহির হইয়াছিল।

২১। প্রথম প্রকাশ প্রবাসী ১৩২০ সাল।

২২। প্রথম প্রকাশ ভারতী ১৩২১-২২ সাল।

২৩। প্রথম প্রকাশ প্রবাসী ১৩২৩ সাল।

২৪। প্রথম প্রকাশ প্রবাসী ১৩২৪ সাল।

২৫। এই গ্রন্থের গল্পগুলি ঠিক ছেলে-ভুলানো নয়। এগুলি লইয়া পূর্ববঙ্গের অঞ্চল বিশেষে লোকগীতের সৃষ্টি হইয়াছিল।

২৬। 'রামগরুড়ের ছানা', আবোল তাবোলে সঙ্কলিত।

২৭। সুকুমার সাহিত্য সমগ্র, প্রথম খণ্ড, সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু সম্পাদিত (১৯৭৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা)।

২৮। প্রথম প্রকাশ নারায়ণে।

২৯। প্রথম প্রকাশ মানসী (অগ্রহায়ণ ১৩১৯ হইতে) কিয়দংশ।

৩০। প্রকাশ প্রবাসী (কার্তিক হইতে চৈত্র ১৩২৮)।

৩১। প্রথম প্রকাশ প্রবাসী ১৩৬২ সাল।

৩২। প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষে।

৩৩। প্রকাশ মাসিক বসুমতী (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ হইতে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬)। কিছুকাল পূর্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভাগলপুরের দল ও অন্যান্য

সেকালে সাহিত্যিককে বলিত কবি। কবির কাম্য ছিল যশ। একালের সাহিত্যিককে বলে লেখক। লেখকের কাম্যও যশ। কিন্তু কবি-যশের সহিত লেখক-যশের পার্থক্য রহিয়াছে। কবির যশ সভা-সমাবেশে লভ্য এবং ফাঁকা আওয়াজ। লেখকের যশ পাঠকসংখ্যা নির্ভর এবং তা টঙ্কাদেবীর টঙ্কার।

এখনকার দিনে বাঙ্গালাভাষায় সর্বাধিক যশস্বী লেখক হইলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যেহেতু তাঁহার বইয়ের পাঠকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। লেখক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভের মুখে তিনি পরলোকগমন করেন। তাহারও পরে অর্দ্ধ শতাব্দীকাল উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে। তবু আজও শরৎচন্দ্র সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু ঘটিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের আলোয় আলোয়।

সেকালের কবি-বিচার অনুসারে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে যশস্বী কবি, আধুনিক কালের সাহিত্যবিদ্যাবিশারদদের মতে তিনি বাঙ্গালাভাষায় সর্বোত্তম লেখক। কিন্তু পাঠক-জনপ্রিয়তায় রবীন্দ্রজ্যোতি শরৎচন্দ্রিকার তুলনায় অনেকখানিই ম্লান। শরৎচন্দ্রের বিশেষ গৌরব এইখানে। তাঁহার জনপ্রিয়তা পাহাড়ে নদীর বান ডাকা নয়, সমতল নদীর প্রবাহ। এ প্রবাহ আরও অনেকদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাহার কারণ শরৎচন্দ্রের রচনার এই স্থায়িত্ব বাঙ্গালী সাধারণ মানুষের অনুভবে আনন্দ জাগায়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) জন্ম হইয়াছিল পৈতৃক নিবাস ব্যাণ্ডেলের অদূরে সরস্বতী নদীর ধারে অবস্থিত দেবানন্দপুর গ্রামে। (গ্রামটির কিছু পূর্বতন গৌরব আছে। ভারতচন্দ্র প্রথম জীবনে এই গ্রামের জমিদার রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে থাকিয়া ফারসী শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং জমিদারের জন্য দুইখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখিয়াছিলেন।) পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতা ভুবনমোহিনী। শরৎচন্দ্রের

মাতুলালয় ছিল হালিশহরে। তাঁহার মাতামহ ভাগলপুরের কাছারিতে কেরানীর কাজ করিতেন। তিনি সেইখানেই উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায়, পরে সেখানকার স্কুলে।

মতিলাল অস্থিরমতি ছিলেন তাই কোন চাকুরিতেই বেশিদিন টিকিয়া থাকিতে পারিতেন না। শেষে অর্থকষ্টের জন্য তিনি দেশ ছাড়িয়া সপরিবারে ভাগলপুরে শ্বশুরালয়ে চলিয়া যান। ভাগলপুরে আসিয়া শরৎচন্দ্র এখানকার ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। মাতামহের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাদের আবার দেশে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিছুদিন পরে মতিলালকে আবার সপরিবারে ভাগলপুরে ফিরিয়া যাইতে হয়। শরৎচন্দ্র এখানে স্কুলে ভর্তি হইয়া ১৮৯৪ অব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শরৎচন্দ্র কলেজে ভর্তি হইলেন। কিন্তু পড়া আর বেশিদিন চলিল না। প্রথমে মাতার অকালে মৃত্যু ঘটিল এবং মতিলালের সহিত শ্বশুরবাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল।

ভাগলপুরে অধ্যয়নকালে বিভূতিভূষণ ভট্টের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বিভূতিভূষণের পিতা ছিলেন ভাগলপুর কোর্টে সাবজজ, তাঁহার বিশেষ সাহিত্যপ্রীতি ছিল। তাঁহার বাড়িতে গল্প-উপন্যাস কেনা হইত এবং ভারতী সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকা নিয়মিত আসিত। বিভূতিভূষণ ও আরও দুই-চারিজন বন্ধু যেমন, গিরীন্দ্রনাথ (শরৎচন্দ্রের মাতুল) যোগেশচন্দ্র, বিভূতিভূষণের ভগিনী অনুপমা (পরে নাম হয় নিরুপমা) মিলিয়া একটি সাহিত্যের আড্ডা জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই আড্ডার মুখপত্র হস্তলিখিত 'ছায়া'য় অনেকের লেখা নিজেদের মধ্যে প্রচারিত হইত। শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা এই পত্রিকাটিতেই স্থান পাইয়াছিল। বিভূতিভূষণ ভট্টের পিতা ভাগলপুর হইতে বদলী হওয়ায় এই আড্ডা ভাঙ্গিয়া যায় এবং হস্তলিখিত পত্রিকাও লোপ পায়।

অতঃপর শরৎচন্দ্রের ক্ষণিক দর্শন পাই ১৯০১ অব্দে কলিকাতায়। তিনি এখানে চাকুরি করিতেন। কিছুকাল পরে (কতদিন পরে জানি না) তিনি চাকুরি লইয়া ব্রহ্মদেশে চলিয়া যান। সেখানে প্রধানত রেঙ্গুনে থাকিয়া নানা সংস্থায় চাকুরি করিবার পর অবশেষে ভারত সরকারের দপ্তরে যোগ দিয়াছিলেন। ১৯১৬ অব্দে তিনি সেই চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং বাজে-শিবপুরে বাস করিতে থাকেন। এইখানে বাস করিবার পর হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যিকদের রঙ্গসভায় শরৎচন্দ্রের রীতিমত প্রবেশ। এখানে প্রায় দশ-এগারো বৎসর থাকিবার পর শরৎচন্দ্র তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর শ্বশুরালয়ের কাছে হাওড়া জেলার দেউলটি রেল স্টেশনের নিকটে রূপনারায়ণের তীরে সামতাবেড় গ্রামে বাস করিতে থাকেন। এখানে হইতে তিনি পরে কলিকাতায় বালিগঞ্জে নিজের বাড়িতে চলিয়া আসেন।

বাল্যকাল হইতে যৌবনারম্ভ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র যে সাংসারিক ও মানসিক দুঃখভোগ করিয়াছিলেন তাহা তিনি যৌবনারম্ভেই কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যানুরাগ তাঁহার মর্মমূল হইতে উৎসারিত বলিয়া শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ছিল। কলিকাতা হইতে ব্রহ্মদেশে[১] যাইবার আগে তিনি একটি গল্প—'মন্দির'—কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য দাখিল করিয়াছিলেন মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেনামিতে। গল্পটি ১৩০৯ সালে প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিল। এই পুরস্কার লাভ করিবার ফলে তাঁহার

গল্প লিখিবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া গিয়াছিল। একটি বড় গল্প— বড়দিদি—লিখিয়া ভারতীতে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। গল্পটি 'ভারতী'তে (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৩১৪) প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব অনেকটা আকস্মিকই বলিতে হইবে। ১৩১৯-২০ সালে যমুনায় ও সাহিত্যে আট নয়টি গল্প বাহির হওয়ায় সাধারণ পাঠক হঠাৎ এক নূতন ও মনোহর গল্প লেখকের সন্ধান পাইয়া বিস্মিত ও সচকিত হইয়া পড়ে। তাহার পর হইতে অনবচ্ছিন্নভাবে তাঁহার গল্প এবং উপন্যাস প্রধানত ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া সাধারণ পাঠক সমাজে শরৎচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সর্বোচ্চ ভূমিতে তুলিয়া ধরে। ১৯১২ অব্দের পূর্বে শরৎচন্দ্রের দুইটিমাত্র গল্প ছাপা হইয়াছিল। গল্প দুইটি চার পাঁচ বছর ব্যবধানে বাহির হইয়াছিল এবং লেখক অন্যনামা ও অজ্ঞাতনামা ছিলেন, তাই সেগুলির রচয়িতার দিকে কাহারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি প্রথম গল্প 'মন্দির' বেনামিতে[২] ১৩০৯ সালের কুন্তলীন-পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল (১৯০৩)। দ্বিতীয় গল্প 'বড়দিদি' ১৩১৪ সালের সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।[৩] তাহার পর একেবারে ১৩১৯ সালে যমুনার কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় 'বোঝা', সাহিত্যের মাঘ সংখ্যায় 'বাল্যস্মৃতি', ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় 'কাশীনাথ', ১৩২০ সালে যমুনায় 'চন্দ্রনাথ' (বৈশাখ হইতে আশ্বিন), 'পথনির্দেশ' (বৈশাখ), 'আলো ও ছায়া' (আষাঢ় ও ভাদ্র), 'বিন্দুর ছেলে' (শ্রাবণ), 'চরিত্রহীন', (আংশিকভাবে, কার্তিক হইতে চৈত্র) ও 'পরিণীতা' (ফাল্গুন), সাহিত্যে 'অনুপমার প্রেম' (চৈত্র) ও 'হরিচরণ' (আষাঢ়) এবং ভারতবর্ষে পণ্ডিতমশাই' (বৈশাখ ও শ্রাবণ) এবং 'বিরাজ বৌ' (পৌষ ও মাঘ) বাহির হইয়াছিল ॥

২

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশই রচনাই গল্প, আকারে না হোক প্রকারে। কিন্তু যেগুলি আকারে ছোট সেগুলির অধিকাংশের মধ্যেই ছোটগল্পের সম্পূর্ণ লক্ষণ মিলে না। প্লট শিথিল ও অসংহত, ভাবালুতায় রস কিঞ্চিৎ তরল ও ফেনিল এবং প্রত্যাশিত আনন্দময় পরিণতি দিবার জন্য উপসংহার তীক্ষ্ণতা-বর্জিত। তবে লেখকের আন্তরিকতা প্রবল এবং ভাষা অনায়াস-মনোহর। এই আন্তরিকতা ও মনোহারিতা শরৎচন্দ্রের রচনার অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূল রহস্য।

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শরৎচন্দ্রের গল্পে আগাগোড়া পড়িয়াছে। এবং এ প্রভাব ১৩২০ সাল হইতে বাড়িয়া গিয়াছে। ভাষার অনুকরণ মাঝে মাঝে তো আছেই, প্লটের অনুকরণও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের 'ব্যবধান', 'অনধিকার প্রবেশ' প্রভৃতি গল্পের নারী-ভূমিকার ছায়া শরৎচন্দ্রের অনেক গল্পেই স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত। শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি' গল্পের[৪] কাদম্বিনী ও হেমাঙ্গিনী যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের ফটিকের মামার ও 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালের ছাঁচে ঢালা। স্ত্রীর-পত্র গল্পটি 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬) রচনায় যে প্রেরণা যোগাইয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর (১৯১৬) আদর্শ যোগাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা'। শরৎচন্দ্রের 'স্বামী'[৫] ঘরে-বাইরের অনুসরণে

পরিকল্পিত।

১৯১৩ অব্দের আগেকার গল্প-রচনায় মাঝে মাঝে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও জলধর সেনের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। 'অনুপমার প্রেম' গল্পের আরম্ভ প্রভাতকুমারের ধরনে এবং উপসংহার রবীন্দ্রনাথের। 'চন্দ্রনাথ'-এর কাহিনী পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের 'ত্যাগ' ও প্রভাতকুমারের 'কাশীবাসিনী' গল্পের এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে' নাটকের অভ্রান্ত প্রভাব আছে।[৬] কোন কোন ভূমিকায় জলধরের 'বিশুদাদা'র এবং রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'র কথা মনে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুকরণ করিয়াই শরৎচন্দ্র প্রথম জীবনে লেখা শুরু করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী শরৎচন্দ্রকে যে গল্পরচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহা তিনি একদা একটি ভাষণে উল্লেখ করিয়াছিলেন, "উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হ'য়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি এমন নয়।" শুধু উপন্যাস নয় বঙ্কিমের অন্য রচনাও তাঁহাকে কম প্রভাবিত করে নাই। গল্প ছাড়া শরৎচন্দ্রের যে দুইটি আদিম গদ্য-রচনা ছাপা হইয়াছিল—'ক্ষুদ্রের গৌরব'[৭] ও 'গুরুশিষ্য-সংবাদ'[৮]—তাহা কমলাকান্তের-দপ্তরেরই জের। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় পরিত্যক্ত 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'র[৯] উপক্রমণিকা অংশটুকুও কমলাকান্তের-দপ্তর স্মরণ করায়।

১৯০১ অব্দের পর হইতে অর্থাৎ চোখের-বালি প্রকাশের এবং গল্পগুচ্ছ প্রচারের পর হইতে—যখন হইতে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনাবলী পাঠের সুযোগ পান তখন হইতে—রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়িতে থাকে। তবে বঙ্কিমের প্রভাব একেবারে মুছিয়া যায় নাই। বঙ্কিমের অনুসরণ শুধু সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস-গল্পেই আবদ্ধ, ইতিহাসের দিকে প্রসারিত হয় নাই। বঙ্কিম যে দৃষ্টিতে বাঙ্গালী সমাজকে দেখিয়াছিলেন শরৎচন্দ্র সে দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই, কেননা তাঁহার জীবনের গতি বঙ্কিমের মতো সহজ ও সরল ছিল না। তবে জীবনে ভালো-মন্দর মৌলিক আদর্শ দুইজনেরই মোটামুটি একরকম ছিল। পার্থক্য এইখানে—বঙ্কিমের সামাজিক নীতিবোধ ছিল শাস্ত্র-শাসিত ও পাঠ্যপুস্তক-নির্ধারিত, শরৎচন্দ্রের নীতিবোধ হৃদয়-অনুভূত, শাস্ত্র-শাসিতের মতো অতখানি কৃত্রিম ও কঠিন নয়। কিন্তু পাঠকের মুখ চাহিয়া হোক অথবা অন্য কারণে হোক শরৎচন্দ্র সমসাময়িক সমাজ-বন্ধনের বেড়া ভাঙিবার সাহস দেখান নাই, বোধ করি ইচ্ছাও করেন নাই। সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা ছিল তাহা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১০]

> একজন অশিক্ষিত পাড়াগাঁয়ের চাষা 'সমাজ' বলিয়া যাহাকে জানে, তাহার উপরেই নির্ভয়ে ভর দেওয়া চলে—পণ্ডিতের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাটির উপরে চলে না। অন্ততঃ, আমি বোঝা-পড়া করিতে চাই এই মোটা বস্তুটিকে লইয়াই। যে সমাজ মড়া মরিলে কাঁধ দিতে আসে, আবার শ্রাদ্ধের সময় দলাদলি পাকায়; বিবাহে সে ঘটকালি করিয়া দেয়, অথচ বউভাতে হয়ত বাঁকিয়া বসে; কাজ-কর্মে, হাতে-পায়ে ধরিয়া যাহার ক্রোধশান্তি করিতে হয়, উৎসব-ব্যসনে সাহায্যও করে, বিবাদও করে; সে সহস্র দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও পূজনীয়—আমি তাহাকেই সমাজ বলিতেছি এবং এই সমাজ যদ্দ্বারা শাসিত হয়, সেই বস্তুটিকেই সমাজ-ধর্ম বলিয়া

নির্দেশ করিতেছি।

এখানে স্পষ্ট বোঝা গেল শরৎচন্দ্রের সমাজ প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের শিথিলায়মান, দলগত পল্লীসমাজ—যে সমাজের একটা চিত্র তাঁহার 'পল্লীসমাজ' বইটিতে (১৩২২ সাল) পাই,—এবং তাঁহার অভিমতে সমাজধর্ম খেয়ালি ভাবাবেগের পথে চলে।

সমাজ-সংস্কারের দিকে শরৎচন্দ্রের কোন ঝোঁক তো ছিলই না অধিকন্তু বিমুখতাই ছিল বলা যায়। সংস্কার-সমর্থক ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও তাঁহার কখনো প্রসন্নতা ছিল না। তাঁহার মনে সমাজ-সংস্কারবিমুখতা ও ব্রাহ্মসমাজবিদ্বেষ পরম্পরানুষঙ্গী ছিল, তবে কোন্‌টি হইতে কোন্‌টি আসিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। প্রবন্ধটিতে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা যুক্তিসহ নয়, স্পষ্টভাষিত নয় এবং সঙ্গতিপূর্ণও নয়। তিনি বলিয়াছেন, ভুল-চুক অন্যায়-অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও সমাজকে মানিয়া চলিতে হইবে।

> যতক্ষণ ইহা সামাজিক শাসন-বিধি, ততক্ষণ ত শুধু নিজের ন্যায্য দাবীর অছিলায় ইহাকে অতিক্রম করিয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তোলা যায় না।...সমাজ যদি তাহার শাস্ত্র বা অন্যায় দেশাচারে কাহাকেও ক্লেশ দিতেই বাধ্য হয়, তাহার সংশোধন না করা পর্যন্ত এই অন্যায়ের পদতলে নিজের ন্যায্য দাবী বা স্বার্থ বলি দেওয়ায় যে কোন পৌরুষ নাই, তাহাতে যে কোন মঙ্গল হয় না, এমন কথাও ত জোর করিয়া বলা চলে না।

এই সাহসহীন ধারণা শরৎচন্দ্রের রচনাকে জনপ্রিয় করিয়াছে নিশ্চয়ই, তবে, তা শিল্পের উৎকর্ষ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কল্পিত সমাজ-গণ্ডীর নীরন্ধ্র প্রাচীরে আবদ্ধ হইয়া শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট কয়েকটি উৎকৃষ্ট ভূমিকা প্রত্যাশিত পরিণতি পায় নাই।

শেষ জীবনে শরৎচন্দ্র তাঁহার সমাজবোধের মধ্যে অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেই অনুসারে তাঁহার সাহিত্যশিল্পের ত্রুটি সংশোধন করিতে চেষ্টাও করিয়াছিলেন।[১১] কিন্তু তখন আর সময় ছিল না, তাঁহার রচনাশক্তি তখন নির্বাণোন্মুখ।

কয়েকখানি গল্প-উপন্যাসে নারী-নির্যাতনের কাহিনীই মুখ্যত স্থান পাইয়াছে।[১২] এমন অবস্থায় আগেকার লেখকেরা সমাজব্যবস্থার অকরুণতা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু অবাধ্যতা করেন নাই। শরৎচন্দ্রও তাহা করেন নাই। তিনি গল্পের মধ্য দিয়া ষাট সত্তর বছর আগেকার শ্লথবন্ধন পল্লীসমাজের মূঢ় হৃদয়হীনতা ও অন্ধ স্বার্থপরতা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রবল নারীত্বের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মহৎ ধারণা ছিল, এমন কি মোহ ছিল বলা যায়। বোধ করি প্রথম জীবনে তিনি একাধিক তেজস্বিনী স্নেহশীলা মহিলার অন্তরের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তবে সে পরিচয় প্রধানত রোমান্‌সকল্পনার ও ভাবালুতার একরঙা ছবিতেই তাঁহার রচনায় প্রকটিত।

সতীত্বের ধারণায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অধিকাংশ পূর্বগামী লেখকদের পার্থক্য বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে আর কোন বড় গল্পলেখকের চারিত্র্যনীতিবোধ সাধারণত গতানুগতিক ধারণার অতিরিক্ত ছিল না। সমাজের চোখে যাহারা পতিত ও ঘৃণ্য তাহাদের মহত্ত্বের পরিমাপ যে মনুষ্যত্বের উচ্চতর মানদণ্ডও ছাড়াইয়া যাইতে পারে সেদিকে আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন,—"মর্ত্যে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতীশিরোমণি"। শরৎচন্দ্রও কয়েকটি উপন্যাসে এই কথাটিই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে একনিষ্ঠ প্রেম তথাকথিত সতীত্বনিষ্ঠারও উপরে। এ-বিষয়ে তাঁহার সুদৃঢ় আস্থা তিনি

'নারীর মূল্য'[১৩] বইটিতে এবং একাধিক প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় বারবার বলিয়াছেন। "সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায় ?"[১৪] "সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলি নে, কিন্তু একেই তার নারীজীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি।"[১৫] বর্মী-নারীর প্রশংসায় বলিয়াছেন, "কেবলমাত্র নারীর সতীত্বটাকে একটা ফেটিস করে তুলে তাদের স্বাধীনতা তাদের ভাল হ'বার পথটাকে কণ্টকাকীর্ণ করে' তোলে নি।"[১৬]

যে-সব নারী ক্ষণিক ভুলের বশে অথবা পেটের দায়ে কিংবা অবস্থার গতিতে পরপুরুষকে দেহ সমর্পণ করে তাহাদের প্রতি সমাজের নির্মম অবহেলা শরৎচন্দ্রকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। মনে হয় প্রথম জীবনে তিনি এইরূপ একাধিক হতভাগিনীর পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা না থাকিলে এতটা সহানুভূতি, এমন কি মাত্রাতিরিক্ত সহানুভূতি জাগিতে পারে না। এক সময়ে শরৎচন্দ্র "এই বাঙ্গালা দেশে কুলত্যাগিনী বঙ্গরমণীর" ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিলেন, "তাহাতে বিভিন্ন জেলার সহস্রাধিক হতভাগিনীর নাম, ধাম, বয়স, জাতি, পরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ লিপিবদ্ধ ছিল।" তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, "এই হতভাগিনীদের শতকরা সত্তর জন সধবা। বাকি তিরিশটি মাত্র বিধবা। ইহাদের প্রায় সকলেরই গৃহত্যাগের হেতু ছিল, অসহ্য দারিদ্র্য এবং স্বামী ও সংসারের অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন।"[১৭]

তথ্যসংগ্রহের দিক দিয়া শরৎচন্দ্র যে দুঃসাহস দেখাইয়াছেন কাহিনীর পরিণতি পর্যন্ত তাহা না দেখাইয়া ভালোই করিয়াছেন কেননা উপাদেয় গল্পসৃষ্টি আর সমাজসংস্কার-প্রচেষ্টা একধরনেব কাজ নয। শরৎচন্দ্র ঠিকই লিখিয়াছিলেন, "সমাজসংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নাই। তাই, আমার বইয়ের মধ্যে মানুষের দুঃখ বেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়ত আছে, কিন্তু সমাধান নেই। ও কাজ অপরের, আমি শুধু গল্পলেখক, তা ছাড়া আর কিছুই নই।"[১৮] কিন্তু শেষের দিকের লেখায় শরৎচন্দ্র শিল্পী-মনের উপযুক্ত নিরাসক্তি রক্ষা করিতে পাবেন নাই।

সমাজ-সমস্যায় বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও শরৎচন্দ্রকে রিয়ালিস্ট অর্থাৎ যথাদৃষ্টপন্থী লেখক বলা চলে না। ইঁহাব জীবনদৃষ্টি সর্বদা অরঞ্জিত ছিল না, গভীরও ছিল না। সে-দৃষ্টি সহজেই হৃদয়াবেগের বাষ্পে ঘোলাইয়া গিয়াছে। ইঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলি সেই অল্প পরিমাণেই বাস্তব যে-পরিমাণে তাহারা জীবনের দীনতা, কুশ্রীতা, ও কদর্যতাকে প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ এই দীনতা ইত্যাদি শুধুই ভাবাবেগের ভারসাম্যের জন্য। প্রধান পাত্রপাত্রীর রোমান্টিক ভাবালুতার সঙ্গে এই অপ্রিয়-অবাঞ্ছিতের টানা-পোড়েনেই শরৎচন্দ্রের কাহিনীর আকর্ষণীয়তা প্রধানত নির্ভর করিয়াছে। সর্বোপরি লেখকের সহানুভূতিতে এবং হীননিপীড়িতদের জন্য অকৃত্রিম অনুকম্পা কাহিনীকে সর্বসাধারণের অনায়াস-উপভোগ্য করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে'[১৯] কবিতাটি পঠনীয়।

তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
'বাসি ফুলের মালা'।

তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণ-দশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেষারেষি,
দেখলেম তুমি মহদাশয় বটে—
জিতিয়ে দিলে তাকে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে গল্পরচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য কোথায়। ইহার উত্তর সহজ। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় মানবজীবনের সেই অখণ্ড রূপটি প্রতিফলিত হইয়াছে যাহা বিশ্বজীবনের ধারার সঙ্গে অনবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত এবং যাহা জীবন-স্রোতের মধ্য দিয়া অনির্বচনীয় চরিতার্থতার অভিমুখে অগ্রসর। তাই রবীন্দ্রনাথের গল্পে দীনতম ভূমিকাও লেখকের সমর্থন অথবা অনুকম্পা ব্যতিরেকেই আপন নিজত্বে মহিমান্বিত। শরৎচন্দ্রের কল্পনায় মানবজীবন খণ্ডরূপে প্রতিবিম্বিত এবং তাহার আরম্ভ ও শেষ এইখানেই। তাই ভূমিকায় মাহাত্ম্য আরোপণ করিতে শরৎচন্দ্রকে বাগ্‌জাল বিস্তার করিতে অথবা হৃদয়াবেগের দোহাই দিতে হইয়াছে, এবং এই কারণেই তাঁহার রচনায় সঙ্কীর্ণ জীবনের বাহিরের ইঙ্গিত প্রায় নাই, অথবা থাকিলেও তাহা নিতান্ত মামুলি। এইজন্যই শরৎচন্দ্রের লেখায় গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা হাস্যকর হইয়াছে ॥

৩

শরৎচন্দ্রের লেখায় গল্প-বলার সহজ, সরল, একটু প্রগল্‌ভ ভঙ্গিরই প্রকাশ। স্টিভেনসনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা করিয়া বলিতে পারি ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যের "তুসিতালা" (গল্পবলিয়ে)। শরৎচন্দ্রের গল্পে প্লট-গাঁথনি মুখ্য নয়, বর্ণনাটাই মুখ্য। নিজের গল্পরচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র একদা বলিয়াছিলেন

> প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া নিই, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। মনের পরশ বলিয়া একটা জিনিস, তাহাতে প্লট কিছু নাই। আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র—তাকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সে সব আপনি আসিয়া পড়ে।[২০]

অভিজ্ঞতার সূত্র যেখানে নাই সেখানে কল্পনানির্ভর গল্প ভালো জমে নাই। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কাহিনীও অনেক সময় আবেগের উচ্ছ্বাসে এলাইয়া গিয়াছে। অথচ এই কৈশোরোচিত আবেগ ও ভাবালুতাই শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয় রচনার একটা প্রধান আকর্ষণ। 'মন্দির', 'বড়দিদি', 'পরিণীতা' প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে রোমান্টিক কৈশোর-কল্পনারই প্রাধান্য, এবং এই ধরনের লেখাগুলিই সাধারণ পাঠকসমাজে লেখক শরৎচন্দ্রের আসনখানি প্রথম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। অভিজ্ঞতার অভাবে পূর্বরাগের ও নববিবাহিতের অনুরাগের বর্ণনায় অবাস্তবের রঙ লাগিয়াছে। তবে সাধারণ ভারতীয় পাঠকের চিরদিনের মনের কথাটি তিনি জানিতেন, সে কথাটি হইল—"মধুরেণ সমাপয়েৎ"। ভাবাতুর ও মধুররসাল বলিয়াই তাঁহার দুঃখান্তিক কাহিনী ট্রাজিক না হইয়া প্যাথেটিক হইয়াছে। এমন কি 'অরক্ষণীয়া'র মতো নিষ্করুণ কাহিনীও শেষে মাটি হইয়া

গিয়াছে।

সেন্টিমেন্টাল আবেদন ও রোমান্টিক পরিমণ্ডলটুকু যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে বোধ করি সেই উদ্দেশ্যেই শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ প্রায়ই অসম্পূর্ণ কিংবা অতিশয়িত হইয়াছে, এবং ইহার ফলে ভূমিকাঁগুলির সম্ভাব্যতার হানি হইয়াছে। তবে যেখানে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় হইতে উপাদান গৃহীত সেখানে কাহিনীর উৎকর্ষ অবিসংবাদিত। শরৎচন্দ্র সংসার ও সমাজকে দেখিয়াছেন ভালোলাগা মন্দলাগার অনুভূতি দিয়া, কৌতূহলী চোখ দিয়া নয়। এইখানেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য।

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু প্লটে এবং চরিত্রকল্পনায় সে সংখ্যার অনুপাতে বৈচিত্র্য পাই না। প্রধান ভূমিকাগুলি মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ফেলিতে পারি,—(১) আত্মভোলা উদাসীন অথবা বুদ্ধিবিবেচনাহীন, মূঢ়, (২) শঠ, কপট অথবা মূর্খ, এবং (৩) অনিয়মিত-হৃদয়াবেগ-উচ্ছ্বসিত স্নেহশীল ব্যক্তি যাহার মেজাজে ও ব্যবহারে যথাক্রমে অসঙ্গত অভিমানের সঙ্গে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান ও আর্দ্র স্নেহের সঙ্গে কোমল অভ্যর্থনা পরপর ছায়া ও রৌদ্র ফেলিয়াছে। মানবের জীবনে প্রচণ্ডতায় প্রকৃতির শক্তির অনেক উপরে যায় অনাদি অদৃষ্টচক্রের গতি। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকল্পনায় অদৃষ্টচক্রের গতি উপেক্ষিত। তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলি নিজেদেরই বিশিষ্ট হৃদয়াবেগান্দোলিত ও মনোবৃত্তিচালিত পুতুলের মতো ক্বচিৎ পারিপার্শ্বিকের চাপে ক্লিষ্ট, কিন্তু কদাপি অমোঘ অদৃষ্টচক্রান্তে পিষ্ট নয়।

শরৎচন্দ্রের গল্পের পাত্রপাত্রীর পরস্পর-সম্পর্কে বিশেষ লক্ষণীয় হইতেছে স্নেহশীলতার তির্যক্‌গতি। অর্থাৎ ভালোবাসার বন্ধন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অবলম্বন না লইয়া অসাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আশ্রয় লইয়াছে। তাই শরৎচন্দ্রের গল্পে বৈমাত্র ভাই, জ্ঞাতি ভাই-ভগিনী, খুড়ী-মাসী, দেবরপুত্র-ভগিনীপুত্র এমন কি আরো দূরতর আত্মীয়তা-সম্পর্কের মধ্যেই নিবিড়তম স্নেহবন্ধন চিত্রিত। ইহার দুইটি কারণ থাকিতে পারে। প্রথমত, একটু পরকীয় হইলে রস জমে ভালো। দ্বিতীয়ত, শৈশবে ও বাল্যে বোধকরি শরৎচন্দ্রের অদৃষ্টে বাপমায়ের ভালোবাসার অপেক্ষা দূরসম্পর্কীয়ের স্নেহ অযাচিতভাবে এবং বেশি করিয়া জুটিয়াছিল ॥

৪

পূর্বগামীর রচনার প্রভাব ও প্রতিচ্ছায়া ধরিয়া সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে শরৎচন্দ্রের প্রধান প্রধান গল্প-উপন্যাসগুলিকে চার পর্যায়ে[২১] ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে পড়ে বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত রচনাগুলি। যেমন, 'দেবদাস' (১৯১৭)[২২], 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬)[২৩], 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬)[২৩], 'দত্তা' (১৯১৮), 'দেনা-পাওনা' (১৯২৩) এবং 'পথের দাবী' (১৯২৬)। এই কাহিনীগুলিতে বঙ্কিমের উপন্যাসের রস যেন ইতিহাস-বর্জিত এবং কালোপযোগী পাত্রে পরিবেশিত হইয়াছে। দেবদাসের আদর্শ 'রজনী', প্রধান যোগসূত্র—বাল্য-প্রণয় ও বৃদ্ধ স্বামীর আনুগত্য। "পরিণীতা" 'রাধারাণী'র কথা মনে পড়ায়; যোগসূত্র ধনিযুবকের প্রেমপ্রশ্রয়। বিরাজ-বৌয়ে 'মৃণালিনী'র ও 'বিষবৃক্ষ'এর অতি ক্ষীণ ছায়া অনুভূত হয়। 'পল্লীসমাজের'

তুলনা করা চলে 'চন্দ্রশেখর'এর সঙ্গে বাল্য-প্রণয়ের প্রকৃতি ও গভীরতার দিক দিয়া। চন্দ্রনাথের সঙ্গে 'ইন্দিরা'র সাদৃশ্য অভ্রান্ত, পাচিকাবেশে মিলন ইত্যাদি অনেক যোগসূত্র।[২৩] ধনিকন্যার জন্য দুই নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দত্তার সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী'র তুলনা নির্দেশ করে। 'দেবী চৌধুরাণী'র আধুনিক ভাবরূপান্তর দেনা-পাওনা, যোগসূত্র নায়িকার মঠাধ্যক্ষতা ও স্বামিপরিত্যাগ। 'আনন্দমঠ'এর সঙ্গে পথের-দাবীর মিল ভাবের দিক দিয়া দুর্লক্ষ্য নয়।

রবীন্দ্র-ভাবিত রচনাগুলি দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত। এগুলি হইতেছে,—'মন্দির', 'বড়দিদি' প্রভৃতি গল্প, 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'গৃহদাহ' (১৯২০) এবং 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫)। চরিত্রহীন 'চোখের বালি'র অনুকরণ, অরক্ষণীয়ায় 'স্ত্রীর পত্র'এর ইঙ্গিত, গৃহদাহে 'গোরা'র আভাস এবং বিপ্রদাসে 'যোগাযোগ'এর ক্ষীণ ছায়াপাত।

তৃতীয় পর্যায়ের রচনা আত্মকথাশ্রিত। যেমন, চার পর্ব 'শ্রীকান্ত' (১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২৭, ১৯৩৩)।[২৪] চরিত্রহীনও অংশত এই পর্যায়ে পড়িতে পারে, তবে সেখানে আত্মগোপন প্রায় সম্পূর্ণ।

চতুর্থ পর্যায়ের রচনা 'শেষ প্রশ্ন'কে (১৯৩১) নাম দিতে পারি "দিক্‌ভ্রান্ত"। বাগ্‌জালে আচ্ছন্ন রচনাটিতে ভাবুকতার পরিচয় দিবার চেষ্টা আছে কিন্তু কাহিনী কিছুমাত্র জমে নাই। চরিত্রগুলি আকস্মিক ও অবুঝ ॥

৫

প্রথম দিকের বড় গল্পগুলির কাহিনীর মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য আছে। 'মন্দির', 'বড়দিদি', 'পথনির্দেশ', 'আলো ও ছায়া', 'পণ্ডিত মশাই', 'পল্লীসমাজ', 'দেবদাস,' এই সব গল্প-উপন্যাসে—দু-তরফা না হোক এক-তরফা—সৌভ্রাত্র্য ও আত্মীয়তা অথবা বংশমর্যাদা মিলনের পক্ষে দুরন্ত বাধা হইয়াছে। 'শ্রীকান্ত' বা 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'ও এই ধরনের কাহিনী। তবে এখানে মিলন দীর্ঘকাল বাধাগ্রস্ত হইয়াছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিহত হয় নাই।

'মন্দির' ও 'বিরাজ বৌ'[২৫] গল্প দুইটির কাহিনী ফাঁদা হইয়াছে শরৎচন্দ্রের পিতৃভূমি সরস্বতী-তীরবর্তী দেবানন্দপুর অঞ্চলে। বিষয় যোগাইয়াছে তাঁহার বাল্যস্মৃতি। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কৈশোর-রচনা (?) 'শুভদা'য় (১৯৩৮) বিরাজ-বৌ-এর কাহিনীর অসংস্কৃত আদি রূপটি পাই।

নায়ক-নায়িকার কঠিন পীড়া কিংবা মৃত্যু দ্বারা কাহিনীর সঙ্কটমোচন অথবা জটিল ঘটনার গ্রন্থিচ্ছেদ শরৎচন্দ্রের প্লট-পরিকল্পনার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। প্রথম দিকের গল্প-উপন্যাসে এই বৈশিষ্ট্য সুপ্রকট। মন্দির, বড়দিদি, বিরাজ বৌ, দেবদাস ইত্যাদিতে প্লটের জট ছাড়ানো হইয়াছে নায়ক অথবা নায়িকার মৃত্যুতে। এইখানেও বঙ্কিমের প্রভাব জাগ্রত।

'দেবদাস'[২৬] শরৎচন্দ্রের প্রথমতম উপন্যাস যদিও না হয় অন্যতম প্রথম উপন্যাস নিশ্চয়ই। কাহিনীতে বঙ্কিমের অনুসরণ সুব্যক্ত। পার্বতী-দেবদাসের বাল্য-সৌহার্দ্যলীলায়

শৈবলিনী-প্রতাপের প্রণয়লীলার অনুসরণ আছে, পার্বতী-ভুবনবাবুর দাম্পত্য-ব্যবহারে লবঙ্গ-রামসদয়ের দাম্পত্যলীলার অনুকরণও দুর্লক্ষ্য নয়। দেবদাস-পার্বতীর করুণ কাহিনীর মধ্যে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চমক আছে। কিন্তু রঙ অত্যন্ত চড়িয়া যাওয়ায় দেবদাসের শোচনীয় পরিণতি পাঠকের অশ্রু আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেও শিল্পের হানি করিয়াছে। দেবদাসের গোড়াকার স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকতা শেষের দিকে সেন্টিমেন্টালিটিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥

৬

'চরিত্রহীন'[২৭] (১৩২৪ সাল) শরৎচন্দ্রের বোধ করি সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট উপন্যাস। একদা লেখকের খ্যাতি-অখ্যাতি অনেকটাই এই রচনাটির উপর নির্ভর করিয়াছিল। এখনো সাধারণ পাঠকসমাজে চরিত্রহীনের মূল্য লইয়া মতভেদ চুকিয়া যায় নাই। তাহার কারণ বইটিতে লেখকের সাহিত্যকৃতির দোষ ও গুণ সমানভাবে বিদ্যমান। চরিত্রহীনের রচনাকাল জানা যায় নাই। কিন্তু ইহা যে ১৩০৮ সালের আগে লেখা হয় নাই তাহা বুঝিতেছি চোখের-বালির ছায়া হইতে। ১৩০৮ সালের খুব বেশি দিন পরেও নয়, কেননা তখনো বঙ্কিমের প্রভাব কমিয়া যায় নাই। চোখের-বালি শরৎচন্দ্রকে কতটা অভিভূত করিয়াছিল তাহা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন।

> ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো।...কোন কিছু যে এমন করে, বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখনও স্বপ্নে ভাবিনি। এতদিনে শুধু সাহিত্যের নয় নিজেরও যেন, একটা পরিচয় পেলাম।[২৮]

কিন্তু এই চোখের-বালিকেই যেন টেক্কা দিয়া চরিত্রহীন লেখা হইয়াছিল। ১৯১৩ অব্দে বর্মা হইতে দুইটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন

> চোখের বালি তার নিন্দার কারণ বিনোদিনী ঘরের বৌ। তাকে নিয়ে এতখানি করা ঠিক হয় নাই। এটাই বাড়ীর ভিতরের পবিত্রতার উপরে যেন আঘাত করিয়াছে। যেমন পাঁচকড়ির "উমা"। আমি ত এখনো কাহারো পবিত্রতায় আঘাত করি নাই ; পরে কি করিব কি জানি !"[২৯]
>
> অথচ রবিবাবুর "চোখের বালি" ভদ্রঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যে এমন কি আত্মীয়কুটুম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে—কেহ কথাটি বলে নাই।[৩০]

চোখের-বালি সম্বন্ধেই যখন এই ধারণা তখন অপর খ্যাতিমান্ লেখকের উপন্যাসের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মনোভাব ভালো হইবার কথা নয়। এ সম্বন্ধে আর একটি পত্রসাক্ষ্য উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসশিল্পেরও অপরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

> সেই সাবিত্রীকে আর নিতান্ত মেসের ঝি রাখি নি। প্রথম থেকেই মানুষ তাকে যেন অবজ্ঞার চোখে না দেখে সে উপায় ক'রেছি। বড় মন্দ হয়নি, প্রমথ ! আর ক্রমশঃ প্রকাশ্য নভেল ওরকম না হলে গ্রাহক জোটে না। লোকে নিন্দে হয়ত করবে—কিন্তু পড়বার জন্যেও উৎসুক হয়ে থাকবে।...ঐ 'ভারতী'র বাগ্‌দত্তা, পোষ্যপুত্র, দিদি, অরণ্যবাস—বারো

> আনা লোকেই পড়ে না, যদিও পড়ে নেহাৎ ব্যাগারখাটা গোছ। অথচ রত্নদীপ এর মধ্যেই অনেকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছে—অথচ সেটা বটতলার যোগ্য বই। এই ধর তোমাদের "মন্ত্রশক্তি"। ঐ পুরুত, আর মন্দির আর ঐ সব ঘ্যানোর ঘ্যানোর কেউ পড়ে না—অপরের কথা কি বলব ভাই, আমি এখনো পড়িনি। অথচ আমার এই ব্যবসা।[৩১]

হারাণ-কিরণময়ীর দাম্পত্য-সম্পর্কে চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর ব্যবহারের আমেজ আছে; এবং কিরণময়ীর ব্যবহার মাঝে মাঝে কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণীর মতো, আর পরিণাম শৈবলিনীর অনুরূপ। বঙ্কিম-প্রভাব এইটুকুতেই পর্যবসিত। রবীন্দ্র-প্রভাব কিন্তু গুরুতর। বিনোদিনীর আদর্শ যেন উন্নত করিতে কিরণময়ীর পরিকল্পনা। উপেন্দ্রও অনেকটা মহেন্দ্রের মতো, তবে বিবর্ণ ও অস্পষ্ট। কিরণময়ী স্পষ্টতই বিনোদিনীর মতো কথাবার্তা বলে। দিবাকরকে লইয়া কিরণময়ীর পলায়ন সহজেই বিনোদিনী-মহেন্দ্রের পলায়ন-কাহিনী মনে করায়। সুরবালা আশার ছাঁচে গড়া, তবে আশার মতো সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব সে পায় নাই। উপেন্দ্রের ভূমিকায় দৈবাৎ বিহারীর ক্ষীণ আভাস। দিবাকর নষ্টনীড়ের অমলকে স্মরণ করায়।

চরিত্রহীনের প্লট খুব গোছালো নয়। কেননা সে প্লটে অভিজ্ঞতা ও কল্পনা মিশ খায় নাই। কোন কোন ঘটনা স্পষ্টতই বাস্তবমূল এবং তাহা লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞানপ্রসূত। দিবাকর যদি শরৎচন্দ্রের বাস্তবজীবনের প্রতিবিম্ব হয় তবে সতীশ তাঁহার ভাবজীবনের প্রতিফলন।

প্লটে দুইটি পৃথক্ কাহিনী সমান্তরালভাবে গাঁথা হইয়াছে। কিন্তু সে দুইটির যোগসূত্র সর্বত্র অবিচ্ছিন্ন নয়। প্রথম কাহিনীর নায়িকা সাবিত্রী দুরদৃষ্টবশে পতিত, দ্বিতীয় কাহিনীর নায়িকা কিরণময়ী স্বকৃতভঙ্গ।

নায়ক বলিতে যদি কেহ থাকে তো সতীশ। এক হিসাবে সতীশই প্রধান ঘটনাচক্রের নিয়ন্তা। সতীশেরই স্নেহভিক্ষায় কিরণময়ীর কঠিন হৃদয় গলিতে শুরু করে, তাহার কথাতেই কিরণময়ীর সম্পর্কে উপেন্দ্র সজাগ হয়। শরৎচন্দ্রের রোমান্সের নায়ক যেমনটি হইয়া থাকে সতীশও তেমনি—ধনবান্ ও সংসারবন্ধনহীন, উদারহৃদয় এবং মধ্যে মধ্যে অযথা উচ্ছৃঙ্খল,—আসলে ভালো লোক। সে প্রবলবিশ্বাসী, তাহার বিশ্বাসভূমি ধোঁয়াটে "উপীন দা"। সতীশ রোমান্টিক মেজাজের লোক, তবুও সাবিত্রীর সম্পর্কে তাঁহার নিরর্থ মান-অভিমানের খামখেয়াল ও চলচিত্ততা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

মনে হয়, দিবাকর-ভূমিকায় লেখক প্রধানত নিজেকেই প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন বলিয়া অনেকটা স্বাভাবিক। কিন্তু শেষের দিকে—বিশেষ করিয়া আরাকানের ব্যাপারে—তাহার পরিণতি স্বভাবসঙ্গত বোধ হয় না।

উপেন্দ্রের ভূমিকা অস্ফুট, কতকটা রহস্যাবৃত। দেবপ্রতিমার মাহাত্ম্যের মতো তাঁহার মহত্ত্বও যেন জনশ্রুতিনির্ভর। কাহিনীর শেষের দিকে উপেন্দ্র মানুষের মতো হইয়াছে বটে কিন্তু অতিমাত্রায় অশ্রুপ্রবণতা চরিত্রটিকে ধোঁয়াটে করিয়াছে। সাবিত্রীকে দেখিবামাত্র সতীশের সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাবের পরিবর্তন "উপীন দা"র তুরীয় জ্ঞানশীলতার ও অনির্বচনীয় হৃদয়বত্তার কাছেও অনপেক্ষিত।

সুরবালার ভূমিকা চরিত্রহীন-কাহিনীর ধ্রুবতারার মতো। সুরবালা স্নেহশীল সরলহৃদয়

বিশ্বাসপ্রবণ। কিন্তু কেন যে তাহার উপর উপেন্দ্রের অত ভক্তি ও আস্থা তাহার ইঙ্গিতটুকুও নাই। সুরবালার মৃত্যুতে উপেন্দ্রের মনে পরিবর্তন আসিল, তাহার হৃদয়ের কাঠিন্য গলিয়া গিয়া ক্ষমাশীলতার আবির্ভাব হইল। কিন্তু সুরবালা কাহিনীর আড়ালে থাকিয়া গিয়াছে বলিয়া এই পরিবর্তন অকারণ বলিয়া মনে হয়। সুরবালা উপেন্দ্রের গুরু, কিরণবালারও। সুরবালার পতিপ্রেমই কিরণবালার নিরুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির যথার্থ প্রকাশপথ দেখাইয়াছিল—স্বামী-সেবার মধ্য দিয়া। সে-পথ যখন অবিলম্বে রুদ্ধ হইয়া গেল তখন সুরবালার সরল বিশ্বাস (এবং সতীশের সস্নেহ ব্যবহার) তাঁহাকে সান্ত্বনার পথ নির্দেশ করিয়াছিল।

কাহিনীর রঙ্গমঞ্চে সাবিত্রী প্রথম দেখা দিল যেন বিলাতি বাড়িওয়ালীর ভূমিকায়। সাবিত্রীর সম্পর্কে মেসের বাবুদের ও লোকজনের ব্যবহার আমাদের দেশের পক্ষে অত্যন্ত অসুলভ। প্রেমাস্পদের উপর তাহার সুদৃঢ় অধিকারবোধ সত্ত্বেও অযথা দুর্ব্যবহারের হেতু খুঁজিয়া পাওয়া দায়। স্বীকার করি প্রেমের কৌটিল্য এবং নারীপ্রকৃতির ছলনাময়তা সাহিত্যে ও মনস্তত্ত্বে স্বীকৃত সত্য, কিন্তু তাহারও সঙ্গতি ও সীমা আছে। শুধু সাবিত্রীতে নয় শরৎচন্দ্রের প্রায় সকল নায়িকা-চরিত্রেই এই প্রেমকৌটিল্য ও বাক্‌বিনিময় পৌগণ্ডচাপল্যে পর্যবসিত। সতীশ-সাবিত্রীর সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিল্বমঙ্গল নাটকের প্রভাব অসম্ভাবিত নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি কিরণময়ী-চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণীর এবং রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীর মনোবৃত্তি আরোপিত বোধ হয়। বিনোদিনীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়া কিরণময়ীকে পুরাপুরি বিদূষী হইতে হইয়াছে। কিরণময়ী ছাপা রামায়ণে খুশি নয়, রামায়ণের "পুথি" পাঠ না করিলে তাহার তৃপ্তি নাই। কিন্তু তাহার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এই পুথি পড়া খাপ খায় না এবং তাহার পরবর্তী জীবনেও ইহার সঙ্গতি নাই। দিবাকরের সঙ্গে তাহার মূষিকমার্জার-ক্রীড়ারও কোন সাফাই নাই, অনপেক্ষিত যৌন-ক্ষুধা ছাড়া। হয়ত কিরণময়ীর স্নায়ুবিকার ছিল।[৩২] পরিণামে মস্তিষ্কবিকৃতিও হয়ত সেই ইঙ্গিতই করে। কিরণময়ীর দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের এক অংশকে উপেন্দ্রের প্রতি ভালোবাসা ত্যাগের ও শান্তির তটভূমিতে টানিয়াছে, অপর অংশকে টানিয়াছে দেহের ক্ষুধা দিবাকরকে উপলক্ষ্য করিয়া ভোগের ও সর্বনাশের আবর্তে। এই দুই বিপরীত টানে পড়িয়া হতভাগিনীর জীবন নষ্ট হইয়া গেল।

সমাজের হৃদয়হীন কঠোরতাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করিলেও শরৎচন্দ্র সমাজের মর্যাদাকে কখনো ক্ষুন্ন করেন নাই। তাঁহার লেখায় হয়ত চাণক্যশ্লোকের নীতিসূত্র উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে, কিন্তু যাহা প্রকৃত নীতিবোধ, যাহার প্রেরণা বইয়ের শুষ্ক পত্র হইতে নয়, মানুষের জীবন্ত হৃদয় হইতে তাহার উপরই তাঁহার নির্ভর। সাবিত্রীর পূর্বজীবন যে ভদ্র-সমাজের অনুমোদিত প্রণালীতে যাপিত হয় নাই তাহার জন্য জ্ঞানত সে দায়ী নয়, দায়ী তাহার পারিপার্শ্বিক, তাহার সঙ্কীর্ণ সমাজ-পরিসর। কিন্তু লোকের চোখে চরিত্রহীন হইলেও সে সতীশের কাছে অসতী নয়, কেননা সতীশের ভালোবাসা পাইবার পর হইতে তাহার হৃদয় একনিষ্ঠ হইয়াছে। কিরণময়ী তাহার দেহকে অপবিত্র করিয়াছে ক্ষণিক প্রবৃত্তির তাড়নায়। কিন্তু উপেন্দ্রের প্রতি তাহার প্রেমনিষ্ঠা এতটুকুও টলে নাই। সুতরাং

চরিত্রহীন হইয়াও সে অসতী নয়। তবুও শরৎচন্দ্র এই দুই নারীকে জীবনের চরিতার্থতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, সমাজের মুখ চাহিয়া। কিরণময়ীর কথা উঠে না। সতীশ-সাবিত্রীর মিলনের বাধা সরোজিনীকাহিনীর পক্ষে অলঙ্ঘনীয় নয়। তবে শরৎচন্দ্রের কাছে বিবাহের মাহাত্ম্য ছিল সুমহৎ, তাই কোনোদিক দিয়া তিনি বিবাহ ব্যাপারে খুঁত রাখিতে চাহিতেন না।[৩৩]

বিলাতি-আচারপরায়ণ শিক্ষিতসমাজের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাই সেখানে তিনি ইংরেজী-শিক্ষিত নব্য মহিলার চিত্র অঙ্কনে অকৃতকার্য হইয়াছেন। সরোজিনী-ভূমিকার পরিকল্পনায়ও তাই এই অজ্ঞতার প্রকাশ। এই ভূমিকায় 'গোরা'র ললিতার কিছু ছায়া আছে। অঘোরময়ীর ভূমিকায় ব্যঙ্গবিজড়িত বাস্তবতা আছে। স্টীমারের ও আরাকানের আখ্যানের অবান্তর ক্ষুদ্র ভূমিকাগুলি জীবন্ত হইয়াছে। জাহাজে কিরণময়ী-দিবাকরের সম্পর্ক নৌকাডুবির কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ॥

৭

'শ্রীকান্ত'[৩৪] লেখকের আত্মস্মৃতিমূলক চিত্রসর্বস্ব উপন্যাস। চরিত্রহীনের সঙ্গে এই বইটির একটু সম্পর্ক আছে। দ্বিতীয় পর্বে বর্মার ঘটনায় চরিত্রহীনের আরাকান কাহিনীবই অনুবৃত্তি হইয়াছে। প্রথম পর্বে বাল্যজীবনকে আশ্রয় করিয়া শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সুপাঠ্য কাহিনী রচনা করিয়াছেন। ইন্দ্রনাথ-ভূমিকার আয়োজন কতটা বাস্তবনিষ্ঠ জানি না, কিন্তু সে যে রবীন্দ্রনাথের তারাপদর মতো সাহিত্যের অমরাবতীর অধিবাসী তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্নদাদিদির আখ্যায়িকা উজ্জ্বল ও মধুর। 'বিলাসী' গল্পে এই কাহিনীব উল্‌টাপিঠের ছবি পাই। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে অভিজ্ঞতার যোগান কমিয়া আসিয়াছে, সেই সঙ্গে কল্পনাব ভাগ বাড়িয়াছে, তাই এখানে আগেকার উজ্জ্বলতা নাই।

রবীন্দ্রনাথের বোষ্টমী ও চতুরঙ্গের প্রভাব চতুর্থ পর্বে কমললতার কাহিনীতে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। আখড়ার ভূখণ্ড লেখকের বাল্যস্মৃতির সৌরভময়। গহরের কাহিনী বিলাসীর সঙ্গে তুলনীয়।

শ্রীকান্তের কাহিনীতে একরম ধারাবাহিকতা থাকিলেও উপন্যাসের সংহত ও অখণ্ড রূপ ইহাতে নাই। বইটিতে সমগ্রতা নাই, না কাহিনীব দিক্ দিয়া, না রচনার দিক্ দিয়া, না ভাবের দিক্ দিয়া। তাহার একটা কারণ বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবের রচনা। বইটির মূল গুণ এই যে ইহাতে লেখকের অভিজ্ঞতাব ও কল্পনার উজ্জ্বল খণ্ডচিত্র গ্রথিত আছে ॥

৮

চরিত্রহীনের মতো 'গৃহদাহ'ও[৩৫] শরৎচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের গোরা পড়িয়াই যে বইটি লিখিবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন, এ কথা লেখক একটি চিঠিতে উল্লেখ করিয়াছেন। কাহিনীর কোন বস্তুই লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ বলিয়া মনে হয় না। তাই পূর্ববর্তী উপন্যাসের গুণ ইহাতে তেমন নাই। অকস্মাৎ পীড়া অথবা মূর্ছা ঘটাইয়া কাহিনীর জট কাটিয়া দেওয়া শরৎচন্দ্রের প্লটরচনার একটি সাধারণ কৌশল। গৃহদাহে এই

কৌশল বার বার চোখে পড়ে।

চরিত্রহীনের যে সমস্যা তাহা স্বাভাবিক, অর্থাৎ জীবনে সেরূপ ঘটনা নিত্যই না হোক কখনো কখনো ঘটে। গৃহদাহের সমস্যা এমন স্বাভাবিক নয়। অবশ্য তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সমস্যার অস্বাভাবিকতা ঢাকা পড়িয়া যায় যদি তাহা কাহিনী ও চরিত্রের পক্ষে অপেক্ষিত এবং পরিপূর্ণ প্রেক্ষণীতে উপস্থাপিত হয়। গৃহদাহের সমস্যা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও কৃত্রিম, এবং প্লটপরিকল্পনার শৈথিল্যে সে কৃত্রিমতা ঢাকা পড়িতে পারে নাই। স্বামিনিষ্ঠা হইতে যে প্রেম নারীহৃদয়ে জন্মায় তাহার মূল সুদূরবিসারী, তাহা প্রতিদিনের ভুলভ্রান্তি মান-অভিমান সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকে, এবং অবস্থার বিপাকে এমন নারীর দেহ-অশুদ্ধি ঘটিলেও তাহার পাতিব্রত্যের হানি হয় না। ইহাই গৃহদাহের তত্ত্বকথা। কিন্তু প্রধান প্রধান ভূমিকার অতিরঞ্জনের জন্য ঘটনাবলীর ঘনঘটার জালে এবং বাগ্‌বিস্তারের ফলে তত্ত্বকথাটুকু পরিস্ফুট হয় নাই। যে সমাজ হইতে শরৎচন্দ্র প্রধান কয়েকটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়, জনশ্রুতিলব্ধ।[৩৬]

গৃহদাহের প্রধান নায়ক মহিমের ভূমিকা ভালো করিয়া ফোটে নাই। উপেন্দ্রের মতো মহিমও সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বহীন এবং অপার্থিব। তাহাকে অহেতুক মহত্ত্বের উচ্চ আসনে বসাইয়া তাহার মানবতাটুকুকে উপন্যাসকাহিনীর যবনিকার অন্তরালেই রাখা হইয়াছে। প্রতিনায়ক সুরেশ শরৎচন্দ্রের সাধারণ নায়কের গুণবিশিষ্ট। সে ইমোশনাল, মেজাজী ও স্বেচ্ছাচারী, অন্তরে ভালো মানুষ, এবং একটুতেই তাহার চোখে জল আসে। গল্পের আসরে তাহার প্রথম আবির্ভাব অত্যন্ত অকারণ। তাহার আরো অনেক কার্যের কোন আধিভৌতিক অথবা আধিমানসিক সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া দায়। সাধু নয়, পাষণ্ডও নয়—হয়ত সে পাগল। সুরেশ কতকটা কিরণময়ীর পুরুষ রূপান্তর। কিরণময়ী পাগল হইয়াছিল শেষে, সুরেশ ছিল প্রথম হইতেই।

কেদারবাবুর ভূমিকায় প্রথম দিকে ব্যঙ্গের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। শেষের দিকে তাঁহাকে কতকটা মানুষের মতো দেখি বটে, কিন্তু রঙ বেশ চড়া। তিনিও পরিণামে ছিচ-কাঁদুনে হইয়াছেন। অচলার ভূমিকায় লেখকের প্রযত্নের পরিচয় আছে। রহস্যময়তা ও অহেতু খেয়ালি-ভাব না থাকিলে ভূমিকাটি স্পষ্টতর হইত। শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার নির্দিষ্ট আদর্শ অনুযায়ী সুরেশ-অচলার মেজাজও ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুসজল প্রেমোচ্ছ্বাসের ও মর্মভেদী কল.হর পেণ্ডুলামে দুলিতেছে। অচলা ব্রাহ্মঘরের শিক্ষিত মেয়ে কিন্তু তাহার আচরণ সর্বদা বাঙ্গালীর মেয়ের মতো নয়। অচলা-ভূমিকার পরিকল্পনায় ইংরেজী নভেলের ঋণ থাকা অসম্ভব নয়। শরৎচন্দ্রের ধারণায় বিধবা বাঙ্গালী মেয়ের নিষ্ঠার ও শুচিতার একদা যে আদর্শ ছিল তাহা মৃণাল-ভূমিকায় অভিব্যক্ত ॥

৯

'দত্তা'[৩৭] (১৯১৮) পুরাপুরি রোমান্টিক উপন্যাস, সরস গল্প। ছোটগল্পের উপযোগী কাহিনীকে টানিয়া বুনিয়া উপন্যাসটিকে দীর্ঘ করা হইয়াছে। চার্‌ল্‌স গার্‌ভিসের (Charles Garvice) 'লিওলা ডেল্‌স্ ফরচুন' *(Leola Dale's Fortune)*

উপন্যাস-কাহিনীর সঙ্গে দত্তার মিল এতটা গভীর যে শরৎচন্দ্র যে প্লটের জন্য খানিকটা ইংরেজী ঔপন্যাসিকের কাছে ঋণী সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।[৩৮] রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী পুরাপুরি বাঙ্গালী সন্দেহ নাই, তবে চরিত্র দুইটির পরিস্ফুটতায় ইংরেজীর রঙ অনুভূত হয়। দয়াল গোরার পরেশবাবুর ছাঁচে ঢালা।

'দেনা-পাওনা'র (১৯২৩)[৩৯] চিত্তাকর্ষক কাহিনীর মূলও ইংরেজী থেকে নেওয়া বলিয়া সন্দেহ জাগে। ষোড়শীর মতো দেবদাসী বিলাতি নভেলেই মানায়। বাউল-বৈষ্ণবদের সেবাদাসী আছে, কিন্তু তাহাদের পক্ষে মঠাধ্যক্ষতা দূরে থাকে মোহন্তগিরিও অসম্ভব। জীবানন্দের ভূমিকায় যে আতিশয্য দেখি তাহাও বিদেশি আমদানি মনে হয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে লেখা (১৯২৮) একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন

> এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করেই।...অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো আমার ষোড়শী![৪০]

'পথের দাবী'তে (১৯২৬) বাঙ্গালার বিপ্লব-আন্দোলনের ঢেউ বঙ্গোপসাগরের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে আছড়াইয়া পড়িয়া কিভাবে একটি অস্ফুট প্রেমকাহিনীর মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে তাহারই চিত্র আঁকা হইয়াছে। বাস্তবমূলক ভূমিকাগুলি বেশ জমিয়াছে। সুমিত্রার ভূমিকায় নির্লিপ্ততার ও কাঠিন্যের মাত্রাধিক্য হইয়াছে। অপূর্ব ও ভারতীর প্রেমকাহিনী গল্পের রহস্যময় গম্ভীর ভীষণ পরিবেশকে জমিয়া উঠিতে দেয় নাই। অতি নাটকীয়তার আতিশয্যও ইহার জন্য দায়ী। অপূর্ব ঘরপোষা কুনো বাঙ্গালী ভদ্রঘরের ছেলে, স্বীকার করি। সে হয়ত লেখকের মানসপ্রতিবিম্ব, এ কথাও স্বীকার করিতে বাধা নাই, কিন্তু সর্বদা লতাইয়া-পড়া ও স্ত্রীলোকের আঁচল-ধরা হইবার আবশ্যকতা গল্পের দিক্ দিয়া খুব ছিল কি? ছোটখাট অসঙ্গতি সত্ত্বেও ভারতীর ভূমিকায় খানিকটা স্বাভাবিকতা আছে। মোটের উপর সব্যসাচীর কোমলগম্ভীর রোমান্টিক ভূমিকাটিই পথের-দাবীর জনপ্রিয়তার হেতু। আসলে কিন্তু বিপ্লবপন্থার ইতিহাস-চিত্র হিসাবে পথের-দাবী খুব সার্থক রচনা নয়।

শরৎচন্দ্রের শেষ সম্পূর্ণ উপন্যাস 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১) লইয়া সাধারণ পাঠকসমাজে প্রবল মতদ্বৈধ আছে। বইটি উদ্দেশ্য লইয়া লেখা। তবে সে উদ্দেশ্য আগেকার উদ্দেশ্য নয়,—সাধারণ পাঠক ভোলাইবার জন্য লেখা নয়। তবে ইহাও টেক্কা দিবার জন্য লেখা—"অতি-আধুনিক" সাহিত্যিকদের। পত্রসাক্ষ্য উপস্থিত করিতেছি।

> "অতি-আধুনিক সাহিত্য" কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত।[৪১]

> শেষপ্রশ্নে অতি-আধুনিক সাহিত্য কিরকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেচি। "খুব করবো, গর্জন কোরে নোঙরা কথাই লিখবো" এই মনোভাবটাই অতি-আধুনিক-সাহিত্যের central pivot নয়—এরই একটু নমুনা দেওয়া।[৪২]

১০

'পল্লীসমাজ' (১৩২৩ সাল), 'অরক্ষণীয়া' (১৩২৩ সাল), 'বামুনের মেয়ে' (১৩২৭ সাল), প্রভৃতি রচনা সাধারণত সামাজিক উপন্যাস বলিয়া চিহ্নিত হইয়া থাকে। আসলে এগুলি "সামাজিক" নয়, শরৎচন্দ্রের সব গল্পের মতো এগুলিও পারিবারিক ও ব্যক্তিগত।

শরৎচন্দ্রের গল্পে যাহা সমাজ তাহা পটভূমিকা অথবা রঙ্গস্থলী মাত্র। অন্য লেখকের রচনায় বহিঃপ্রকৃতির যে স্থান শরৎচন্দ্রের রচনায় সমাজ অনেকটা সেই রকম। এমন কি পল্লীসমাজের "সমাজ"ও নিতান্তই গৌণ, কেননা সেখানে সমাজ স্বতন্ত্র সত্তা বা শক্তিরূপে কাজ করিতেছে না। পল্লীসমাজের পল্লী-পরিবেশ রমা-রমেশের প্রেমকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত। পল্লীসমাজের বিষয় খানিকটা বাস্তব ঘটনা হইতে নেওয়া বলিয়া শরৎচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন। তবে কল্পনাও অনেকখানি। (তাহা না হইলে সাহিত্য হইত না।) চিঠির নজীর উদ্ধৃত করি।

> এমনি আমার আব একখানা বই আছে পল্লী-সমাজ, এর বিক্রীও যত, খাতিরও তত। ..জানি এও টিকবে না। কারণ এ-ও সত্যে মিথ্যেয় জড়ানো।[৪৩]

১১

শরৎচন্দ্রের রচনারীতির প্রধান গুণ সরলতা ও মনোহারিতা। তাঁহার গল্প-উপন্যাসের উপক্রম যেমন একেবারে কাহিনীর অন্তঃপুরে পাঠককে পৌঁছাইয়া দেয় তাঁহার লেখার ভঙ্গিও তেমনি অজানিতে বুদ্ধির চৌকাঠের হোঁচট ঢাকিয়া দেয়। কাহিনীর অতর্কিত আবম্ভ রবীন্দ্রনাথের টেকনিক। যেমন, "বেণী ঘোষাল মুখুয্যেদের অন্দরের প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সম্মুখে এক প্রৌঢ়া বমণীকে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'এই যে মাসী, রমা কই গা ?'" —পল্লীসমাজের এই আরম্ভের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ'-এর উপক্রম—"বৃন্দাবন কুণ্ডু মহা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল—আমি এখনি চলিলাম।"

রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম প্রভাব সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের রচনারীতির স্বকীয়তা স্বীকার্য। কিন্তু কোন কোন সময়ে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ অত্যন্ত বেমানান হইয়াছে। যেমন, চরিত্রহীনে সতীশ কথা বলিয়া, (গোরার পরেশবাবুর মতো) "ঘাড় হেঁট করিয়া নিজের অন্তরের ভিতর তলাইয়া দেখিতে লাগিল।" "অকস্মাৎ লব্ধ নূতন চেতনার মত এই একটা কথা তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া গেল।"

আসল কথা, কাহিনীর পরিকল্পনায় এবং বর্ণনায় শরৎচন্দ্র স্বতঃস্ফূর্তির ও রসসৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু শিল্পকার্যে নৈপুণ্যের পরিচয় সর্বত্র পরিস্ফুট নয়।

শরৎচন্দ্র সজ্ঞান লেখক। কোন্ পথে তাঁহার লেখা পাঠককে খুশি করিবে তাহা মনে রাখিয়া তিনি লিখিতেন। পড়িয়া পাঠকের তৎক্ষণাৎ ভালো লাগিবে এবং চরিত্রের মধ্যে নিজের জীবনের ভালো লাগার মিল খুঁজিয়া পাইবে—ইহাই শরৎচন্দ্রের শিল্পের উদ্দিষ্ট। অতএব ট্র্যাজেডির ধার দিয়াও তিনি যান নাই। এ প্রসঙ্গে তাঁহার নিজের কথাই উদ্ধৃত করি।

> গল্প পারতপক্ষে ট্রাজেডি করতে নাই।...গল্প শেষ ক'রে যদি না পাঠকের মনে হয় "আহা বেশ" তবে আবার গল্প কি ? আমি এই লাইনে চলছি। রামের সুমতি, পথনির্দেশ, বিন্দুর ছেলে সব এই ছাঁচে ঢালা। শেষ ক'রে একটা আনন্দ হয়—শেষ ক'রে মনের মধ্যে gloomy ভাব আসে না। তোমাদের হরিদাস বাবুর মত যেন লোকে মন্তব্য প্রকাশ "রামের সুমতির নারায়ণীর মত একটি স্ত্রী পেতে ইচ্ছা করে।" এই সমালোচনাই সব

চেয়ে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা।[৪৪]

পড়িয়া যদি না আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে তবে সে গল্প কি?[৪৫]

আমার ছোটগল্পগুলা কেমন যেন বড় হইয়া পড়ে, এটা ভারী অসুবিধার কথা। আরো এই যে আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই গল্প লিখি, সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্যন্ত ছাড়িতে পারি না।[৪৬]

গ্রন্থকারের মুখে রচনার বিষয়টা চোদ্দ আনা না দিয়া পাত্র-পাত্রীর মুখে দিতে হয়...বেশি খুঁটিনাটি লইয়া আপনাকে এবং পাঠককে কাহাকেও দুঃখ দেওয়া কর্তব্য নয়।[৪৭]

গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে বলে প্লট তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দেবার দরকার নেই। যে যে তোমার বইয়ে থাকিবে প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। এই ধরো যাঁকে খুব জানো, তোমার বাবা কিংবা তোমার স্বামী। তারপরে এই দুটি চরিত্র তাঁদের দোষগুণ লইয়া কোন্ কোন্ ব্যাপারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারেন তাহাই ঠিক করিয়া লইতে হয়।[৪৮]

১২

বাঙ্গালার সিদ্ধ উপন্যাসরীতিকে সাধারণ পাঠকের মানসোপযোগী, ঘরোয়া এবং ভাবালু রূপ দিয়া উপস্থাপিত করিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইঁহার গল্পকাহিনীতে প্রণয় ও প্রীতিরস জমিয়া উঠিয়াছে মান-অভিমানের পালায়, প্রত্যাখ্যান-সমাদরের দোলায়। শরৎচন্দ্রের প্লট রচনার এই বিশেষত্ব অল্পবিস্তর দেখা গেল এমন কয়েকজন সমসাময়িক লেখক-লেখিকার রচনায় যাঁহাদের বলা যাইতে পারে শরৎচন্দ্রের কৈশোর-ভাবশিষ্য। শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবন কাটিয়াছিল ভাগলপুরে, এইখানে ইঁহার সাহিত্যিক জীবনেরও আরম্ভ। তাঁহার বয়স যখন আঠারো-কুড়ি তখন তিনি ও তাঁহার সমবয়সী কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু মিলিয়া সাহিত্যচর্চার একটি ছেলেমানুষি আসর ও আড্ডা জমাইয়াছিলেন।[৪৯] সে আসরে ও আড্ডায় যে গল্প ও কবিতা পড়া হইত তাহা হাতেলেখা পত্রিকা 'ছায়া'য় প্রকাশিত হইত।[৫০] কোন-না-কোন সময়ে এই আসরের সঙ্গে যাঁহারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই পরে গল্প ও উপন্যাস রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। যেমন গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৫৪) ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়[৫১], সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, ইন্দিরা (সুরূপা) দেবী, বিভূতিভূষণ ভট্ট এবং তাঁহার ভগিনী নিরুপমা দেবী। আরো একজন আত্মীয় ভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও এই দলে ছিলেন। ইঁহার গল্প 'উপেক্ষিতা' ১৩১৪ সালের প্রথম কুন্তলীন-পুরস্কার লাভ করিয়াছিল। গল্পটিতে শরৎচন্দ্রের হাত থাকা সম্ভব। এই লেখক-লেখিকারা, মায় শরৎচন্দ্র, সকলেই ভারতী পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সকলেই কুন্তলীন-পুরস্কৃত—ইহা লক্ষণীয়। সৌরীন্দ্রমোহনের কথা আগে বলিয়াছি। শরৎচন্দ্রের প্রভাবে পড়িয়া দাম্পত্য মান-অভিমানের পালা গাহিয়াছেন ইনি 'আঁধি' উপন্যাসে।[৫২] শরৎচন্দ্রের লেখা সভায় পড়া হইত অথবা তাঁহার রচনার খাতা এবং 'ছায়া' সভ্যদের হাতে হাতে ফিরিত। এই

সূত্রে ইঁহারা সকলেই শরৎচন্দ্রের তদানীন্তন রচনাবলী পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাই ইঁহাদের কোন কোন গল্প-উপন্যাস কাহিনীতে শরৎচন্দ্রের রচনাপরিচিতির সাক্ষ্য দুর্লক্ষ্য নয় ॥

১৩ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠালাভের পর আর একজন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৮২-১৯৪৫) উপন্যাস লেখকরূপে দেখা দিয়াছিলেন। ইনি কিছুকাল 'গল্পলহরী' সম্পাদন করিয়াছিলেন (১৩৩৭-১৩৪৮)। ইঁহার উপন্যাস 'চাঁদমুখ' (১৯২২), 'মুখরক্ষা' (১৯২২), 'পথের সন্ধান' (১৯২৫), 'শুভলগ্ন' (১৯২৬), 'সুপ্রভাত' (১৩৩৪) ইত্যাদি ॥

১৪ ভাগলপুরের দল

শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত রচনা ('মন্দির') তাঁহার আত্মীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়েয় নামে প্রেরিত হইয়া কুন্তলীন-পুরস্কার পাইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের স্বরচিত (?) প্রথম দুইটি রচনা ১৩১৪ ও ১৩১৫ সালে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ইনি যে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে প্রথম 'বৈরাগ্য-যোগ'।[৫৩] উল্লেখযোগ্য অপর উপন্যাস 'স্মৃতির আলো' (১৯২৮), 'মৃগ-তৃষ্ণা' (১৯৩১), 'পূর্বরাগ' (১৯৩৪)।

শরৎচন্দ্রের আর এক আত্মীয় গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প দুই-চারটি ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।[৫৪] ইঁহার গল্পের বই 'মঞ্জরী' (১৯১২) ও 'বিজলী'। ছয়টি ছোট-বড় গল্প লইয়া ইঁহার 'মঞ্জরী' বাহির হইয়াছিল ১৯২২ অব্দে। সুতরাং শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ দলের মধ্যে ইনিই প্রথম গ্রন্থকার। মঞ্জরীর গল্পগুলির বিষয়ে ভাগলপুরের দলের, বিশেষ করিয়া শরৎচন্দ্রের, পূর্বাভাস বিদ্যমান। ভূমিকায় লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা অনুধাবনযোগ্য।

> অনেকগুলি গল্পে পতিতা অথবা পুণ্যপথভ্রষ্টার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।...সমাজ যাহাদিগকে কলঙ্কের ছাপ দিয়া আপনার গণ্ডীর বহির্ভূত করিয়া দিয়াছে, তাহাদের অনেকেরই হয়ত মুহূর্তের উত্তেজনা অথবা ক্ষণিকের ভ্রান্তির বশে পদস্খলন হইয়াছে। তাহাদের অনেকেই হয় দারুণ অনুশোচনা করিয়াছে, এবং এমন যদি কেহ উদারহৃদয় মহানুভব থাকেন যাঁহারা তাঁহাদের অপরাধকে মার্জনা করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে সংসার তাহাদিগকেই আবার সার্থক গৃহিণীরূপে, স্নেহময়ী সেবিকারূপে, প্রেমময়ী নায়িকারূপে ফিরিয়া পাইতে পারে। পাপ দৃঢ় সংস্কারবদ্ধ হইবার পূর্বে, পতনের প্রারম্ভেই যদি ক্ষমা তাহাকে উদ্ধার করে, তাহা হইলে সে উদ্ধার ব্যর্থ হয় না। কৃতজ্ঞতায়, প্রেমে, শ্রদ্ধায় তাহা পবিত্র, সুন্দর ও মঙ্গলময় হইয়া উঠে।

শরৎচন্দ্রের মাতুলবংশীয় অপর আত্মীয়দের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৮৩-১৯৬০) পবরর্তী কালে গল্প-উপন্যাস রচনায় বিশেষভাবে মন দিয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথের একটি কবিতা ১৩১৪ সালে ভারতীতে (—যে বছর শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি'ও বাহির হইয়াছিল—) প্রকাশিত হয়। তাহার পর দুই একটি গল্প।[৫৫] 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদক রূপে (১৩৩৪-৪৪ সাল) উপেন্দ্রনাথ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথের প্রথম বই 'অমূল তরু' (১৯২৩) বড় গল্প।

উপেন্দ্রনাথের গ্রন্থসংখ্যা প্রায় বিশ। তাহার মধ্যে গল্পও আছে উপন্যাসও আছে।

তাঁহার রচনায় প্রথম জীবনের সহযোগীদের প্রভাব খুব কম।

বিভূতিভূষণ ভট্টের একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল ১৩১৪ সালে ভারতীতে।[৫৬] ইঁহার কয়েকটি গল্প ভগিনী নিরুপমার রচনার সহিত 'অষ্টক' (১৯১৭) নামে সঙ্কলিত হয় (১৩২৪ সাল)। তাহার পর বাহির হয় বড় গল্প (বা ছোট উপন্যাস) 'স্বেচ্ছাচারী' (১৯১৭) ও 'সহজিয়া' (১৯২২) এবং ছোটগল্প-সঙ্কলন 'সপ্তপদী' (১৯২৩)। বিভূতিভূষণের রচনা সরল তবে কিছু ভাবুকতার আধিক্য আছে। এইখানে তাঁহার রচনায় ভারতী-গোষ্ঠীর প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। স্বেচ্ছাচারীর কাহিনীতে ভাগলপুর সাহিত্যসভার ছাপ আছে। ছোটগল্পের মধ্যে সপ্তপদীর 'হাত দু'খানি' উল্লেখযোগ্য।

সহজিয়াকে লেখক "কাব্য-উপন্যাস" বলিয়াছেন। গল্পবস্তু ক্ষীণ, লেখকের ভগিনী নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী'ব কাহিনীর সঙ্গে একটু মিল আছে। লেখক চেষ্টা করিয়াছেন বাউল-সহজিয়ার সঙ্গে যোগী-সন্ন্যাসীর সাধনার এবং তাহার সঙ্গে নিরাসক্ত গৃহীর জীবনের মিল করিয়া দিতে। গোড়ার দিকে যে সহজিয়া বোষ্টম-বোষ্টমীর চিত্রটি আছে তাহা দুর্লভ এবং খাঁটি। কথ্যভাষায় লেখা, ঝরঝরে রচনা তবে কিছু উচ্ছ্বাস-কণ্টকিত।

শরৎচন্দ্র হইতে ভাগলপুরের দলের জোটবাঁধা। তাহারও আগে একজনের নাম করিতে পারি যদিও তিনি কোন সাহিত্যগোষ্ঠী বাঁধেন নাই। ইনি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।[৫৭] (ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্দ্র শরৎচন্দ্রের বাল্যসঙ্গী "ইন্দ্রনাথ"।) প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়কে ধরিলে বৃহত্তর 'বিহারের সাহিত্যচক্র'ও বলিতে পারি।

ভাগলপুরের দলের লেখিকারা লেখকদেব আগেই উপন্যাস লিখিয়া নাম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮)। ভারতীতে (১৩১৪ সাল) ইঁহার গল্প বাহির হইবার অনেক আগেই ইঁহার রচনা কুন্তলীন পুরস্কাব পাইয়াছিল। অনুরূপার উপন্যাস 'পোষ্যপুত্র' (১৯১১) ধারাবাহিকভাবে ভারতীতে বাহির হয় (১৩১৭-১৮ সাল), এবং এই বইখানিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠার শুরু। তাহার পর অচিরকাল মধ্যে 'জ্যোতিহারা' (১৯১৫)[৫৮] ও 'বাগ্‌দত্তা' (১৯১৪)[৫৯] বাহির হইল এবং তাহার পর 'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫)[৬০], 'মহানিশা' (১৯১৯), 'মা' (১৯২০)[৬১] ইত্যাদি বাহিব হইতে লাগিল। পোষ্যপুত্রের প্লটে বিদেশি প্রভাব আছে। জ্যোতিহারায় রবীন্দ্রনাথের গোরার ছাপ পড়িয়াছে। মন্ত্রশক্তিতে শরৎচন্দ্রের মন্দির গল্পেরই অনুসরণ।

অনুরূপা অনেক (পঁচিশখানারও বেশি) উপন্যাস এবং কিছু গল্প ও কয়েকখানি নাটক[৬২] লিখিয়াছিলেন। উপন্যাস সবই গার্হস্থ্য বা পারিবারিক নয়, ঐতিহাসিকও আছে। বিস্তর এবং ভালো লেখা সত্ত্বেও অনুরূপার রচনায় ক্রমবিকাশের (অথবা ক্রমাবনতির) পরিচয় নাই। প্লট অযথা ফেনানো ও জটিল এবং বর্ণনার আড়ম্বর বিরক্তিকর। উপন্যাস লিখিতে গিয়া লেখিকা ভুলিতে পারেন নাই যে তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী, পাণ্ডিত্যের আস্ফালন উপন্যাসে শোভা পায় না, এবং প্রাচীন পন্থার ও রক্ষণশীলতার সমর্থন তাঁহার কাজ নয়। এ কথা যদি ভুলিতেন তবে তাঁহার হাতে বাঙ্গালা উপন্যাসের মর্যাদা বাড়িত।[৬৩]

অনুরূপার অগ্রজা ইন্দিরা[৬৪] (১৮৮৯-১৯২২) সুলেখিকা ছিলেন। ১৩০৯ সাল হইতে ইঁহার গল্প কুন্তলীন-পুরস্কার পাইতে থাকে এবং ১৩১৪ সাল হইতে ভারতীতে ইঁহার গল্প বাহির হইতে থাকে। 'নির্মাল্য' (১৯২২)[৬৫], 'কেতকী' (১৯১৫) ও 'ফুলের তোড়া' (১৯১৮) ইঁহার গল্পের বই। ইঁহার প্রথম উপন্যাস 'সৌধরহস্য'[৬৬] কোনান্ ডয়েলের 'দি মিস্ট্রি অব্ ক্লুম্‌বার'-এর *(The Mystery of Cloomber)* অনুবাদ। 'স্পর্শমণি'[৬৭] ইঁহার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ মৌলিক উপন্যাস। ঘরোয় পরিবেশের চিত্রণে বেশ নিপুণতার পরিচয় আছে। লেখার ভঙ্গি সহজ এবং আড়ম্বরবর্জিত।

উপন্যাস রচনায় নিরুপমা দেবীর[৬৮] (১৮৮৩-১৯৫১) স্বাচ্ছন্দ্য প্রথম হইতেই পরিস্ফুট। ছোটগল্পে ইঁহার কৃতিত্ব তত উজ্জ্বল নয়, ছোটগল্প ইনি বেশি লিখেনও নাই। কয়েকটি গল্প অগ্রজ বিভূতিভূষণ ভট্টের রচনার সঙ্গে 'অষ্টক' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৯১৭)। ইঁহার নিজস্ব গল্পের বই 'আলেয়া' (১৯১৭)।

নিরুপমার প্রথম উপন্যাস 'অন্নপূর্ণার মন্দির' (১৯১৩)।[৬৯] বইটির প্লট শরৎচন্দ্রের 'অনুপমার প্রেম' গল্পের ছায়াবহ। শরৎচন্দ্রের গল্পটি নিরুপমার উপন্যাসের একবছর পরে বাহিব হইয়াছিল,[৭০] তবে বচনাকাল নিশ্চয়ই কিছু আগে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'দিদি' (১৯১৫) প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়া (১৩১৯-২০ সাল) সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিল। প্লটের পরিকল্পনা সরল ও স্বাভাবিক, রচনারীতি নিরাড়ম্বর ও অবাধগতি। কাহিনীটিকে বিষবৃক্ষের কালোপযোগী রূপান্তর বলিতে পারি। (দিদির কাহিনীসূত্র ধরিয়া নিরুপমা পূর্বে দুইট গল্প লিখিয়াছিলেন, 'বিস্মৃত স্মৃতি' ও 'গুরুদক্ষিণা')।[৭১] তাহাব পরে একে একে বাহির হইল 'বিধিলিপি' (১৯১৭),[৭২] 'শ্যামলী' (১৯১৮),[৭৩] 'বন্ধু' (১৩২৮ সাল), 'উচ্ছৃঙ্খল' (১৩২৭ সাল), 'পরের ছেলে' (১৩৩১ সাল)[৭৪], 'আমাব ডায়েরি' (১৩৩৪ সাল), 'দেবত্র' (১৩৩৪ সাল), 'অনুকর্ষ' (১৯৪০) ইত্যাদি। বন্ধুর কাহিনী পরিকল্পনায় শরৎচন্দ্রের প্রভাব আছে এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযেব আলোক লতাব ও হেমেন্দ্রকুমার বায়ের আলেয়ার-আলোর প্লটের সঙ্গেও সাদৃশ্য আছে। রাজেন্দ্র ও অমলা ভূমিকা ভাগলপুরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত হওয়া সম্ভব। অনুকর্ষেব কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে বৃন্দাবনের পুরোভূমিকায়। নায়ক চতুরঙ্গের শচীশেব আদর্শে গডা। বিশেষত্ব হইল লেখিকার অভিজ্ঞতার ছাপ।

নিরুপমার উপন্যাসের গঠন সরল ও গতি স্বচ্ছন্দ। ভাগলপুরের দলের রচনায় ঘরোয়া মান-অভিমানেব পালাই জমিয়াছে বেশি। নিরুপমার উপন্যাসে সে মান-অভিমানের বাড়াবাড়ি নাই। স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা, দুর্ভাগিনী নারীর মর্মবেদনার প্রকাশই বেশি করিয়া চোখে পড়ে। লেখিকা নারীহৃদয়ের ব্যর্থতাকে মিলনের সস্তা উপায়ে মিটাইয়া না দিয়া বাৎসল্যের ও ত্যাগের মহত্তর পরিণামে সার্থক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিরুপমার উপন্যাসে হয়ত গভীরতা নাই, তবে লেখিকার সংবেদনশীল হৃদয়ের ছাপ আছে। সেই কারণে এবং রচনার প্রসন্নতার জন্য সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে নিরুপমার নিজস্বতা সবিশেষ পরিস্ফুট॥[৭৫]

১৫ শৈলবালা ঘোষজায়া, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও অন্যান্য নারী ঔপন্যাসিক

ভাগলপুরের দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ না থাকিলেও এইসঙ্গে আর এক লেখিকার প্রসঙ্গ উঠে। ইনি শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪)। ইঁহাকে প্রথমেই পাই গল্প-লেখিকারূপে। ইহার একটি গল্প প্রবাসীর প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছিল (১৩২২ সাল)। শৈলবালা তাঁহার প্রথম সম্পূর্ণ প্রকাশিত উপন্যাস 'সেখ আন্দু'র (১৯১৭)[৭৬] প্লটে একটু বিশেষরকম স্বাধীনতা ও সাহসিকতা দেখাইয়াছিলেন। উপন্যাসের অস্ফুট ও রোমান্টিক প্রেমকাহিনীর নায়ক মুসলমান ড্রাইভার, নায়িকা হিন্দু মনিবকন্যা। মুসলমান ঘরের সরস কাহিনী 'মিষ্টি সরবৎ' (১৯২০) ও 'অবাক' (১৯২৫)। এখানেও লেখিকার উদার সাহসের পরিচয়। 'নমিতা' (১৯১৮)[৭৭] ইঁহার প্রথম রচিত উপন্যাসের অন্যতম। অপর উপন্যাস 'জন্ম অপরাধী' (১৯২০), 'জন্ম অভিশপ্তা' (১৯২১), 'মঙ্গলমঠ' (১৩২৭ সাল), 'ইমানদার' (১৯২২), 'মহিমাদেবী' (১৯২৩), 'অভিনেত্রীর একরাত্রি', 'মনীষা' ইত্যাদি। 'অকালকুষ্মাণ্ডের কীর্তি' গল্পের বই। শৈলবালার গ্রন্থসংখ্যা তিরিশের উর্ধ্বে।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ভাগলপুরের দলের ছিলেন না, তবে সেই অঞ্চলেরই লোক এবং শ্রীশচন্দ্র ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের আত্মীয়। নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ও মানসী-ও-মর্মবাণীতে প্রকাশিত ইঁহার দশটি গল্প 'বেহার-চিত্র (প্রথম খণ্ড)' নামে প্রকাশিত হয় (১৯২১)। গল্পগুলিতে সেকালের বিহার অঞ্চলের অর্ধশিক্ষিত খয়ের খাঁ ও হামবড়া জাতীয় ব্যক্তির সরস পরিচয় পাই। এ পরিচয়ের বাস্তবতা সন্দেহের অতীত। 'নিবেদন'-এ লেখক বলিয়াছেন

> যখন এই চিত্রগুলি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল, তখন কোন কোন পাঠক অনুযোগ করিয়াছিলেন যে, আমি এই সকল চিত্রে বেহারী-চরিত্রের কেবল "অন্ধকার অংশ" মাত্র চিহ্নিত করিয়া তাঁহাদের অপদস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহাদের এ অনুযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। আমরা পুরুষানুক্রমে বেহার-নিবাসী। বেহার আমাদের মাতৃভূমিতে পরিণত।
>
> অন্যান্য সকল প্রদেশের মত বেহারও এখন একাগ্রচিত্তে উন্নতিপ্রয়াসী। সুতরাং এই সময়ে আমি বন্ধুভাবে বেহারবাসীর চরিত্রের অপূর্ণতাগুলি হাস্যরসের আবরণে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি।

যতীন্দ্রমোহনের অপর গল্প-উপন্যাস—'দুর্বাদল' (১৯১৬), 'বিল্বদল' (১৯১৭), 'গৌরী' (১৯২১), 'পুষ্পদল' (১৯২২), 'অশ্রুময়' (১৯২৪) ইত্যাদি।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক বাঙ্গালায় নারী ঔপন্যাসিকদের স্বর্ণযুগ বলা চলে। নিরুপমা দেবী, ইন্দিরা দেবী, অনুরূপা দেবী ও শৈলবালা ঘোষজায়া ইত্যাদির কথা বাদ দিলেও আরো কয়েকজনকে পাই যাঁহারা গল্প উপন্যাস লিখিয়া অল্প বয়সেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। নিরুপমা অনুরূপা প্রভৃতি লেখিকাদের রচনার বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেনামি যে আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা সর্বাংশে অন্যায্য না হইতে পারে কিন্তু ঈর্ষার ঝাঁজ লক্ষ্য করা যায়।[৭৮] শরৎচন্দ্রের এই আক্রমণেই নারী লেখিকাদের সার্থকতার

প্রকারান্তরে স্বীকৃতি রহিয়াছে।

শান্তা দেবী (১৮৯৪-১৯৮৪) ও সীতা দেবী (১৮৯৬-১৯৭৪)—দুই ভগিনীর যুগ্মচেষ্টার প্রথম ফল শ্রীশচন্দ্র বসুর সঙ্কলন *Tales of Hindoostan* বইটির অনুবাদ 'হিন্দুস্থানী উপকথা' (১৯১২) প্রথম রচনার পর্যায়ে পড়ে। তাহার অনেককাল পরে প্রবাসী পত্রিকায় "শ্রীসংযুক্তা দেবী" এই ছদ্মনামে 'উদ্যানলতা' (গ্রন্থাকারে ১৯১৯) উপন্যাস বাহির হয়। যুক্তপ্রয়াস এইখানেই শেষ। দুই ভগিনীই অনেকগুলি ভালো ছোট-গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন। এবং সেগুলি প্রধানত প্রবাসীতে প্রথম বাহির হইয়াছিল। শান্তা দেবীর রচনা—'উষসী' (১৯১৮), 'স্মৃতির সৌরভ' (১৯১৮), 'সিঁথির সিঁদুর' (১৯১৯), 'চিরন্তনী' (১৯২১), 'জীবনদোলা' (১৯৩০) ইত্যাদি। সীতা দেবীর রচনা—'বজ্রমণি' (১৯১৮), 'ছায়াবীথি' (১৯১৯), 'পথিকবন্ধু' (১৯২০), 'আলোর আড়াল' (১৯২১), 'রজনীগন্ধা' (১৯২১), 'সোনার খাঁচা' (১৯২৭), 'পরভৃতিকা' (১৯৩০) ইত্যাদি।

গিরিবালা দেবী (১৮৯১-১৯৮৩) 'তৃণগুচ্ছ' (১৯২২), 'রূপহীনা' (১৯২৫), 'হিন্দুর মেয়ে' (১৯৩৭), 'দানপ্রতিদান' (১৯৩৭), 'খণ্ড মেঘ' (১৯৪৫) ইত্যাদির রচয়িত্রী।

সরসীবালা বসুর গল্প-উপন্যাসে ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য ও সারল্য লক্ষণীয়। ইঁহার উপন্যাস—'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯১৯), 'শিবানী' (১৯২১), 'শুকতারা' (১৯২২), 'রেখা' (১৯২২) ইত্যাদি। গল্পের বই—'শ্রেয়সী' (১৯২১), 'মিলন' (১৯২১) ইত্যাদি।

সুরুচিবালা রায় যেসব গল্প-কাহিনী লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মর্মস্মৃতি' (১৯১৯) 'ঝরাপাতা' ও 'আহুতি'।

পূর্ণশশী দেবীর (১৮৮৮-১৯৬৪) জন্ম কর্ম সবই বাঙ্গালা দেশ হইতে দূরে, পঞ্জাবে, উত্তরপ্রদেশ অথবা বিহারে। বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। ইঁহার গল্প কুন্তলীন-পুরস্কার পাইয়াছিল। ইঁহার উপন্যাস এইগুলি—'অভিশপ্তা', 'সাদাকালো', 'রাতের ফুল', 'অনুরাগ', 'ভালোবাসা এলো জীবনে', 'পথে বিপথে', 'চিত্তবিত্ত', 'মনের মানা নাই', 'স্রোতের মুখে', 'মরুনির্ঝর', 'কুয়াশা' ইত্যাদি।[৭৯]

জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮) চোখা অথচ স্নিগ্ধ দৃষ্টি আর পাকা হাত লইয়াই গল্পরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন (প্রথম প্রকাশ বিজলী ১৩২৭ সাল)। ইঁহার জন্ম রাজপুতানায়, জয়পুরে বাস তিন পুরুষের। কি বাঙ্গালা দেশের কি রাজপুতানায় ঘরে বাইরে ইঁহার স্বচ্ছ ও অনুভূতিময় দৃষ্টি ইঁহার গল্পগুলিতে সমুজ্জল হইয়া ফুটিয়াছে। 'সোনা রূপা নয়' (১৩৭৬ সাল) ইঁহার শ্রেষ্ঠ গল্প সঙ্কলন। অপর গ্রন্থ : গল্পের বই—'রাজযোটক' (১৯৪১), 'আরাবল্লীর আড়ালে' (১৯৫৫), 'ব্যান্ড মাষ্টারের মা' (১৯৬১), 'আরাবল্লীর কাহিনী' (১৯৬৫)। উপন্যাস—'ছায়াপথ' (১৯৩৫), 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' (১৯৪৮), 'মনের অগোচরে' (১৯৫২), 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' (১৯৬৮) ইত্যাদি।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৯০৫-১৯৭২) শতাধিক উপন্যাসের রচয়িত্রী। ইঁহার প্রথম দিকের রচনা—'অম্বা' (১৯২২), 'আয়ুষ্মতী' (১৯২৩), 'বিজিতা' (১৯২৩), 'আমার কথা' (১৯২৪), 'জাগরণ' (১৩৩৩ সাল), 'বিধবার কথা' (গল্প), 'সংসারপথের যাত্রা', 'শুভা', 'অপরাধের জের' ইত্যাদি। উপন্যাস-রচনা যে ইতিমধ্যে ইন্ডাস্ট্রিতে পর্যবসিত হইয়াছে

প্রভাবতী দেবীর রচনার অজস্রতা তাহার সুনিশ্চত প্রমাণ।

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে আরও এক প্রভাবতী দেবী (জন্ম ১৯০৫) আছেন।[৮০] পূর্বে ইনি নামের শেষে পদবী "গঙ্গোপাধ্যায়" লিখিতেন ॥[৮১]

১৬ সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ইত্যাদি

কয়েকজন প্রবীণ লেখক বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকেও উনবিংশ শতাব্দীর নভেলের জের টানিয়া চলিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০), সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, যদুনাথ ভট্টাচার্য (১৮৫৭- ?), শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৯-১৯৪৪), হারাণচন্দ্র রক্ষিত, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। ইঁহাদের মধ্যে শক্তিশালী লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে শুরু করিয়া বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক অবধি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরিয়া এড়্ভেঞ্চার-বহুল গার্হস্থ্য-চিত্রময় রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন। বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য।[৮২]

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য প্রায় সত্তরখানি উপন্যাস গ্রন্থের প্রণেতা। ইঁহার কয়েকখানি বই বহুকাল অবধি "বেস্ট-সেলার" হইয়াছিল এবং দু-একখানি এখনো ছাপা হয়। যেমন 'লোহার বাঁধন' (১৯০৪) ও 'মিলন-মন্দির' (১৯১১)। অপর উপন্যাস—'কুলীনকুমারী' (১৯০০), 'ভিখারিণী' (১৯০০), 'মায়াবিনী' (১৯০১), 'প্রেম-উন্মাদিনী' (১৯০২), 'পাষাণময়ী' (১৯০৩), 'লুকোচুরি' (১৯০৩), 'সোনারকণ্ঠী' (১৯০৪), 'নারীবলি' (১৯০৬), 'লাল পল্টন' (১৯১১), 'কুলুইচণ্ডী' (১৯১৯), 'বোধনবাড়ী' (১৯২৩), 'প্রেমের বাঁধন' (১৯২৯) ইত্যাদি। রোমান্টিক ও ঐতিহাসিক প্রেমকাহিনী হইতে রোমাঞ্চক ও যোগ-হিপ্‌নটিজ্‌ম্ পর্যন্ত কোন বিষয়ই ইঁহার উপন্যাসের অধিকার হইতে বাদ যায় নাই। 'লোহার বাঁধন' বইটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। অন্যান্য বই 'দুই দারোগা' (৪র্থ সং ১৩২৭ সাল), 'নকলরাণী', 'ধড়িবাজ চোর' 'ভৈরবী' ইত্যাদি। (মদীয় 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি' পৃ. ১৮৭ দ্রষ্টব্য।)

যদুনাথ ভট্টাচার্য প্রায় বিশখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসও আছে। যদুনাথের উপন্যাস—'সুশীলা ও সরলা' (১৯০১), 'কমলা' (১৯০২), 'পাঁচুঠাকুর' (১৯০৪), 'কর্মবীর' (১৯০৬), 'কালাপাহাড়' (১৯০৭), 'লক্ষ্মী বৌমা' (১৯০৯), 'সোনার সংসার' (১৯০৯), 'রাজা শত্রুজিৎ সিংহ' (১৯১২), 'রাজা দেবল রায়' (১৯২৩), 'বক্তিয়ার খিলিজি' (১৯১৫), 'দুই ভ্রাতা' (১৯১৬), 'রাজা শচীপতি রায়' (১৯১৭) ইত্যাদি। 'পাঁচ ফুল' (১৯১৪) গল্পের বই।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জীবনীকার। ইঁহার অধিকাংশ উপন্যাস ঐতিহাসিক—'বীরপূজা' (১৯০৫), 'বাঙ্গালীর বল' (১৯০৬), 'বঙ্গসংসার' (১৯০৭), 'নীরদা' (১৯০৮), 'রাজা গণেশ' (১৯০৯), 'অমরনাথ', 'রাণী ব্রজসুন্দরী' (১৯১৮), 'মেঘমালা' (১৯৩৭) ইত্যাদি। 'বারিবাহিনী' (১৯১৯) বঙ্কিম-আরব্ধ একটি কাহিনীর উপন্যাসরূপ।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত ইতিহাস ও কিংবদন্তী-অবলম্বনে আট-নয়খানি উপন্যাস

লিখিয়াছিলেন। যেমন, 'জ্যোর্তিময়ী (বা নূরজাহান)' (১৯০০), 'রাণী ভবানী' (১৯০৩), 'প্রতিভাময়ী' (১৯০৪), 'মন্ত্রের সাধন (বা রাণা প্রতাপ)' (১৯০৪) ইত্যাদি।

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস-সংখ্যা বিশ-বাইশের কাছাকাছি। যেমন, 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'রাজপুতের মেয়ে' (১৯২০), 'দোকানদার' (১৯২১), 'নবীনা জননী' (১৯২৩), 'দেবতার দান' (১৯২২), 'মিলন শঙ্খ' (১৯২৫) ইত্যাদি। ইঁহার কতকগুলি উপন্যাস গ্রন্থাবলী আকারে বাহির হইয়াছিল।

সত্যচরণ মিত্র লিখিয়াছিলেন 'বড় বৌ বা সুধাবৃক্ষ' (১৮৯২, চ-স ১৯১৭), 'আকাশগঙ্গা' (১৯০২) ইত্যাদি।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর (১৮৯৬) লেখক দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) ভারতী সাহিত্য প্রভৃতি বহু পত্রিকার লেখক ছিলেন। শেষ বয়সে ইঁনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা বিভাগে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি অধ্যাপনার কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার 'রামায়ণী কথা' (১৩১১) উল্লেখযোগ্য সুললিত গদ্য-রচনা। রূপকথা অবলম্বন করিয়া ইঁনি একটি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন—'তিনবন্ধু' (১৯১১)। পরবর্তী কালে ইঁনি আরও কিছু গল্প উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। গল্পের বই—'গায়ে হলুদ' (১৯২০), 'লতিকা' (১৯২২), 'ভয়ভাঙ্গা' (১৯২৩), 'দেশমঙ্গল' (১৯২৪), উপন্যাস—'আলোকে আঁধারে' (১৯২৫), 'চাকুরীর বিড়ম্বনা' (১৯২৬), 'শ্যামল ও কজ্জল' (১৯৩৮) ইত্যাদি। 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' (১৯২২) আত্মজীবনী ॥

১৭ বঙ্কিমী রীতি

বঙ্কিমী রীতি হইতে অধিকতর অপসৃত উপন্যাসের লেখকও সংখ্যায় কম ছিলেন না। ইঁহাদের আলোচনা করিতেছি। ইঁহাদের রচনা রোমান্টিক প্রকৃতির এবং ইঁহারা যে স্বদেশি ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে কথাবস্তুর বহির্ভূত রাখেন নাই তাহা উপন্যাসের নাম ও প্রকাশকাল মিলাইয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে।

নবকৃষ্ণ ঘোষ (১৮৬৮-১৯৪১) দুই-তিনখানি জীবনী,[৮৩] একটি কবিতার বই,[৮৪], দুইটি শিশুপাঠ্য বই[৮৫], এবং দুইটি গল্পের বই[৮৬] ও তেরোখানি উপন্যাস[৮৭] লিখিয়াছিলেন। এই পনরোখানি গল্পের বই ও উপন্যাস চৌদ্দ বছরের মধ্যে বাহির হইয়াছিল। নবকৃষ্ণের লেখা সরল ও উপভোগ্য।

কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত (১৮৭১-১৯৪২) 'প্রভাবতী' (১৮৯৬), 'ঋণপরিশোধ' (১৯০৯), 'লহর' (১৯১৪), 'পল্লীর প্রাণ (১৯১৯), 'লেডি ডাক্তার' (১৯২১) প্রভৃতি প্রায় তিরিশখানি উপন্যাস ও গল্পের বই লিখিয়াছিলেন। স্বাদেশিকতার প্রচার ইঁহার রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অনেকগুলি বই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের আট আনা সিরিজে বাহির হইয়াছিল।

বিধুভূষণ বসু (১৮৭৫-১৯৭২) প্রথম হইতেই "স্বদেশী" ভাবের লেখক। ১৯০৯ অব্দে প্রকাশিত ইঁহার 'শিকার' গল্পটির জন্য ইনি রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হইয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ ইনি গল্প, উপন্যাস, নাটক, জীবনী, গীতিকাব্য, গান ইত্যাদি রচনা করিয়া আসিয়াছেন। তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—উপন্যাস :

'লক্ষ্মী মেয়ে' (১৮৯৭, পরে পাঁচটি সংস্করণ হইয়াছিল) ; 'লক্ষ্মী বৌ' (নয়টি সংস্করণ প্রকাশিত), 'চারুচন্দ্র' (১৯০০), 'অমৃত গরল' (১৯০১), 'সতীলক্ষ্মী' ইত্যাদি। গল্পের বই : 'বনমালা' (১৯১৪)। নাটক : 'দাদা' (১৯২৫) ও 'ব্রহ্মচারিণী' (১৯২৫)। গীতিনাট্য : 'বঙ্গবাসীর সোনার স্বপন'। গানের সঙ্কলন : 'গীতাহার' (১৯১৭) ; ইত্যাদি ইত্যাদি ॥[৮৮]

১৮ ফণীন্দ্রনাথ পাল ও অন্যান্য

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু, 'যমুনা'র সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল (১৮৮১-১৯৩৯) অন্যূন একুশ-বাইশখানি গল্প-উপন্যাসের বই লিখিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম গল্পের বই 'সই-মা' (১৯১৫) প্রশংসিত হইয়াছিল। উপন্যাসের মধ্যে 'ছোট বউ' (১৯১৫), 'ইন্দুমতী' (১৯১৬) ও 'স্বামীর ভিটা' (১৯১৬) জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইঁহার গল্পের বই—'সুকুমার' (১৯১৬), 'অকৃতজ্ঞ' (১৯১৮), 'সম্পত্তি রক্ষা' (১৯১৮), 'ভৌতিক কাহিনী' (১৯১০), 'বড় মা' (১৯৩১), 'রূপসী' (১৯৩১)। উপন্যাস—'পুষ্পরাণী' (১৯১৮), 'অণিমা' (১৯২০), 'জীবন্তসমাধি' (১৯১৭), 'নারী' (১৯২১), 'মধুমিলন' (১৯১৭), 'ময়ূরপুচ্ছ', 'ফিরে পাওয়া', 'মণিকাঞ্চন' (১৯২৩) ইত্যাদি। সরোজনাথ ঘোষ (১৮৭৮-১৯৪৪) লিখিয়াছিলেন গল্পের বই 'মস্তকের মূল্য' (১৯০৭) ও 'বিদ্রোহী' (১৯১৯) ; উপন্যাস 'যমুনাধারা' (১৯৩৪) ইত্যাদি। যতীন্দ্রনাথ পাল প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। যেমন, 'মিলন' (১৯১৬), 'বিধির বিধি' (১৯১৭), 'সঙ্গিনী' (১৯১৭), 'সতীরাণী' (১৯১৮), 'প্রলোভন', 'দেশের মেয়ে' (১৯১৪) ইত্যাদি। পাঁচকড়ি দে'র সহযোগী ধীরেন্দ্রনাথ পালও কিছু গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। সেগুলির বেশির ভাগই ডিটেক্টিভ। বিজয়রত্ন মজুমদারের (১৮৯৪-১৯৩৫) গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা তিবিশের ঊর্ধ্বে। ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'জীবনের সাধ', 'নিখিলের শান্তি', 'বিশ্বনাথের দববাবে', 'বন্ধুর দান' ইত্যাদি প্রায় পঁয়তাল্লিশখানি বই লিখিয়াছিলেন। প্রথম চারখানি বই ১৯২৩ অব্দে বাহির হইয়াছিল—'শিথিল কবরী', 'লক্ষ্মীপ্রতিমা', 'সোহাগী' ও 'সোনালী'। দেবেন্দ্রনাথ বসুর (১৮৫৯-১৯৩৩), 'বাসিফুল' (১৯১৫) ও 'সীমন্তিনী' (১৯১৮)। শ্রীপতিমোহন ঘোষ লিখিয়াছিলেন 'মায়ার শৃঙ্খল' (১৯১৪), 'দেনমোহর' (১৯১৯), 'বন্দিনী' (১৯১৯), 'বিজয়িনী' (১৯২৪), 'সাধের বিয়ে' ইত্যাদি। প্রফুল্লচন্দ্র বসু 'রবি দাদা' (১৯১৬), 'অঙ্গহীনা', 'বিয়ের কনে' (১৯১৯), 'কুলীনের মেয়ে' (১৯২২), 'বৈরাগী ঠাকুর', 'রাজা বর', 'সুরের হাওয়া' ইত্যাদির লেখক। হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন 'গৃহলক্ষ্মী', 'পল্লীমোড়ল' (১৯১৮), 'পরাধীনা' (১৯১৮), 'অনাদৃতা' (১৯১৯), 'মায়ের প্রাণ' (১৯১৯), 'মুগ্ধা', 'লুকোচুরি' (১৯২২), 'মরণের পরে' (১৯২৯) ইত্যাদি। চরণদাস ঘোষ (১৮৯৫-১৯৬৬) লিখিয়াছিলেন 'মণ্টুর মা' (১৯২২), 'সুবাস' (১৯২৩), 'ছন্নছাড়া' (১৯২৪), 'হিন্দুর বৌ' (১৯২৬) ইত্যাদি। সত্যেন্দ্রকুমার বসু (১৮৭৫-১৯৩১) লিখিয়াছিলেন 'বৈষ্ণবী' (১৯১১), 'পরাজয়' (১৯২৫) ইত্যাদি।

মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৮৯-১৯৬৫) মানসী-ও-মর্মবাণী পত্রিকার প্রায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। ইঁহার গল্পের বই—'হাসি ও অশ্রু' (১৯১৮), 'কালো বৌ' (১৯২৩), 'পাথরের

দাম' (১৯২৩), 'প্রেমের মূল্য' (১৯২৪), 'বন্ধু' (১৯৪০, দ্বি-স ১৯৪৪), 'মিলন' (১৯৩৯) ইত্যাদি। উপন্যাস—'চির-অপরাধী' (১৯২০), 'অপূর্ণ' (১৯২৪), 'অশ্রুনির্ঝর' (১৯২৫), 'প্রশান্ত' (১৯২৫), 'অদৃষ্টের খেলা' (১৯৩০), 'স্বয়ংবরা' (১৯৩৩, দ্বি-স ১৯৪৫), 'স্মৃতির-মূল্য' (১৯৩৪) ইত্যাদি।

মাণিকচন্দ্রের মতো খগেন্দ্রনাথ মিত্রও (১৮৮০-১৯৬১) প্রধানত মানসী-ও-মর্মবাণী পত্রিকাতে লিখিতেন। ইঁনি প্রথম জীবনে ছিলেন সরকারি কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, অবসর লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ এবং কীর্তন গানে সবিশেষ দক্ষতা ছিল। ইঁহার গল্পের বই—'নীলাম্বরী' (১৯১২), 'কানের দুল' (১৯২১), 'বিবি বৌ' (১৯২৬), 'সারি' (১৯২৯) ও 'মন্দাক্রান্তা' ; উপন্যাস—'রূপতৃষ্ণা' (১৯২৬) ; প্রবন্ধের বই—'সুখ ও দুঃখ' (১৯৩২) ইত্যাদি। ইঁহার রচনা সরল ও সুখপাঠ্য।

সতীশচন্দ্র ঘটক (১৮৮৫-১৯৩২) লিখিয়াছিলেন দুইখানি গল্পের বই—'সতীর জেদ' (১৯২৪) ও 'দুই চিঠি' (১৯২৮) · একটি প্রবন্ধের বই—'রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' (১৯১৫) ; দুইটি হাল্‌কা কবিতার বই—'ঝলক' (১৯২৩) ও 'লালিকাগুচ্ছ' (১৯৩০) এবং তিনখানি নাট্যরচনা—'নাটিকাগুচ্ছ' (১৯২৯), 'হাটে হাঁড়ি' (১৯২৯, দ্বি-স ১৯৪৯) ও 'অগ্নিশিখা' (১৯৩০)।

ভবানীচরণ ঘোষের (১৮৬২-১৯২৫) উল্লেখ আগে করিয়াছি। ইনি লিখিয়াছিলেন পরিণয় কাহিনী' (১৯০৩), 'উৎপলা' (১৯১৩), 'যুগমানব' (১৯২৬) ইত্যাদি। উপেন্দ্রনাথ ঘোষ 'নাচওয়ালী' (১৯১০), 'দামোদরের বিপত্তি' ইত্যাদি সাত-আটখানি গ্রন্থের রচয়িতা। উপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছিলেন 'নকল পাঞ্জাবী' (১৯১৭) ইত্যাদি। মনোমোহন রায় লিখিয়াছিলেন 'মণিমালা', 'সতীর মূল্য' ইত্যাদি।

বীরেন্দ্রকুমার দত্ত 'প্রহেলিকা' (১৩২৪ সাল) ও 'জঞ্জাল' উপন্যাসের, 'সনাতনী' (১৯৩২) গল্পগ্রন্থের এবং 'সন্ধান' ও 'যুগমানব' নামক চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ-গ্রন্থের লেখক। 'প্রহেলিকা' বাঙ্গালায় বৃহত্তম উপন্যাসের অন্যতম। একদা বইটির সমাদর হইয়াছিল।

বিশ্বপতি চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৭৮) 'ব্যথা' (১৯১৫), 'স্বপ্নশেষ' (১৯৩০), 'সেতু' (১৯৩৪) ও 'বহুরূপী' (১৯৩৭) গল্পের বই—আর 'ঘরের ডাক' (১৯২১), 'বৃন্তচ্যুত' (১৯২২), 'আশীর্বাদ' (১৯২২) ও 'ঘূর্ণি' (১৯২৯) উপন্যাস—লিখিয়াছেন। চিত্র-অঙ্কনে এবং সঙ্গীতেও ইঁহার অধিকার ছিল।

শরচ্চন্দ্র ঘোষাল 'বারুণী' (১৯১৫) ইত্যাদি তিনখানি বইয়ের লেখক। ইঁহার উল্লেখ আগে করা হইয়াছে।

কেশবচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮১-১৯৭১) অনেক দিন লিখিয়াছেন। ইঁহার গল্পের বই সাত-আটখানি—'কনকরেখা' (১৯১৪), 'হিসাবনিকাশ' (১৯১৮), 'আসমানের ফুল' (১৯২০), 'কটাক্ষ' (১৯২২) ইত্যাদি। উপন্যাস—'লাল দুম্বা' (১৯৩৬), 'বিদ্রোহী তরুণ' (১৯৩৭), 'হামজুল্লি' (১৯৪০) ইত্যাদি। 'ভোলানাথের ভুল' (১৯২২) ইত্যাদির লেখক তারকনাথ সাধু (১৮৫৪-১৯৩৭) সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং কেশবচন্দ্রের মতোই ইনি কলিকাতা পুলিশ কোর্টের উকীল ছিলেন।

বঙ্কুবিহারী ধর পাঁচ-ছয়খানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 'কাকীমা' (১৩১৪ সাল), 'কনে মা' (১৩২২ সাল), 'পিসিমা' (১৩২৯ সাল), 'বেয়ান ঠাকরুণ' (১৩২৯ সাল) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী (১৮৭৬-১৯৫৪) লিখিয়াছিলেন 'শুভেন্দুর কলঙ্ক', 'নবীনের সংসার' (১৯১৪), 'জলপ্লাবন' (১৯১৬), 'দেশের বড়দা' (১৯১৮), 'সোনার বাঁধন' (বইটির অন্তত সাত সংস্করণ হইয়াছিল, বোধহয় বিবাহে উপহারের উপযোগিতার জন্য), 'হালদার বাড়ী' (১৯১৭) ইত্যাদি। মুনীন্দ্রপ্রসাদ ছয়খানি কবিতাগ্রন্থেরও রচয়িতা।

অপূর্বমণি দত্ত (১৮৯৪-১৯৭২) মানসী-ও-মর্মবাণী প্রভৃতি বিবিধ পত্রিকায় গল্প প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার তিনটিমাত্র বই এযাবৎ বাহির হইয়াছে। 'অভ্রপুষ্প' (১৯২২) গল্পের বই, 'সিদ্ধিকবচ' (১৯২২) ও 'সোনার শাঁখা' (১৯৪৪) উপন্যাস।

নাট্যকার মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯৬৩) পঞ্চাশের বেশি গ্রন্থের লেখক। ইঁহার গল্পের বই—'দুঃখের পাঁচালী' (১৯৩৭), 'ভুলের মাশুল' (১৯৩৯), 'হুইপ' (১৯৪০) ইত্যাদি ; উপন্যাস—'কুমারী ইন্দিরা' (১৯০৯), 'চিত্রকরী' (১৯১৪), 'সোনার টাকা' (১৯১১), 'তান্তিয়া মহারাজ' (১৯১৬), 'স্বয়ংসিদ্ধা' (১৯৩৭) ইত্যাদি। নাটক—'রাণী মীনাবতী' (১৯১২), 'অহল্যাবাই' (১৯১৪), 'মাধবরাও' (১৯১৫), 'বাজীরাও' (১৯৩১) ইত্যাদি।

সত্যচরণ চক্রবর্তী লিখিয়াছিলেন 'গৌরী' (১৯১৮), 'বাঙ্গালী বীর' (১৯১৯), 'রাণী দুর্গাবতী' (১৩২৭ সাল), 'কনে বৌ' (১৩২৯ সাল), 'প্রেমের হাট' (১৩৩২ সাল), 'ফুলদেবী' ইত্যাদি। গল্পের বই 'চিত্রকর' (১৯১৮)।

মুসলমান সংসারের চিত্রঘটিত লেখায় দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন 'মতিচুর' (প্রথম খণ্ড ১৯০৫ ; দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২১)-এর লেখিকা মিসেস আর. এস. (রোকেয়া সাখাওয়াত) হোসেন (১৮৮০-১৯৭২), 'অপরিচিতা'র লেখক মনির হোসেন, 'গরীবের মেয়ে'র লেখক নজিবর রহমান।

'মীর পরিবার'-এর (১৯১৮) ও 'নদীবক্ষ' (১৯১৯) এবং 'পথ ও বিপথের' (১৯৩৯) লেখক কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), 'রূপের নেশা' (১৯২০), ভাঙ্গাবুক (১৯২১)-এর লেখক গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), 'আবদুল্লাহ'-এর (১৯৩১) লেখক কাজী ইমদাদুল হক, 'কাঁটাফুল'-এর (১৯৩২) লেখক শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫০) ইঁহারাও অল্পবিস্তর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

এস. ওয়াজেদ আলীর (১৮৯০-১৯৫১) বিশেষ দক্ষতা প্রকাশিত সহজ সরল ভাষায় ছোট গল্পচিত্র রচনায়। প্রথম দিকের সমস্ত গল্প ও উপন্যাস সবুজপত্রে বাহির হইয়াছিল। সেগুলি 'মাশুকের দরবার' (১৯৩০), 'গুলদাস্তা' (১৩৩৪ সাল), 'ভাঙ্গা বাঁশী', 'দরবেশের দোয়া' (১৯৩৮), 'গল্পের মজলিস' (১৩৫১ সাল) ইত্যাদিতে সঙ্কলিত। প্রবন্ধ রচনাতেও ইঁহার দক্ষতা পরিস্ফুট। 'ভবিষ্যতের বাঙালী'র (১৯৪৩, চ-স ১৯৪৬) প্রবন্ধগুলির নাম হইতে প্রবন্ধবিষয়ে বিশেষত্বের ইঙ্গিত মিলিবে—'ভবিষ্যতের বাঙালী', 'রাষ্ট্রের রূপ', 'রাষ্ট্র ও নাগরিক', 'হিন্দু-মুসলমান', 'ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্য', 'প্রেমের ধর্ম' ও 'জাতীয় জাগরণ'॥

১৯ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন

মুসলমান সাহিত্যিকেরা বাঙ্গালায় লেখনী চালাইতে স্বভাবতই কিছু কুণ্ঠা বোধ করিতেন। অনেক ক্ষেত্রে এ কুণ্ঠা অনভ্যস্তের ভীতি মাত্র। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাঁহাদের এ জড়তা কাটিয়া আসিতেছিল এবং উপন্যাসে ধীরে ধীরে মুসলমান লেখক-লেখিকার দেখা মিলিতেছিল। প্রথম দিকের মুসলমান লেখিকাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করিতে হয় মিসেস আর. এস. হোসেনের। ইঁহার 'মতিচুর' বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা বিভাগ লইয়া ইংরেজ শাসনকর্তারা দেশে যে মনান্তর আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা রাজনৈতিক উচ্চাশাবিহীন শিক্ষিত ও সাহিত্যপ্রিয় মুসলমানদের প্রথমে বিচলিত করিতে পারে নাই। তবে একবার মনের ভাঙ্গন ধরিতে আরম্ভ করিলে তাহার প্রসার বন্ধ করা যায় না। শিক্ষিত মুসলমানদের মনও একটু একটু করিয়া বিচলিত হইতে লাগিল। কয়েকজন শিক্ষিত ও সাহিত্যপ্রবণ ব্যক্তি মিলিয়া "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি" স্থাপন করিলেন (১৯১১)। তাহার পর হইল "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন" (১৯১৪), অবশেষে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" (১৯১৯)।

বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পৃথক্ হইবার প্রথম উদ্যমের এই ইতিহাস মুসলমান সাহিত্য সমিতির একজন প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানটির প্রথম সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহের সাক্ষ্যে উদ্ধৃত করিতেছি।[৮৯]

> আমরা কয়েকজন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য ছিলাম। সেখানে হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদ না থাকলেও আমরা বড়লোকের ঘরে গরীব আত্মীয়ের মতন মন-মরা হয়ে তার সভায় যোগদান করতাম। আমাদের মনে হলো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিলোপ না করেও আমাদের একটি নিজস্ব সাহিত্য সমিতি থাকা উচিত। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার ৯ নং আন্টুনিবাগান লেনে মৌলবী আবদুর রহমান খানের বাড়ীতে ১৯১১ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর এক সভা আহূত হয়...আমি সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদক হই।

মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন মুসলমান সাহিত্য সমিতিকে জীয়াইয়া রাখিতে পারে নাই, মুসলমান সাহিত্য সমিতিও মুসলমান সাহিত্য পত্রিকাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে নাই। তাই বাঙ্গালা সাহিত্যে তখন ভাইভাই ঠাঁইঠাঁই হইল না—সাড়ে পাঁচ বছর সবল থাকিয়া পত্রিকাটি উঠিয়া গেল। তাহার আগে সে দুইটি বড় সাহিত্যিক বন্ধুকে—একজন মুসলমান (কাজী নজরুল ইসলাম) ও একজন হিন্দু (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়)—পরিচিত করিয়া দিয়া গেল ॥

২০ নূরন্নেছা খাতুন ও তাঁহার কন্যা

বাঙ্গালা রচনায় কুণ্ঠা ও ভীরুতা সত্ত্বেও কোন কোন মুসলমান লেখক যে কম শক্তিশালী ছিলেন না (সমসাময়িক অনেক হিন্দু লেখকের তুলনায়) তাহা একটি উপন্যাস-লেখিকার রচনার আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি। ইনি নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী সাহিত্যসরস্বতী, (১৮৯৪-১৯৭৫), বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা সঙ্ঘের সভানেত্রী। নিবাস শ্রীরামপুর। 'মোস্‌লেম বিক্রম ও বঙ্গে মোসলমান রাজত্ব' ছাড়া তিনি তিনখানি বড় ও তিনখানি ছোট উপন্যাস লিখিয়াছিলেন[৯০],—'স্বপ্নদৃষ্টা' (১৯২৩), 'জানকী বাঈ' (১৯২৪),

'আত্মদান' (১৯২৫), 'ভাগ্যচক্র', 'বিধিলিপি' ও 'নিয়তি' (১৯২৮ ?)। স্বপ্নদৃষ্টা পারিবারিক উপন্যাস পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত মুসলমান ঘরের মনোরম চিত্র ও কাহিনী। ঝরঝরে লেখা। একটু উদ্ধৃত করি।

যে কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া সুর জমিয়া উঠিলে, আর তাহা শীঘ্র ছাড়িতে ইচ্ছা করে না।

এই মধুর স্বদেশী গানটি পাল্‌টাপাল্‌টি তিনবার গাহিয়া ও তৎসঙ্গে বাজাইয়া শেষ করিয়া, নার্শ পুনরায় সুলেখক কবীন্দ্র[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণস্পর্শী গান—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি"

আলাপ করিতে করিতে, ক্রমশঃ হারমোনিয়মের সুরে সুর মিলাইয়া মধুর কণ্ঠে—

"তুমি অবসর মত বাসিও।
আমি নিশিদিন হেথা বসে' আছি
তোমার যখন মনে পড়ে আসিও।"

গাহিতে লাগিল।...

এটা শেষ কবে নার্শ ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর একটি গান ধরিল--

"মেঘেব উপর মেঘ করেছে আঁধার ক'রে আ—সে.
.. ..
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।

গানটি দুই তিনবার গাহিয়া নার্শ উঠিয়া পড়িল। গান বন্ধ হইল, বাজনা থামিয়া গেল, কিন্তু সুরটা তখনো ঘুরিয়া ঘুরিয়া মোমেনাব কানের মধ্য দিয়া, বুকেব ভিতর দিয়া ধাক্কা মারিযা বলিতে লাগিল—"পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।"

আহা! আমার প্রাণ যে বিশ্বময় কেঁদে বেড়াচ্ছে। আর আমি কেবল মাত্র বেঁচে "আছি তোমারি আশ্বাসে।"

স্বপ্নদৃষ্টার 'নিবেদন'-এ লেখিকা নিজের কথা কিছু বলিয়াছেন। তাহা তাঁহাব রচনার পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ, অতএব উদ্ধৃতির যোগ্য।

প্রাচীন ভদ্রবংশীয়া মোসলমান, আয়মাদার কন্যা বিধায়ে, এবং কঠিন পর্দাবগুণ্ঠনের খাতিরে আমার সামাজিক ও পার্থিব অভিজ্ঞতা খুবই কম। বলিতে কি, পিত্রালয়ে অবস্থানকালে অষ্টম বর্ষ পূর্ণ হইবার পর, চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিতে অন্দর ও মস্তকোপবি চন্দ্র তারকা খচিত নীল চন্দ্রাতপ ভিন্ন, কোনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাব নয়নপথের পথিক হয় নাই।

স্বামীর দেশপর্যটনটা ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বাবা স্বভাবগত হইয়া পড়ায় বিবাহেব বৎসর অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১৩১৯ সাল হইতে আমিও জেলের কোমরেব হাঁড়ির ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এদেশ ওদেশ যাইতে আবম্ভ করিলাম। এবং তজ্জনাই কঠিন strict পর্দা ক্রমশঃ আপনা আপনিই একটু শিথিল ভাবাপন্ন হইয়া আসিল।

এই হইতেই আমার সামান্য অভিজ্ঞতা। এবং এই যৎসামান্য অভিজ্ঞতা মূলেই আমাব পুস্তিকা রচনার প্রয়াস বা ঘোর পাগলামি।

জীবনে কখনও পাঠাগারের বেঞ্চে বসার আস্বাদন পাই নাই। কখনও কোন শিক্ষকেব নিকট পাঠার্থে বই খুলিয়া বসি নাই। আপন কৌতূহল নিবারণার্থে আপনা আপনি সামান্য ক. ব, ঠ, শিখিয়া দুচারিখানি বই হাতে করিয়াছি মাত্র।

লেখিকা তাঁহার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁহার উপন্যাসে—বিশেষ করিয়া প্রথম ও শেষ

তিনটিতে---বেশ কাজে লাগাইয়াছেন।

নূরন্নেছার দ্বিতীয় বইটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। নাম 'জান্‌কী বাঈ', উপনাম 'ভারতে মোস্‌লেম বীরত্ব'। সে সময়ে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এবং মফস্বলে সখের থিয়েটারে "দেবলা দেবী" কাহিনী বেশ জনপ্রিয় ছিল। এই নাটকে মুসলমান বিজেতা পক্ষের পাত্রের সঙ্গে হিন্দু বিজিত পক্ষের পাত্রীর বিবাহ-ঘটনা আছে। হিন্দু লেখকের রচনায় মুসলমানের বীরত্ব কমানো হইয়াছে এবং হিন্দুর বীরত্ব বাড়ানো হইয়াছে এই মনে করিয়া লেখিকার স্বামী তাঁহাকে দেবলা দেবী ও খিজির খাঁর বিবাহ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া একটি "সত্য ঘটনা সমন্বিত" ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে অনুরোধ করেন এবং বিবিধ গ্রন্থ হইতে ইতিহাসবস্তু সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দেন।[৯২]

মুসলমান অধিকার-কালের ইতিহাস হইতে বিষয় নির্বাচন করিয়া হিন্দু লেখকেরা যে সব উপন্যাস-নাটক লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের রচনার প্রতি সাধারণ শিক্ষিত মুসলমান পাঠক-পাঠিকার মনোভাব কেমন ছিল তাহার মূল্যবান্ সাক্ষ্য জান্‌কী-বাঈয়ের 'বক্তব্য'-এ পাই।

> আজ-কাল প্রায়ই ঐতিহাসিক নামের আবরণে, জ্ঞানতঃ মিথ্যা ঘটনা প্রকাশে সমাজ বিশেষকে সাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়া, অনেক লেখক সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনা সম্বলিত উপন্যাস লিখিয়া বাহাদুরি করিবার চেষ্টা করেন। আবার সময়ে সময়ে ঐ সকল গ্রন্থকারের স্বেচ্ছা প্রণোদিত কাল্পনিক মিথ্যা ঘটনাচয় নাটকরূপে অবস্থান্তরিত হইয়া, নাট্যশালায় অভিনীত হইতে দেখা যায়।

অথচ হিন্দু পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করিবার ইচ্ছা লেখিকার ছিল না। তাই 'অনুনয়'-এ তিনি লিখিয়াছেন

> যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষের সেনাপতিই অধীনস্থ সৈন্যগণের উৎসাহ বর্ধন করে, বিপক্ষ সেনাও সময় সময় অপর পক্ষীয় সৈন্যাধ্যক্ষগণকে সর্বতোভাবে হেয় ও হীনবীর্য প্রতিপন্ন করিয়া নিজ সৈন্যগণের প্রাণে বিদ্বেষভাব উৎপাদন করিবার, এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগকে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে নানারূপ প্রস্তাবনা উত্থাপনা করিয়া থাকেন।
>
> এক্ষেত্রেও দেবগিরির শৈলদুর্গ জয়ের ও রণথম্বর দুর্গাক্রমণ আদির ব্যাপারে, উভয়পক্ষীয় সেনানীগণ দ্বারা ঐরূপ যে সমুদয় উক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সাময়িক উত্তেজনার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।
>
> এই সমুদয় উক্তিতে কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা সঙ্কীর্ণ চিত্ততার ভাব গ্রহণ না করিয়া, আশা করি সকল সম্প্রদায়ের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা নিজ নিজ উদারতার পরিচয় দিবেন।

'আত্মদান', লেখিকার ভাষায়, "সত্য ঘটনা-মূলক গার্হস্থ্য কথন"। বাস্তব ভিত্তির উপরে রচিত কাহিনীটি ভালোই জমিয়াছে।

'ভাগ্যচক্র', 'বিধিলিপি' ও 'নিষ্কৃতি' কতকটা যেন উদ্দেশ্যমূলক রচনা। তাই তিনটিরই উপনাম 'অদৃষ্ট'। ভাগ্যচক্রের ও বিধিলিপির কাহিনীতে মুসলমান ভূমিকা নাই। প্রথমটিতে প্রেমে পড়িয়া গোঁড়া ঘরের শিক্ষিত হিন্দুর খ্রীস্টান হওয়া, দ্বিতীয়টিতে বিধবাকে বিবাহ করা। নিয়তির কাহিনী অনেকটা আত্মদানের মতো, ট্রাজিক। তিনটি রচনাতে দেশভ্রমণ উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক ও তীর্থস্থানের কিছু বর্ণনা আছে। হিন্দুদের তীর্থস্থানেরও

আছে। হিন্দুদের অনেক কিছুই গোঁড়া মুসলমানের দৃষ্টিতে বিসদৃশ ঠেকিবে। লেখিকা কিন্তু সে বিষয়ে যথাসম্ভব সতর্ক হইয়াছেন এবং একবার পাঠকদের সাবধানও করিয়া দিয়াছেন।[৯৩]

"নূরন্নেছা গ্রন্থাবলীর উপহার পুস্তক" রূপে প্রকাশিত (এবং নূরন্নেছা-গ্রন্থাবলীতে পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত) হইয়াছিল 'গাঙ্গুলী ম'শায়ের সংসার' (শ্রীরামপুর ১৯২৯)। বইটি একটি ক্ষুদ্র ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। লেখিকা হইলেন নূরন্নেছা খাতুনের কন্যা কাম্‌রন্নেছা খাতুন (পান্না বেগম)। অল্পবয়সীর ও কাঁচা হাতের লেখা বলিয়া প্লট রচনায় ছেলেমানুষি আছে। তবে ভাষা নিতান্ত নিন্দনীয় নয়। যতদূর জানি তাহাতে এইটিই মুসলমান লেখিকার লেখা একমাত্র ডিটেক্‌টিভ কাহিনী। সেইটুকুই ইহার কিঞ্চিৎ মূল্য ॥

টীকা

১, আমার সংগ্রহে একটি বই আছে। বইটি রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'-র একটি সংখ্যা। দপ্তরীর সাধারণ বাঁধানো। তাহাতে স্বাক্ষর আছে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৬২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা। এই বাড়িটি হেদোর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত। বহুকাল ইহা মেসবাড়ি ছিল। এই বাড়িতে বিলাত যাইবার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় থাকিতেন; আমি অনুমান করি এখানে শরৎচন্দ্র থাকিতেন। হয়তো প্রভাতকুমারের প্ররোচনাতেই তিনি গল্পটি কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

২ শরৎচন্দ্রের নিকট আত্মীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে।

৩ প্রথম দুই সংখ্যায় লেখকের নাম ছাপা হয় নাই।

৪ প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩২১।

৫ প্রথম প্রকাশ নারায়ণ শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১৪।

৬ সরযু, দয়াল, বিশ্বেশ্বর—এই নামগুলি চন্দ্রনাথে আছে, পরপারেতেও আছে।

৭ রচনাকাল শ্রাবণ ১৩০৮, প্রকাশ যমুনা মাঘ ১৩২০।

৮ রচনাকাল ১৩০৮ সাল, প্রকাশ যমুনা ফাল্গুন ১৩২০।

৯ প্রকাশ ভারতবর্ষ মাঘ ১৩২২।

১০ 'সমাজধর্মের মূল্য' ভারতবর্ষ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩। "শ্রীমতী অনিলা দেবী" এই ছদ্মনামে প্রকাশিত।

১১ 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১)।

১২ যেমন 'চন্দ্রনাথ', 'বিরাজ বৌ' ও 'পল্লীসমাজ'।

১৩ "শ্রীমতী অনিলা দেবী" এই ছদ্মনামে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ যমুনা ১৩২০ সাল।

১৪ স্বদেশ ও সাহিত্য পৃ ৯২।

১৫ ঐ পৃ ১৬।

১৬ ঐ পৃ ১৮।

১৭ 'নারীর মূল্য' (যমুনা আষাঢ় ১৩২০)।

১৮ স্বদেশ ও সাহিত্য পৃ ১৪৮।

১৯ 'পুনশ্চ' কাব্যে সঙ্কলিত।

২০ ত্রিপঞ্চাশ জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজ ভাষণ (সেপ্টেম্বর ১৯২৮). 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী' পৃ ২০৭।

২১ এই পর্যায়বিভাগ নিখুঁতভাবে কালানুক্রমিক নয়।

২২ রচনাকাল ১৩০৮ (?) প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২৩-২৪ সাল।

২৩ চন্দ্রনাথে রবীন্দ্রনাথের ও প্রভাতকুমারের রচনারও প্রভাব আছে। সে কথা পূর্বে বলিয়াছি।

২৪ প্রথম প্রকাশ,—প্রথম পর্ব ভারতবর্ষ (১৩২২-১৩২৩ সাল), দ্বিতীয় পর্ব ঐ (১৩২৪-১৩২৫ সাল), তৃতীয় পর্ব

(অংশত) ঐ (১৩২৭-১৩২৮ সাল,) চতুর্থ পর্ব বিচিত্রা (১৩৩৮-১৩৩৯ সাল)।

২৫ বিবাহের উপহার হিসাবে 'বিরাজ-বৌ' একদা প্রচুর বিক্রয় হইত। শুধু এই উদ্দেশ্যে বইটির লাল কালিতে ছাপা সংস্করণ বাহির হইয়াছিল।

২৬ প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২৩-১৩২৪ সাল।

২৭ প্রথম প্রকাশ (অংশত) যমুনা ১৩২০-১৩২১ সাল। তাহার পরে নূতন করিয়া ভারতবর্ষে।

২৮ স্বদেশ ও সাহিত্য পৃ ১৫৪।

২৯ 'শরৎচন্দ্র চিঠিপত্র', শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় সঙ্কলিত, পৃ ২৯।

৩০ ঐ পৃ ৭১।

৩১ ঐ পৃ ৫৭। নিরুপমা দেবীর 'দিদি' ও অবিনাশ দাসের 'অরণ্যবাস' প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল, প্রভাতকুমারের 'নবদ্বীপ' মানসীতে। 'বাগদত্তা' ইত্যাদি অনুরূপা দেবীর লেখা।

৩২ এরকম কোন ইঙ্গিত থাকলে কিরণময়ীর চরিত্র সত্যকার "বাস্তব" হইতে পারিত।

৩৩ দত্তা, দেনা-পাওনা ও শ্রীকান্ত ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৩৪ 'শ্রীকান্ত' 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী' নামে ধারাবাহিকভাবে ভারতবর্ষে প্রথম বাহির হইয়াছিল (প্রথম পর্ব মাঘ ১৩২২ হইতে মাঘ ১৩২৩, পুস্তকাকারে ফাল্গুন ১৩২৩ ; দ্বিতীয় পর্ব আষাঢ় ১৩২৪ হইতে, পুস্তকাকারে ভাদ্র ১৩২৫, তৃতীয় পর্ব পুস্তকাকারে চৈত্র ১৩৩৪, চতুর্থ পর্ব পুস্তকাকারে ফাল্গুন ১৩৩৯)।

৩৫ প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২৩-১৩২৬ সাল।

৩৬ চৌত্রিশ পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মসমাজের উপর যে কটাক্ষ আছে তাহা অন্যায়।

৩৭ প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩১৪ ২৫ সাল।

৩৮ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় এই সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।

৩৯ প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২৭ ৩০ সাল।

৪০ 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' পৃ ২০১ ২০৩।

৪১ ঐ পৃ ২৯১।

৪২ ঐ পৃ ৩২৯।

৪৩ ঐ পৃ ২৩৩।

৪৪ ঐ পৃ ৪২-৪৩।

৪৫ ঐ পৃ ৯১।

৪৬ ঐ পৃ ১১৭।

৪৭ ঐ পৃ ১৯৩।

৪৮ ঐ পৃ ২০৫।

৪৯ শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন "আমি ছিলাম সভাপতি, কিন্তু আমাদের সাহিত্যসভায় গুরুগিরি করিবার অবসর অথবা প্রয়োজন আমার কোন কালেই ঘটে নাই। সপ্তাহে একদিন করিয়া সভা বসিত এবং অভিভাবক গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া কোন একটা নির্জন মাঠেই বসিত। জানা আবশ্যক যে সে সময়ে সে-দেশে সাহিত্য-চর্চা একটা গুরুতর অপরাধের মধ্যে গণ্য ছিল।" 'ছোটদের মাধুকরী' আশ্বিন ১৩৪৪ হইতে 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী'তে উদ্ধৃত পৃ ২৭৬

৫০ "গিরীন ছিলেন একাধারে সাহিত্য-সভার সম্পাদক 'ছায়া'র সম্পাদক ও 'অঙ্গুলি-যাত্রে' অধিকাংশ লেখার মুদ্রাকর।" ঐ।

৫১ এই তিনজন শরৎচন্দ্রের নিকট আত্মীয়।

৫২ প্রথম প্রকাশ ভারতী ১৩১৮ সাল।

৫৩ প্রথম প্রকাশ মানসী ও মর্মবাণীতে।

৫৪ যেমন 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৪ সাল), 'বাগানবাড়ীর কথা' (১৩১৮ সাল)।

৫৫ যেমন 'বিভ্রম' (চৈত্র ১৩১৮)।

৫৬ 'বাল্মীকির সীতা'।

৫৭ পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

৫৮ এই বইখানি প্রথমরচিত উপন্যাস, 'দ্বিপত্নীক' নামে ধারাবাহিকভাবে 'সুপ্রভাত' (১৩২২ সাল) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।

৫৯ প্রথম প্রকাশ ভারতী ১৩১৯-২০ সাল।

৬০ প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২০-২১ সাল।

৬১ ঐ ১৩২৫-২৭ সাল।

৬২ নাট্যরচনা এইগুলি—'বিদ্যাবণ' (১৯২০), 'কুমারিল ভট্ট' (১৯২৩) ও 'নাট্যচতুষ্টয়' (১৯৩৩)।

৬৩ শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধে ('নারীর লেখা', ফাল্গুন ১৩১৯, "শ্রীমতী অনিলা দেবী" নামে প্রকাশিত) অনুরূপার পোষ্যপুত্রের সম্বন্ধে কঠিন সমালোচনা করিয়াছিলেন। "...বইখানি জ্ঞানগর্ভ। বেদ, কোরাণ, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারত, এথিক্‌স মেটাফিজিক্‌স, রামপ্রসাদী, তন্ত্র, মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, মারণ, উচাটন, বশীকরণ, সমস্তই আছে। এ ছাড়া সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী—কালিদাস, সেকস্‌পিয়র, টেনিসন—যাহা কিছু শিক্ষা করা প্রয়োজন একাধারে সমস্তই।.. অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোক হইয়াও সর্বতোমুখী পাণ্ডিত্যের বহরে লোকজনের তাক্ লাগাইয়া দিব এই স্পিরিটটাই নিন্দার্হ।"

৬৪ ইঁহার আসল নাম ছিল সুরূপা। এই নামে লেখা গল্প কুন্তলীন-পুরস্কার পাইয়াছিল একাধিকবার। ১৩২০ সাল হইতে ইনি লেখিকারূপে ইন্দিরা নাম গ্রহণ করেন।

৬৫ কয়েকটি গল্পের প্লট ইংরেজী হইতে গৃহীত।

৬৬ প্রথম প্রকাশ ভারতী।

৬৭ প্রথম প্রকাশ মানসী ও মর্মবাণী ১৩২৪-২৫ সাল।

৬৮ ইঁহার আসল নাম ছিল অনুপমা। ১৩১৫ সালের মাঘ মাস হইতে (ভারতী, 'শেফালিকা') নিরুপমা নাম গৃহীত হইয়াছিল। কুন্তলীন পুরস্কারে (১৩১১ সাল), জাহ্নবীতে (মাঘ ১৩১৪) এবং ভারতীতে ('১৩১৫ ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত গল্পে অনুপমা নামই পাই।

৬৯ প্রথম প্রকাশ ভারতীতে কার্তিক হইতে চৈত্র ১৩১৮।

৭০ প্রথম প্রকাশ সাহিত্য চৈত্র ১৩২০, ভারতী ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ ১৩১৫।

৭১ দ্বিতীয় খণ্ড আর প্রকাশিত হয় নাই।

৭২ প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষে।

৭৩ প্রথম প্রকাশ প্রবাসীতে।

৭৪ প্রথম প্রকাশ ভারতী বৈশাখ ১৩২৯ হইতে।

৭৫ 'নারীর লেখা' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র নিরুপমার অন্নপূর্ণার-মন্দিরের প্রশংসাই করিয়াছেন, ".. নিরুপমার রচনাকে অনেক দিক্ হইতে ভাল বলিতেই হইবে। সহজ, সরল ও বিনীত। যাকে 'পাণ্ডিত্যের হুঙ্কার' বলে সেটা নাই, এবং স্টেজ আস্ফালনিং কম। কথাবার্তাগুলি কথাবার্তারই মত।"

৭৬ প্রথম প্রকাশ প্রবাসী ১৩২২ সাল।

৭৭ অংশত বামাবোধিনী-পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।

৭৮ 'নারীর লেখা' যমুনা ফাল্গুন ১৩১৯ ও তাহার প্রতিবাদ জাহ্নবী চৈত্র ১৩১৯ দ্রষ্টব্য।

৭৯ শ্রীমতী পুষ্পদল ভট্টাচার্যের 'শ্রীযুক্ত পূর্ণশশী দেবী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (দেশ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩)।

৮০ 'আমার নাম প্রভাবতী দেবী এবং গত ১০ বছরে প্রায় ত্রিশটি উপন্যাস আমার দ্বারা রচিত হয়ে..বের হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু আমি কখনও 'সরস্বতী' কথা আমার নামের শেষে লিখি নাই বা লিখি না। —প্রভাবতী দেবী, চুঁচুড়া।" (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫ এপ্রিল ১৯৬২)।

৮১ ১৩৩৪ সালের 'গল্প লহরী' দ্রষ্টব্য।

৮২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। তৃতীয় খণ্ড (আনন্দ সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

৮৩ 'প্যারীচরণ সরকার (জীবনবৃত্ত)' (১৯০২), 'দ্বিজেন্দ্রলাল (জীবনী ও সমালোচনা)' (১৯১৬) এবং 'সাধ্বী সৌদামিনী (জীবনকথা)' (১৯১৪)।

৮৪ 'তর্পণ' (সচিত্র সনেট, ১৯১৫)—কয়েকজন স্মরণীয় ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

৮৫ 'অডিসির গল্প' (১৯১৪) ও 'ইলিয়াডের গল্প' (১৯২৪)।

৮৬ 'নেপালচন্দ্রের ঘটকালী' (১৯১৭) ও 'কেরাণীর মাসকাবার' (১৯২১)।

৮৭ 'শান্তি' (১৯১৬), 'ইন্দু' (১৯১৭), 'সবয়ূ' (১৯১৭), 'পথহারা' (১৯১৭), 'অপবাদ' (১৯১৮), 'শুভা' (১৯১৮), 'অনুতাপ' (১৯১৮), 'ভোরের আলো' (১৯১৯), 'স্নেহের দান' (১৯১৯), 'গোধূলি' (১৯২০), 'একালের মেয়ে' (১৯২০), 'আশার আলো' (১৯২২) ও 'মনের দাগ' (১৯২৩)।

৮৮ লেখকের পঞ্চনবতিতম জন্মদিবসে (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬) প্রকাশিত 'শ্রীবিধুভূষণ বসু' পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

৮৯ 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রবন্ধ (মাহে নও কার্তিক ১৩৬৫) দ্রষ্টব্য।

৯০ প্রথম তিনটি উপন্যাস প্রথমে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছিল। শেষ তিনটি প্রথম ছাপা হয় প্রথম তিনটির সঙ্গে একত্র 'নূরন্নেছা গ্রন্থাবলী'তে (শ্রীরামপুর ১৩৩৬ সাল)।

৯১ ছাপায় "কবিন্দ্র"।

৯২ "স্বামিন্ ! আমার 'স্বপ্নদ্রষ্টা' প্রেসে দিবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি আমাকে একখানি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংযুক্ত পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ইংরাজী ও ফারসী ভাষায় আমার সামান্য অভিজ্ঞতা হেতু, প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে দুরূহ হইবে বিবেচনায় আমি ঐরূপ গ্রন্থ প্রণয়ণে অগ্রসর হইতে সাহস করি নাই।

"পরে আপনি বিভিন্ন ইতিহাস হইতে সাময়িক সত্য ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে উৎসাহিত করায়, আমি আমার যৎসামান্য ভাষা জ্ঞানে এই প্রকৃত জাতীয় বীরত্ব কাহিনী লিখিয়া আপনার করকমলে অর্ঘ্য দান করিতেছি।" ('কৃতজ্ঞতা')

৯৩ "বিধিলিপি"র শেষাংশে পুরীর যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে বা তথাকার সারদীয় উৎসবের সম্বন্ধে যাহা কিছু উল্লেখ আছে, তাহার কোন অংশই কাল্পনিক নহে। ইহা প্রকৃত এবং আমার সজ্ঞানপ্রসূত।"

'উপন্যাসের এই বাস্তব অংশ, কোন সমাজের পদ্ধতির প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশে লিখিত হয় নাই, এইটুকু আমার নিবেদন।"

দশম পরিচ্ছেদ
সবুজপত্র ও নবোদ্যম

১

এক অভিনব ও চমকপ্রদ শক্তির অভ্রান্ত পরিচয় বহন করিয়া আশুতোষ চৌধুরীর মধ্যমভ্রাতা প্রমথনাথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) গদ্য-পদ্য রচনা বাহির হইল রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্তির সমসময়ে অর্থাৎ ১৯১৩ অব্দে। বৎসর খানেকের মধ্যেই প্রমথবাবুর সম্পাদিত সবুজপত্র প্রকাশিত হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সমাজ চিন্তায় মর্মান্তিক ও গতানুগতিকতার উপর প্রাণান্তিক আঘাত হানিল। ১৯১৩ অব্দের আগেও প্রমথবাবুর লেখা অল্পস্বল্প বাহির হইয়াছিল, এবং সে লেখায় স্বাতন্ত্র্য ও উদগ্রতা কিছু কম ছিল না। তবে দীর্ঘকালের ব্যবধানে এক একটি প্রবন্ধ বাহির হইত বলিয়া সে সব লেখা অনেকের নজরে পড়ে নাই। সবুজপত্র বাহির হইবার পূর্বে প্রমথবাবুর রচনা প্রধানত ভারতী পত্রিকাতেই ছাপা হইত এবং যতদিন সবুজপত্র প্রকাশিত ছিল ততদিন অন্য কাগজে তাঁহার লেখা ছাপা হয় নাই।

কলম ধরিবার আরম্ভ হইতেই প্রমথবাবু শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাহিত্যচিন্তায় চিরাভ্যস্ত ধারণার ও অমনস্কতার বিরুদ্ধে তাল ঠুকিতে থাকেন। ইঁহার প্রথম প্রবন্ধ 'জয়দেব' ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। দেশ-বিদেশের সাহিত্যের আদর্শে তুলনা করিয়া লেখক দেখাইয়াছিলেন যে ভাব ও ভাষা কোন দিক দিয়াই জয়দেবকে ভালো কবি বলা যায় না, গীতগোবিন্দে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শও নাই এবং জয়দেব আমাদের ভালো লাগে শুধু এই কারণে যে আমরা ভুল করিয়া চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস প্রভৃতি পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের রচনার সঙ্গে জয়দেবের রচনা গুলাইয়া ফেলি ("তাঁহার পরবর্তী কবিসকলের গুণ আমরা ভুলক্রমে জয়দেবে আরোপ করি") বলিয়া।

এই প্রবন্ধের প্রায় চার বছর পরে সাধনায় (ফাল্গুন ১৩০০) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জয়দেব' প্রবন্ধ বাহির হয়। বলেন্দ্রনাথও জয়দেবকে বড় কবি বলিতে পারেন নাই, গীতগোবিন্দকে অধ্যাত্ম-কাব্যও নয়। কিন্তু দুই লেখকের মেজাজ ও আক্রম (approach)

ঠিক এক রকম ছিল না। প্রমথবাবু গীতগোবিন্দ-পদাবলী সংস্কৃত শ্লোকের আদর্শে বিচার করিয়াছিলেন, বলেন্দ্রনাথ সেগুলিকে লইয়াছিলেন গান বলিয়া, সেগুলির যথার্থ মূল্যে। কাব্যের প্রারম্ভে জয়দেবের উক্তি স্মরণ করিয়া ("যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্") আদিরসাত্মকতার অভিযোগে গীতগোবিন্দকে বলেন্দ্রনাথ একেবারে নস্যাৎ করেন নাই, তবে স্বীকার করিয়াছেন যে "সচেতন বিলাসিতাই জয়দেবের শ্রীহানি করিয়াছে। শৃঙ্গাররসও নহে সম্ভোগবর্ণনাও নহে, মদনতরঙ্গও নহে, মানবদেহও নহে।"

এই 'জয়দেব' প্রবন্ধ দুইটিকে লইয়া বিংশ শতাব্দীর প্রত্যাসন্ন প্রত্যুষে বাঙ্গালা সাহিত্যে জাগরণোন্মুখ দুইটি শক্তির এবং সাহিত্য বিচারে দুটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিমাপ করিতে পারি। বলেন্দ্রনাথ বয়সে কিছু ছোট তবে সাহিত্যের ভুবনে অগ্রজ। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনেককাল পরে প্রমথবাবু সাহিত্যের আসরে রীতিমত অবতীর্ণ হন। দুইজনেই অল্পবিস্তর রবীন্দ্রলালিত, এবং দুইজনেই গৌণত কবিতা-রচয়িতা এবং মুখ্যত গদ্যলেখক। দুইজনেই শিক্ষিত, সংস্কৃতিমান্, মনীষী। তবে বলেন্দ্রনাথের প্রবল অধিকার সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রমথবাবুর বিশেষ দখল ফরাসী সাহিত্যে। বলেন্দ্রনাথের অনুভব ছিল প্রধানত ধৈর্যশীল ভাবুকের, প্রমথবাবুর অনুভব মূঢ়তা-অসহিষ্ণু বিজ্ঞানীর। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বিশ্লেষণ সংশ্লেষণের অর্থাৎ সৃজনের সহযোগী, প্রমথবাবুর প্রবন্ধে বিশ্লেষণ প্রত্যাখ্যানের নির্দেশক।

১২৯৭ হইতে ১৩০৫ সালের মধ্যে জয়দেব ছাড়া প্রমথবাবুর চারটি গদ্য রচনা বাহির হইয়াছিল,—'আদিম মানব',[৩] 'ফুলদানী' (মেরিমে-র ফরাসী গল্পের অনুবাদ),[৪] 'টরকোয়াটো টাসো এবং তাঁহার 'সিদ্ধ বেতালের কথোপকথন' (ইতালীয় হইতে অনূদিত)[৫] এবং 'প্রবাসস্মৃতি'[৬]। এই পাঁচটি রচনা সাধু ভাষায় লেখা ॥

২

১৩০৯ সালের গোড়াতেই প্রমথবাবু চলিত-ভাষার সমর্থকরূপে দেখা দিলেন।[৭] এই সময় হইতে তিনি নিজেও চলিত-ভাষাকে আশ্রয় করিলেন এবং আর প্রায় কখনও সাধুভাষায় কলম ধরেন নাই।[৮] গদ্যরচনায় প্রমথবাবু ছদ্মনাম গ্রহণ করিলেন "বীরবল"। প্রমথবাবু বলিয়াছেন যে তিনি নামটি ভাবিয়া চিন্তিয়া অবলম্বন করেন নাই। না করিলেও নামগ্রহণ সার্থক হইয়াছে। আকবরের সভাসদ্ বীরবলের সূক্তির মতোই যেন তিনি বচনে সত্যকে মর্মভেদী, সংক্ষিপ্ত অথচ মনোহারী করিয়া বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার লেখায় মধু ও হুল দুইই আছে।

> বছর কুড়িক আগে আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি, তখন আমি না ভেবেচিন্তে বীরবলের নাম অবলম্বন করলুম। এ করে আমি স্বজাতিকে বাদশাহের পদবীতে তুলে দিয়েছি; সুতরাং তাঁদের এতে খুশি হবারই কথা।[৯]

যখন 'কথার কথা' লেখা হয় তখন বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রচলন অধিকতর করিবার জন্য সংস্কৃতশিক্ষিত পণ্ডিতরা ও তাঁহাদের সমর্থকগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। এই রকম দুই পণ্ডিত-ভ্রাতার[১০] প্রবন্ধ উপলক্ষ্য করিয়াই প্রমথবাবু চলিতভাষার ওকালতি শুরু করেন। প্রমথবাবুর "ইচ্ছে বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই

লেখা হয়", অর্থাৎ "আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়।" সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে ও আমদানিতে প্রমথবাবুর আপত্তি নাই। তবে সে সব শব্দকে যদৃচ্ছা ও আনাড়িভাবে নয়, তাৎপর্যপূর্ণ ও সঙ্গতভাবে ব্যবহার করিলেই তবে ভাষার বোঝা না বাড়িয়া শক্তি বাড়িবে।

> এ কথা আমি অবশ্য মানি যে, আমাদের ভাষায় কতক পরিমাণে নতুন কথা আনবার দরকার আছে। যার জীবন আছে, তারই প্রতিদিন খোরাক জোগাতে হবে। আর, আমাদের ভাষায় দেহপুষ্টি করতে হলে প্রধানতঃ অমরকোষ থেকেই নতুন কথা টেনে আনতে হবে। কিন্তু যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন তাঁর এইটি মনে রাখা উচিত যে, তাঁর আবার নূতন করে প্রতি কথাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দশ-এগার বছর পরে আরও দুইটি প্রবন্ধ[১১] বাহির হইল চলিত-ভাষার সমর্থনে। প্রথমটি 'ঢাকা রিভিউ সম্মিলন'-এ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার বিরুদ্ধ-সমালোচনার প্রতিবাদ। প্রমথবাবু লিখিলেন, সমালোচনার দ্বারা ভুল দেখাইলেই সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না, "সাহিত্যক্ষেত্রে কতকটা আলো এবং হাওয়া এনে দেওয়াই সে স্থানকে স্বাস্থ্যকর করবার প্রকৃষ্ট উপায়।" তেমনি "লেখার ভাষাতেও প্রাণসঞ্চার করতে হলে মুখের ভাষার সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না ; আমি সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের বিরোধী নই, শুধু ন্যূন অর্থে, অধিক অর্থে কিংবা অনর্থে বাক্য প্রয়োগের বিরোধী।" কথ্যভাষা বলিতে প্রমথবাবু কোন আঞ্চলিক উপভাষাকে ধরেন নাই, ধরিয়াছেন দক্ষিণবঙ্গের[১২] শিক্ষিত লোকের ভাষাকে—যাহার উপর, তাঁহার মতে, একদা সাধুভাষা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

> লিখিত ভাষার রূপ যেমন কথিত ভাষার অনুসরণ করে, তেমনি শিক্ষিত লেখকদের মুখের ভাষাও লিখিত ভাষার অনুসরণ করে। এই কারণেই দক্ষিণদেশি ভাষা, যা কালক্রমে সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে, নিজ প্রভাবে শিক্ষিত সমাজের ও মুখের ভাষার ঐক্যসাধন করেছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলকাতার মৌখিক ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে। ঐ একটি মাত্র শহরে সমগ্র বাংলাদেশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

তবে এ ভাষা খাস "কলকাত্তাই" উপভাষা (Cockney) নয়। "বাঙালে ভাষা কিংবা কলকাত্তাই ভাষা, এ উভয়ের কোনোটিই অবিকল লেখার ভাষা হতে পারে না।"

৩

চলিতভাষা বনাম সাধুভাষার মামলা যখন বেগে চলিতেছে তখন প্রমথ চৌধুরী দেখা দিলেন কবির ভূমিকায়। ১৩১৮-২০ সালের ভারতীতে ইঁহার কতকগুলি সনেট বাহির হইল, জের চলিল সবুজপত্রে। কবিতাগুলি দুইটি বইয়ে সঙ্কলিত হইল, 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) ও 'পদ-চারণ' (১৯১৯)। সমসাময়িক বাঙ্গালা কবিতায় (—রবীন্দ্রনাথের ছাড়া—) কৃত্রিম ভাবালুতার, গতানুগতিক প্রকৃতিবর্ণনার অথবা বইপড়া তত্ত্বকথার নিরর্থ শব্দপ্রচুর ভাষার এবং শিথিল সাহিত্যকর্মের বিরুদ্ধে প্রমথবাবুর প্রতিক্রিয়া ও আপত্তি এই কবিতাগুলিতে প্রকাশিত। শব্দচয়নের শ্রমসাধ্য নিপুণতায়, ভাষা ও ভঙ্গির কঠিন দীপ্তিতে এবং রচনাবন্ধের গাঢ়তায় প্রমথবাবুর সনেটগুলিতে নূতন স্বাদ পাওয়া গেল। পদ্যবন্ধে

গদ্যের ভারবহতা দেখা দিল। স্বতঃস্ফূর্তির অভাব থাকিলেও তাহা নির্মাণকৌশলে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। প্রমথবাবুর দৃঢ়পিনদ্ধ কাব্যশিল্পের উপযুক্ত আধার এই সনেট। সনেট-পঞ্চাশৎ পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ প্রমথবাবুকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেই ইঁহার কবিতার যথার্থ মূল্যবিচার হইয়া গিয়াছে।

> বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি ত দেখিনি। এর কোন লাইনটি ব্যর্থ নয়, কোথাও ফাঁকি নেই—এ যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাটগুলি জহুরির নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি—তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝকঝক করচে, কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা হয়নি—কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে। বাংলায় সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছ।[১৩]

পুরানো বাঙ্গালা কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথবাবুর কিছু তুলনা চলে। (ভারতচন্দ্রের রচনার প্রতি প্রমথবাবুর পক্ষপাতিত্ব ছিল। তাহা তাঁহার গদ্য-পদ্য রচনায় অনেকত্রই প্রকাশিত।) প্রমথবাবুর সনেটের গঠনরীতিতে ইতালীয় অপেক্ষা ফরাসী সনেটের সঙ্গে বেশি মিল দেখা যায়, বিশেষ করিয়া ষট্‌কের প্রথম দুই ছত্র দ্বিপদীতে। সনেট-পঞ্চাশতের অর্ধেকেরও বেশি কবিতায় মিলের কাঠামো এই—কখখক কখখক গগ ঘঙঘঙ। একটি ছাড়া[১৪] আর কোথাও অষ্টকের মিলে ব্যতিক্রম নাই। অষ্টকের দ্বিপদীতে কোথাও ব্যতিক্রম নাই, আছে শুধু ষট্‌কের শেষ চতুষ্পদীতে।[১৫] স্তবকবন্ধ সাধারণত এই মাপে—৪+৪+২+৪। চারটি কবিতায় ৮+৬।[১৬] দুই জায়গায় ১০+৪।[১৭] এক জায়গায় ৪+৪+৬[১৮], আর এক জায়গায় ৪+৬+৪।[১৯] ৪+৪+২+৪ এই বন্ধের মধ্যেও বিচিত্রতা আছে,—(৪+৪)+(২+৪), (৪+৪+২)+৪, ৪+৪+(২+৪), (৪+৪)+২+৪ ইত্যাদি।

সমসাময়িক কবিতার সম্বন্ধে প্রমথবাবুর অভিমত 'উপদেশ' কবিতায় খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত।

> প্রিয় কবি হ'তে চাও, লেখো ভালোবাসা,
> যা পড়ে গলিয়ে যাবে পাঠকের মন।
> তার লাগি চাই কিন্তু দু'টি আয়োজন,—
> জোর-করা ভাব, আর ধার-করা ভাষা।
> বড় কবি কিম্বা যদি হ'তে তব আশা,
> ভাবুক বলিবে তোমা জন-সাধারণ,
> শেখো যদি সমাজের, করি প্রাণপণ,—
> দরকারি ভাব, আর সরকারি ভাষা।
> যত যাবে মাটি আর খাঁটিকে ছাড়িয়ে,
> শূন্যে শূন্যে মূল্য তব যাইবে বাড়িয়ে ॥

আর একটি কবিতায়ও সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যে কবিতার রূঢ় কিন্তু ন্যায্য বিচার আছে।[২০]

> রচি গদ্য পদ্য।
> তাহার পনেরো আনা সবাকারি আছে জানা
> মোটে নয় সদ্য।

যে কথা হয়েছে বলা সেই কথা সেধে গলা,
বলি আব বাব
মনেব পুবানো মাল মেজে ঘষে করি লাল
কবি কাববাব।
হয ত বা পুরোপুবি না জেনে কবেছি চুবি
পব মনোভাব।
অথবা জাওব কাটি খেয়ে আমি পবিপাটী
সাহিত্যেব জাব।
ভলো ধর্ম, ভালো নীতি বেচা কেনা হয নিতি,
সাহিত্য বাজাবে।
তত্ত্ব, তথ্য, তন্ত্র মন্ত্র, জন্ম দেয মুদ্রাযন্ত্র
হাজাবে হাজাবে।

'আত্মকথা'য নিজেব কবিতা সম্বন্ধে উক্তি আছে।

হৃদযে জন্মিলে মোব ভাবেব অঙ্কুব
ওঠে না তাহাব ফুল শূন্যেতে দুলিয়ে।
প্রিযা মোব নাবী শুধু, থাকেনা ঝুলিযে
স্বর্গ মর্ত্ত্য মাঝখানে মত ত্রিশঙ্কুব।
নাহি জানি অশবীবী মনেব স্পন্দন,-
আমাব হৃদয সাথে বাহুব বন্ধন ॥

'বিশ্বরূপ'-এও আছে।

আমি চাই টেনে নিয়ে ছডানো প্রক্ষিপ্ত
অন্তবে বাখিতে কবি আঁধাব আলোব
প্রতীব বচনা কবি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত, -
চতুর্দশ পদে বদ্ধ চতুর্দশ লোক।

অনেককাল পবে 'আমাব সনেট'[১] কবিতায প্রমথবাবু তাঁহাব সমালোচকদেব প্রতি কটাক্ষ কবিয়া লিখিয়াছিলেন

আমি নাকি ভাবদেহ কবি বিশ্লেষণ,
প্রাণহীন মূর্ত্তি গডি অঙ্গে অঙ্গ যুডে।
পূর্ণিমা দর্শনে শুধু, বিনা আশ্লেষণ,
পোবে না এদেব সাধ, গাত্র যায় পুডে।

প্রমথবাবুব শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিব কাব্যকৌশলে নিটোল ভাব ও তীক্ষ্ণ পবিমিত ভাষা অলঙ্কাবেব দীপ্ত কারুকার্য খচিত। যেমন কামিনীকাঞ্চনেব রূপক কবিতাটি।

বহুনো অন্তবে মোব গভীব বিবাগ,
হেমন্তেব বাত্রি হেন থাকে গো জডিয়ে,
--যাহাব সর্বাঙ্গে যায নীববে ছডিয়ে
কামিনী ফুলেব শুভ্র অতনু পবাগ ॥

বাসনা যখন করে হৃদয় সরাগ,
শিশিরে হারানো বর্ণ লীলায় কুড়িয়ে,
চিদাকাশে দেয় জ্বেলে, বসন্ত গড়িয়ে
কাঞ্চন ফুলের রক্ত চঞ্চল চিরাগ ॥

কভু টানি, কভু ছাড়ি, মনের নিশ্বাস।
পক্ষে পক্ষে ঘুরে আসে সংশয় বিশ্বাস ॥

বসন্তের দিবা আর হেমন্ত যামিনী,
উভয়ের দ্বন্দ্বে মেলে জীবনের ছন্দ।
দিবাগাত্রে রঙ আছে, নিশাবক্ষে গন্ধ,—
সৃষ্টির সংক্ষিপ্তসার কাঞ্চন-কামিনী ॥

পুরাতন ভাবও অনেক সময় শব্দের ঝঙ্কারে উজ্জীবিত হইয়াছে। যেমন

লীন হ'য়ে প্রিয়া-অঙ্কে, সুবর্ণ পালঙ্কে,
কলঙ্কের মত রই জড়ায়ে শশাঙ্কে!

সনেট-পঞ্চাশতের চারটি কবিতার উদ্দিষ্ট চারজন সংস্কৃত কবি—ভাস, জয়দেব, ভর্তৃহরি ও চোর-কবি। জয়দেবকে প্রমথবাবুর পছন্দ নয়। ভাসের নাটকে প্রণয়বিলাসের তেমন স্থান নাই কেবল গতানুগতিকতার বাহিরে বলিয়াই তাঁহার প্রতি পক্ষপাত। তাঁহার নিজের আদর্শ—ভোগ ও যোগের সমন্বয়—ভর্তৃহরিরও আদর্শ ছিল মনে করিয়া ভর্তৃহরি প্রমথবাবুর প্রশংসা পাইয়াছেন। আর চোর-কবিরও মর্যাদা স্বীকৃত হইয়াছে তাঁহার রচনায় প্রেমোদ্দীপনার উষ্ণতা আছে বলিয়া। দুইটি কবিতা সংস্কৃত সাহিত্যের দুইটি নায়িকার বিষয়ে—'বসন্তসেনা' আর 'পত্রলেখা'। দ্বিতীয় কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে। বসন্তসেনার অভ্যর্থনা এই বলিয়া

কলঙ্কিত দেহে তব সাবিত্রীর মন

বিদেশি সাহিত্যিকদের মধ্যে শুধু বার্নার্ড শ-র উপর একটি কবিতা আছে। শ-র সঙ্গে প্রমথবাবুর সাহিত্যদৃষ্টিতে মিল ছিল। প্রমথবাবু বলিয়াছেন

এ দেশে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক।

প্রমথবাবুর চাবুক নেহাৎ নরম ছিল না।

পদচারণের কবিতাগুলি ১৯১১ হইতে ১৯১৮ অব্দের মধ্যে লেখা। বইটির নামকরণ করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[২২] রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায়[২৩] বোধহয় কাজ হইয়াছিল। আগেকার কবিতাগুলিতে "পাঠকের মনকে প্রতিছত্রে ফুটিয়ে দেবার" যে ঝোঁক ছিল তাহা যেন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। তবে কবিতার জলুসও খানিকটা ম্লান হইয়াছে। পদাবন্ধের দৃঢ়তা হ্রাস পাওয়ায় এ কবিতাগুলি যেন প্রচলিত কাব্যরীতির দিকেই খানিকটা ঢলিয়া পড়িয়াছে। রহস্যকৌতুকের আমেজে একটু নূতন ঝাঁঝ লাগিয়াছে। লেখক বলিয়াছেন,[২৪] কবিতাগুলির ভিতর "আর কিছু না থাক, আছে 'rhyme' এবং সেই সঙ্গে

কিঞ্চিৎ—'reason'।" আর সেইসঙ্গে আছে এমন কিছু রস যাহা আর কোন কবির রচনায় পাই নাই। Rhyme অর্থাৎ মিল যেমন

সে রূপ বর্ণনা করে বর্ণ নাই বর্গে,
না মরিয়া চলে এনু একদম স্বর্গে।

Rhyme এবং reason যেমন

এ হাতে মুরতি ধরে আজি যে সনেট,
কবিতা না হ'তে পারে, কিন্তু পাকা পদ্য,—
প্রকৃতি যাহার "জেঠ", আকৃতি "কনেঠ"।
অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য,
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,
বারো কিম্বা তেরো নয়, পূরাপুরি 'চোদ্দ'![২৫]

তীক্ষ্ণ কৌতুকের স্পর্শ যেমন

জানি মোর ভারতীর তনুর তনিমা,
না বধি রাবণ পদ্যে, কিম্বা রাজা কংশ!
সাধনার ধন মোর ভাবের অণিমা,—
অর্থাৎ ভাষায় ধৃত মনের ভগ্নাংশ।[২৬]

পদ-চারণের গোড়ার দিকে দু-একটি কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভঙ্গির আভাস আছে। যেমন

এস সখি স্ফটিকের সুরাপাত্র ভরি,
রূপরসগন্ধ-সার শুষে পান করি।
ওকি কথা? কার ভয়ে হও তুমি ভীত?
সুরাপানে পাপ হবে?—হোক না তাই বা
জীবনে কদিন আসে বসন্তের ঋতু?
ফসলে গুল্‌মে ছি ছি মম্‌সে তৌবা?[২৭]

এই প্রসঙ্গে লোকেন্দ্রনাথ পালিতের রচনা স্মরণ করিতে পারি॥[২৮]

৪

সাহিত্যের বাহনের সমস্যা হইতে স্বভাবতই প্রমথবাবু সাহিত্যের বস্তু ভাব ও শিল্পের প্রসঙ্গে উপনীত হইলেন।[২৯] সমসাময়িক সাহিত্যকে যাচাই করিয়া তিনি দেখিলেন যে তাহাতে ছয়টি লক্ষণ পরিস্ফুট। (১) সাহিত্যসৃষ্টি আর স্বল্পসংখ্যক অধিকারীর একচেটিয়া নয়, বহু লোক বহু কারণে বহুবিধ রচনায় সহজেই অগ্রসর। (২) কালধর্মে, শ্রেণী-মানুষের সঙ্গে শ্রেণী-মানুষের ব্যবধান কমিয়া আসিতেছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম যাহা কোনদিনই পুরাপুরি বাস্তবে ছিল না, তাহার বল্‌গা অর্থাৎ শাস্ত্রশাসন আর টিকিতেছে না, সুতরাং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অব্যাপারে ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী। (৩) রচনার আয়তন কমিয়া আসিয়া প্রায় "চুটকি"-আকার ধারণ করিতেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বিষয়ের বৈচিত্র্যও বাড়িতেছে। (৪) সাহিত্যরচনা অর্থোপার্জনের এক উপায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। (৫) মাসিকপত্রের সচিত্রতা

ক্রমশ বাড়িতেছে, আর সেইসব শ্রীহীন ছবিতে শিল্পরুচি তো জন্মাইতেছে না, অধিকন্তু শিল্প তাকাইবার দৃষ্টি লোপ পাইতেছে। (৬) কবিতায় গতানুগতিক প্রকৃতিবর্ণনার ও কৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাসেরই ছড়াছড়ি।[৩০] অতএব, প্রমথবাবু সিদ্ধান্ত করিলেন, এখন লেখকদের পক্ষে আবশ্যক—"বস্তুজ্ঞানের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসনাধীন" হওয়া এবং ভাববস্তুকে যথোচিত শিল্পরূপ দিবার জন্য পরিশ্রম করা। এককথায় রীতিমত সাধনা করা।

> অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা যে এক জিনিষ নয়, এ কথা গণধর্মাবলম্বীরা সহজে মানতে চান না—এই কারণেই এত কথা বলা। আমার শেষ বক্তব্য এই যে, ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও যে মহত্ত্ব আছে, আমাদের নিত্যপরিচিত লৌকিক পদার্থের ভিতরেও যে অলৌকিকতা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তার উদ্ধারসাধন করতে হলে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করতে হলে, সাধনার আবশ্যক ; এবং সে সাধনার প্রক্রিয়া হচ্ছে, দেহমনকে বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগতের নিয়মাধীন করা।...নব্য লেখকদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে তাঁরা যেন দেশি বিলাতি কোনরূপ বুলির বশবর্তী না হয়ে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় লাভ করবার জন্য ব্রতী হন।

রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' (১৮৯১-১৮৯৫) এই ইঙ্গিতই দিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সাধনা শুধু সাহিত্যের নয়, সংসার জীবনেরও। সাহিত্যের ক্ষেত্রসীমানা এখন (১৯১৩) বিস্তৃততর, তাই সাহিত্যের সাধনায় ডিসিপ্লিনের আবশ্যকতা এখন অনেক বেশি। বাজে কথায়, বাজে তর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালীকে সাহিত্যের সচল পথটির নির্দেশ দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথই প্রমথ চৌধুরীকে দিয়া 'সবুজপত্র' নিশান মেলিয়া ধরিলেন (বৈশাখ ১৩২১ সাল), এ কথা আগে বলিয়াছি। প্রমথবাবুর চিন্তার তীক্ষ্ণতা ও সজীবতা এবং তাঁহার ভাষার জোর ও উজ্জ্বলতা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকেই সাহিত্যশাসনে গাণ্ডীবীরূপে বরণ করিলেন। (সাধনার সময়ে লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে দিয়া এমন কাজ করাইবার অস্ফুট বাসনা তাঁহার ছিল।) সবুজপত্র বাহির হইবার কয়েকমাস পূর্বে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রমথবাবুকে লিখিয়াছিলেন

> আমার ত দেখে শুনে মনে হচ্চে বাংলা সাহিত্যে তোমার একটা দিন আসচে এবং তোমার একটা কাজ আছে। এইবার সাহিত্য-সিংহাসনে তুমি রাজদণ্ড গ্রহণ করে শাসনভার নেবে এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।[৩১]

প্রচলিত অপ্রচলিত কোন বাঙ্গালা মাসিকপত্রের সঙ্গে সবুজপত্রের মিল দেখা গেল না। সাইজ অর্ধ-ফুলস্‌ক্যাপ। ছবি নাই। এক ছত্রও বিজ্ঞাপন নাই। সবুজরঙের মলাট, মলাটের মধ্যখানে সবৃন্ত তালপাতার গাঢ় ছায়াছবি। উদ্ধত, অদম্য, চিরহরিৎ, বাঙ্গালাদেশের সর্বত্র পরিচিত, চিরকালীন প্রাণের সরল সবল উদ্দণ্ড ঊর্ধ্বাভিমুখিতার চিহ্ন এই অভিনব তালধ্বজ।

কি অভাব পূরণের ও কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই অভিনব পত্রটির প্রকাশ তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন সম্পাদক 'সবুজপত্রের মুখপত্র'-এ। সাধারণ বাঙ্গালী লেখকদের নিজের ত্রুটি-অসম্পূর্ণতার বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি ঘোলাটে, মন অনড়, গতানুগতিক। সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবণতা—মাসিপিসির রূপকথা আওড়ানোর মতো পুরানো ভাবের জাবর কাটিয়া ও পুরানো বুলির চাপড় মারিয়া পাঠকের মনকে ঘুম

পাড়াইয়া রাখা, তাহার নড়া ধরিয়া নাড়া দিয়া জাগাইয়া দেওয়া নয়। সুতরাং সবুজপত্রের উদ্দেশ্য হইল—(১) ইউরোপীয় সাহিত্যের স্পর্শে আসিয়া আমাদের সাহিত্যে যে মুক্তির স্ফূর্তি ও সচলতা আসিয়াছে সেই নূতনের বেগ নিরুদ্ধ না করা। (২) সর্বভূমিক, সর্বজনিক, সর্বকালিক ভাবকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে নিজের দেশে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা,—ইউরোপীয় সাহিত্যের এই-যে শিক্ষা আমাদের গৌরবের অতীত আমাদের চিনাইয়াছে এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাইয়াছে,—এই শিক্ষা প্রত্যাখ্যান না করা। (৩) বাঙ্গালীর জীবনে যে নূতনত্ব আসিয়া পড়িয়াছে তাহাকে স্বচ্ছন্দে স্বীকার ও প্রকাশ করা। (৪) সাহিত্যকে শিক্ষা ও উপদেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা, অর্থাৎ সাহিত্যকে সামাজিক প্রয়োজনের সামগ্রী বলিয়াই জ্ঞান না করা। (৫) ভাবকে সংক্ষিপ্ত ও সংহতভাবে প্রকাশ করিবার জন্য লেখার চেষ্টা করা। (৬) ইংরেজী শিক্ষাকে ঠেকাইয়া না রাখিয়া তাহা আমাদের এক প্রধান হাতিয়ার করিয়া লওয়া।

রবীন্দ্রনাথকেই দেখা গেল সবুজপত্র-অন্তরালে প্রমথবাবুর রথের বল্গা ধরিয়া। কৈশোরে লেখা 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১)[৩২] ছাড়া আর কিছু তিনি আদ্যন্ত চলিত-ভাষায় লেখেন নাই। এই রচনাটি প্রথমত[৩৩] চিঠি হিসাবেই লেখা হইয়াছিল, এবং রচনার ভাবে ও ভাষায় চিঠির অন্তরঙ্গতা ও জনান্তিকতা পরিব্যাপ্ত। বাহন তাহার শুধু চলিত-ভাষাই নয়, তাহা কথ্যভাষার আরও অনুগত, এমন কি মেয়েলি ভাষার ধার ঘেঁষিয়া গিয়াছে।[৩৪] ভূমিকা সাধু ভাষায় লেখা, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে।" পোষাকি গদ্যে চলিত-ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিলেন প্রথম সবুজপত্রে প্রকাশিত রচনায়। শুধু গদ্যরীতিতে নয় তাঁহার কবিতায় এবং গল্প-উপন্যাসেও অভাবনীয় নবীনতা দেখা দিল। কবিতায় পাইলাম ছন্দের যতিমুক্তি ও ভাবনার বিস্ফার, গল্পে-উপন্যাসে পাইলাম ঋজু দৃষ্টি, ভাবনার সতেজ তীক্ষ্ণতা। মৃত্যুর অল্পদিন আগে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন

> আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ যে এই পত্রকে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য সাধনায় একটি নূতন প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোন পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর কৃতিত্ব।

৫

রবীন্দ্রনাথের গল্পসপ্তক ও চতুরঙ্গ বাহির হইবার পরে এবং ঘরে-বাইরে চলিবার সময়ে প্রমথবাবুর গল্পচতুষ্টয় 'চার ইয়ারী কথা' সবুজপত্রে প্রকাশিত হইল (১৯১৬)[৩৫]। বিলাত প্রত্যাগত, ক্লাব-চর চার বন্ধুর ব্যর্থ প্রণয়-কাহিনী। নায়িকা চারজনই বিদেশিনী। ঘটনাস্থল একটির কলিকাতা, দুইটির ইংলণ্ড, একটির ইংলণ্ড ও কলিকাতা। চার জন নায়িকা চার রকম, সকলেই অসামান্য সুন্দরী—অবশ্য নায়কের চোখে। তবে একজন পাগল, একজন জুয়াচোর, একজন প্রগল্ভ ও ধর্মনিষ্ঠ আর একজন মূক সেবিকা। চার জনই চিরন্তন নারীত্বের লক্ষণ বহন করিয়াছে। তবে শেষ গল্পের নায়িকা পুরাপুরি

রক্তমাংসের মানুষ, বাকিগুলিতে কিছু তির্যগ্‌ভাব আছে। চিরন্তন নারীর ও তাহার আকর্ষণের মূলে আছে একটি বিরাট রহস্য—"ও পদের সংস্কৃত অর্থেও বটে, বাঙ্গালা অর্থেও বটে—অর্থাৎ ভালবাসা হচ্ছে both a mystery and a joke"। নায়ক-নায়িকা ছাড়া কোন তৃতীয় ভূমিকার স্থান নাই। নায়কের অনুভূতি ও বিচার-বীক্ষণের মধ্য দিয়াই কাহিনী প্রবাহিত। ইতিপূর্বে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে বাঙ্গালী ছেলেকে বিলাত-প্রবাসে দেখিয়াছি। প্রমথনাথের গল্প-চতুষ্টয় কিন্তু অন্য মেজাজের ও অন্য রসের। প্রমথনাথের গল্পের চরিত্র সোজাসুজি জীবন থেকে প্রতিফলিত নয়, সেগুলিকে জীবনের প্রতিস্ফুরণ (refraction) বলিতে পারি। চিন্তায় বক্রিমসুভগতা ও তীক্ষ্ণতা এবং ভাষায় শাণিত উজ্জ্বলতা গল্পগুলিকে যেন ভাস্কর্যের কঠিন কারুকার্য মণ্ডিত করিয়াছে। প্রমথনাথ পরে অনেক গল্প লিখিয়াছেন[৩৬], এবং সেগুলি তাঁহার স্বকীয়তায় ঝলমল, তবে শিল্পের দিক দিয়া চার-ইয়ারী-কথা অনতিক্রান্ত ॥

৬

সবুজপত্রেব সারথি রবীন্দ্রনাথ, গাণ্ডীবী সব্যসাচী প্রমথনাথ। সবুজপত্রের দল যেটি ছিল তাহা মোটেই ভারি ছিল না,—কয়েকটিমাত্র শিক্ষিত চিন্তাশীল তরুণ। ইঁহাদের সকলেরই লেখা সবুজপত্রের রঙ-লাগা। সে লেখা ভাব-সংহত, ভাষা-পরিমিত সতেজ ও স্পষ্ট এবং স্বাধীনচিন্তা-প্রণোদিত। পরে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রচনায় নিজস্ব লিপিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সবুজপত্রের বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে ছিলেন—প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, সুবেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী,[৩৭] বরদাচরণ গুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বীরেশ্বর সেন ইত্যাদি।

সবুজপত্রের গল্পলেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা মাধুরীলতা দেবীর (১৮৮৬-১৯১৮) নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি সবুজপত্র বাহির হইবার অনেক আগে হইতেই কিছু কিছু গল্প লিখিতেন। বিদেশি গল্পের অনুবাদে এবং মৌলিক গল্প রচনায় মাধুরীলতার সহজ দক্ষতার পরিচয় পরিস্ফুট। 'মাতা শত্রু'[৩৮] ও 'সুরো'[৩৯] চমৎকার। এসব কাহিনী রবীন্দ্রনাথের কাছ হইতে পাওয়া বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সংশোধনও অল্পস্বল্প থাকা সম্ভব।

আঞ্চলিক কথ্যভাষায় লেখা দুটি একটি গল্পও সবুজপত্রে বাহির হইয়াছিল। যেমন সুরেশানন্দ ভট্টাচার্যের[৪০] 'হৈরা'।[৪১] গল্পটি বেশ জোরালো। "মানিকগঞ্জের মৌখিক ভাষায় লিখিত"। কিছু নমুনা দিই।

> বেলা তলানের আগেই যার যার মতো কিছু কিঞ্চিৎ ট্যাকে গুইজ্যা গায়ের যত মুরুব্বি মাতব্বর এই ব্যাপারটিরে পানে চুনে মিশানের মতন নিভাজে হজম করণের লাইগ্যা, এক জুঠ হৈল। সদ্য খুনের দিন বৈলা স্মৃতিচুরামণি মশায় সেদিন আর ঐ দলে যোগ দিলেন না কিন্তু পরের দিন তিনির মোকাবিলা। গয়ানাথ যেমুন রাইমণির পাওনা টাকায় খতখান ফাইরা ফ্যালাইল, অমনি তিনির মনে বাওয়নের জাইৎ রাখনের লাইগা ফট্‌ কৈরা ধর্মভাব উৎলায়্যা উঠ্‌ল।

৭ নারায়ণ পত্রিকা ও পুরানো বিরোধ

সবুজপত্র বাহির হইবার পর রবীন্দ্রনাথ আশংসা করিয়াছিলেন, "সবুজপত্রের উচিত হবে খুব একচোট গাল খাওয়া। সেইটেই একটা লক্ষণ যে ওর কথাগুলো মর্মস্থানে গিয়ে লাগ্‌বে।" এ কথা ফলিতে দেরি হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের পুরানো বিরোধীরা, অতীতে নিবদ্ধদৃষ্টি পণ্ডিতেরা, ঈর্ষালুরা, এবং "হঠাৎ-ডিমক্রাসির" নকলনবীশেরা[৪২]—সকলে একজোট হইলেন এবং সবুজপত্রের প্রতিপক্ষরূপে চিত্তরঞ্জন দাশ-সম্পাদিত[৪৩] ও পরিপুষ্ট এবং বিপিনচন্দ্র পাল-পরিসেবিত 'নারায়ণ' পত্রিকার (অগ্রহায়ণ ১৩২১ হইতে) ছায়ামণ্ডপে সমবেত হইলেন। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হইল প্রমথবাবুর ভাষা অর্থাৎ চলিত-ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথের ভাব। চলিত-ভাষার বিরুদ্ধে অভিযানে জোর লাগিল না।[৪৪] রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগে একটু জোর লাগিল বিশেষ করিয়া দুইটি রচনায়, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে এবং 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে। স্ত্রীর-পত্রের প্যারডি 'মৃণালের কথা' বাহির হইল নারায়ণের প্রথম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩২১ সাল)[৪৫]। আর ঘরে-বাইরের বিষয় ও ভাব যে নিতান্ত দুর্নীতিপূর্ণ সে বিষয়ে প্রতিপক্ষেরা একমত এবং সরবে একতান। সন্দীপের মুখে সীতার বিরুদ্ধে গ্লানিকর মন্তব্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ হিন্দুসংস্কৃতির মর্মে শূল বিঁধিয়াছেন এবং বিমলা-ভূমিকার দ্বারা বর্তমান হিন্দু-সমাজের ভিত্তিতে বোমা ফাটাইয়াছেন—এই অপরাধে "সাহিত্যিক" ও "চিন্তাশীল" সমাজের আশাস্থলেরা কেহ কেহ ব্যবস্থা দিলেন লেখনীর সাহায্যে সম্ভবপর না হইলে লগুড়ের সাহায্যে "কালাপাহাড়" রবীন্দ্রনাথকে শায়েস্তা করিতে হইবে, তাঁহার সাহিত্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে হইবে। কিন্তু নিঃসার প্রগল্‌ভতা নীরব হইতে বিলম্ব হইল না। তবে বিরুদ্ধবাদীরা বিনা যুদ্ধে—যদিও সে যুদ্ধ অসম—ক্ষান্ত হইলেন না। সনাতন শাস্ত্রের ও চিরন্তন সমাজের দোহাই ছাড়িয়া দিয়া ইঁহারা পাশ্চাত্য বিদ্যার অস্ত্র খুঁজিলেন। সবুজপত্রের বিরুদ্ধে ইঁহাদের এবং আমাদের—ভারতবাসী ও বাঙ্গালীর জাতীয় মনোভাবের কঠিন অথচ সত্য মূল্যবিচার করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথই প্রমথনাথকে লেখা একটি চিঠিতে।[৪৬]

> আমরা মননের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মাইনি—যে দেশে সকল ভাবনা ভাবিত এবং সকল কর্ম কৃত হয়ে চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে গেচে সেই "আমার জন্মভূমি"তে আমরা মানুষ। তার পরে আবার আমাদের বিদ্যাশিক্ষাও মূল বই থেকে নয় নোটবই থেকে। এইরকম করে আরেক জনের মন যেটা চিবিয়ে আমাদের জন্যে অর্ধেক হজম করে দেয় সেই খাদ্যেই আমাদের মনের বাড়বার বয়স কাটল। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভাবতে বল্লে আমাদের রাগ হয়—এবং ভেবে যেটা দাঁড়ায় সেটা অজীর্ণতা, তুমি কিছুকাল যদি ইব্‌সেন, মেটারলিঙ্ক, ডস্‌টয়েভ্‌স্কি, বার্নার্ড শ কোট কর তাহলে তার মূল্য যতই তুচ্ছ হোক্ তার কাট্‌তি এবং খ্যাতি হবে প্রচুর। কিন্তু তোমার দোষ হচ্চে তুমি নিজে ভাব সুতরাং তুমি ভাবনা দাবী কর—এতবড় দুরাশা আমাদের দেশে চলবে না।

সবুজপত্র বিরোধীদের ইউনাইটেড ফ্রন্ট্ বা সম্মিলিত শক্তির আক্রমণ হইল বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে বর্ধমানে ১৩২১ সালের চৈত্র মাসে। মূল এবং সাহিত্য-শাখার সভাপতি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার অনুগামীদের রচনাকে "চুটকি" বলিয়া তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন।[৪৭] নবীন অধ্যাপক

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়[৪৮] 'নব-নাগরিক সাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার অনুপ্রাণিত সাহিত্য-সৃষ্টিকে অনাসৃষ্টি বলিয়া সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিলেন। সবুজপত্রের একটি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত-সূত্র ছিল সাহিত্যসাধনায় অধিকারবাদের স্বীকৃতি। রাধাকমলবাবু এ কথা মানিয়াও মানিলেন না। তিনি বলিলেন শিক্ষাই সাহিত্যের রঙ্গভূমির পাসপোর্ট, আর লেখক ও পাঠকের মধ্যে যে ব্যবধান দিন দিন বাড়িতেছে তাহার জন্য দায়ী ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংবেজী-অনুকারী সাহিত্য। রাধাকমলবাবুর অভিমত অনুসারে বাঙ্গালায় দর্শনের আলোচনার প্রাণসঞ্চাব হইযাছে বটে কিন্তু সাহিত্যে বিশেষ-কিছু উন্নতি হয় নাই। তাঁহার মতে, হয়ত নূতন-পুরানোর সমাবেশে গীতি-কবিতায় অল্পস্বল্প লাভ হইয়াছে

> কিন্তু গল্পে, উপন্যাসে, নাটক-নভেলে আমরা শুধু নূতন লইযা খেলা করিতেছি মাত্র আমবা এখনও ইউবোপীয়নবিশির আত্মশ্লাঘা ত্যাগ করিতে পাবি নাই। আমরা এখনও অ্যানা কারেনিনাব (Anna Karenina-ব) মোহে "চোখের বালিতে" দেশের মনেব সম্পূর্ণ বিবোধী নাযক-নায়িকাব অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র আঁকিতেছি, "স্ত্রীর পত্রে" ও "নারীব মূল্যে" ইবসেন (Ibsen)-এব মত প্রচার করিতেছি। আলফন্‌সো ডডে (Alphonse Daudet) ও গিডে মোঁপাসা (Guy de Maupassant) বর্তমান নব্য-সাহিত্যিকদলের গুরু হইয়াছেন।
>
> ইঁহাবা ভাবিতেছেন, ইঁহাবা যে জীবনের ছবি আঁকিতেছেন, তাহা আসল, সত্য ও সুন্দব, তাহাতে সমাজেব মিথ্যা আচাব-ব্যবহাবের প্রশ্রয দেওয়া হয না, সমাজের কদর্য অনুশাসন সেখানে ব্যক্তিত্বেব প্রতিবোধ করে না। সেখানকাব জীবন একেবারে স্বাধীন, বাধাবন্ধনহীন, নিত্য-সবস, নবীন, সবুজ।

রাধাকমলবাবুব মতে, এই সাহিত্য যাহা আঁকিতেছে তাহা জীবন নহে, জীবনের অলীক কল্পনা, যাহাব সহিত আসল জীবনেব যোগাযোগ নাই। টবে সাজানো মৌশুমি ফুলের মতো "বর্তমান নব্য-সাহিত্য আভিজাত্য-দোষপুষ্ট হইয়া জাতীয় জীবনের নিকট নিষ্ফল হইতেছে।" তখনো 'ঘবে-বাইরে' বাহিব হয নাই, সুতবাং রাধাকমলবাবুর সমালোচনার লক্ষ্য ছিল 'গোবা'।

> সাহিত্যে abstractions বস্তুতন্ত্রহীন কল্পনা লইয়া সৃষ্টিব শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমাদেব "গোরা"। প্রত্যেক চবিত্র সেখানে মানুষ নহে, একটা ভাবের প্রচণ্ড অভিব্যক্তি। তাহাদের ভাব ও বক্তৃতাব বিশ্লেষণের ধূমে মানুষগুলো ছায়াময় হইয়া গিয়াছে। এই 'গোবা'ই হইতেছে নব-নাগবিক-সাহিত্যের কল্পনাব শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

সবুজপত্র-বীজিত সাহিত্য অভিজাত-গ্লানিপুষ্ট এবং জাতীয় জীবনের পরিপন্থী। তবে, প্রবন্ধ-লেখকদের মতে "লোকসাধারণের, অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত জনসমাজের হৃদয়ে আমাদের জাতীয় সভ্যতা ও সাধনা আপনাদের গৌরব অটুট রাখিয়াছে।" স্কুল-কলেজে, অফিস-আদালতে, ড্রয়িংরুমে-বৈঠকখানায়, ক্লাব-ঘরে যে জীবন যাপিত হয় তাহা নকল আর যাহা আসল জীবন তাহা "গরুচরা মাঠে, ছায়াঢাকা খেয়াঘাটে, বনে-ঘেরা কুটীরে, নিত্য-নূতন রসের রাজ্য সৃষ্টি করিতেছে।" "আসল সাহিত্য গডিয়া উঠিবে, এই আসল জীবনকে অবলম্বন করিয়া।"

রাধাকমলবাবুর অভিযোগের সমুচিত উত্তর দিলেন প্রমথবাবু 'সাহিত্যে খেলা'[৪৯] প্রবন্ধে। প্রমথনাথ বলিলেন, সাহিত্যে খেলা করিবার অধিকার লেখকদের আছে কেননা

সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য আনন্দ দেওয়া—কাহারো মনোরঞ্জন নহে, শিক্ষাদান তো নয়ই।

> সমাজের মনোরঞ্জন করিতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক, এইসব জিনিষে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।

রাধাকমলবাবুর প্রত্যাশিত "আসল সাহিত্য" গড়িয়া ওঠার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এখানে স্মরণীয়।[৫০]

> আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকত তাহলে কি হত?...কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাদম্বরীর আমি নিন্দা কবচিনে। সাহিত্যের শোভাযাত্রাব মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে কিন্তু যাত্রাপথের সমস্তটা যুড়ে 'তারাই যদি আড্ডা করে' বসে, তাহলে সে পথটাই মাটি, আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাকবে, মানুষ থাকবে না।

নব্য-সাহিত্যকে অস্বীকার করিলেও তাহার বাহন নব্য-সাহিত্যের বাহন যে চলিত-ভাষা তা রাধাকমলবাবুরাও ব্যবহার না করিয়া পারেন না। তাঁহাদের উক্তিতে ও আচরণে এই অসঙ্গতির দিকেও রবীন্দ্রনাথ অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

> বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিষকে মুক্তি দিয়েছে সে ত বিদেশী নয়—সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তাব ফলে হয়েছে এই যে, যে বাংলা ভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকেব দল ছুঁতে চাইত না, এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করবে ও গৌরব করবে। অথচ যদি ঠাহব করে দেখি তবে দেখতে পাব, গদ্যে-পদ্যে সব জায়গাতেই সাহিত্যের চালচলন সাবেক কালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যাঁরা তাকে জাতিচ্যুত বলে' নিন্দা কবেন ব্যবহাব কববাব বেলা তাকে বর্জন করতে পারেন না।

৮ হরিদাস হালদার

বলা বাহুল্য, সবুজপত্রের দলের বাহিরেও কোন কোন লেখক চিন্তাশীলতার সঙ্গে উজ্জ্বল রচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। যেমন হরিদাস হালদার (১৮৬২-১৯৩৪)। ইঁহার 'গোবর গণেশের গবেষণা' (১৯১৫)[৫১] একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। বইটির ছয়টি পরিচ্ছেদে লেখক আমাদেব ধর্ম, আইন-আদালত, স্বাদেশিকতা ও সংস্কৃতিতে যে মিথ্যা ও আত্মপ্রবঞ্চনার জালজঞ্জাল জড়াইয়া রহিয়াছে তাহা উদ্‌ঘাটিত ও বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। বহস্যচ্ছলে লেখা প্রবন্ধগুলিতে স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ ও চিন্তার বলিষ্ঠ প্রকাশ সমসাময়িক সাহিত্যে সবুজপত্রের বাহিরে অভাবিত ছিল।

ধর্ম সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন

> আমরা সকল হারাইয়া একমাত্র ধর্মকেই সার করিয়াছি। তাই সকল কাজেই আমরা ধর্মের নাড়া দিয়া থাকি। প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া আমরা বলিয়া থাকি, "ধর্ম আছেন, আমি সহিলাম, ধর্মে সহিবে না।" আমাদের অক্ষমতার অনুপাতে ধর্মের দোহাই বাড়িয়া গিয়াছে।[৫২]

অতীতে পাঞ্জাবে ধর্মের মধ্য দিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রচেষ্টা একদা হইয়াছিল। তাহার কি ফল ফলিয়াছে সে সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন

আমি পাঞ্জাবে গিয়া দেখিয়াছিলাম সেখানে শিখ ও মুসলমানের মধ্যে যতদূর ধর্ম-বিরোধ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ততদূর নহে। তাঁহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম যে, হিন্দু-মুসলমান ধর্মের বিবাদ ঘুচাইবার অভিপ্রায়ে গুরু নানক উভয়ের ধর্মশাস্ত্র হইতে সার সঙ্কলন করিয়া সামঞ্জস্যমূলক শিখধর্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বুঝিলাম ধর্মের সিমেণ্ট দিয়া রাম ও রহিম নামক দুই সহোদরকে জুড়িয়া এক করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু এখন সেখানে দাঁড়াইয়াছে রাম, রহিম ও গ্রন্থ-সাহেব ; এবং এই তিন সহোদরের মধ্যে বহুদিন যাবৎ পৈতৃক বাস্তুভিটাব পার্টিশনের মামলা চলিতেছে।[৫৩]

সাহিত্যের বিচার সম্পর্কে হরিদাসবাবু লিখিয়াছেন

...বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে আমার নিকট অনুরোধ আসিল যে, উক্ত[৫৪] পুঁথিখানি যথামূল্যে সংগ্রহ করিয়া এড়িট করিয়া দিতে হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমি তাহা করিয়া পরিষদের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলাম। পরিষদের কোন কোন অধ্যক্ষ বলিয়াছিলেন যে, আমার ঐ এডিশনের মধ্যে সর্বত্রই মৌলিক আদিরসকে আদ্যন্তমধ্যরস করিয়া সর্বাঙ্গীণ ফুটাইয়া তোলা হইয়াছিল। এবং তাহার কোথাও বস্তুতন্ত্রের অভাব হয় নাই। আমি জানিতাম, যে কথা সাধারণ ভাবে বলিলে অশ্লীল বা রুচিবিরুদ্ধ হইবাব সম্ভাবনা, তাহা প্রাচীন কাব্যের দোহাই দিয়া কৃষ্ণপ্রেমের আবরণে প্রকাশ করিলে সকলে বিশেষ রুচিপূর্বক উদরস্থ করে।[৫৫]

গোবর-গণেশের-গবেষণা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ প্রমথবাবুকে লিখিয়াছিলেন, হরিদাসবাবুকে সবুজপত্রের আওতায় আনিলে ভালো হয়।[৫৬] তাহা সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে প্রতিপক্ষেরা তাঁহাকে হস্তগত করিয়াছিলেন। অতঃপর নারায়ণে হরিদাসবাবুর দুই-একটি "বাস্তব" গল্পচিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।[৫৭] শতাব্দীর গোড়ার দিককার এক বিপ্লবী নায়ক অবলম্বনে তিনি একটি "সামাজিক ও রাজনৈতিক উপন্যাস" লিখিয়াছিলেন, নাম—'কর্মের পথে' (১৯১৭)। কাহিনীতে যৎসামান্য "বাস্তবতা"র স্পর্শ ছিল। ১৯০৬-১০ অব্দের বিপ্লবী আন্দোলন অনুসরণ করিয়া কল্পিত। লেখক বলিয়াছেন

এই উপন্যাসের সকল ঘটনার উপর বাস্তবের আববণ দেওয়ার সাধ্যমত চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার সকল চরিত্র ও ঘটনাই কাল্পনিক সুতরাং কেহ যেন মনে না করেন যে, কোনও প্রকৃত ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এইগুলোর মধ্যে কোথাও কিছু ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

মনে হয় গল্পের নায়ক রাসবিহারী বসুর আদর্শে পরিকল্পিত।

'বক্কেশ্বরের বেয়াকুবি' (১৯১৮) ব্যঙ্গরসাত্মক। 'মদন পিয়াদা' (১৯২১) গল্পের বই। 'বক্কেশ্বরের বেয়াকুবি' বইটি ঠিক রসরচনা নয়। কতকটা বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের স্টাইলে, তবে লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট এবং ইষুক্ষেপণ ঋজু। সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষে যে "ফাঁকিদারী সভ্যতা" জাঁকিয়া বসিয়াছে এবং দেশে সামাজিক আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছে তাহার বিচার ও বিশ্লেষণ (এবং প্রতিবাদ) বইটির প্রবন্ধগুলির বিষয় (ও উদ্দেশ্য)। প্রবন্ধগুলি পরিচ্ছেদরূপে সাজানো। কয়েকটি প্রবন্ধ খোলা চিঠির মতো। সপ্তম পরিচ্ছেদের খোলা চিঠির উদ্দিষ্ট গান্ধীজী। লেখক আশঙ্কা করিতেছেন, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন যেন প্রকারান্তরে দারুণ হিংসা আনিয়া না দেয়।

রুশিয়াতে টলষ্টয় অর্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া তাঁহার অহিংসা মন্ত্র ও সত্যাগ্রহ ব্রত প্রচার করিয়াছিলেন। তথাপি সম্প্রতি সে দেশের তুষারের স্ফটিক স্তম্ভ ভেদ করিয়া বলসেবীরূপী

নরসিংহ অবতার দেখা দিয়াছে—অর্থাৎ নরসঙ্ঘ রূপে বিরাজমান নারায়ণ অকস্মাৎ প্রচণ্ড সিংহমূর্তি ধারণ করিয়া সেখানকার সকল প্রকার রাজৈশ্বর্য শক্তির নাড়ীভুঁড়ি অতীব নৃশংসভাবে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। এ ঘটনাটি এই যুগের ঐতিহাসিক সত্য। অহিংসার পশ্চাতে হিংসার তাণ্ডবলীলা যে অসম্ভব নহে, তৎসম্বন্ধে পুরাণ ও ইতিহাস একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে। অতএব হে মহাত্মাজি! আপনাকে খুব হুঁসিয়ার হইয়া এমন ভাবে সত্যাগ্রহ প্রচার করিতে হইবে, যেন তাহার ল্যাজ ধরিয়া কোন অবতার না আসিতে পারেন। প্রহ্লাদ ও টলষ্টয় এ কাজ করিতে না পারিলেও, আপনাকে পারিতে হইবে; যেহেতু গুরুর চেয়ে চেলা এককাঠি সরেস হইয়া থাকে, গুরুর অসাধ্য কাজ চেলার দ্বারা সাধিত হয়।

৯ চিত্তরঞ্জন দাশ, অমলা দেবী

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) নারায়ণের পোষক ও সম্পাদক ছিলেন বটে কিন্তু মূল স্তম্ভ ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৭-১৯৩২)। বাগ্মিতা ও লিপিকুশলতা বিপিনচন্দ্রের অনায়াসসাধ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন বঙ্গদর্শন পরিচালনা করিতেছিলেন তখন ইঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ তাহাতে বাহির হয়, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন ছাড়িয়া দিলে পর বিপিনচন্দ্র সেখানে জাঁকাইয়া বসেন। বঙ্গদর্শন উঠিয়া গেলে (১৩২০ সাল) অল্প কাল পরে নারায়ণের আবির্ভাব। বিপিনচন্দ্র কয়েকটি গল্পও লিখিয়াছিলেন, এগুলি 'সত্য ও মিথ্যা' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৯১৭)। ইঁহার প্রবন্ধাবলী গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয় নাই। দুইটি বই আছে—'ভারত সীমান্তে রুষ' (১৮৮৬) ও 'চরিত কথা' (১৯১৬)।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে পড়িয়া চিত্তরঞ্জন দাশ অনেক দিন আগে কবিতা-কর্মে অল্পস্বল্প মনোযোগী হইয়াছিলেন। ১২৯৫ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'নব্যভারত'-এ তাঁহার 'বন্দী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষিতব্য। চিত্তরঞ্জনের (ও তাঁহার ভগিনীদের) রচনা আরো কিছু নব্যভারতে এবং মানসীতে বাহির হইয়াছিল। ইঁহার প্রথম দিকের রচনায় রবীন্দ্রনাথের সংশোধন ছিল বলিয়া মনে হয়। নারায়ণ বাহির করিবার কিছু আগে হইতেই চিত্তরঞ্জন ভক্তকবিদের দলে ঢলিয়া পড়েন এবং তাঁহাদের চাপে রবীন্দ্র-বিরোধীদের পৃষ্ঠপোষক হন।

চিত্তরঞ্জন এই কাব্যগ্রন্থগুলি বাহির করিয়াছিলেন—'মালঞ্চ' (১৮৯৬, দ্বি-স ১৯০৫), 'মালা' (১৯০২), 'সাগরসঙ্গীত' (১৯১৩), 'অন্তর্যামী' (১৯১৪) ও 'কিশোরকিশোরী' (১৯১৫)। সাগরসঙ্গীতের একটি অভিজাত সংস্করণও বাহির হইয়াছিল। তেমন বাহারি বই বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র মহতাব (১৮৮১-১৯৪১) ছাড়া আর কেহ পূর্বে বাহির করেন নাই।[৫৮]

'মালঞ্চ' হইতে তাঁহার কাব্যরচনার একটু নমুনা দিই।

> তোমারে পাব না জানি! তবু মনে আসে
> অনন্ত বাসনাপূর্ণ অসংখ্য কল্পনা;
> অন্তরের কানে কানে মোহমন্ত্র ভাষে
> দিবসে নিশীথে জাগি সহস্র কল্পনা।

যদি কোন দিন আমি মুহূর্তের তরে
সব ভুলে যাই তব সৌন্দর্যের ছায়,
যদি কোন দিন সত্য সত্য মোহ ভ'রে
আপনা রাখিতে পারি তব পুষ্প-পায় !

কল্পনার স্বপ্ন-ছল সত্য হয়ে উঠে
আপনার বাসনার নিবিড় তৃষায় ;
আমার অন্তর তলে শত পুষ্প ফোটে
শরৎ প্রভাতে আর বসন্ত নিশায় !

এ তনুর প্রতি অণু তৃষিত লোলুপ,
এ প্রাণের পিপাসায় কোথা তব রূপ ?

মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার পর পত্নী বাসন্তী দেবীর সহযোগিতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 'বাঙ্গালার কথা' নামে সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিয়াছিলেন (১৯২১-২২)।

চিত্তরঞ্জনের ভগিনী অমলা দেবী সঙ্গীতজ্ঞ ও সুগায়িকা ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে ও পদ-কীর্তনে ইনি যশস্বিনী ছিলেন। ১৯১৭ অব্দে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ইঁহারই নেতৃত্বে "জনগণমন-অধিনায়ক" গানটি প্রথম প্রকাশ্যে গাওয়া হইয়াছিল। অমলা দেবীর কবিতা দুই-একটি মানসীতে বাহির হইয়াছিল। ইঁহার একটি নাট্য-রচনাও আছে। নাম 'ভিখারিণী' (১৯১১)। চিত্তরঞ্জনের আর এক ভগিনী ঊর্মিলা দেবীর কয়েকটি গল্প ১৩১৮-২০ সালের দিকে মানসীতে ও অন্যান্য পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। এগুলি পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই ॥

১০ সরযূবালা দাশগুপ্তা

দার্শনিক মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কন্যা, চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতৃজায়া সরযূবালা দাশগুপ্তা (১৮৮৯-১৯৪৯) নারায়ণের নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। অকালে স্বামী-বিয়োগের পরিণত শোকোচ্ছ্বাস ইঁহার কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া একটি দীর্ঘ ভাবুক রচনার আকারে ঘনীভূত হইয়াছিল। বইটি রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ভূমিকা মণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হয় 'বসন্ত-প্রয়াণ' নামে (১৯১৪)। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় বলিলেন যে বসন্ত-প্রয়াণ কাব্য, তবে কাব্য বলিতে আমরা সচরাচর যাহা বুঝি তেমন নয়। ইহার মধ্যে রসের এবং তত্ত্বের অংশ অন্তরের আগুনে গলিয়া গদ্যে-পদ্যে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। কাব্যের তত্ত্বকথা সব সময়ে ব্যাখ্যা করিয়া কহা যায় না, তাই রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন

> আমার প্রতি অনুরোধ ছিল এই রচনার তত্ত্বকথাটি ভূমিকায় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে। কিন্তু সে ভার আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না। নিজের লেখার অস্পষ্টতার জবাবদিহি আজও আমার চুকিল না ; অতএব আমি চেষ্টা করিলে পাঠকদের কাছে অস্পষ্টকে অস্পষ্টতর করা সম্ভব না হইতে পারে, হয়ত ইতিমধ্যেই তাহাতে কতকটা কৃতকার্য হইয়াছি।
>
> ...মানুষের মর্মান্তিক একটি বোধশক্তি বেদনায় জাগরিত হইয়া উঠিয়া, বিশেষ হইতে বিশ্বে ও

বিশ্ব হইতে বিশ্বাতীতে সমস্ত ব্যবধানকে সহজে দূর করিয়া দেখিতেছে ইহাই এই লেখায় আমি বুঝিয়াছি, ইহা বুদ্ধি করিয়া ভাবা নয় ; চিন্তা করিয়া পাওয়া নয়...

এরূপ রচনাকে একেবারে জলের মত বোঝা যায় না—যে বেদনা পাইয়াছে ও প্রকাশ করিয়াছে তাহার সঙ্গে মন মিলাইয়া দিয়া তবে বুঝিতে হয়।

ইঁহার অপর গ্রন্থ 'ত্রিবেণী-সঙ্গম' (১৯১৪) ও 'দেবোত্তর বিশ্বনাট্য' (১৯১৫)। এই দুইটি রচনায় দার্শনিক পিতার চিন্তার ও রচনার (?) প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। লেখিকার নীহারিকাবৎ ভাব প্রায়-অদৃশ্য রূপকের সূত্রে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। সেই জন্য সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে রচনাগুলি খুব সার্থক হয় নাই। বসন্ত-প্রয়াণের খ্যাতিটুকুও আজ সম্পূর্ণ চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

দেবোত্তর বিশ্বনাট্য রূপক নাটক, কতকটা রবীন্দ্র-প্রভাবিত। আধুনিক যুগের যে প্রধান সমস্যা—শ্রমিকের ও ধনিকের, শাসিতের ও শাসকের বিরোধ—তাহার সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে নাট্য-কাহিনীতে। শেষ (তৃতীয়) অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের এই অংশটুকু হইতে লেখিকার উদ্দেশ্য বোঝা যাইবে।

দীনুমোড়ল—মহারাজ ! একদিন আমি ব্যক্তিশক্তির উপাসক ছিলাম. এই গুরুদেবই আমাকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন ! যৌবনে আমি চাষীদের দলবল নিয়ে অনেক জমিদারী মহাজনী সরকারী সংক্রান্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার নামে লড়াই করেছি, অনেক কুঠি ও গোলাঘর লণ্ডভণ্ড করেছি, অনেক ভালমন্দ সংস্কার ও প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গেছি, ভাঙ্গাতেই ছিল আমার স্ফুর্তি, আমি শান্তি অপেক্ষা ঝড় ভালবাসিতাম ! আজ সেই ঝড় আমার ঘরের উপর দিয়ে বহে গেছে, বেশী কিছু নয়, আমার মাথার চুল কয়গাছাকেও উড়াইয়া লইয়া গেছে ! স্বাভাবিক মায়ার টানে আমি একটা মস্ত বড় একাধিকার আঁকড়াইয়া ছিলাম, সে টান ছাড়া করিয়া ঠাকুর আমায় সকল অধিকার থেকে মুক্ত করেছেন। আমার কুঁড়ের বেড়া ভেঙ্গে ফেলে আমায় ফাঁকা রাস্তায় দাঁড় করাইলেন, ঠাকুর ধন্য !

রাজা—(স্বগত) আমি ত ফাঁকা ছেড়ে এলাম, এর দেখি উল্টা গতি ! (প্রকাশ্যে)—বিশ্বমানব-ধর্মে রাজার নিকট চাষীর পক্ষ হইতে কি দাবী শুনিতে চাই।...

দীনুমোড়ল—এবার চাষী-বংশের জন্য নূতন ব্যবস্থা চাই। জমি কেবল জমিদারের নয়, সকলেরই যৌথ সম্পত্তি। যে আপন শ্রম ও দক্ষতায় জমি চষ্‌বে, জমি তার কাছে গচ্ছিত থাক্‌বে। এবার প্রতি চাষীই হবে ভূস্বামী ও মহাজন, প্রতি চাষীই গৃহপতি।

'অন্নপূর্ণা' (প্রথম প্রকাশ, সবুজপত্র বৈশাখ, ১৩২২), হইল অপর একটি একাঙ্ক নাটক। নাটকটি ডঃ কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্যের সম্পাদনা "সেকালের নির্বাচিত একাঙ্ক" এই পুস্তক হইতে সংগৃহীত (প্রথম প্রকাশ ১১ই পৌষ, ১৩৯৫)। ইহাতে প্রধান চরিত্রের সংখ্যা দশ। এছাড়াও অপ্রধান কয়েকটি চরিত্র রহিয়াছে। এইভাবে নাটকটি শুরু করিয়াছেন।

স্থান—বিশ্বের হাট। অনতিদূরে কারখানা ও খনি। সামনে পাহাড়। চূড়ায় মন্দির, পাহাড়ের গায়ে কুটীর।

(পাহাড়ের নিম্নদেশে বসিয়া)

আমি—কত আকাশ ঘুরে এই মাঝপথে এসে থেমে গেছি। সেই যে শূন্যময়ের দেশ পার হ'লাম, তারপর এক ঘূর্ণীপাকে পড়ি, সেথায় দুটা ছায়ামূর্ত্তি, অবিরাম গোলপথে পরস্পর

> পরস্পরকে অনুধাবন করছে। উভয়ে দেখে কেবল উভয়ের পশ্চাতের একটা আবছায়া, আর উভয়েই উভয়ের ছায়া ধরবার জন্য ছোটে। বুঝলাম এ যুগল জীবন ও মরণ। তখন সেই দ্বন্দ্বের ঘোর কেটে গেল, আবার চলতে লাগলাম। এবার নতুন প্রয়াণে মধ্যপথে, সন্ধিস্থলে, এসে পড়লাম। বুঝলাম তৃতীয় হ'য়ে মাঝে থাকাই সত্য,—দুই মিথ্যা তিন সত্য। সেই অবধি এই মাঝপথে তৃতীয় হয়ে আছি।...

নাটকটি সমাপ্ত হইয়াছে শ্রমজীবীগণের নৃত্য ও গীতের মধ্য দিয়া এবং সর্বশেষে রহিয়াছে একটি দৃশ্যের বর্ণনা। যেমন

কোমর বেঁধে চল
আজ খুঁড়বো মাটি, তুলবো সোনা,
শুনবো না আর কারো মানা ;
চষলে মাটি ফলবে দানা ;
এ যে অন্নপূর্ণার কল !
(সকলে সমস্বরে—
পদক্ষেপ করিতে করিতে)
তবে ভাবনা কিসের বল,
চলরে সবাই চল,
কোটি কোমর বেঁধে চল !
... ...
চল—অন্নপূর্ণার নাইকো মানা,
মাটি সবার সবার সোনা,
নাইকো নাইকো মহাজনা,
দুনিয়া কার দখল !
চলরে সবাই চল
কোটি কোমর বেঁধে চল !

দৃশ্য

বিজনপ্রান্তর—সূর্য্য অস্তগত। সুদুর পূর্বে পর্ব্বতভূমে, "বৈকুণ্ঠধামে'র পাহাড় আঁধারে আচ্ছন্ন। পশ্চিমে কান্তার, দো-আলোয় ধূধূ করিতেছে। কান্তারের দিকে মুখ রাখিয়া লাঙ্গলে ভর দিয়া দণ্ডায়মান এক চাষী, অঙ্গে ও পরিচ্ছদে মাটির দাগ। একপাশে, পরিত্যক্ত মুকুট, রাজদণ্ড ও রাজবেশ।

যবনিকা পতন

১১ সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

সবুজপত্রের শত্রু সনাতনীদের অস্ত্র নারায়ণের পৃষ্ঠাতেই ঈষৎপরবর্তী কালের আভাস দেখা দিল। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নারায়ণেই প্রথম দেখা দিয়াছিলেন, এবং এই কাগজেরই একজন বাঁধা লেখক সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত 'ডালিম' গল্প[৫১] লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর-পত্রের উত্তর হিসাবে ইনি 'মৃণালের দুঃখ' লিখিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাইয়ের বংশধর। ইনি দুই-একটি নাটকও লিখিয়াছিলেন। যেমন মহাভারত-কাহিনী অবলম্বনে 'মহাপ্রস্থান' (১৯৩২)। ইঁহার লেখা কয়েকটি একাঙ্ক

"কথানাট্য" নারায়ণে বাহির হইয়াছিল ॥[৬০]

১২ যতীন্দ্রমোহন সিংহ

নারায়ণে প্রকাশিত কয়েকটি রচনার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া একজন প্রবীণ লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা সমস্যায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। 'উড়িষ্যার চিত্র' রচয়িতা যতীন্দ্রমোহন সিংহ নারায়ণে প্রথম বছরেই রবীন্দ্র তথা সবুজপত্র-বিরোধী হইয়া দেখা দিয়াছিলেন।[৬১] কিছুকাল পরে (১৯২০) ইনি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ ছাপাইলেন—'সাহিত্য স্বাস্থ্যরক্ষা' নামে। ইহাই পরে 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল (১৯২২)। লেখকের অভিযোগ ব্যাপক, এবং অভিযুক্ত তিনজন সমসাময়িক লেখক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং হরিদাস হালদার। (বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিলে তিনিও অভিযুক্ত হইতেন।) 'ডালিম', 'মরণে জয়', 'হাসির দাম', 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা', 'বিভাকর' ইত্যাদি নারায়ণে প্রকাশিত গল্প উপলক্ষ্য করিয়া ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণে একটি বড় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন 'গণিকাতন্ত্র সাহিত্য' নামে।[৬২] ললিতকুমারের বিপরীত দৃষ্টি লইয়া হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় মানসী-ও-মর্মবাণীতে প্রবন্ধ লিখিলেন—'সাহিত্যে বাস্তবতা'।[৬৩] এই দুই প্রবন্ধ বিচার করিয়া যতীন্দ্রমোহন সমসাময়িক শক্তিশালী লেখকদের বিরুদ্ধে এই চারটি চার্জ আনিলেন।

১. বিধবার প্রেম। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে এই দুর্নীতির সূত্রপাত। পরিণতি রবীন্দ্রনাথে (চোখের-বালি), শরৎচন্দ্রে (বড়দিদি, পল্লীসমাজ), হরিদাসে (কর্মের-পথে)।

২. সধবার প্রেম (কুমারী অবস্থায় সঞ্জাত)। এ দুর্নীতিরও উৎস বঙ্কিমচন্দ্রে। পরিণতি শরৎচন্দ্রে (দেবদাস, স্বামী)।

৩. সধবার প্রেম (বিবাহের পরে সঞ্জাত)। ইহার জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথ (নষ্টনীড়, ঘরে-বাইরে) ও শরৎচন্দ্র (চরিত্রহীন)।

৪. গণিকার প্রেম। "বর্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের এই দিকে একটা ঝোঁক (tendency) দেখা যাইতেছে—এমন কি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রভৃতি চিন্তাশীল প্রবীণ ব্যক্তিগণও এই পথ ধরিয়াছেন।"

শেষে লেখক এই রায় দিলেন

> আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—পাশ্চাত্য-সমাজের প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের স্থিতিশীল সমাজে অনেকদিন হইতে "ভাঙ্গন ধরিয়াছে"; সমাজের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অত্যন্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে,...পাশ্চাত্য সমাজের লালসা-পিপাসা উদ্দীপ্ত হইয়া—হিন্দুজাতির মজ্জাগত সংযমের বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীশ্বর শিক্ষাপদ্ধতি (godless education) নব্য যুবকদিগকে কেন্দ্রভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া আসিতেছে। ইহার পরে বাস্তব নামধারী কামকলুষময় সাহিত্য যদি আর্টের পুষ্টির জন্য লালসার ইন্ধন যোগাইতে আরম্ভ করে, তবে সমাজকে কিসে রক্ষা করিবে ?

দেশের হাওয়া অনেকদিন হইল ফিরিয়াছে। হিন্দু-জাতির সংযম-আদর্শ ইত্যাদি বড়

বড় কথা সকলেরই মুখস্থ, সুতরাং তাহার দ্বারা আর ভবীকে ভুলানো গেল না। সমাজপতির দলের এই শেষ কামড়ও ফসকাইল ॥

১৩ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অসহযোগিতা আন্দোলনের গোড়ার দিকে কয়েকজন ভূতপূর্ব বিপ্লবী লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯) এ বিষয়ে প্রবীণতম। ইঁহারও পূর্ববর্তী হইতেছেন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (১৮৫৮-১৯১৯)। ইঁহার 'নির্বাসন কাহিনী', ১৯১১ অব্দে, জনপ্রিয় হইয়াছিল। বারীন্দ্রবাবুর ছাত্রাবস্থায় লেখা গল্প কুন্তলীন-পুরস্কার লাভ করিয়াছিল। আন্দামান হইতে মুক্তি পাইয়া বারীন্দ্রকুমার তাঁহার অবরুদ্ধ কর্মোদ্যম সাহিত্যের পথে নিয়োগ করিলেন। কয়েকখানি উপন্যাস ইত্যাদি ছাড়া ইনি লিখিলেন ভাগে ভাগে আত্মকাহিনী—'দ্বীপান্তরের কথা' (১৩২৭ সাল), 'আত্মকাহিনী' (১৩২৯ সাল),[৬৪] 'বোমার যুগের কথা',[৬৫] এবং 'আমার আত্মকথা' (১৯৩১)। গল্প-উপন্যাস—'সোনার সিঁড়ি', 'মুক্তির দিশা' (১৯২৯, গল্পের বই), 'দীপালী' (ঐ), 'মিলনের পথে', 'পাতালের ডাক' ইত্যাদি।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৫১) দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' সম্পাদন করিতে থাকেন (১৯২১)। উপেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা 'নির্বাসিতের আত্মকথা' (১৩৩৮ সাল) অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচারিত হইয়াছিল। এই বইখানি লেখক হিসাবে তাঁহার যশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সরস-গম্ভীরতায় ইঁহার 'ঊনপঞ্চাশী' (১৯২২) উপভোগ্য রচনা ॥

১৪ সুরেশচন্দ্র ঘোষ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ইত্যাদি

পোর্ট্রেট অঙ্কনে দক্ষ শিল্পী সুরেশচন্দ্র ঘোষ (?—১৯৩২) লেখক বলিয়া জ্ঞাত নহেন। তাহার কারণ তিনি নিজ গ্রন্থের প্রচার সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। ইনি দুইখানি বই রচনা করিয়াছিলেন,—'দাদার কথা' (রাসবিহারী ঘোষের জীবনী, ১৯২৭) এবং 'নিরঞ্জন' (১৯২৭) উপন্যাস। দুইটিই সরল এবং সহৃদয় রচনা।

সবুজপত্রের একজন তরুণ লেখক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৯১) গদ্য রচনায় নিজস্বতা দেখাইয়াছিলেন গোড়া থেকেই। ইনি গদ্য পদ্য দুই-ই লিখিয়াছিলেন, তবে ঝোঁক ছিল জীবন-ভাবনার দিকে। নূতন চিন্তার পরিচয় আছে তাঁহার প্রবন্ধের বইগুলিতে—'নবযুগের কথা' (১৯১৯), 'সবুজ কথা' (১৯২১), 'উড়োচিঠি' (১৯২২)। রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনীর ও লিপিকার ইঙ্গিত অনুসরণে রূপকথার অনিন্দনীয় এবং নিজস্বরীতিতে লেখা 'নতুন রূপকথা ও একটি রূপক গল্প' (১৯২০, দ্বি-স ১৯২৭) সুপাঠ্য রচনা। বইটির ভূমিকায় প্রমথনাথ চৌধুরী রচনা দুইটির ভাব ও ভাষা লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন, সুরেশচন্দ্রের

> ভাষা সাবেগ কিন্তু অসংযত নয়, প্রচুর কিন্তু প্রগলভ নয়। তাঁর লেখার ভিতর প্রাণের উচ্ছ্বাস, গতি, লীলাভঙ্গী সবই আছে। এই রূপকথা দুটি একটি জ্যান্ত মানুষেব জ্যান্ত মনের জ্যান্ত ভাষায় আত্মপ্রকাশ অতএব এ যথার্থ সাহিত্য।

নূতন-রূপকথার তত্ত্বটুকু হইতেছে এই যে আমরা ভারতীয়েরা পরলোকাপেক্ষী সুতরাং ইহজীবনের কর্তব্যের তথা আনন্দের প্রতি উদাসীন হইয়া আমাদের অতীত দিনের ঐশ্বর্য এবং স্বাধীনতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। ভারতীয়

> মানুষ ধরিত্রীকে অস্বীকার করেছে, নিজেও তাই নিরর্থক হ'য়ে উঠেছে। মানুষের প্রাণহীনতায় তার চতুষ্পার্শ্বের প্রকৃতি নির্জীব আনন্দহীন হ'য়ে উঠেছে, মহারাজ। আপনার জীবনের প্রতি মানুষ প্রেম হারিয়েছে, তার বিনিময়ে সে লাভ করছে কেবল মৃত্যু। এরা আজ মনে করতে শিখেছে যে, ইহলোকের দুঃখ পরলোকের সুখ হ'য়ে দেখা দেবে, ইহলোকের অক্ষমতা পরলোকের সামর্থ্য হ'য়ে ফুটে উঠবে, এদের ধারণা, মহারাজ, ইহলোকে নরক ভোগ করাই পরলোকে স্বর্গলাভের সহজ ও সত্য উপায়।[৬৬]

'ইরাণী উপকথা'য় (১৯২০) পাঁচটি গল্প আছে। 'একটি অসম্ভব গল্প' ও 'সমুদ্রের ডাক' এই দুইটি ছাড়া সবই রূপক ও রূপকথার রীতিময়। এ দুইটি গল্পও রূপকের স্পর্শবিহীন নয়। রচনা স্বচ্ছন্দ ও সুপাঠ্য।

ইঁহার অপর রচনা গল্পের বই 'সাগরিকা' (১৯২৪), 'ঐন্দ্রজালিক' (১৯২৫), 'সাকী' (১৯২৬), 'ইন্দ্রধনু' (১৯২৮) ইত্যাদি।

সুরেশ চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৭২) কাশী হইতে 'উত্তরা' (১৩৩২ সাল) কাগজ বাহির করিয়াছিলেন। এই পত্রিকায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নবীন লেখকদের প্রথম রচনা অনেক বাহির হইয়াছিল। গল্পের বই—'রহমান খাঁর দুর্গোৎসব' (১৯২১) ও 'মানসী' (১৯২২)। 'মধুপ' (১৯২৮) উপন্যাস।

সুরেশচন্দ্র নন্দী ফারসী কবিতার আলোচনায় ও অনুবাদে সবিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য দেখাইয়াছিলেন। ইঁহার গ্রন্থ—'ওমর খয়্যাম' (১৯২২) ও 'কবি শেখ সাদী' (প্র-স ১৯২৩)।

ব্যবহারজীবী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৭৯—?) 'বাসবী', 'দেবনাথ' প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক ॥

টীকা

১ সবুজপত্র বাহির করিবার আগেই ইনি নামের, "নাথ" অংশ বর্জন করিয়াছিলেন।

২ সবুজপত্রে (আষাঢ় ১৩১৭) পুনর্মুদ্রিত।

৩ সাহিত্য, আষাঢ় ১২৯৮।

৪ ঐ, আশ্বিন ১২৯৮।

৫ সাধনা, বৈশাখ ১৩০০।

৬ ভারতী কার্তিক ১৩০৫ (সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ)। লেখকের নাম ছিল না। বিলাত-প্রবাসের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কাহিনীটি প্রথমবাবুর গল্পরচনার প্রথম নিদর্শন। রচনায় রবীন্দ্রনাথের সংশোধন আছে বলিয়া আমার ধারণা। মাতুলের কাছে শোনা ঘটনাটি লইয়া অনেককাল পরে প্রিয়ম্বদা দেবী ও একটি গল্প লিখিয়াছিলেন 'বিগত-বসন্তে' (বিচিত্রা আষাঢ় ১৩৩৯)।

৭ 'কথার কথা' ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯। বৈশাখ মাসে বাহির হইল 'হালখাতা'। এই প্রবন্ধেই "বীরবল" নাম প্রথম দেখা গেল।

৮ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত 'অভিভাষণ' (সবুজপত্র ফাল্গুন ১৩৩২) সাধুভাষায় লেখা।

৯ 'বীরবল' (সবুজপত্র চৈত্র ১৩৩৩)।

১০ শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

১১ বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা' (ভারতী পৌষ ১৩১৯), 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' (ঐ চৈত্র)।

১২ প্রমথবাবু আসলে কৃষ্ণনগর অঞ্চলের চলিত ভাষাকেই Standard Colloquial বাঙ্গালার মূল এবং আদর্শ মনে করিতেন। তাঁহার এই মত ভ্রান্ত। তিনি ভারতচন্দ্রের ভক্ত পাঠক ছিলেন এবং তিনি কৃষ্ণনগরে মানুষ হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার মতটির হেতু।

১৩ চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড পৃ ১৬৭। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা চিঠিখানিও দ্রষ্টব্য। (ঐ ২৪-২৫)।

১৪ 'বসন্তসেনা' (কককক খখখখ গগ ঘঙঘঙ)।

১৫ ঘঙঘঙ ('জয়দেব', 'বন্ধুর প্রতি', 'রূপক' 'হাসি', 'উপদেশ'), ঘকঘক ('ধরণী', 'গোলাপ', 'ধুতুরার ফুল', 'একদিন'), ঙঙঙঙ ('চোরকবি', 'তাজমহল', 'ভুল'), কঘঘক ('ভাব', 'রজনীগন্ধা', 'স্বপ্ন-লঙ্কা'), কঘকঘ ('সনেট', 'বাহার'), খঘখঘ ('গজল', 'ফুলের ঘুম'), গখখগ ('রোগ-শয্যা'), কগগক ('মুস্কিল-আসান'), এবং গগগগ ('প্রতিমা')।

১৬ 'চোরকবি', 'ধরণী', 'একদিন ও 'প্রতিমা'।

১৭ 'পূরবী' ও 'মুস্কিল-আসান'।

১৮ 'প্রিয়া'।

১৯ বসন্তসেনা'।

২০ 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদককে উদ্দেশ করিয়া লেখা। কবিতাটির নাম 'পত্র'। ১৩২০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা সাহিত্যে প্রকাশিত।

২১ 'পদ-চারণ'। রচনাকাল আষাঢ় ১৩২১।

২২ চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড পৃ ২৬৩।

২৩ ঐ পৃষ্ঠা ২৪-২৫।

২৪ 'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত করকমলেষু।'

২৫ কৈফিয়ৎ।

২৬ 'সনেট চতুষ্টয়'।

২৭ 'ফসলে গুল্‌মে ময়্‌সে তৌবা?'

২৮ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৯ 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' (ভারতী আশ্বিন ১৩২০)।

৩০ "অনেকখানি ভাব মনে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না এই ধারণাটি যদি আমাদের মনে স্থান পেত তা হলে আমরা সিকি পয়সার ভাবে আত্মহারা হয়ে কলার অমূল্য আত্মসংযম হতে ভ্রষ্ট হতুম না।"

৩১ চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড পৃ ১৭০।

৩২ প্রথম প্রকাশ ভারতী (১২৮৬ সাল হইতে) 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে।

৩৩ তেরটি চিঠির মধ্যে প্রথম পাঁচটি ছাপার জন্য লেখা হয় নাই।

৩৪ মেয়েলি ভাষার ইডিয়ম যেমন, "সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ", "এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে কি বলব"; "তাকে দেখলেই আমার গা কেমন করত", "আমরা নিরুপায় লজ্জায় ও রাগে পুড়ছিলেম"; "যদি একবিন্দুও খবর জানে"; আমার আদবে ভাল লাগে না"; "তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি"; "তাঁদের মাপাজোকা ভদ্রতার পায়ে গড় করি", এখানকার বাড়িগুলো আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে"; ইত্যাদি।

৩৫ প্রথম প্রকাশ সবুজপত্রে। রবীন্দ্রনাথের প্রয়োচনাতেই গল্পগুলি লেখা (চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড পৃ ১৮০, ১৮৮, ১৯৬)।

৩৬ 'গল্প-সঙ্কলন'-এ (১৩৪৮) সঙ্কলিত।

৩৭ প্রমথবাবুর পত্নী।

৩৮ ভারতী কার্তিক ১৩১৫।

৩৯ সবুজপত্র আষাঢ় ১৩২২।

৪০ ইনি হাস্যরসের কবিতা লিখিতেন্।

৪১ ঐ ফাল্গুন ১৩২৪। 'হৈরে' > হরিয়া, পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় 'হ'রে'।

৪২ 'আমাদের দেশে যে একটা হঠাৎ-ডিমক্রাসির প্রাদুর্ভাব হয়েছে এখনো তার চালচলনে পাক ধরেনি—গদ্যসাহিত্যে তার প্রকাশটা অত্যন্ত শব্দাদামের শৈথিল্য-প্রাচুর্যের দ্বারাই নিজের পরিচয় দিচ্ছে।" (প্রমথনাথকে

লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ২৬ অক্টোবর ১৯১৩)।

৪৩ ইনি প্রথমে কিঞ্চিৎ রবীন্দ্র-অনুরাগী ছিলেন। পরে যখন কবিযশঃপ্রার্থী তখন হইতে রবীন্দ্রবিদ্বেষীদের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। এই দলে ছিলেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও বিপিনচন্দ্র পাল ছাড়া অক্ষয়কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইত্যাদি।

৪৪ প্রমথনাথের ভাষার তথা চলিত-ভাষার দোষ ধরিতে গিয়া প্রতিপক্ষেরা কতটা ছেলেমানুষি প্রলাপ বকিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নারায়ণে প্রকাশিত (পৌষ ১৩২১) বিপিনচন্দ্র পালের 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে মিলিবে। বিপিনচন্দ্র বলিয়াছেন, "ক্রিয়াটা সকলের ছোট, সর্বাপেক্ষা হেয়, আর এই কারণেই কর্তৃপদ ও কর্মপদ উভয়ের পর ক্রিয়াপদের সন্নিবেশ হইয়া থাকে। এটি আমাদের ভাষাতেই হয়।...অন্যান্য দেশের ভাষায় হয় না। ইহা আমাদের জাতীয়তার মার্কা। এটি ক্ষইয়া গেলে, মুছিয়া ফেলিলে, ভারতের ভারতত্ব, হিন্দুর হিন্দুত্ব, আমাদের সভ্যতার ও সাধনার মূলগত বৈশিষ্ট্যটুকু—নষ্ট হইয়া যাইবে।"

৪৫ লেখকের নাম ছিল না। স্ত্রীর পত্র বাহির হইয়াছিল সবুজপত্রের শ্রাবণ সংখ্যা। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও একটি সরস প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তবে তাহাতে ঝাঁঝ ছিল না। প্রবন্ধটি 'পাগলা ঝোরা'র সঙ্কলিত আছে।

৪৬ চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড ২৪০। চিঠিটি লেখা হয় ২ ফাল্গুন ১৩২৪।

৪৭ পৃষ্ঠা ১১৬-১১৭ দ্রষ্টব্য।

৪৮ ইনি একটি ছোট উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, নাম 'শাশ্বত ভিখারী', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের আট-আনা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত (১৯১৬)।

৪৯ সবুজপত্র শ্রাবণ ১৩২২।

৫০ 'সোনার কাঠি' (সবুজপত্র জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)।

৫১ তৃতীয় সংস্করণ ১৯২২। ইহার অপর রচনা উপন্যাস 'কর্মের পথে' (১৯১৭), এবং গল্পের বই 'মদন পিয়াদা ও তিনটি গল্প' (১৯১৮)।

৫২ প্রথম পরিচ্ছেদ।

৫৩ ঐ।

৫৪ "তরজার দলের কবি শ্রীবল্লভের প্রপিতামহের রচিত রাসলীলা বিষয়ক একখানি কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথি"। বলা বাহুল্য পুথিটি সদ্যঃপ্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।'

৫৫ পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

৫৬ চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড পৃ ১৯৬।

৫৭ যেমন 'মদন পিয়াদা' (কার্তিক ১৩২২)।

৫৮ যেমন 'বিজয়গীতিকা', 'বিজয়বিজলী', 'একাদশী', 'শুকদেব' (নাটক) ইত্যাদি। বইগুলি অব্দের খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাহির হইয়াছিল।

৫৯ পৌষ ১৩২১। চিত্তরঞ্জনের গ্রন্থাবলীতে গল্পটি সঙ্কলিত আছে। আসলে লেখক সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ বলিয়াই মনে করি।

৬০ যেমন 'মরণে জয়' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২২), 'আঁধার ঘরে' (আষাঢ় ১৩২২) ও 'হাসির দাম' (শ্রাবণ ১৩২৩)।

৬১ 'ভাষার কথা', আষাঢ় ১৩২২।

৬২ শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২৬।

৬৩ পৌষ ১৩২৬।

৬৪ 'দ্বীপান্তরের পথে' নামে বিজলীতে প্রথম প্রকাশিত।

৬৫ বিজলীতে আংশিক প্রকাশিত ও অসমাপ্ত।

৬৬ পৃ ৪১।

একাদশ পরিচ্ছেদ
"কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি"

১ উপক্রম

স্কুল-কলেজের শিক্ষা দিন দিন প্রসারিত হইতেছে অর্থাৎ পাশ-করা ছেলের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা বাড়তির মুখে, সেইসঙ্গে বাঙ্গালা বইয়ের পাঠকের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান, তবুও শিক্ষাপ্রাপ্তের সংখ্যা-বৃদ্ধির অনুপাতে সাহিত্য-পাঠকের বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা ও মনের উজ্জ্বলতা ঘটিতেছে না। ইহার একটা বড় কারণ বাঙ্গালীর ঘরের ব্যবস্থার ও আবহাওয়ার পরিবর্তন। ভদ্র বাঙ্গালী অধিকাংশ এখনো ছিলেন পল্লীবাসী এবং অনেকেই আপন ভূমির উৎপাদনভোগী। চাকরির খাতিরে শিক্ষাপ্রাপ্তদের শহর-নিবাসী হইতে হইতেছে বটে কিন্তু শতাব্দীর গোড়ার দশক পর্যন্ত তাহাদের মনের টান ছিল ভিটার পানে। বছরে একবার অন্তত পূজার ছুটিতে, দেশে গিয়া মানসিক শ্রান্তি বিনোদন করিয়া আসিবার সুযোগ ছিল, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে শরতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, পল্লীসমাজের নিরুদ্যম অকর্মণ্যতা এবং জমির ভাগা-ভাগির ফলে দেশে যাওয়ার আবশ্যকতা দিনে দিনে কমিয়া আসিতে লাগিল। সুতরাং যাহার কিছুমাত্র উপায় ছিল সে শহরে—মুখ্যত কলিকাতায়—বারোমাসের বাসিন্দা হইল। উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে ম্যালেরিয়ার অত্যাচার ছিল না বটে তবে সেখানেও ভদ্র বাঙ্গালীর অর্থসঙ্কট দেখা দিতে এবং কলিকাতার মহিমা দিন দিন উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। এই সব কারণে পূর্ব-উত্তর-পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষিত বাঙ্গালী যতদূর সম্ভব কাজে, নপার্যমাণে চিন্তায়, (কলিকাতা) নগরবাসী হইয়া পড়িতে লাগিল। কলকারখানার প্রসারের ফলে অশিক্ষিত শ্রমোপজীবী বাঙ্গালীও পারিলে নগরোপকণ্ঠবাসী হইতে লাগিল। এ পরিবর্তন কালগত এবং অবশ্যম্ভাবী।

পল্লীজীবনে ছেদ পড়ার আগেই একান্নবর্তিতা ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। ভদ্র বাঙ্গালীর সংসার-স্থিতি একান্নবর্তিতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একান্নবর্তিতায় ফাটল ধরিল অথচ সমস্ত সামাজিক কাজই আগেকার মতো যথাসম্ভব বিরাট আয়োজনে ফাঁদা হইতে লাগিল,

যতদিন পারা যায়। এই কারণে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থার অবনতি দ্রুততর ঘটিতে লাগিল। বারো-চৌদ্দ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া দুরূহ হইতে লাগিল। অগত্যা মেয়েদেরও স্কুলে পাঠাইতে হইল। ইস্কুল-কলেজে পড়া মেয়েদের পক্ষে আর আগেকার একান্নবর্তিচালে আত্মীয়-পরিজন লইয়া চলা সম্ভব হইল না। সুতরাং ঘরের আয়তন ও আবহাওয়াও বদলাইতে লাগিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট অর্থ উপার্জনের একমাত্র অবাধ ক্ষেত্র ছিল হাইকোর্টে অথবা জেলা কোর্টে ওকালতি। এখন দিনদিন বি-এল্ পাস-করা গ্র্যাজুয়েটের ভিড়ে সে ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইতে লাগিল। চাকরির ক্ষেত্র তো আরও সঙ্কীর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশের বাহিরে গিয়া জীবিকা-অর্জন করিবার দিকে খানিকটা ঝোঁক দেখাইয়াছিল এবং তাহাদের সে চেষ্টার ফলে অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালীর বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। এখন স্বদেশি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পাণ্ডা বাঙ্গালীকে বাঙ্গালাদেশের বাহিরে খাতির জমাইতে দিতে বিদেশি শাসকের বিশেষ অনিচ্ছা। এমন কি বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে খাস বাঙ্গালারও খানিকটা টুকরা বাহির করিয়া লইয়া বাঙ্গালা দেশকেই ছোট করিয়া ফেলা হইল। বাঙ্গালীর ঘরের হাতায় যেন প্রাচীর উঠিল। বিহার উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হওয়ায় বাঙ্গালীর পক্ষে সরকারী চাকরির ক্ষেত্র আরো সঙ্কুচিত হইল। অথচ এখনো উচ্চ শিক্ষা এমন ধাতস্থ হয় নাই যে আপিসে চাকরি ও কোর্টে ওকালতি ছাড়া আর কোন জীবিকায় তাহার মন বসিতে পারে। শিক্ষকতার কথা তুলিলাম না, কেননা কলেজের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয় আর সাধারণ স্কুলে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকের বেতনের হার ছিল মাসিক তিরিশ হইতে ষাট টাকা।

মিণ্টো-মর্লি রিফর্মের দৌলতে (১৯১০) শাসন ও বিচার বিভাগীয় উচ্চতম চাকরিতে নিতান্ত দুই-চার জন যোগ্য উচ্চশিক্ষিতেরই স্থান হইতে লাগিল। ওকালতি ও শিক্ষকতার দিকে আকর্ষণ না থাকায় এই দুই ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব দেখা দিল। বাঙ্গালীর জেদ যখন জয়ী হইল, বঙ্গভঙ্গ রদ হইল, শাসন-কর্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন ইহাতে বাঙ্গালী শান্ত হইবে। তাহা হইল না, পূর্ব-পশ্চিম বঙ্গের পুনর্মিলন বিপ্লবপ্রচেষ্টার অবসান ঘটাইতে পারিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সে প্রচেষ্টার বাহিরে চাপা আগুন নিভিল না, ধূম ছাড়িতে লাগিল। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মের (১৯১৯) সান্ত্বনা কার্যকর হইল না। গান্ধীজি নন্-কোঅপারেশনের শঙ্খধ্বনি করিলেন, দেশের সর্বত্র হইতে সাড়া জাগিল। প্রমাণ হইয়া গেল যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় দেশের মধ্যে দ্বিমত নাই। নন-কোঅপারেশনের ফল ভালো-মন্দ দুই রকমই ফলিল। ভালো ফল—জনশক্তির সংহত রূপের ক্ষণিক হইলেও অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া গেল, আর মন্দ ফল—ইস্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মনে অ-বিনয়ের, বিধি-উল্লঙ্ঘনের মনোবীজ উপ্ত হইল আর দেশের অন্তস্তলে যে গঠনক্রিয়া অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে চলিতেছিল তাহাতে ব্যাঘাত হইল। (এখনকার দিনের অনেক দুর্গতি অ-বিনয়ের মাহাত্ম্যেই রূঢ়মূল হইয়াছে।)

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির আলোচনায় উপরের কথাগুলি স্মরণীয়॥

২

ভারতীর দলের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া নবীন সাহিত্যিকেরা "বাস্তব"-প্রবণ হইলেন। অর্থাৎ কল্পনার ঘোড়দৌড় ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা সন্নিকট পারিপার্শ্বিকের দিকে তাঁহাদের কৌতূহলী-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মোগলাই ভারতবর্ষ ও বঙ্কিমী বাঙ্গালা এবং গার্হস্থ্য কলিকাতা ছাড়িয়া সমাজের দরিদ্র কুৎসিত অবজ্ঞাত ও ছায়াচ্ছন্ন বসতির দিকে কিছু নজর দিলেন। এ দৃষ্টি ঘোলাটে তবুও আগেকার দরিদ্র-নারায়ণী, সমাজ-সংস্কারী বা ভলাণ্টিয়ারী নজর নয়। ইহার মধ্যে ছিল কিছু সমবেদনা, কিছু জিজ্ঞাসা, খানিকটা রোমাণ্টিক কল্পনাবিলাস, এবং সর্বোপরি "হঠাৎ ডিমক্র্যাসির" প্রেরণা। কণ্টিনেণ্টাল উপন্যাসের প্রভাবে এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের আর্থিক দুর্গতির চাপে রোমাণ্টিক কল্পনাবিলাস প্রবলতর হইয়া তরুণ লেখকদের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন "বস্তি"-বিলাস ফেশান হইয়া দাঁড়াইল। এ বিলাস-মোহ অবশ্য বেশিদিন টিকিল না। অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধি এবং শক্তিস্ফুবর্ণের সঙ্গে সঙ্গে এই ঝোঁক কমিয়া গেল।

এই "বাস্তব" বিলাসিতার বা "বাস্তব" দৃষ্টির প্রথম উন্মোচন ভারতীর আসরে।[১] এবং লালন খানিকটা নারায়ণের পৃষ্ঠায়।[২] স্পষ্ট যৌন-আবেগমূলক রোচক সাহিত্যের গুরু হইলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪)। ইনি আইন-অধ্যাপনা সূত্রে ঢাকায় গিয়া ধীরে ধীরে যে সাহিত্যিক মণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করিলেন তাঁহারাই গল্পে-উপন্যাসে-কবিতায় এই "বাস্তব" বা "আধুনিক" ভঙ্গিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন। ভারতীর আসর ভাঙ্গিয়া আসিলে, দলভাঙ্গা কয়েকজন তরুণ-অতরুণ লেখক ঢাকা গ্রুপের সহযোগিতায় কলিকাতায় 'কল্লোল' পত্রিকা বাহির করিলেন (১৯২৩)। কল্লোলের বীজ বপন হইয়াছিল ঢাকায়,—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের বার্ষিক পত্রিকা 'বাসন্তিকা'য় (১৯২২)। স্বভাবতই বিদ্যালয় ও ছাত্রনিবাসের আওতায় এ বীজ সতেজে প্ররূঢ়ই হইতে পারে নাই। কল্লোলের প্রবাহ কিছুদূর গড়াইলে পর ইহার একটি কচি শাখা বাহির হইয়াছিল ঢাকায়—'প্রগতি' (১৯২৭)। কলিকাতায় আগেই গজাইয়াছিল—'কালি-কলম' (১৯২৬)। তখন সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক শরৎচন্দ্রের গল্পে মশগুল ও কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় ভোর। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির পোষকেরা রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে জাত ও পুষ্ট হইলেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমগ্র মহিমা ইঁহাদের গোচর অথবা উপলব্ধ হয় নাই। তাহার একটা প্রধান কারণ, রবীন্দ্র-ঐতিহ্য যে প্রাচীনতর ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নাই সে বোধ তাঁহাদের ছিল না। আর একটা কারণ, নব নব সৃষ্টির অভিমুখে রবীন্দ্র-সাহিত্যের গতিশীলতা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। তা ছাড়া আধুনিক বিদেশি সাহিত্যের দ্বারা ইঁহারা অনেকটাই অভিভূত ছিলেন এবং সেই প্রভাবের ফলে ইঁহারা যেন এক হাতে শাস্ত্র আর এক হাতে শস্ত্র লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। অর্থাৎ রচনা করিতে লাগিলেন এবং সেই রচনার প্রচারও জোর গলায় করিতে থাকিলেন। সৃষ্টি ও প্রচার দুই কাজ সমান জোর দিয়া করিতে গিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ইঁহাদের রচনায় ও প্রচারে উগ্রতা ও আতিশয্য দেখা দিল। ইঁহারা প্রবল বাধা বলিয়া মনে করিলেন প্রথমেই উপেক্ষিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রচনামুগ্ধ বাঙ্গালী পাঠককে। ইঁহাদের আত্মশক্তিতে অগাধ আস্থা। ইঁহাদের দৃঢ় ধারণা—যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘকাল কলম চালাইয়া সিদ্ধিলাভ

করিয়াছেন সেই হেতু তাঁহারাও বেশিদিন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার অতিরিক্ত সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। ইহার প্রমাণ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা 'আবিষ্কার'[৩]—অর্থাৎ আত্মাবিষ্কার।

এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহঙ্কার,
যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
কারেও ডরিনা কভু ;...
পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে' পথ রুধি' রবীন্দ্র ঠাকুর,—
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর।

... ...

গভীর আত্মোপলব্ধি এ আমার দুর্দান্ত সাহস

... ...

ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি—নবীন প্রেরণা !
আপনারে তাই নমস্কার।
চক্ষে থাক আয়ু ঊর্মি, হস্তে থাক্ অক্ষয় লেখনী !

স্পষ্ট রবীন্দ্র-বিদ্বেষ না থাকিলেও রবীন্দ্র-বিমুখতা ছিল অনেকেরই। ঢাকাই (বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্য) সমাজ রবীন্দ্রনাথের স্থানে গদ্যে বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্র কাব্যে মাইকেল ও নজরুলকে বসাইয়াছিল, এ কথা স্মরণীয়।

"তরুণ" সাহিত্যিকদের বিশিষ্ট মনোভাবের মধ্যে খানিকটা ছিল রবীন্দ্র-বিমুখতা এবং অনেকটা ছিল শরৎ-প্রীতি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ইঁহাদের সকলের পড়া ছিল বলিয়া মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ইঁহারা রস পান নাই। ইঁহাদের পড়া ছিল সমসাময়িক গদ্য কথিকাগুলি, যেগুলি 'লিপিকা' নামে গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এ কথিকাগুলির সদ্ব্যবহার তরুণ সাহিত্যিকদের অনেকেই করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রথম রচনাগুলির মধ্যে তাহার সাক্ষ্য মিলিবে।

ইঁহাদের শরৎ-প্রীতি যথার্থই আন্তরিক। বঙ্কিমচন্দ্র সেকেলে, রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক। দুইয়ের মধুর মিক্‌শ্চার শরৎচন্দ্র, অল্পবয়সীর অন্তরঙ্গ লেখক। প্রবীণ ও নবীন দুই দলের লেখকের শরৎপ্রশস্তি উদ্ধৃত করিতেছি।[৪]

"মণিবজ্র ভারতী" ছদ্মনামে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন

> "আধুনিক সাহিত্যের কল্যাণে" আজ আমাদের অনেক জিনিষ সম্ভবপর হয়েছে। নারী আজ তার সতীত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। এখন আমাদের মধ্যে মনে এই কথা জাগ্রত হয়েছে যে, নারীত্ব বড় না সতীত্ব বড় ?
>
> শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যে এর নির্ভীক উত্তর পেয়ে পাঠকের মন সভয় বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

জগদীশ গুপ্ত লিখিয়াছিলেন

> এমন করিয়া আগে ত' অপ্রকাশকে কেহ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয় নাই।—কথা ছিল, শিল্প ছিল,

ছিল না দরদ। অপরের মনের কথাটি বুনিয়া বুনিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া বাছিয়া বাছিয়া হয়তো বলা হইয়াছিল ; কিন্তু সে শুধু অনুভূতির বহিরঙ্গ স্পর্শ করিত। ... জীবানন্দ, ষোড়শী, অভয়া, অচলা, বামুনের মেয়েটি, আর কিরণময়ী—ইহারা আছে বলিয়াই জানিতাম। —এ ছাড়া আরো আছে। এবং সাহিত্যে তাহারা দেখা দিবেনও।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই বেনামি উক্তিটুকুও প্রণিধানযোগ্য।

আধুনিক সাহিত্যে যদি এই কথা বলে যে প্রেমকে বর্জন করিলে জীবনটা নোংরা হয়ে যায় তো সে তো খুব বড় সত্যই বলছে। এই বলতে গিয়ে যদি নোংরা ছবি ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন হয়ে থাকে তো সেটা সেই নিত্য-চিরন্তনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই।

মানুষের জীবনে খাওয়া-শোওয়ার মত ব্যবহারিক ব্যাপারের মধ্যে আধুনিক সাহিত্য যদি রস অন্বেষণ ক'রে থাকে তো বুঝবো যে আমাদের সত্যের ক্ষুধা জেগেছে—আমরা আর শিব-সুন্দরকে কল্পনার বাসর ঘরে বসিয়ে রেখে অলীকের গান শুনিয়ে তৃপ্ত থাক্‌তে পারছি নে।

"তরুণ" সাহিত্যিকদের এই যে দৃষ্টি-আবিলতা তাহা বয়সের বৃদ্ধিতে ও অভিজ্ঞতার গভীরতায় নিঃশব্দে কাটিয়া যাইত যদি বিরুদ্ধবাদী একটি বিশেষ লেখকগোষ্ঠী[৬] তাঁহাদের পত্রিকায় ইঁহাদের রচনার টুকরা সাধারণ পাঠকের রুচিকর চানাচুর করিয়া মাসে মাসে পরিবেশন না করিত। আসল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া 'শনিবারের চিঠি'র মতো কাগজ প্রকারান্তরে এই রোচক "বাস্তব" সাহিত্যেরই বাজার-দর বাড়াইয়া দিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের কিন্তু এখনও রেহাই নাই। সবুজপত্রের তাড়নায় বিপিনচন্দ্র পাল অনেকদিন ক্ষান্ত এবং রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালার বাহিরে গিয়া নিরস্ত। এখন বিরোধ করিতে আসিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। তাঁহার পিছনে রহিল তাঁহার ঢাকার দল,—অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার ও অধ্যাপক "তরুণ" আধুনিক সাহিত্যিকেরা। ইহারা প্রবলভাবে ঘোষণা করিতে লাগিলেন, রবীন্দ্রনাথের যুগ অতীত হইয়াছে, এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রাচীনের নঙ্গর-ছেঁড়া নবীন, "অতি আধুনিক" যুগ। এ যুগের নেতা গল্পে-উপন্যাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কবিতায় নজরুল ইসলাম (ও মোহিতলাল মজুমদার[৭])।

অতি-আধুনিক লেখকদের প্রতিপক্ষেরাও মুখর হইলেন প্রতিবাদে। তাঁহাদের মতে "অতি-আধুনিক" সাহিত্য অশ্লীল, অপাঠ্য, কুৎসিত রচনা—যাহার উৎপত্তি লেখকদের মানসিক অসুস্থতায় এবং যাহার প্রেরণা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ববোধ ও যৌনজিজ্ঞাসা হইতে। যাঁহারা ধীরমতি মধ্যস্থ তাঁহারা স্বীকার করিলেন যে "অতি-আধুনিক" লেখকদের কেহ কেহ শক্তিমান বটেন, তবে তাঁহাদের রচনার ভাব প্রায়ই বিদেশের ধার করা এবং তাঁহারা যে সমস্যার উপস্থাপন করিতে চাহেন সে সমস্যা আমাদের দেশে সামাজিক অথবা পারিবারিক পরিবেশে ভয়াবহ আকার ধারণ করে নাই।

আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, ইউরোপেরই মনের প্রাণের একটা বিপর্যয়ের ফলে, ইউরোপের চেতনার ধারার সহিত তাহার রহিয়াছে জীবন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের চেতনায় যে সকল জিজ্ঞাসা সজীব সার্থক হইয়া দেখা দেয় নাই—এখনও তাহারা অনেকখানি আমাদের খোসখেয়ালের কথা, জীবনের প্রয়োজন হইতে বা অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি হইতে

তাহারা উঠিয়া দাঁড়ায় নাই। তাই দেখি আমাদের মধ্যে অধিকাংশের হাতে আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে, একটা ঢঙে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে।

তবুও স্বীকার করিব, আজ যাঁহারা বঙ্গবাণীর জন্য নৈবেদ্য আহরণ করিতে গিয়া পাতাল রসাতল ঢুঁড়িতেছেন, সাহিত্য সাধক যাঁহারা সত্যসত্যই হাতে হাতিয়ারে "লজ্জা ঘৃণা ভয়" এই তিনটিকে বিসর্জন দিয়া বসিয়াছেন, এই যে সব অবধূতমার্গ অঘোরপন্থী তাঁহাদের সকলেই স্রষ্টা হিসাবে যে অক্ষম অপটু তাহা নয়। একাধিকে হয়ত শিল্প-রচনার দিক দিয়াই দেখাইয়াছেন বিশেষ ক্ষমতা ও নৈপুণ্য—বাংলা সাহিত্য, ভাষা ও ভাব উভয় হিসাবে তাঁহাদের হাতে পাইয়াছে একটা বিশেষ পুষ্টি ও ঋদ্ধি; তবে কথা এই, এই শিল্প হইতেছে মুখ্যতঃ পশু-পিশাচের, প্রেম-প্রমথের, জিন-দানার (—কথাগুলি সদর্থেই আমি গ্রহণ করিয়াছি, গালাগালি হিসাবে ব্যবহার করা আমার অভিপ্রায় নয়। —) শিল্প; দেবতার শিল্প মানুষের শিল্প যাহা, তাহা অন্য ধরণের বস্তু।[৮]

রবীন্দ্রনাথ সর্বথা ও সর্বদা জীবনের তথা সাহিত্যের উদারতম ভাবক। অতি আধুনিকদের মধ্যে যাঁহাদের রচনায় ক্ষমতার কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হন নাই। কিন্তু "অতি আধুনিক" সাহিত্যের নামে যে 'কাদাখেড়ু' চলিতেছিল তাহা রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে তাঁহার কিছু করিবার ছিল না। তাঁহার প্রতি "অতি-আধুনিক"দের অপ্রসন্নতা একরকম স্বতঃসিদ্ধ ছিল। তবুও তাঁহাদের তাঁহারই দ্বারস্থ হইতে হইল। "অতি-আধুনিক" সাহিত্যের অনুরাগী অথচ রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন দুই-চারজন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে ধরিয়া বসিলেন অতি-আধুনিক ও অনতি-আধুনিক সাহিত্যের বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ মধ্যস্থতা করিতে রাজি হইলেন। তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিচিত্রা সদনে সভা দুই দিন ডাকা হইল, চৌঠা ও সাতই চৈত্র ১৩৩৪। প্রথম দিনে শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, দ্বিতীয় দিনে আলোচনা। আলোচনায় কোন সিদ্ধান্তে আসা গেল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে যে পরিষ্কার ইস্যু ধার্য করিয়া দিলেন[৯] দলাদলির পাণ্ডাদের তাহা স্বভাবতই মনঃপূত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, সাহিত্যশিল্পের বিচারে রূপসৃষ্টিই একমাত্র লক্ষ্য। ভাব ও ভাষা ভেজাল ধারকরা অথবা চোরাই মাল হইলেও খুব ক্ষতি নাই, যদি তাহার দ্বারা কোন নূতন রূপের প্রকাশ হয়। মাইকেল ও বঙ্কিম বিদেশি সাহিত্য হইতে মালমশলা ও প্যাটার্ন লইয়া আমাদের সাহিত্যে নূতন রূপের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা দেশের পাঠকদের পরমানন্দ দিয়াছিলেন, "তারা বললে না যে, এটা বিদেশী, এই রূপকে তারা স্বীকার করে নিলে"। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিলেন, "নবযুগের কোনো সাহিত্যনায়ক যদি এসে থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করব সাহিত্যে তিনি কোন্ নবরূপের অবতারণা করেছেন"।[১০] তাহার পর রবীন্দ্রনাথ "আধুনিক" সাহিত্যের আধুনিকত্ব বিশ্লেষণ করিলেন।

সাহিত্যের যুগ বল্তে কি বোঝায় সেটা বোঝাপড়া কর্‌বার সময় হয়েচে। কয়লার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে? এই রকমের কোনো একটি ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায় একথা মানতে পারব না। সাহিত্যের মতো দলছাড়া জিনিষ আর কিছু নেই। বিশেষ একটা চাপরাস-পরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। কোনো-একটা চাপরাসের জোরে যে সাহিত্য আপনার বিশিষ্টতার গৌরব খুব চড়া গলায় প্রমাণ করতে দাঁড়ায় জান্‌ব তার গোড়ায় একটা দুর্বলতা আছে। তার

ভিতরকার দৈন্য আছে বলেই চাপরাসের দেমাক বেশি হয়। য়ুরোপের কোনো কোনো লেখক শ্রমজীবীদের দুঃখের কথা লিখেচে, কিন্তু সেটা যে-ব্যক্তি লিখেচে সেই লিখেচে। দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন নীলদর্পণ নাটক, দীনবন্ধু মিত্রই তার সৃষ্টিকর্তা। ওর মধ্যে যুগের তক্‌মাটাই সাহিত্যের লক্ষণ বানিয়ে বসে নি ; আজকের দিনে বারো আনা লোক যদি চরকা নিয়েই কাব্য ও গল্প লিখতে বসে তাহ'লেও যুগসাহিত্যের সৃষ্টি হবে না—কেন না তার পনেরো আনাই হ'বে অসাহিত্য। খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন, তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে বলেই করেন, সেটা সৃষ্টি করবার তাগিদ—সেটা ভিন্ন লোকের ভিন্ন রকম। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খনিক আপনিই এসে পড়ল তো ভালোই। কিন্তু সেই এসে পড়াটা যেন যুগধর্মের একটা কায়দার অন্তর্গত না হয়। কোনো-একটা উদ্ভট রকমের ভাষা বা রচনায় ভঙ্গী বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি একথা বল্‌বার চেষ্টা হয় যে, যে-হেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয় নি সেইজন্যেই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হোলো সেও অসঙ্গত। পাগলামীর মতো অপূর্ব আর কিছু নেই—কিন্তু তাকেও ওরিজিন্যালিটি বলে গ্রহণ করিতে পারিনে।

সাহিত্যে নূতন যুগের আবির্ভাব-ঘোষণাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন

আমাদের দেশের লেখকদের একটা বিপদ আছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের একটা বিশেষ মেজাজ যখন আমাদের কাছে প্রকাশ পায় তখন আমরা অত্যন্ত বেশি অভিভূত হই। কোনো সাহিত্যই একেবারে স্তব্ধ নয়। তার চল্‌তিধারা বেয়ে অনেক পণ্য ভেসে আসে ; আজকের হাটে যা-নিয়ে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায় কালই তা আবর্জনা-কুণ্ডে স্থান পায়। অথচ আমরা তাকে স্থাবর ব'লে গণ্য করি ও তাকে চরম মূল্য দিয়ে সেটাকে কাল্‌চারের লক্ষণ বলে মানি। চল্‌তি স্রোতে যা-কিছু সব শেষে আসে তারই যে সব-চেয়ে বেশি গৌরব, তার দ্বারাই যে পূর্ববর্তী আদর্শ বাতিল হ'য়ে যায় এবং ভাবী কালের সমস্ত আদর্শ ধ্রুবরূপ পায় এমনতরো মনে করা চলে না। সকল দেশের সাহিত্যেই জীবনধর্ম আছে, এইজন্যে মাঝে মাঝে সে-সাহিত্যে অবসাদ ক্লান্তি রোগমূর্চ্ছা আক্ষেপ দেখা যায়। কিন্তু দূর থেকে আমরা তার রোগকেও স্বাস্থ্যের দরে স্বীকার করে নিই। মনে করি তার প্রকৃতিস্থ অবস্থার চেয়েও এই লক্ষণগুলো বলবান্ ও স্থায়ী যেহেতু এটা আধুনিক।

এই তো গেল সাহিত্যের রূপ। সাহিত্যের ধর্ম লইয়া রবীন্দ্রনাথ আর একটি প্রবন্ধ লিখিলেন।[১১] তাহার প্রতিবাদ করিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'সাহিত্যধর্মে সীমানা' বিচার করিয়া।[১২] নরেশচন্দ্রের মতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সাহিত্যধর্মের সীমানা লঙ্ঘনের অপরাধী।

শরীর-ব্যাপার মাত্রই তো অপাংক্তেয় নয়, কেননা চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল সাহিত্য-সম্রাট। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে। তা'ছাড়া "হৃদয়-যমুনা", "স্তন", "বিজয়িনী", "চিত্রাঙ্গদা" প্রভৃতি বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব রস উদ্বোধন করিয়াছেন। সুতরাং এখানেও একটা সীমারেখা আছে, যাহা অতিক্রম করিলেই সাহিত্য বে-আব্রু পদবাচ্য হইতে পারে। সে সীমানা কবি কোথায় টানিয়াছেন, তার বাহিরে কোন্ বই, ভিতরেই বা কোন্ বই,—তাহা নির্ণয় করিবার কোনও নির্দেশই কবি দেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী নরেশচন্দ্রের প্রবন্ধের জবাব দিলেন।[১৩] নরেশচন্দ্র লিখিলেন তাঁহার

কৈফিয়ৎ।[১৪]

এই বাদ-প্রতিবাদে অতি-আধুনিকেরা সুবিধা করিতে না পারিলেও নিজেদের কোট ধরিয়া রহিলেন। অবশেষে যখন 'শেষের কবিতা' বাহির হইল[১৫] তাঁহারা তখন নিজেদের ত্রিশঙ্কু অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। জানিলেন যে-টেকনিক "অতি-আধুনিক"দের কাম্য অথচ নাগালের বাহিরে তাহাতে কেমন অনায়াসে সাহিত্যে নূতন রূপের সৃষ্টি হইতে পারে। কথায় ও লেখায় যে কথা স্পষ্টভাবে বলা অসম্ভব ছিল সে কথাও রবীন্দ্রনাথ সহজে বুঝাইয়া দিলেন,—যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে দেউলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়া দিয়া নিজেদের নূতন কারবারী বানাইতে চাহেন তাঁহাদের মূলধন তো তাঁহার কাছেই ধার করা। রবীন্দ্রনাথই নিবারণ চক্রবর্তী, যিনি পদে পদে নিজের শিল্পের গুটি কাটিয়া বাহির হইয়া নিজে নূতনতর শিল্প সৃজন করিয়া চলিয়াছেন।

> মিতা কি ক'রে জানবে তুমি কী বলো, আর সে বলার কী অর্থ! আবার দেখচি নিবারণ চক্রবর্তীকে ডাক্‌তে হ'ল। ওর নাম শুনে শুনে তুমি বিরক্ত হয়ে গেছ। কিন্তু কী করব বলো, ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভাণ্ডারী। নিবারণ এখনো নিজের কাছে নিজে পুরানো হ'য়ে যায় নি,—ও প্রত্যেক বারেই যে-কবিতা লেখে সে ওর প্রথম কবিতা।

অতি-আধুনিকেরা নর-নারীর "বিবাহের চেয়ে বড়" সম্বন্ধ লইয়া বড়াই করিতেছিলেন। সে সম্বন্ধের সাহিত্যে প্রতিফলিত রসরূপটি কি রবীন্দ্রনাথ তাহার একটু পরিচয় ঘরে-বাইরেতে দিয়াছিলেন, আর একটু পরিচয় এই শেষের-কবিতায় দিলেন। এ বিষয়ে তাঁহারই উক্তি স্মরণীয়।

> পরকীয়া সাধনের তত্ত্বটা মিথ্যা নয়, তার মানেই হচ্চে পরকীয়া আমার বাধ্য নয় ব'লেই আমার পরে তার শক্তি এত প্রবল, তার প্রেমের এত মূল্য। এইজন্য বিবাহ যখন বর্বর যুগের স্থূল শাসনের থেকে মুক্তি পাবে তখন সকল বিবাহেই পরকীয়া সাধন প্রচলিত হবে, তখন স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য আছে বলেই তার মূল্য পুরুষের কাছে বেশী হবে। বিবাহে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে পরকীয়া সাধনার যুগ এসেছে ব'লেই আশা করি। যদি এসে থাকে তবে মূঢ়তা ক'রে আমরা যেন সেই সাধনার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই।[১৬]

তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির অস্বীকৃতি যে তাহাদেরই দ্বারা যাহারা সেই সাহিত্যেরই অধমর্ণ, ইহা রবীন্দ্রনাথের মনে লাগিয়াছিল। শেষের-কবিতা লিখিয়াও তাঁহার ক্ষোভ মিটিয়া যায় নাই, 'বাঁশরী'তে (১৯৩৩) কঠিনভাবে ব্যক্ত হইল। তবে অতি-আধুনিকদের সম্বন্ধে আশা তিনি একেবারে ছাড়েন নাই। ক্ষিতীশের সম্বন্ধে বাঁশরী লীলাকে বলিতেছে

> অবিচার করিস্‌নে। ওর লেখার শক্তি আছে। ও আমাদের ময়মনসিংহের বাগানের আম, জাত ভালো কিন্তু যতই চেষ্টা করা গেল ভিতরে ভিতরে পোকা হোতেই আছে। ঐ পোকা বাদ দিয়ে কাজে লাগানো হয়তো চলবে।

শেষের-কবিতার ইঙ্গিত ব্যর্থ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছরের জয়ন্তী-উৎসবে (১৩৩৮ সাল) অতি-আধুনিকেরা পিছাইয়া থাকেন নাই।

'শেষের-কবিতা'র পর গদ্য-কবিতা। তাহা দেখিয়া "নূতন" কবিতার নবীন কবিরা চমকিত হইয়া গেলেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের মানিয়া লইতে হইল—মনে মনে না-হোক মুখে। প্রগতিবাদ ছাড়িয়া দিয়া ইঁহারা এখন নিজেদের নিজেদের ঘাঁটি আগলাইয়া

গোষ্ঠী-গঠনে ও আত্ম-প্রচারে মন দিলেন। ইঁহাদের সাহিত্যচর্চা একটু মোড় ফিরিল ॥

৩ শনিবারের চিঠি ও গোষ্ঠী

স্বল্পজ্ঞাত ও স্বল্পপ্রচারিত "অতি-আধুনিক" সাহিত্যকে তুচ্ছ করিতে ও ভ্যাংচাইতে গিয়া শনিবারের-চিঠির দল প্রকারান্তরে সেইগুলিকেই পরিজ্ঞাত ও পরিচিত করিয়া দিয়া তাহার দর বাড়াইয়া দিয়াছিল, সে-কথা বলিয়াছি। আসলে কয়েকটি বিশিষ্ট সাহিত্যিককে লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ কৌতুকরসের যোগান দিবার জন্যই শনিবারের-চিঠি বাহির হইয়াছিল। এই উদ্যোগের মূলে ছিলেন প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র সদ্য কেমব্রিজ প্রত্যাগত (১৯২২) অশোক চট্টোপাধ্যায় ও ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের পুত্র যোগানন্দ দাস আর পিছনে ছিলেন তাঁহার বন্ধুগণ ও সজনীকান্ত দাস। এই দলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও সাহিত্যিকও দুই-একজন ছিলেন। প্রবাসী আফিস ইহার জন্মভূমি। শনিবারের-চিঠির ব্যঙ্গবাণের প্রথমে প্রধান লক্ষ্য ছিলেন তিনজন—কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার এবং হেমেন্দ্রকুমার রায়। শনিবারের-চিঠির ব্যঙ্গ কবিতায় ইঁহাদের বিকৃত নাম ছিল যথাক্রমে "গাজী আব্বাস বিটকেল", "মধুকরকুমার কাঞ্জিলাল" এবং "ক্ষীণেন্দ্র খেয়াল গায়"। ব্যঙ্গ-কৌতুকের লক্ষ্য ব্যক্তিবিশেষ হইলে মাত্রা ঠিক রাখা দায় হয়। শনিবারের-চিঠিও মাত্রা ঠিক রাখিতে পারে নাই। লক্ষ্য ব্যক্তি সুপরিচিত না হইলে পাঠক জমায়েত হয় না। সুতরাং সাপ্তাহিক রূপে পত্রিকাটির প্রকাশ শীঘ্রই বন্ধ হয়। কিছুদিন বন্ধ থাকিবার পর পত্রিকাটি যখন মাসিক রূপ ধারণ করিল তখন শিকারের ক্ষেত্র বাড়িয়া গিয়াছে। তখন সহজ ও সুলভ লক্ষ্য হইল অতি "আধুনিক সাহিত্য" ও "আধুনিক সাহিত্যিক"।[১৭] বাছা বাছা অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিবার ফলে অ-বিবেচক (প্রধানত অল্পশিক্ষিত) পাঠক "আধুনিক সাহিত্য"-এর মজাদারত্বের পরিচয় পাইল (এবং শনিবারের-চিঠির প্রচারও বাড়িল।) ফল কিন্তু উলটা ফলিল দুই-একজন ছাড়া ব্যঙ্গবিদ্ধ সাহিত্যিকেরা টলিলেন না, উপরন্তু আধুনিক সাহিত্য সাধারণ পাঠকদের বিজ্ঞাপিত হইয়া গেল। প্রবীণ সাহিত্যিকেরাও সকলে রেহাই পাইলেন না। এমন কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাদ যান নাই। রবীন্দ্রনাথের আচরণ, তাঁহার রচনা, তাঁহার ছবি—কোন কিছুই শনিবারের-চিঠির অশিষ্ট, কুটিল কটাক্ষের লক্ষ্য এড়ায় নাই। প্রথমেই যাঁহারা ব্যঙ্গবিদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহাদের একজন, মোহিতলাল মজুমদার, নিজেই অল্পকাল পরে শিকারীর দলে ভিড়িয়া গেলেন এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া রবীন্দ্র-বিদ্বেষবিষ ছড়াইতে লাগিলেন।

তবে শনিবারের-চিঠিতে সৃষ্টির কাজও অল্প-স্বল্প হইয়াছিল। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল সজনীকান্ত দাস, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী এবং বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকের সরল গদ্য রচনা, ব্যঙ্গ-কবিতা ও প্যারডি। গম্ভীর প্রবন্ধ এবং সাধারণ গল্প-উপন্যাসও এমন কিছু কিছু বাহির হইয়াছিল যাহাতে শনিবারের-চিঠির কালিমাস্পর্শ নাই।

কল্লোল-কালিকলমের কর্তৃপক্ষ দল বাঁধিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করেন নাই। কিন্তু "প্রগতি"র পরিচালকেরা গোড়া হইতেই ভূমিকা লইয়াছিলেন

যুগপৎ ফরিয়াদীর এবং উকীলের, বরের এবং বরযাত্রী ঢাকীর। এ ব্যাপার আমাদের দেশে আগে কখনো ঘটে নাই। প্রমথ চৌধুরীও কখনও তাহা করেন নাই। নিজেদের সাহিত্যমতের ও সাহিত্যসৃষ্টির দালালগিরি রীতিমতভাবে এই-ই প্রথম। ইহার ফলও মিলিয়াছিল। "অতি-আধুনিক" সাহিত্যিকদের মধ্যে কেহ কেহ প্রধানত প্রোপাগ্যাণ্ডার জোরেই মাথা তুলিয়াছিলেন।

দৈবাৎ এক-আধজন, অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে, শনিবারের-চিঠির সাহিত্যিক গুণ্ডামির কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।[১৮] এইরকম এক জন প্রতিবাদকারীর[১৯] পত্র ছাপাইয়া শনিবারের-চিঠির সম্পাদক যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহার উপযুক্ত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

> ...যে ব্যাধি এক্ষণে দেখা দিয়াছে তার জন্য খাঁটি দেশী দাওয়াই দরকার। ইংরাজী শিখিয়া যে নীতিজ্ঞান ও রুচিবিলাস আমাদের হইয়াছে তাহার খাঁটি দেশী রুচি ও নীতিজ্ঞানের represence-এর ফলে তরুণেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে—সাহিত্যে তাহারই reaction দেখা দিয়াছে। তরুণ সাহিত্যে যে অশ্লীলতার বান ডাকিয়াছে, তাহা য়ুরোপের আমদানী নয়—আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের realism বা বিদ্রোহনীতির দোহাই দিয়া, সেই ইংরাজী রুচিবিলাসীর বংশধরেরাই প্রাণ ভরিয়া রুচির আদ্য শ্রাদ্ধ করিতেছে, অশ্লীলতাকেই ঠাকুর ঘরে বসাইয়া পূজা করিতেছে। আমাদের দেশে পাষণ্ড পীড়নের জন্য চিরদিন যে গালির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ইংরাজী রুচিবাগীশদের মতে অশ্লীল বটে, কিন্তু কার্যসাধনের পক্ষে তাহাই আবশ্যক। গালাগালির অশ্লীলতায় আমাদের চরিত্র কখনও কলুষিত হয় নাই ; অতিশয় সাধু ব্যক্তিও দুর্নীতিকে যে ভাষায় গালি দেন, তাহা ইংরাজী রুচিসম্মত নয়। আজ যে আমরা ইহা সহ্য করিতে পারি না, তাহার কারণ বিদেশী সভ্যতার চাপে আমাদের কতকগুলি সংস্কার জন্মিয়াছে উহা আদৌ আমাদের জাতির পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে।...

কল্লোল-পত্রিকার মাহাত্ম্যের এক ব্যক্তি ভাগীদার আছেন। তিনি ডি. এম. লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ গোপালদাস মজুমদার (১৮৯০-১৯৮০)। কাজী নজরুল হইতে আরম্ভ করিয়া কল্লোল-গোষ্ঠীর অধিকাংশের রচনা পুস্তকাকারে ইনিই প্রথম ছাপাইয়াছিলেন। তাহা না হইলে ইঁহাদের মধ্যে অনেককেই হয়ত তৎক্ষণাৎ সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইত।

ঢাকার দল ভাঙ্গিয়া গেলে পর প্রগতিচালকদের কেন্দ্র কলিকাতায় উঠিয়া আসিল। ঢাকায় যে অবশেষ রহিয়া গেল তাহা প্রগতিচালকদের বামপন্থী, সুতরাং তাহাদের ঘোরতর বিদ্বেষ্টাও, বলা চলে। প্রগতিবাদীদের সঙ্গে এই বামপন্থীদের মিল ছিল শুধু রবীন্দ্র-বিদ্বেষে। যতদিন প্রগতিওয়ালারা রবীন্দ্রবিমুখ ছিলেন ততদিন বামপন্থীরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন নাই। এখন অবস্থা পাল্টাইয়া যাওয়ায় ইঁহারা দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ চালাইবার জন্য সাজিয়া আসিলেন। যুদ্ধ আসলে একাই চালাইলেন সব্যসাচী মোহিতলাল মজুমদার—লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, একদা রবীন্দ্রভক্ত ও ভারতী-গোষ্ঠীভুক্ত, অধুনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের ব্যাখ্যাতা। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গোড়ার দিকে রবীন্দ্রবিমুখ ছিল।) মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথকে খর্ব করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেলকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া একটা "বঙ্কিম-মধুসূদন" কাল্ট্ বানাইতে ব্রতী হইলেন।

মোহিতলাল (তথা ঢাকার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সুশীলকুমার দে এবং আর দুইএকজন) প্রকাশ্যে ভর করিলেন সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় (১৯৩৩)। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই "প্রবীণ" দলের মনোভাব কেমন দাঁড়াইল তাহার একটু পরিচয় দিই। প্রথম সংখ্যা বঙ্গশ্রীতে পৌষ (১৩৩৮ সাল) সংখ্যা প্রবাসীর সমালোচনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করা হইয়াছিল।

> সন্ধ্যাসঙ্গীতের নূতন রবীন্দ্রনাথ 'মহুয়া' লেখা সমাপ্ত করিয়া হঠাৎ যেদিন 'শেষের কবিতা'র দুর্ভাগা নিবারণ চক্রবর্তীর কথা স্মরণ করিয়া নিজেকে পুরাতন মনে করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন, সেই দিনই বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্দিন আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে তখন অতিনূতনে পাইয়া বসিল। পুরাতনের ধারা ছিন্ন করিয়া রবীন্দ্রনাথ অভিনব হইতে চাহিলেন। সুরের ওস্তাদের সুর কাটিল, তাল কাটিল।
>
> পৌষের প্রবাসীর প্রথম কবিতা 'শুচি' পুরাতন রবীন্দ্রনাথের সেই নূতন সুরকাটা তালকাটা কবিতা। ভীত সন্ত্রস্ত বাঙ্গালী পাঠক এইগুলিকে গদ্য-কবিতা আখ্যা দিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহারে পূজাভাষ জাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করে।

এই বছরের বঙ্গশ্রীতে মোহিতলাল মজুমদার ("শ্রীসত্যসুন্দর দাস" ছদ্মনামে) 'সাহিত্যের অশ্লীলতা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এ প্রবন্ধের শেষে লেখক সব ছাড়িয়া দিয়া সেই কর্তিতপুচ্ছ শ্যালককে লইয়া পড়িয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'।

মোহিতলালের বক্তব্য

> 'চিত্রাঙ্গদা'-র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ নূতন নহে ; স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এক সময়ে এই লইয়া একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিদেশী সমালোচক, রবীন্দ্রনাথের ইংজের-ভক্ত টমসন সাহেবও তাঁহার গ্রন্থে এই অশ্লীলতার অভিযোগ সম্পূর্ণ এড়াইতে পারেন নাই, কতকটা স্বীকার করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। আমি ঠিক এই ধরণের অভিযোগ সমর্থন করি না ; 'চিত্রাঙ্গদা'-র যাহা প্রধান দোষ তাহা অশ্লীলতা নয়, দুর্নীতি ; তাহাতে ভাষাগত অশ্লীলতা ত নাই-ই, অর্থগত অশ্লীলতা যেখানে যেটুকু আছে, কাব্য হিসাবে তাহা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু যে ধরনের দুর্নীতি এ কাব্যের প্রধান দোষ, তাহা কল্পনাবস্তু ও কল্পনাভঙ্গিতেই প্রকট হইয়াছে। আমি যে দুর্নীতির কথা বলিতেছি তাহা নীতিবাগীশের দুর্নীতি নহে ; কবির কল্পনায় যে ভাব-বঞ্চনা রহিয়াছে, সৃষ্টির সত্যকে উপেক্ষা করিয়া একটা অযথার্থ আদর্শ প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা উহাতে লক্ষিত হয়—এ কাব্যের সর্বপ্রকার দুর্নীতির কারণ তাহাই ; ইতিপূর্বে কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই।[২০]

রাগ ও বিরাগ—দুই ভাবের রঙ-বেরঙের ফেরতায় এইটুকু প্রতিপন্ন হইল যে রবীন্দ্রনাথের পথ অপরের অনুগমনীয় নয়। (যিনি ওস্তাদ তিনি যে শিল্প সৃষ্টি করেন তাহার গুণাগুণ যেমন হোক তাহা স্বসম্পূর্ণ। তাহার অনুকরণ করিলে কার্বন কপি হইবে শিল্প হইবে না, এবং তাহার উন্নয়ন পাগলের কল্পনা।) নবীন-প্রবীণ দুই দলেই এ কথাটা অবশেষে বুঝিলেন। তবুও এটুকু অনেকে বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে রবীন্দ্রনাথের কালান্তর নাই, কোন বড় কবিরই নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেই যখন "উত্তর-রৈবিক" কাব্যের দাবি শোনা গিয়াছিল তখন মনে জাগিয়াছিল রবীন্দ্রনাথেরই বাণী

কালিদাস তো নামেই আছেন,
আমি আছি বেঁচে ॥

৪ কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

দেবেন্দ্রনাথ সেনের গৃহবাসী ভাবুকতা ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দোমঞ্জুলতা, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৮৭-১৯৩১) কবিতায় একটু নূতনতর রঙের আভাস দিল। কবির জীবন দীর্ঘ হয় নাই, কবিতালেখার জন্যও বেশি সময় পান নাই। মোটামুটি বলা যায় বছর পাঁচেকের মধ্যেই তাঁহার উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি রচিত। ইঁহার কাব্যগ্রন্থ একটিমাত্র, 'নূতন খাতা' (১৯২৩)।[২১] কিরণধনের রচনা প্রচুর নয়, তবে তাহাতে খুব ক্ষতি হয় নাই। কবির যে বিশিষ্ট অনুভব তাহাতে বেশি কবিতা লেখা চলিত না।

কিরণধনের কবিতায় ঘরোয়া প্রেমের মৃদুসৌরভটুকু পাওয়া যায়। যেমন 'আব্‌দারের ঘণ্টা'য়

ওদিকেতে চেও না,
চাও এই দিক ;
আলোটা নিভে আসে,
দাও করে ঠিক ;
লাগচে চোখে আলো
ক'রে দাও কম।
ঐ যা, বাতি নিভে
গেল একদম !

অথবা 'আব্‌দারের বেড়ি'তে

কাল রাতে ভাল করে
হয়নিক ঘুম,
কাঁদবে যে খোকা, তাকি
আগে জানতুম।
শোবো তারে নিয়ে আজ
আলাদা না হয়
দেখো দেখো হবে ঘুম
আজ নিশ্চয়।
কথা তুমি শোনোনাক
এই ভারী দোষ,
ব্যথা দিলে পরে মনে
পাবে আফ্‌শোষ,
তাই বলি কাল যেও,
থেকে যাও আজ,
ঐ দেখ বিদ্যুৎ,
পড়ে বুঝি বাজ !

পত্নীবিয়োগে কবির বেদনা দুই-তিনটি কবিতায় প্রকাশিত। সেগুলি কিরণধনের শ্রেষ্ঠরচনার অন্তর্গত। 'ব্যথার স্মৃতি'তে সদ্যোবিরহীর উৎকণ্ঠা।

চুড়িওলা হাঁকে, জানালার ফাঁকে
কতজনা ডাকে—'এ বাড়ী !'
আধ-ঘোমটায় মুখ দেখা যায়,
মন চম্‌কায় ফি-বারই ।
বাসন্তী রং কাঁচের বাসন
আরো কি-রকম কত কি—
পথে হেঁকে-হেঁকে যায় ডেকে ডেকে
কে তাদের দেখে নিরখি !

'উড়ো চিঠি'র ভাবুকতায় কবিত্বের সহজ প্রকাশ ।

কে পাঠালো উড়ো চিঠি বসন্তের এই রঙীন হাওয়ায়—
ও ফুলেরা জানিস্ তোরা কোন্‌খানে সে কোন্ ঠিকানায় ?
গোলাপ বলে—তার ঠিকানা
আমার ভাল আছে জানা ।
বকুল বলে—না না না না
কাজ কি গোলাপ পরের কথায় ?
চাঁপা বলে—কথা আমি কইব নাক তোমার সনে,
মানুষগুলো এমনি খেলো কিছু কি তার রয়না মনে ?
আমি ত কই যাইনি ভুলে
সেই কালো সেই রেশ্‌মী চুলে,
নরম নরম দু আঙুলে
আমায় তুলে পোরতো খোঁপায় !

'ব্যথার ভুল'এর শেষ চরণেতে একটু মোহকর মাধুর্য আছে ।

স্বপ্ন-জাগরণের মায়া সঞ্চরে তার এলো চুলে ।

৫ মোহিতলাল মজুমদার

সমসাময়িক ও সমবয়স্ক কবিদের হইতে মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) খানিকটা ভাবগত স্বাতন্ত্র্য আছে। মোহিতলাল নিজের সম্বন্ধে একটু বেশিমাত্রায় সচেতন ছিলেন, বোধ করি অতিসচেতন ছিলেন, এবং তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে একটা মনগড়া কাব্য-আদর্শ—সুন্দরতৃষ্ণা—ও আধ্যাত্মিক (কতকটা আধিদৈবিকও বলা চলে) মতবাদ প্রায় সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল। (প্রথমদিকের গদ্যরচনায়—যেমন 'তুমি'[২২]—'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'এর আতিশয্য আছে। 'সুন্দর' কবিতায়ও[২৩] তাহাই পুনরুক্ত।) এই "আধ্যাত্মিক" মতবাদটি খুব স্পষ্ট নয়। তবে তাহাতে বৈষ্ণবতার সঙ্গে বেদান্তের একটা সমন্বয়ের প্রচেষ্টা আছে। বৈষ্ণবভাবটুকু পাইয়াছিলেন তিনি আত্মীয়-গুরুজন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাছে, আর বেদান্তাশ্রিত তত্ত্বটুকু পাইয়াছিলেন 'অভয়ের কথা'[২৪] ও 'ঠাকুরাণীর কথা'[২৫] রচয়িতা অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (মৃত্যু ১৯১৪) কাছে। দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব বেশ গভীর, এইজনাই তাহা মোহিতলালের অনেক রচনায় সহজে বোঝা যায়। ক্ষেত্রমোহনের প্রভাব তত গভীর নয়। এবং সে প্রভাব তাঁহার প্রসিদ্ধতর কবিতাগুলিকে পায়াভারি

করিয়াছে ও গুরুপাক দিয়াছে।

বাঙ্গালা কবিতাক্ষেত্রে মোহিতলালের প্রকৃত আবির্ভাব ১৯১৯ অব্দে, যখন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাশিল্প সমসাময়িক কবিতালেখকদের উপর ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। তাহার পূর্বেও মোহিতলাল কবিতারচনা করিতেন এবং সে রচনা দুই-চারটি কোন কোন পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। যেমন 'জাহ্নবী'তে[২৬] প্রকাশিত 'জীবন ও মৃত্যু' নামক সনেট-যুগ্ম। কবিতা দুইটিতে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ অত্যন্ত স্পষ্ট। 'জীবন'এর শেষ দুইছত্র

ক্ষুদ্র সে প্রাণীর তরে ক্ষণিক জীবন ;—
জগতের অন্তঃপুরে কোথায় মরণ !

'মৃত্যু'র আরম্ভ ও শেষ

হেমন্তের মৌনস্নিগ্ধ সায়াহ্ন ছায়ায়
হিম অবসাদ যথা নেমে আসে ধীরে—
তেমতি তুমিও প্রিয়, আসিবে কি হায়,
জীবনের বেলা শেষে ?...

কার মাঝে ওগো সখা সে বা কত দূর,
সবলে আমারে যেথা লইবে টানিয়া ?
সে কি সুপ্তি—অন্ধকার রজনী-বন্ধন ?—
অথবা আলোক মাঝে চির জাগরণ !

১৯১২ অব্দে মোহিতলালের 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল'[২৭] বাহির হয়, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রশস্তি। ইহাতে ষোলোটি চতুর্দশপদী কবিতা আছে। বইটি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যগ্রন্থগুলির আকারে ছাপা এবং সেই সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছিল।[২৮]

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত পরিচিত হইয়া মোহিতলাল ভারতীর আসরে যোগ দেন এবং ভারতী পত্রিকায় তাঁহার অনুবাদ ও মৌলিক কবিতা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। এই কবিতাগুলি তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ মণিলালের উদ্যোগে প্রকাশিত 'স্বপন-পসারী'তে (১৯২২)[২৯] সঙ্কলিত আছে। স্বপন-পসারীর অনেকগুলি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শিল্পের অনুসরণ দেখা যায়।[৩০] সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব মোহিতলাল সযত্নে কাটাইতে যত্নবান হইয়াছিলেন[৩১], কিন্তু নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন করিয়া সত্যেন্দ্র-প্রভাব জাগিয়াছিল। যেমন একটি ওমর খয়্যামি ঢঙের কবিতায়[৩২]

"তার সে ভুরুর একটুকু চাঁদ আধ্-ঢাকা
'রোজা'র উপোস ভেঙে দিল যেন 'ইদ্'-রাতে।
রাত হ'ল দিন সেই আতশের রোশ্‌না'য়ে—
দিন হ'ল রাত, নয়নে নামিল নিদ্ প্রাতে !
ইয়ারা ! তোমার পিয়ালা শপথ—সেই দিনই
শরাব-খানার পথটি প্রথম নেই চিনি' !
পথে বাহিরিনু, পিরাহান্ মোর মদ-মাখা—
সেই দিন হ'তে ঠাঁই নাই আর 'ইদ্‌গা'-তে !"

ইহার সহিত তুলনা করিতে পারি সত্যেন্দ্রনাথের 'পেয়ালার প্রেম (উর্দু হইতে)'[৩৩]।

ভাল নাই বা বাসিলে হায় সাকী।
এই পেয়ালা বাসিল ! তায় বা কি ?
সরাবখানাই হ'ল মশ্‌গুল
সরাবের ফেনা গায়ে মাখি'।
পেয়ালা বাসিল ! তায় বা কি ?...

কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে একটু দেরি হইয়াছিল। তাহার উদাহরণ 'কালাপাহাড়'[৩৪] ও 'রুদ্র-বোধন'[৩৫]। সত্যেন্দ্র-প্রভাব সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে।[৩৬] বিশুদ্ধ সত্যেন্দ্র-রীতির নমুনা

যৌবনের মউ-বনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি,
দুপুর-বিজন ঝরণাতলায় এক্‌লা বসে চুল খুলি'।
পূর্ণিমারই ঢেউ উঠেছে রূপ-সায়রের মাঝখানে—
থির রহে না মোতির মালা, উঠছে কানের দুল্ দুলি' ?[৩৭]

'কিশোরী', 'লীলা', 'ভ্রান্তি-বিলাস', প্রভৃতি কবিতায় দেবেন্দ্রনাথের ছাপ অভ্রান্তভাবে পড়িয়াছে। পরে এই প্রভাব চাপা পড়িলেও বিলুপ্ত হয় নাই। যেমন

মনে হ'ল, একি সেই ?—কণ্ঠে যার পরাইনু
সবসুখ-বিনিময় পণে
কল্পনার পঞ্চনরী ! (ধুক্‌ধুক্ করে বুকে
পাঁচখানি ধুক্‌ধুকি তার)—
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আদি অঙ্গরাগ
মিলাইনু যার প্রসাধনে
প্রাণের সঙ্গীত রসে—এক পাত্রে ধরেছিনু
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ উপচার ![৩৮]

.

এত চুপিচুপি এয়োরা সাজায় বরণ-ডালা—
সিঁদুরের ঝাঁপি খুলে তুলে রাখে গোধূলি-বালা !
এক কোণে হোথা বাখানে কেহ বা কনে'র সিঁথি,
পরখিছে কেহ ঝাঁপ্‌টার মণি-মুকুতা-বীথি।[৩৯]

মোহিতলালের কবিতার ভাষায় যে মাঝে মাঝে মাইকেলের মতো পদ বা বাক্যাংশ দেখা যায় তাহা দেবেন্দ্রনাথেব সূত্রেই আগত।

বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও বেদান্ত অদ্বৈতবাদ মিশ্রিত যে জীবনদৃষ্টি মোহিতলাল স্বীয় কাব্যসাধনায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তান্ত্রিক শবসাধনার সঙ্গে ওমরখয়্যামি দেহবাদও ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। এই বিভ্রান্ত দৃষ্টির প্রথম পরিচয় মিলিল 'অঘোরপন্থী'তে।[৪০]

আমরা ডরি না মৃত্যুরে কেউ—শব-শিব একাকার,
জীবন-সুরায় নিঃশেষ করি' দেখি যে তলানি সার !

তখন মাথাটি রিমঝিম্ করে,
ব্রহ্মরন্ধ্র বুঝি ফেটে পড়ে,
জ্ঞান হয়, এই জগৎ যেন রে মড়ারই মাথার খুলি—
কঠিন সুগোল—সবটাই খোল্—সুরায় ভরিয়া তুলি'
চুমুকে চুমুক দাও বার বার পড়্‌গো সবাই ঢুলি'।

এই আইডিয়াটিই 'মৃত্যু' কবিতায় অন্যরকম রূপ লইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'চুপিচুপি আসা মরণ'কে কটাক্ষ করিয়া মোহিতলাল বলিতেছেন

কবির কাব্যে 'বঁধু' বলে' তারে ডাকা,
ধর্মের নামে পরিচয় করে' থাকা—
সে কথা বলিনা, দেখছে কি কভু তারে
বাহির-দুয়ারে সম্মুখে একেবারে ?

যে মৃত্যুকে কবি সম্মুখে দেখিয়াছেন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন সে মৃত্যু দুঃস্বপ্নের মতো। কবিতা শেষ হইবার পূর্বেই তা বিস্মৃত হইয়াছেন। কবি চাহিতেছেন দুঃখসুখ ভোগের শেষে শান্ত নির্বাণ।

ঝিরি-ঝিবি নিশা-বায়
ফুল যথা মুরছায়,
তেমনি মুদিব আঁখি'—
ধবণীতে মাথা রাখি,—
আমাব 'আমি'টা একেবারে শেষ হোক্,
করিব না কোন শোক,
মৃত্যুর পরে চাহিব না কোন সুন্দর পরলোক।

দেহের বাহিরে দেবতার স্থান নাই, কামনাই নিত্য ও সত্য, এবং বাসনার হুতাশনে আত্মসমর্পণই পরমদেবতা মদনের আরাধনা—এই ভাবটি মোহিতলালের বিশিষ্ট ও গম্ভীর কবিতাগুলির মধ্যে ওতপ্রোত।

আঁখি অনিমিখ, মেটে না পিপাসা, এ দেহ দহিতে চাই।
সুখ-দুঃখ ভুলে যাই।
বুঝিয়াছি কেন কুলে কালি দেয় তোমা লাগি' কুলবালা। [৪১]

দেহী আমি, মন্দিরে মন্দিরে তাই পরশ-ভিখারী
দেবতারে স্পর্শ করি যে করি প্রণাম। [৪২]

দেহ-অরণিরে মন্থন করি' লভি যে অগ্নি-কণা—
সেই দহনের মিঠা-বিষে মোর মদনের আরাধনা !.
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা—
লাখ, লাখ যুগে আঁখি জুড়াল না !
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত ![৪৩]

আজ মোর নাহি ভয়, দুঃখ সুখ দুয়েরি সমান
সাধক আমরা সবে, জানি জন্ম আর হেথা নাই—
স্বর্গলোভ করি না যে, নরকের নাহি যে নিশানা !
কৈশোর যৌবন জরা—জীবনের যতকিছু দান
আগ্রহে লুটিয়া লই, যাহা পাই অমূল্য যে তাই !
ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা ।[৪৪]

স্বপন-পসারীতে নাম-কবিতাটির[৪৫] মতো অ-তত্ত্বগর্ভ কয়েকটি কবিতায় গীতিকাব্যগুঞ্জরণের স্মরণীয় ইঙ্গিত আছে। এমন কবিতায় মোহিতলাল বাঙ্গালা গীতিকবিতার মূল ধারাকে সবলে অস্বীকার করিতে চাহেন নাই। যেমন

তাই বটে, এ যে তাহারই লিখন—সবুজ মলাটে জোড়া
পুঁথি একখানি, এ যেন শুভ্র সুরভি শ্লোকের তোড়া !
কেশরে-পরাগে পড়িনু সে বাণী—চুম্বনে আঘ্রাণে,
প্রাণের রাগিণী বাজিতে লাগিল বাদলরাতের গানে ।[৪৬]

আকাশের তারা বকুলের মত ঝরিছে তরুর মূলে,
পুঁথির লিখন কণ্টকী-লতা—তাও ভরে' গেছে ফুলে !
মধু-সৌরভ—সৌরভ-মধু, আর শুধু শুধু মধু !
আপনি প্রাণ দুইখান হ'য়ে হ'ল বর, হ'ল বধূ ।[৪৭]

মোহিতলাল প্রথম যৌবনে দেবেন্দ্রনাথ সেনের সাহিত্য-আসরের সভ্য ছিলেন এবং এই আসরের সভ্যদের মতো তিনিও রবীন্দ্র-অননুরাগী ছিলেন না। তাহার পর তাঁহাকে দেখি মানসীর দলে। তখনও সেখানে তিনি রবীন্দ্র-ভক্ত। (তুলনীয় 'বিজয়িনী' প্রবন্ধ[৪৮]—"বঙ্গের গীতিকবিতার দেবতা, বাঙ্গালীর Apollo" রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার রসাস্বাদন।) সেখান হইতে তাঁহাকে দেখা গেল ভারতীয় বৈঠকে। তখনো তিনি রবীন্দ্র-অনুগত। ১৯১৯ অব্দে দেখি মোহিতলাল রবীন্দ্র-কাব্যের নিগূঢ় রসজ্ঞ ও মর্মজ্ঞ। কিন্তু হঠাৎ কি যেন হইয়া গেল। অল্পকালের মধ্যে ('স্বপন-পসারী' বাহির হইবার কয়েক মাস আগে) রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে মোহিতলালের মত অকস্মাৎ ফিরিয়া গেল। এবিষয়ে সমসাময়িক সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিতেছি। সাক্ষ্যদাতা হেমেন্দ্রকুমার রায় ভারতী-গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট সদস্য। ইনি কোন নাম করেন নাই। তবে অজ্ঞাতনামা শক্তিধর সাহিত্যিক যে মোহিতলালই তাহা সহজে অনুমান করা যায়।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের কোন শক্তিধর পুরুষ (ডাঃ নরেশচন্দ্র নন) রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভঙ্গির ভিতরে আত্মপ্রকাশ করেও কিছুকাল আগে থেকে হঠাৎ রবীন্দ্র-বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। তিনি মণিলালের আসরে সকলেরই বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-বিদ্রোহী হবার পর থেকেই তিনি 'ভারতীর দলে'র প্রায় প্রত্যেকের কাছে হয়েছিলেন চোখের বালির মত।[৪৯]

(লক্ষ্য করিতে হইবে, রবীন্দ্র-বিদ্রোহী হইবার পরেই মোহিতলাল, বন্ধু সুশীলকুমার দে'র প্রযত্নে, কলিকাতায় ইস্কুল-মাস্টারি ছাড়িয়া দিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা-সংস্কৃত বিভাগে

লেকচারার রূপে যোগ দেন।) মোহিতলালের রবীন্দ্র-বিদ্রোহের আরও কিছু ব্যক্তিগত কারণ থাকা অসম্ভব নয়। 'রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে' কবিতায়, মনে হয়, এই অনুমানের সমর্থনে কিছু ইঙ্গিত আছে।[৫০]

> তাই আমি কাব্যগীতিমুখরিত তব পূজা-উৎসবের দিনে,
> লুপ্ত করি' আপনারে, একান্ত নিঃসঙ্গ হেন জনতা-বিপিনে,
> বসেছিনু বাক্যহারা ; গণি নাই মানি নাই কিবা প্রয়োজন
> খুলি' দিতে কণ্ঠ মোর সে-সভায়, মুক্ত যবে নয়ন-শ্রবণ !
> কত ভক্ত নিবেদিল পূজাঞ্জলি থরে থরে চরণে তোমার,
> মন্ত্র পড়ি পুরোহিত সমর্পিল অনবদ্য নৈবেদ্য-সম্ভার !
> হেরি' মোর মূঢ় দৃষ্টি. রিক্ত, হস্ত, নিরুচ্ছ্বাস নিষ্প্রভ বদন,
> ডাকে নাই কেহ মোরে,—ধন্যবাদ ! সে যে হত বড় অশোভন !

মোহিতলালের কবিতায় রবীন্দ্র-বিমুখতার পরিমাণ-অনুপাতে ভোগসর্বস্ব দেহতাত্ত্বিকতার ভার বাড়িতে লাগিল। ভারতীর আসর হইতে তিনি ক্রমশ দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন, এবং পরে তরুণ "অতি-আধুনিক" লেখকদের দলে যোগ দিতে চেষ্টা করিলেন।[৫১] ইতিমধ্যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পাইয়াছেন। সেখানকার আবহাওয়া পূর্ব হইতেই রবীন্দ্র-প্রতিকূল। ঢাকায় থাকিয়া মোহিতলালের রবীন্দ্র-বিমুখতা নূতন রূপ লইল। তিনি পঞ্চাশোত্তর রবীন্দ্র-কাব্যকে মানিলেন না এবং বঙ্গ-সাহিত্যসংস্কৃতির মূর্ধাভিষিক্ত রূপে মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্রকে বাড়াইয়া "বিশ্বকবি" রবীন্দ্রনাথকে দাবাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার রণমঞ্চ হইল 'শনিবারের চিঠি', কেননা অতি-আধুনিকেরা ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। স্বভাবতই মোহিতলালের উষ্মা রবীন্দ্রনাথ হইতে অতি-আধুনিকদের উপর সঞ্চারিত হইল। এ বিরাগ শেষ অবধি যায় নাই।

> তোমার প্রখর তাপে কাননের যত বৈতালিক
> নিরুদ্দেশ ; দুই চারি হেথা হোথা পল্লবের ছায়
> করিছে কূজন বটে—দুঃসাহসী কলকণ্ঠ পিক !
> কে শোনে তাদের গান ?—মাছিদের কল্লোলে হারায় !
> এমনি দুর্ভাগ্য দেশ !—তুমি রবি, তবুও হা ধিক !
> তোমার আলোকে হের, পাখী মূক, কীট নাচে গায় ![৫২]

এই দলাদলির ফলে মোহিতলালের সাহিত্যজীবন বিঘ্নিত হইয়াছিল।

মোহিতলালের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বিস্মরণী'র (১৯২৭) কবিতাসংখ্যা পঁচিশ। অনেকগুলি কবিতা স্বপন-পসারীর সমসাময়িক এবং সহজ আবেগে লেখা। তত্ত্বগর্ভ কবিতার মধ্যে প্রধান হইতেছে 'মোহমুদ্গর' ও 'পান্থ'। মোহমুদ্গরে দেহসর্বস্ব ভোগবাদের সমর্থন। প্রথম দুই স্তবকের উদ্দিষ্ট যথাক্রমে মোক্ষকাম তপস্বী ও শবসাধক কাপালিক। তৃতীয় স্তবকে রবীন্দ্রনাথকে চ্যালেঞ্জ।

> ঊর্ধ্বমুখে ধেয়াইয়া রজোহীন রজনীর মল্লিকা-মাধবী,
> নেহারিয়া নীহারিকা-ছবি,—

কল্পনার দ্রাক্ষাবনে মধু চুষি নীরক্ত অধরে,
উপহাসি' দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে,
বুভুক্ষু মানব লাগি' রচি ইন্দ্রজাল,
আপনা বঞ্চিত করি' চির ইহকাল,
কতদিন ভুলাইবে মর্ত্যজনে বিলাইয়া মোহন আসব,
হে কবি-বাসব ?

জীবনপ্রেমিক মোহিতলাল, চিরন্তন জীবনপ্রবাহ মানেন না, পুনর্ভাবে তিনি বিশ্বাসহারা। তাই তাঁহার অভিনব চার্বাকবাণী

কারে চেয়ে ঠেলে দাও এ প্রসাদ-পরমান্ন, হে চিরভিখারী ?
—আনন্দের ক্ষণ অধিকারী !

কবিতাটির শেষ স্তবকে পৌঁছিয়া দেখি যে নব-চার্বাকীয় মেজাজ চলিয়া গিয়াছে, মোহিতলাল পুরাপুরি "বঙ্গ-কবি" রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন।

এ ধরার মর্মে বিঁধে রেখে যাব স্নেহ ব্যথা, সন্তান-পিপাসা,
তাই রবে ফিরিবার আশা !
দুধের বাটিটি তুলে রেখে দিবে সে যে মোর লাগি—
মৃতবৎসা জননীর বেদনা যে নিত্য রহে জাগি' !
ক্রোড়ে তার বার বার আহ্বান-আকুল—
ঝরিবেই পরলোক-নিশীথের ফুল,
তারি তরে ওরে মূঢ় ! জ্বেলে নে রে দেহ-দীপে স্নেহ-ভালবাসা
—নবজন্ম-আশা।

'পান্থ' "দার্শনিক সন্ন্যাসী Schopenhauer এর উদ্দেশে" লেখা। কবিতাটির মূল আইডিয়াটি দুর্বল। কবি চাহেন মৃত্যুর পরেও চেতনার প্রবাহ রুদ্ধ হইবে না, এবং নির্বাণ তাঁহার কিছুতেই কাম্য নহে এইজন্য যে তাহা হইল জীবন-মরণের অন্তর্বাহী চেতনার ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এ চেতনা ঠিক আত্মা নহে, বৌদ্ধমতের সুখদুঃখের অনুভবকারী সংস্কারপ্রবাহ।

আমারে হারাই যদি !—যদি মরি সুচির-মরণে !
ব্যথা আর নাই পাই—শেষ হয় নয়নের ধারা !—
বল, বল, হে সন্ন্যাসী ! এ চেতনা চিরতরে হবে না ত' হারা ?

এই ব্যথা-বেদনার অভীপ্সা একটা ভঙ্গিমা মাত্র। ইহাকে বলিতে পারি ড্রয়িংরুম দুঃখ বা দুঃখবিলাসিতা।

তৃতীয় গ্রন্থ 'স্মর-গরল'এ (১৯৩৬) কবিতাসংখ্যা চল্লিশ, তাহার মধ্যে একটিকে ('প্রেম ও ফুল') ক্ষুদ্র কাব্য বলা যাইতে পারে। এটির বিষয় যোগাইয়াছে বোধ করি কবির প্রথম যৌবনের স্মৃতি। 'নারীস্তোত্র'এ কবি যেন নূতনতর শক্তি মত প্রচার করিতেছেন। নারী কামরূপিণী।

স্বচ্ছন্দ-স্বৈরিণী ও যে, নিত্যশুদ্ধা—নহে সতী, নহে সে অসতী।

নারী চিন্ময়ী এবং মৃন্ময়ী।

রাসরসোল্লাসময়ী নিয়তি-নিয়মহারা পীরিতি পরমা।

মানবের মানস-মোহিনী, মানবের দেহ-প্রসবিনী নারীর মাঝে নিখিলের প্রাণ-প্রবাহিণীকে হেরিয়া

লভিবে নির্বৃতি নর, ফুরাইবে নিত্য বিসম্বাদ—
মৃত্যু-মুক্তি হবে কবে ?—ঘুচে যাবে চিরতরে অমৃতের সাধ ?

'বুদ্ধ' কবিতায় মোহিতলাল নির্বাণকামী ব্রহ্মচর্যকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। 'শেষ-শিক্ষা'য় কবি কামের সর্বেশ্বরত্ব অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শুনি নাই প্রেমের আহ্বান,
প্রাণের পাড়ায়ে ঘুম স্বপনেরে দিয়েছিনু ফাঁকি,
বাজে নাই দেহ-বীণে আত্মহারা কামনার গান।

মোহিতলালের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'হেমন্ত-গোধূলি' (১৯৪১)। বইটির দুইটি অংশ,—মৌলিক 'হেমন্ত-গোধূলি', অনুবাদ 'বিদেশী কবিতা'। প্রত্যেক অংশে কবিতার সংখ্যা ঊনচল্লিশ। বিদেশি কবিতাগুলি সবই আগের লেখা, মৌলিক কবিতার কতকগুলিও তাহাই। মোহিতলাল বোদ্‌লেয়ারের সন্ধ্যারাগিণী কবিতাটির অনুবাদ করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদের[৫৩] সঙ্গে তুলনা করিবার জন্য দুইটি স্তবক উদ্ধৃত করিলাম।

এখন সন্ধ্যা, কুঞ্জলতিকা দুলিছে মন্দ বায়,
ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়, যেন সে ধূপের ধূম ;
বাতাস ভরিছে বসন-সুবাসে, গীতের মূর্ছনায়—
নৃত্যের তালে মূর্ছার রেশ, চরণে জড়ায় ঘুম।

ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়, যেন সে ধূপের ধূম !
বেহালার সুরে শুনিতেছি কোন্ প্রেতের আর্তনাদ !
নৃত্যের তালে মূর্ছার রেশ, চরণে জড়ায় ঘুম,
অস্ত-গগন মৃত্যুসদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ !

মৌলিক কবিতাগুলির মধ্যে নূতন কোন ভাবের বা ফর্মের সন্ধান নাই। তবে তত্ত্ববাদের বোঝা নামিয়া গিয়াছে। সর্বশেষের দিকে লেখা একটি কবিতায়[৫৪] দেবেন্দ্র-শিষ্য ভক্তকবি নিজেকে ধরা দিয়েছেন।

সব শেষে আর রহিবে না কিছু বাহির ভুবনে মোর,
জন্মতিথি যে মিলাইয়া আসে মৃত্যুতিথির সনে !
তবু যতখন জাগিবে আঁধারে—রহিব নেশায় ভোর,
তোমারে দেখেছি—এই কথা শুধু জপিব পরাণপণে।

অধরের রেণু, বনমালা আর পায়ের নূপুর-মণি—
সেই শিখি-চূড়া, পীতধটিখানি হেরিব না আর যবে,
তখনো বৃক্ষে নৃত্য-চপল তব চরণের ধ্বনি

থামিবে না জানি—যতখন মুখে তারকারা চেয়ে রবে।

মোহিতলালের শেষ কাব্য 'ছন্দ-চতুর্দশী' (১৯৫১)। ইহার একটি সনেট (১২) প্রথম বই 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল' হইতে নেওয়া।

ভারতীর আসরে মোহিতলাল মজুমদার প্রথম হইতে কবি ও ক্রিটিক এ যুগল সাজে দেখা দিয়াছিলেন। তাহার আগে যে একটি পদ্য-রচনা চোখে পড়িয়াছে তাহাতে 'অভয়ের কথা'র লেখক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যত্বই পরিস্ফুট।[৫৫] ভারতীর (১৯১৯) 'মাসকাবারি' প্রবন্ধগুলি চলিত ভাষায় লেখা। পরে মোহিতলাল সাধুভাষার দিকে একান্তভাবে ঝুঁকিয়া ছিলেন।

ভারতীর প্রবন্ধগুলিতে মোহিতলাল "আর্ট-তত্ত্ব"এর আলোচনা করিয়াছিলেন। মোহিতলাল বলিলেন, রবীন্দ্রনাথের জন্য কোন ক্রিটিকের দরকার নাই "কিন্তু আমাদের সাহিত্যে বর্তমান যুগে ক্রিটিকের দরকার খুব বেশী"।

> ঘরের সমস্যা ঠিক কি, সেটাকে শুধু বাইরের দিক থেকে, বিশ্বের দিক থেকে নয়—ঘরের দিক দিয়ে ভাল করে বুঝে, ভাল টনিকের ব্যবস্থা করে' সমালোচনা ও সৃষ্টি—দুইয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতিয়ে, সোজা কথাটাই ভাল ক'রে বুঝিয়ে বড় ক'রে তুলে', ভুল ভাঙিয়ে, আশ্বাস দিয়ে, রস-বস্তুর স্বরূপ ও বিরূপ বেশ ক'রে ফুটিয়ে তুলে, উচ্চসাহিত্যের পত্তন করাই কি ক্রিটিকের কাজ নয়?[৫৬]

মোহিতলালের এই উক্তির মধ্যেই তাঁহার কবিজীবনের বিনষ্টির বীজ নিহিত আছে। ঢাকায় গিয়া তাঁহাকে অধ্যাপনা-সূত্রে পাঠ্যগ্রন্থের সমালোচনা করিতে হইত। সেই সূত্রে তিনি সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনায় কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়েন। তাঁহার এই সমালোচনাপ্রবন্ধগুলি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাতরণের ভেলা হিসাবে উপযোগী ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু সাহিত্যসমালোচনা হিসাবে সেগুলি খুব মূল্যবান্ নয়। মোহিতলাল "সোজা কথাটাই ভাল ক'রে বুঝিয়ে বড় ক'রে তুলে" দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ভারতীতে প্রবন্ধ রচনার সময় হইতে মোহিতলাল তাঁহার সমালোচনা প্রবন্ধগুলিতে "শ্রীসত্যসুন্দর দাস" এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিতে থাকেন। এ নামটি গ্রহণ করিবার হেতু মোহিতলালের উক্তি হইতেই ধরা পড়িবে।

> সব বিষয়ের উপর মনের স্বচ্ছন্দ গতি রেখে' সর্ব বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যকে অপরোক্ষ করতে হবে। এই দৃষ্টি—জগতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা-করবার সাধনা—তাই হচ্ছে কবির সৌন্দর্য সাধনা, ক্রিটিকের সত্যসাধনা। তাই এ যুগে কবিও ক্রিটিক, ক্রিটিকও কবি।...
>
> এই সত্যসুন্দরের প্রচারই হচ্ছে ক্রিটিকের আসল কাজ।[৫৭]

মোহিতলাল ভুল করিয়াছিলেন। কবি যেখানে ক্রিটিক এবং ক্রিটিক যেখানে কবি সেখানে কোন কিছুরই প্রচারের কথা উঠিতে পারে না। কবি ক্রিটিক হইলেও শিল্পী, কদাপি প্রচারক নহেন। মোহিতলাল প্রচারক হইয়া শিল্পিধর্মচ্যুত হইয়াছিলেন। এখানে তিনি "অতি-আধুনিক" প্রগতিপন্থার পন্থী হইয়াছেন। তাঁহার শিক্ষকতা-কর্ম ইহার জন্য কম দায়ী নয় ॥

৬ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) বি-ই পাস ইঞ্জিনিয়ার। ওভারসিয়ারি ছিল তাঁহার জীবিকা। এদিক দিয়া তিনি আমাদের কবিদের মধ্যে একটু স্বতন্ত্র। তাঁহার জীবিকার প্রভাব তাঁহার কাব্যসৃষ্টিতে খানিকটা প্রতিফলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রানুসারী সমসাময়িক কবিদের মধ্যে ইনি প্রথম হইতেই রচনাশক্তির প্রমাণ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ'-প্রভাবিত যতীন্দ্রনাথের 'শীত'[৫৮] তাহার নিদর্শন।

বিশ্বের বিরাট বক্ষে পাতি শবাসন
সাধিতেছে প্রলয় সাধন—
কে তুমি সন্ন্যাসী।
বর্ণ-গন্ধ-গীত-বিচিত্রিত জগতের নিত্য প্রাণস্পন্দ
কি স্বতন্ত্র মন্ত্রবলে পলে পলে হয়ে আসে বন্ধ !
মরণের আবাহন তরে কেন এই তীব্র আরাধন,
চেষ্টা সর্বনাশী ?
বর্ষ পরে বিশ্ব জুড়ে, বসিলে আবার—হে রুদ্র সন্ন্যাসী !

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বিঘোষিত "হঠাৎ ডিমক্র্যাসি"'র প্রভাব যতীন্দ্রনাথের রচনায় অনতিবিলম্বে পড়িয়াছিল। তাহাতে কবির দৃষ্টি প্রথমে দুঃস্থ দুর্গত মানুষের দিকে, তাহার পর মানবজীবনের দুঃখসর্বস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দিকে আকৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে একটি প্রথম রচনা 'মানুষ'।[৫৯]

শোভন করিয়া ঢাকিবে আপন লজ্জাটুক্—
জুটে নাই হেন বাস ;
তারি খুঁটে যারা পিঠে ছেলে বেঁধে, রক্তমুখ,
তুলিছে মাটির রাশ ;[৬০]
মাঝপথে যার শিরে নিজ বোঝা দিতেছে পতি,
থাক্ বা না থাক্ শ্রী—
ঘৃণা কি করুণা[৬১] কোরো না তাদের, কর গো নতি,
তারা মানুষেরি স্ত্রী !

যতীন্দ্রনাথের কবিতায় দুঃখবাদ ভাববিলাসিতায় এলাইয়া যায় নাই। মৃদু ব্যঙ্গের ঝাঁঝ থাকায় ইঁহার কবিতায় একটু নূতন রকম স্বাদের সঞ্চার হইয়াছে।

যতীন্দ্রনাথের কবিতা পাঁচখানি বইয়ে সঙ্কলিত—'মরীচিকা' (১৯২৩), 'মরুশিখা' (১৯২৭), 'মরুমায়া' (১৯৩০), 'সায়ম্' (১৯৪০) ও 'ত্রিযামা' (১৯৪৮)। মৃত্যুর পরে বাহির হইয়াছে 'নিশান্তিকা' (১৯৫৭)। 'অনুপূর্বা' (১৯৪৬) সঙ্কলনগ্রন্থ। 'কাব্য-পরিমিতি' (১৩৩৮ সাল) কাব্যতত্ত্বের বই। কাব্যনামগুলির মধ্যে যতীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার একটা স্থূল পরিচয় আছে। প্রথম জীবনে মানুষ ছোটে মরীচিকার পিছনে, পড়ে মরুশিখার দহনে, তাহাকে জড়ায় মরুর মায়া।[৬২] তাহার পর জীবনসন্ধ্যার অন্ধকার ঘনায়। মৃত্যুর, নব-জীবনের প্রত্যাশায় সে ভাবে "সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা"। উমার তপস্যার দীর্ঘরাত্রি সম্বন্ধে কালিদাসের উক্তি স্মরণে রাখিয়াই বুঝি যতীন্দ্রনাথ শেষ বইটির

নাম দিয়াছিলেন।

মরীচিকা কাব্যের মটো রবীন্দ্রনাথের এই কয়ছত্র

মরীচিকা চাহি জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি।
সে আলোটুকুও হারিয়েছি আজ
আমরা খাঁচার পাখী।

মরীচিকার 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাটিতে যতীন্দ্রনাথ ধর্ম ও আধ্যাত্মচিন্তাশ্রিত পলায়নী মনোবৃত্তিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—যাঁহারা ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করিয়াছেন পৃথিবীতে তাঁহাদের বাণী বারে বারে ব্যর্থ হইয়াছে। "প্রথম ঝোঁক্"এ "বন্ধু" নিষ্করুণ, জড়বৎ অবিচলিত ।

যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িল না একচুল ;
ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল !

ঈশ্বর নির্লিপ্ত, নিরীহ। তিনি স্রষ্টা না হইতে পারেন, তিনি দ্রষ্টা।

ঘুরণের পাকে কেউ কাছে থাকে, কেউ চলে' যায় দূরে,
তব আনন্দ রয়েছে কেবল তোমারি হৃদয় জুড়ে'।

মানুষের ধর্ম মানুষের প্রেম দুইই ক্ষণধর্মী, স্থায়িত্ববিহীন, মূঢ় মানবের অসহায় অক্ষমতার আবরণ।

মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি !

জগতে যে শৃঙ্খলা আমরা কল্পনা করি তাহা গোঁজামিল মাত্র, এবং চৈতন্য সে তো জড়েরই বিকার।

বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হয়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।
প্রেম বলে কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

ঘুমের "দ্বিতীয় ঝোঁক্"এ "বন্ধু"র কাছে আরো ঘুমের জন্য প্রার্থনা। ইহজীবনের পূর্ব এবং পর দুইই অব্যক্ত। মৃত্যু ছাড়া কিছুই ধ্রুব ও নিয়মাধীন নয়। নিত্য সত্য শুধু দুঃখ।

চারি দিক দেখে চারি দিকে ঠেকে বুঝিয়াছি আমি তাই,
নাকে শাঁখ বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।
যদি বল তুমি, সুখদুখ নাই—দুটাই মনের ভ্রম,
এও তবে এই ঘুমেরি একটা আফিং মেশানো ক্রম !
জারি কর তব খ্যাতি,
এ-ভব-রোগের নব চিকিৎসা আমাদের "ঘুমিওপ্যাথি"।

"তৃতীয় ঝোঁক্"এ সুখের দিন আগত, কিন্তু তাহার পিছনে শত দুঃখের স্মৃতি। কবিচিত্ত তাহাতে ভুলিতেছে না।

তব প্রসন্ন আঁখির আলোকে আমার পিছন ভরি'
যে ছায়া পড়েছে, তাহাতে লুকায় কত শোক বিভাবরী !
ভরেছ আতর-দানি,
কত প্রভাতের আধ-ফোটা ফুল-মর্ম নিঙাড়ি' ছানি' ?
কণ্ঠে দুলালে মিলন মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা—
সদ্যচ্ছিন্ন শিশু কুসুমের কচি মুণ্ডের মালা !

"চতুর্থ ঝোঁক"এ কবিচিত্ত নিত্যসত্য দুঃখের নগ্নমূর্তির আবির্ভাবের প্রতীক্ষারত।

কোথা সে অগ্নিবাণী—
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে নগ্ন মূর্তিখানি !...
এ কথা বুঝিব কবে—
ধানভানা ছাড়া কোন উঁচু মানে থাকে না ঢেঁকির রবে !

"পঞ্চম ঝোঁক্"এ ঘুমের চটকা-ভাঙ্গা জাগরণের ক্রন্দন-বেদনায় "বন্ধু"-র অন্বেষণ।

বার বার জাগরণে,
যন্ত্রণা যত বাড়ে অবিরত তোমারেই পড়ে মনে।...
যদি ভাল লাগে, ভালবেসে তোমা ডাকিব বন্ধু বলে,
সমানে সমানে ছলনা-বিহীন দিন যাবে কুতূহলে।

"ষষ্ঠ ঝোঁক্"এ জাগরণ সম্পূর্ণ, কিন্তু জীবনে ক্লান্তি ও শ্রান্তি।

ঢেলে সাজ', সেজে ঢালো,
সকল দুঃখ সূক্ষ্ম হউক, যত সাদা সব কালো।

"সপ্তম ঝোঁক্"এ দুঃখমূর্তি "বন্ধু"র বিশ্বরূপদর্শন।

হে বিরাট ! আজ হেরি যেন এত দুঃখের নাহি ওর ;
চির বর্ষণে ফুরায় না তবু অফুরান আঁখিলোর !
ওগো অক্ষয় বট !
যত বেড়ে যাও আপনি ছড়াও শত দুঃখের জট।

এ দুঃখদর্শন কবিকে জীবনরসের প্রতি বিতৃষ্ণ করে নাই। দুঃখের ফ্রেমে বাঁধা হইলেও জীবন-চিত্রের উজ্জ্বলতা তাঁহার কাছে কিছু কম কমনীয় নয়।

'প্রেমের স্পর্দ্ধা' কবিতায় চিত্ররূপ উপভোগ্য। বিষম বৈশাখী রোদে পোড়াদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে টিনে-ছাওয়া শেডের তলায় বরযাত্রীদল জড় হইয়াছে। বরের

শুকায়ে গিয়াছে মুখ, চোখ গেছে বসিয়া
কণ্ঠে মলিন ফুলমালা,
সারাদিন অনাহারে, রাঙা পানে রসিয়া
ঠোঁট দুটি মোহরের গালা !
নিঙাড়ি সে নীরসতা রসিকতা যা মেলে
সঙ্গীরা ঢালিতেছে কানে ;

'পথের চাকরি'কে বলিতে পারি এ কালের কবির "বারমাস্যা"।

আষাঢ়ে চাষার আশা বাড়ে যেয়াদা—
দাদন ছাঁদনে ছেঁদে ঘোরে পেয়াদা !
সহরে বরষা ঝরে,
মেঘদূত ঘরে ঘরে,
গাঁয়ে মাঠে কাঠ ফাটে, এ বড় ধাঁধা !
আমি কি করি ?
ঘুরি 'বাইকে' চড়ি,
আল্-পথে ঢাল রেখে,
বেড়াই ইঁদারা দেখে',
যোগাই যে চায় তারে কলসি দড়ি !

'অভাগার ভাগ্য'-এর ব্যঞ্জনা উপভোগ্য ।

চাই ধন জন স্বাস্থ্য শান্তি,
অভাবে পাই—
রুগ্না পত্নী, মূর্খ পুত্র,
গোঁয়ার ভাই !
তোমারে জীবনে চাব কি চাব না,
ভুলেও কখনো এমন ভাবনা
ভাবিনে বসে'—
তাই চাইনে বলিয়া পেয়ে বস যদি
কপাল-দোষে ।

মরুশিখায় 'দুখবাদী', 'নবপন্থা', 'কবির কাব্য' ইত্যাদি কবিতায় যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদী ভাবনার প্রকাশ ।

তা'রই পরে তব কোপ গো বন্ধু, তা'রই পরে তব কোপ,
যেজন কিছুতে গিলিতে চায়না এই প্রকৃতির টোপ্ ।
সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল !
ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাবকবি,
সমসুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি ।
তেলে সিন্দূরে এ সৌন্দর্যে 'ভবি' ভুলিবার নয় ;
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে দুঃখেরি জয় । [৬৩]

দুখের মাঝে সুখের মরুশিখা মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠে, তাহাতেই কবিচিত্ত চকমকির স্পর্শ পায় ।

আছে গো আছেও সুখ ;—
খদ্যোত বিনা দেখা যাবে কেন বনের আঁধার মুখ ।
মাঝে মাঝে মৃগতৃষ্ণিকা বিনা কে মাপে মরুর তৃষা !
আলেয়ার আলো নহিলে পান্থ কেমনে হারায় দিশা !
বন্ধু, বন্ধু, হে কবিবন্ধু, উপমার ফাঁস গুণি'
আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই কাব্যের জাল বুনি । [৬৪]

কয়েকটি কবিতায় সমসাময়িক নন-কোঅপারেশন আন্দোলনের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া কবির বাণী ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে নিগূঢ় বেদনায় উৎসারিত। যেমন

সেই দুর্যোগ উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার ;—
সরে' পড়ি যদি ক্ষমা কোরো দাদা !
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা ?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই,—চাষার ব্যারিষ্টার ![৬৫]

মোদের কি বল দোষ ?
অহিংসা পেলে অহিংসা করি, রাগ পেলে করি রোষ।
এই ভবজ্বালা প্রাণ ঝালাপালা, তবু ত ছাড়িনি বুলি
নাম জপিবারে কিনেছি এবারে খাঁটি খদ্দরে ঝুলি।
সময় পেলেই বলি,—সকলেই মহা যুগবাণী শোন—
নিজ চরকার তেল দাও, নিজ আস্‌কের ফোড় গোণ।
বোকা বোকা ছেলে চ'লে যাক্ জেলে আমরা বাহিরে আছি,
কাগজে দেখিব এল কিনা দেশ স্বরাজের কাছাকাছি।
সিদ্ধ পুরুষ নেতা ভারতের,—মন্তর যদি ঝাড়ে,
ঠিক মজাই ভাই হবে,—
ফিকে আড়ষ্ট রাজা ও রাজ্য, আমরা ঘুমাব সবে।[৬৬]

মরুমায়ার বিশিষ্ট কবিতার মধ্যে একটি হইল 'বিভীষণ'। চিরজীবী বিভীষণ চিরন্তনী মৃত্তিকার মোহিনী মায়ার বন্দনা করিতেছে।

রক্তপিপাসা ভক্ত সাজিয়া পূজে মৃন্মহামায়া,
স্বার্থপ্রদীপে পুরোহিত করে আরতি আপন ছায়া।
মিছে, ওরে সব মিছে,—
মাটির প্রেমের হেমকুরঙ্গ বনে বনে ছুটাইছে।

'নূতন পথে' কবিমানসের জীবন-অভিসারের ছবি।

এই ধূলায়-ছাপা
বুকে পাথর-চাপা
সাদা দুরু দুরু গুরু গুরু চাকায় কাঁপা
সিধা বাঁধা রাজপথে আমি আর না র'ব।
আজ মরণে পড়েছে মোর পন্থা নব
ওই 'পাওটা' পথের আমি পথিক হ'ব।
বামে তর-তর ভরা গাঙ্ শাওন-রাঙা,
ডানে থর-থর খাড়া পা'ড় ভাঙন-ভাঙা ;
গাঙ-শালিখের দল
খোপে কলচঞ্চল
যেথা বেণার শিকড় ধ'রি ঝুলিছে ডাঙা ;

সেই উঁচু নীচু আঁকা বাঁকা
পাউড়ির বুকে আঁকা
যে পথ ভাঙে ও গড়ে নিত্য ন'ব।
আজ সে পাওটা-পথে একা পথিক হ'ব।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্প সহজ ও স্পষ্ট, কারুকার্যহীন, হয়ত খানিকটা শ্লথ। তবে কবির অনুভব ও আবেগ খাঁটি, উজ্জ্বল ও সংযত। এ বিষয়ে মোহিতলালের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের গুরুতর পার্থক্য। দুইজনের লেখার চালও আলাদা। যতীন্দ্রনাথের কবিতার চাল হালকা, মোহিতলালের ভারি। একই ছন্দে লেখা দুই কবির 'কেতকী' কবিতা দুইটি পড়িলে দুইজনের কবিভাবনার ও নির্মাণ-কৌশলের পার্থক্য বোঝা যাইবে।[৬৭] যতীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

সে জানে সে কোন বনে
কাঁটার আড়ালে উঠেছিল ফুটে আঁধারে সঙ্গোপনে।
শ্যাম পাতে ঢাকা শ্বেত কিশলয়, তাহে ডাকে পীত রেণু।
শ্রাবণ-সোহাগে যৌবন জাগে বাজে গন্ধের বেণু।
এল বায়ু-রথে মত্ত ভ্রমর নূতন মধুর লোভে,
তরুমূলবাসী বিষভুজঙ্গ ফণা তুলে' ফোঁসে ক্ষোভে !...
বনের বেদনা পথে বিকাইছে,—কি মোর কপাল-ভোগ,—
গন্ধের লোভে কিনে' এনে ঘরে ধরে অনিদ্রারোগ !...
নয়নের নিদ্ নয়নে রুধিতে আঁখিপাত মুদি মিছে,—
অন্ধ আকাশে উড়িছে সে কেয়াগন্ধের পিছে পিছে।
পথে পথে রাতে এই বর্ষাতে তুমিও যে ঘোর' ভাই,
তোমারেও তবে ধোরেছে বন্ধু আমারই অনিদ্রাই।
মেঘে আর ঘুমে, ঘুমে আর মেঘে ডুবে গেছে যত তারা,
কোন্ কেতকীর শোকে গো বন্ধু তুমিও নিদ্রাহারা ?

মোহিতলাল লিখিয়াছেন

প্রাবৃট-আঁধারে বিদ্যুৎ যবে বিদারিয়া নভ-তল
ঘোর গর্জনে শিহরিয়া তোলে নিম্নে জলস্থল—
তুমি বন্দিনী রবি-বিরহিণী তাপসিনী ফুলবালা
সবুজ বাকলে ঢাকি' তনুখানি পর' যে কাঁটার মালা !
ফণী-ফণিনীরা ফুঁসিয়া উঠিছে সৌরভ-সংবাদে,
তাই সে তরুণী সারা তনুখানি নিবিড় নিচোলে বাঁধে ;
গরল-শ্বাসে মেলিতে পারে না আপন দীর্ঘ দল—
গোরচনা-গোরী পাণ্ডুর হ'ল—যৌবন নিষ্ফল !...
বাদল-তিমিরে বেদনার মত গন্ধের আবেদন
সারা প্রাণ-মন নিমেষে হরিল, হয়ে গেনু অচেতন।
তবু বুকে করি' নিয়ে গেনু ফুল—পাইনু কি সন্ধান ?
জনমে জনমে খুঁজে ফিরি যারে এ তারি অভিজ্ঞান ?

যতীন্দ্রনাথের ও মোহিতলালের 'দুঃখের কবি' কবিতা দুইটিতে[৬৮] দুইজনের জীবনভাবনার পার্থক্য পরিস্ফুট। যতীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত ঠুনকা সুখের মোহে পড়িতে চায় না।

ও নাকি শপথ কোরেছে,—'কপালে না জুটিলে খাঁটি সোনা,
আভরণহীন কেঁদে যাক্ দিন, খাদে তবু ভুলিব না'। ...
ভক্তি প্রেম কি দণ্ডের তালে শ্রীচরণে মাথা ঠোকা ?
মুক্তি কি এই ?—দড়া ছিঁড়ে' ছুটে' সাকিম খোঁয়াড়ে ঢোকা ?

মোহিতলাল বলেন, ঠুনকা সুখের সান্ত্বনাও তো মিথ্যা নয়।

মিথ্যার মোহে কেহ যদি সত্যই সুখ পায়—
তপ্ত বলিয়া ভান ক'রে কেহ পান্তা জুড়াতে চায়—
লয়ে গোপালের পাষাণ পুতলি
বন্ধ্যার স্নেহ উঠে যে উথলি'—
তার সেই সুখে কার না বক্ষ অশ্রুতে ভেসে যায় ?
কঠোর সত্য স্মরণ করায়ে কে তারে শাসিতে চায় ?

৭ কাজী নজরুল ইসলাম

স্কুলের পড়া বোধ করি শেষ না করিয়াই কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাঙ্গালী পল্টনে ভর্তি হইয়া মেসোপোটেমিয়ায় যান (১৯১৭)। স্কুলে পড়িবার সময় হইতে কাজী ও তাঁহার সহপাঠী সুহৃদ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় দুইজনে গল্প ও কবিতা লিখিতেন। মেসোপোটেমিয়ার বাঙ্গালী পল্টনের মুসলমান সিপাহীদের তদারকের জন্য একজন পাঞ্জাবী মৌলবী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মুখে একদিন হাফিজের কবিতা আওড়ানো শুনিয়া নজরুল মুগ্ধ হইয়া যান এবং মৌলবী সাহেবের কাছে ফারসী শিখিতে থাকেন।[৬৯] তাঁহার কাছেই নজরুলের ফারসী-কাব্যের পাঠগ্রহণ হয়। এখন হইতেই নজরুলের কবিজীবনের উন্মেষ শুরু হইল। "হাবিলদার" কবির প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা-রচনা হাফেজেরই অনুসরণে।

নাই বা পেল নাগাল, শুধু সৌরভেরি আশে
অবুঝ সবুজ দূর্বা যেমন যূঁইকুঁড়িটির পাশে
বসেই আছে—তেমনি বিভোর থাক্ রে প্রিয়ার আশায়,
তার অলকের একটু সুবাস পশবে তোরও নাসায়।
বরষ শেষে একটিবারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ
জাগাবে রে তোরও প্রাণে অমনি অবুঝ হরষ।[৭০]

দেশে ফিরিয়া (১৯১৯) দুই-চার দিন মক্‌শ করিবার পর[৭১] নজরুলের কবিতা স্বীয় আবেগ-উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া বাঙ্গালী পাঠককে মাত করিয়া দিল, এবং বাঙ্গালা কবিতার যে বাজারদর হইতে পারে তাহা জানাইয়া দিল নজরুলের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২২ ; দ্বি-স ১৯২৩)।

দম্‌কা-হাওয়ার কবি শুধু অগ্নিবীণা বাজাইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি 'ধূমকেতু'ও

ছাড়িলেন। কবিতার ঝঙ্কার যাহাদের কানে কোনদিন পশিবে না তাহারাও 'ধূমকেতু'র ঝাপটা হইতে রেহাই পাইবে না। 'ধূমকেতু' পাক্ষিক পত্রিকা (১৯২২)। মটো রবীন্দ্রনাথের এই কয় ছত্র[৭২]

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু ;
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

ধূমকেতুর জন্য কবি রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

নজরুলের অগ্নিবীণা বাহির হইবার মাসকয়েক পরে মোহিতলালের 'স্বপন-পসারী' প্রকাশিত হয়। এই সময় পর্যন্ত দুই কবির মধ্যে সহৃদয় সহযোগ ছিল। এই সহযোগিতায় নজরুল কতটা লাভবান্ হইয়াছিলেন জানি না তবে লোকসান হয় নাই। মোহিতলালের সম্বন্ধে সে কথা কতটা খাটে বলিতে পারি না। বোধকরি নজরুলই তাঁহাকে কল্লোলের আসরে (১৯২৩-৩০) ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। ১৯২৪ অব্দের মাঝামাঝি শনিবারের চিঠি বাহির হইয়া দুই কবিকেই আঘাত হানিল।[৭৩] অনুমান করিতে পারি এই আঘাতই দুইজনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল।

নজরুলের প্রথম উৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে জোরালো কবিতা দুইটির[৭৪] প্রত্যক্ষ প্রেরণা আসিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের দুইটি কবিতা হইতে।[৭৫] নজরুল যোগ করিলেন "বেগের আবেগ"। কবিতা দুইটির অসাধারণত্ব কাহারো দৃষ্টি এড়াইবার মতো নয়। উচ্ছ্বসিত প্রাণের পেয়ালা-ভরা তরুণ কবিকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত করিলেন 'বসন্ত' উৎসর্গ করিয়া (১৯২৩)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসান ঘটিল কিন্তু প্রাচ্যভূমির দুর্দশা ঘুচিবার লক্ষণ দেখা গেল না। মেসোপোটেমিয়ায় গিয়া নজরুল স্বাধীনতাকামী নবজাগ্রত মুসলিম রাষ্ট্র তুর্কীর উদ্যম খানিকটা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার কবিতায় বিদ্রোহ-উল্লাসের সুর আনিয়াছিল।

'অগ্নিবীণা' নামটি রবীন্দ্রনাথের গান থেকে নেওয়া।

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে,
আকাশ কাঁপে তারার আলোয় গানের ঘোরে।

অগ্নিবীণার লিরিক আবেগ বিদ্রোহের, নির্জীবতার নিশ্চেষ্টতার নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে প্রাণবান্ চিত্তের অসহিষ্ণুতা। তাই কাব্যখানি উপহৃত হইয়াছিল "বাঙলার অগ্নিযুগের আদি পুরোহিত সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণেষু"। অগ্নিবীণায় কবিতাসংখ্যা বারো। নজরুলের কবি-প্রকৃতি যে ধর্মের গণ্ডীর মাপে গড়িয়া উঠে নাই তাহার পরিচয় কবিতাগুলির মধ্যে,—'রক্তাম্বর-ধারিণী মা', এবং 'আগমনী'ও আছে, আবার

'কোরবাণী' এবং 'মোহর্‌রম্‌'ও আছে।

অগ্নিবীণায় অগ্নিদীপ্তি আছে নিশ্চয়ই কিন্তু তাহার সুরটি বীণার নয়, বিষাণের।

আস্‌ছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশায় নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল!
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ডরূপে
ধূম্র ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আস্‌ছে ভয়ঙ্কর—
ওরে ঐ আস্‌ছে ভয়ঙ্কর!'
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌![৭৬]

এই-যে বিদ্রোহের, ধ্বংসের আবেগ-উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ হইতে টানা কাব্য-রচনা চলে না, পুনরাবৃত্তি ছাড়া। সুতরাং অনিবার্য ভাবেই অতঃপর নজরুলের কবিতা প্রেমের আবেগের ও প্যাশনের উচ্ছ্বাসের পথ ধরিল। নজরুল তরুণ "অতি আধুনিক" কবিদেব পথপ্রদর্শক হইলেন। কল্লোলে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০) বাহির হইল তাঁহার 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে'। নজরুলের কবিতা এখন খাদের অনুসরণ করিল।

নজরুলের প্রেমের কবিতায় যে দেহ-বাদ তাহা মোহিতলালের দেহ-বাদের তুলনায় আবেগ সংযত।

আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছে গোপন,
বৃথা আমি খুঁজে মরি জন্মে জন্মে করিনু রোদন।
প্রতি রূপে, অপরূপা, ডাক তুমি,
চিনেছি তোমায়,
যাহারে বাসিব ভালো সে-ই তুমি
ধরা দেবে তায়![৭৭]

নজরুলের প্রথম কবিতার (ও গানের)[৭৮] বই 'ব্যথার দান' (১৯২১), তাহার পর 'অগ্নিবীণা' (১৯২২), 'ছায়ানট' (১৯২৩), 'দোলনচাঁপা' (১৯২৩), 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪), 'ভাঙ্গার গান' (১৯২৪), 'ফণিমনসা' (১৯২৪), 'পূবের হাওয়া' (১৯২৫), 'চিত্তনামা' (১৯২৫), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'বুলবুল' (১৯২৮), 'জিঞ্জির' (১৯২৮), 'চোখের চাতক' (১৯২৯), 'চক্রবাক' (১৯২৯), 'সন্ধ্যা' (১৯২৯), 'সুরাসাকী' (১৯৩২), 'জুলফিকার' (১৯৩২), 'নূতন চাঁদ' (১৯৪৫), 'সিন্ধু-হিল্লোল', 'ঝিঙ্গে ফুল', ইত্যাদি। কতকগুলি বই, নেহাৎ পুস্তিকা—'বাঙালীর গান' (১৯২৪), 'সাম্যবাদ' (১৯২৫), 'সিরাজ' (১৯৩২) ইত্যাদি। অনেকগুলি বইয়ের নাম হইতেই বোঝা যায় যে কবির মন পলিটিক্‌সে জড়াইয়া পড়িয়াছে। নজরুল হাফেজের অনুবাদও করিয়াছিলেন,—'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' (১৩৩৭ সাল)। 'ব্যথার দান' (১৯২১), 'রিক্তের বেদন' (১৯২৬), 'শিউলি মালা' (১৯৩১) ও 'সোনালী স্বপন' (১৯৩৩) গল্পের বই। 'কুহেলিকা' (১৩৩১ সাল), 'মৃত্যুক্ষুধা', 'বাঁধন হারা' ও 'জীবনের জয়যাত্রা' (১৯৩৯) উপন্যাস। 'ঝিলিমিলি' (১৯৩০)[৭৮ক] ও 'আলেয়া' (১৯৩২) নাটক। 'দুর্দিনের যাত্রী' ও

'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধ পুস্তিকা।

নজরুলের কবিতার বিশিষ্টতা ছন্দের চপলতায় ও বাগ্‌ভঙ্গির ওজস্বিতায়। তৎসম ও তদ্‌ভব শব্দের সঙ্গে আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের প্রয়োগ তাঁহার রচনারীতিকে ওজস্বী করিয়াছে। তবে শব্দভার-সাম্যের অভাবে কোন কোন কবিতা অত্যন্ত অস্বচ্ছ ও দুর্বল হইয়াছে। ভাবের দিক দিয়া আবেগের অকৃত্রিমতা ও অধীর তীব্রতা নজরুলের কবিতার প্রধান বিশিষ্টতা।

নজরুলের কবিতা সত্য অর্থে সাময়িক কবিতা। অর্থাৎ সে সময়ে দেশের মধ্যে এমন কবিতার আসর প্রস্তুত হইয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলন বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যতটুকু আলো, যতটুকু ভালো, যতটুকু মুক্তি আনিয়াছিল তাহা নজরুলের কবিতা-গানের দ্বারা অনেক অংশে সম্ভাবিত হইয়াছিল। নজরুলের কবিতার ছন্দঃস্পন্দ ও ভাবের উচ্ছ্বাস পাঠকের চিত্তে যে বিস্ফার সঞ্চারিত করিয়াছিল তাহার মূল্য সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরবর্তী সাহিত্যের পক্ষে তুচ্ছ নয়। কবি নজরুল ইস্‌লামের প্রাণ-প্রাচুর্যের সমগ্র প্রকাশ তাঁহার কবিতা গানের মধ্যে নাই। তাঁহার বলিষ্ঠ প্রাণবত্তা তাঁহার সহচর ও অনুচর কতিপয় তরুণ লেখককে যে নাড়া দিয়াছিল তাহাতেই নজরুলের সাহিত্যশক্তির যথার্থ পরিচয় উহ্য রহিয়াছে॥

৮ সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি

দ্বিতীয় দশকের কবিতালেখকেরা অনেকেই পল্লীজীবনের নিরাবিল শান্তিসুখের বর্ণনায় মুখর হইয়াছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু অল্পবিত্ত পল্লীজীবন দিন দিন কষ্টময় ও দুর্বহ হইয়া আসিতেছিল। সেই অনুপাতে কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে কলকারখানার শ্রমজীবীর সংখ্যা বাড়িতেছিল। পল্লীবাসীর দুঃখময় ও শহরবাসী শ্রমিকের কদর্য জীবনযাত্রার দিকে কবিতালেখকদের এইবার নজর পড়িল। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৬৫) তাঁহার 'পল্লীব্যথা'য় (১৯২০)[৭৯] কয়েকটি কবিতায় পল্লীজীবনের নিরানন্দের ছবি তুলিয়া ধরিলেন।

> গম্ ধরে' আছে, পাতাটি কাঁপে না, ছম্‌ছম্ করে দেহ,
> দেবতা-বিহীন দেবালয় আজ জনহীন সব গেহ!
> মানুষের গেহে প্রেতের নৃত্য রণতাণ্ডব সম,
> আপন রক্ত আপনি শুষিছে নিষ্ঠুর নির্মম।

কাব্যশিল্পে অথবা কাব্যবস্তুতে কোন নির্দিষ্ট আদর্শ অথবা উদ্দেশ্য লইয়া কবিতা রচনায় হাত দেন নাই এমন কয়েকজন কবিও কিছু না কিছু পাঠযোগ্য ও উৎকৃষ্ট মৌলিক ও অনুবাদ কবিতা লিখিয়াছিলেন। যেমন "সুরেশ্বর শর্মা" (১৮৮১-১৯৪৪, বিজ্ঞানাধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের কবিনাম বা "তখল্লুস্")। ইঁহার কবিতা-গ্রন্থ 'শতপর্ণী' (১৯৩৬),[৮০] 'পর্ণজা' (১৯৩৭)[৮১], 'অন্তঃসলিলা' (১৯৩৮), 'জাপানী ঝিনুক' (১৯৩৮)[৮২], 'শেলী-সংগ্রহ' (১৯৩৯)[৮২] 'জোনাকি' (১৯৩৯), 'উপলা' (১৯৪০)[৮২], 'খোয়াই', 'ব্রাউনিঙ পঞ্চাশিকা' (১৯৩৯)[৮২], ইত্যাদি। 'ঝরা পালক' (১৯৩৭) গল্পের বই।[৮৩] 'বিচিত্রা' (১৯৪১) প্রবন্ধ (অভিভাষণসংগ্রহ)।

সুধীরকুমার চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৮৩) প্রথমে প্রবাসী-সম্পাদনা কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন কিন্তু দুইটি ছাড়া কবিতার বই নাই এবং সে দুটিও অনেককাল পরে সঙ্কলিত—'জলের লিখন'[৮৪] (১৯৩৮) ও 'একাত্মা' (১৯৪৭)। ইঁহার তিনখানি গল্প-উপন্যাস বই অনেককাল আগে বাহির হইয়াছিল—'রাহুর প্রেম ও অন্যান্য গল্প' (১৯১৯), 'যৌবনের ছিট ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৩) এবং 'আবছায়া' (১৯৩৫)। শেষ বইটিতে একটি প্রেমের কাহিনী পাই। তাহাতে প্রেততত্ত্ব, প্রেতাবেশ এবং মুগ্ধ ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি মিশিয়া গিয়াছে। বইটি উপভোগ্য।

সুধীরবাবুর কবিতা সাধারণত একটু বড় বহরের। ইঁহার কবিতায় স্বচ্ছন্দ ও অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সৌষ্ঠব দেখা দিয়াছে। যেমন

এই ভয়াতুর হাসি, এই যে বিপন্ন হাসি,
এই অপরাধী হাসি,—কতকাল রবে এরে লয়ে ?
কোন শুদ্ধ সঙ্গীহীন অন্ধকার বর্ষারাতে
বুক কি ওঠেনি ভার হয়ে
অনামা অমানা বেদনাতে,
শুধু শুধু দুটি ফোঁটা জলকণা কখনো কি
জড়ায়ে আসেনি আঁখিপাতে,
ব্যথা সে কি বলে নাই, আছে আছে,
তবু সে যে আছে।
মনে হয় ত্রাণ কারো নাহি।
প্রতিটি কীটাণু আর তৃণাঙ্কুর সনে মোরা চলিয়াছি একই পথ বাহি,
অন্তরের পানে অনিবার ;
সে-পথে যা-কিছু আছে সে আলো সবার ,—
হোক তা দহন, হোক অনাদর, অপমান, শ্লেষ,
ভাষার অতীত ব্যথা, সহ্যাতীত ক্লেশ,
সে-সবই সহিতে হবে সবাকারে কোনো-একদিন।
অনন্ত কান্নার ঋণ
যেতে হবে কাঁদিয়া শুধিয়া
বেদনার কিম্বা সমবেদনার আঁখিজল দিয়া।[৮৫]

তৃতীয় দশকের শেষের দিকে আরও কয়েকজন নবীন লেখক দেখা দিয়াছিলেন যাঁহারা কবিতা-রচনায়, অনেকে গদ্য-রচনায়ও, বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ পরবর্তী কালে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন।

কান্তিচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৬-১৯৪৮) ফিট্জেরাল্ডের ওমরখয়্যাম অনুবাদ করিয়াছিলেন। এ অনুবাদ পাঠকবর্গের অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। মৌলিক রচনা 'ধূমকেতু' (১৯৪৫)। ধূমকেতুতে নয়টি গল্প ও আটটি "কথিকা" আছে। কথিকাগুলি পূর্বে 'সেবিকা' নামে পুস্তিকাকারে বাহির হইয়াছিল। কবিতা রচনায় তাঁহার দক্ষতা মোটামুটি ছিল। 'সনেট' নামে একটি কবিতা পুস্তিকার লেখক ছিলেন। বিচিত্রা পত্রিকা হইতে তাঁহার কবিতা রচনার নমুনা দিতেছি।

ওপারে জ্বলিছে চিতা—শিখা তার যেন
চুমিবারে চায় ভীত কুণ্ঠিত আকাশ ;
এ পারে সাঁঝের বেলা—মনে লাগে হেন
কর্ণে পশিতেছে কার তৃপ্তির নিঃশ্বাস।
চিতা নহে—
ক্ষুব্ধ দিবসের সে যে বিদায় চাহনি।
সে নিঃশ্বাস—
গৃহমুখী কপোতের ক্লান্ত পদধ্বনি।..

ওপারে শুনেছি যেন অশ্রু-ভেজা সুরে
আশাহত জীবনের চরম আহ্বান ;
এপারে সরিয়া যায় দূর হতে দূরে
অলকের গন্ধ কার—স্মৃতি অবসান।
সুর নহে—
ঊর্মি সাথে পবনের লুকোচুরি খেলা।
গন্ধটুকু—
আমারি যে সাজি হতে বহে সন্ধ্যাবেলা।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৫) ডাক্তার-সাহিত্যিক। রচনারীতি বলিষ্ঠ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিসমন্বিত। কিছু প্যারডি, ব্যঙ্গগল্পের ও কবিতার এবং 'যোগভ্রষ্ট' (১৯২৯) ও 'দশচক্র' (১৯৩২ ?)[৮৬] উপন্যাসের ইনি লেখক। সমসাময়িক উপন্যাসের মধ্যে রচনায় ও কল্পনায় যোগভ্রষ্টের বিশেষত্ব আছে। যোগভ্রষ্টের গল্পকাহিনী সামান্যই। সমকালীন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক তথা গার্হস্থ্য সমস্যাঘটিত। লেখকের চিন্তার প্রখরতা ও স্পষ্টতা অনন্যসাধারণ। চরিত্রচিত্রণ স্বভাবসঙ্গত। অনেকটা ঘরে-বাইরের কথা মনে পড়ায়। ঘটনা ১৯২৬ অব্দের দিকে। তখন কলিকাতায় প্রথম হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা লাগিয়াছিল।

> 'ক' বাঁশী বাজাইল। তাতে 'খ'-এর ধর্মে আঘাত লাগিল। তাই খ, গ আসিয়া ঘ-এর মাথা ফাটাইল।...
>
> নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ চীৎকার করিতেছেন, 'We are fighting! We are fighting' আর কেহ কেহ বলিতেছেন, 'না না। নেতারা fight করিবেন কেন ? এ সমস্তটাই গুণ্ডাদের কাজ। গুণ্ডারা ধর্মের জন্য মাতিয়াছেন।' 'ধর্মসংস্থাপনায়' ভগবান কত বিচিত্র রূপেই না অবতীর্ণ হইয়াছেন। এবারে 'কেশবকৃষ্ণও গুণ্ডারূপ জয় জগদীশ-হরে।' এদিকে আর একদল বলিতেছেন, 'ও ধর্ম-টর্ম মিছা কথা। ব্যাপারটা Purely economic. যোগ্যতার পুরস্কার কেবল যোগ্য ব্যক্তিরাই পাইবে কেন ? ইহা লইয়াই বিবাদ তবে এই Struggle যথেষ্ট মত্ততা ও উৎসাহ আনিবার জন্যই ধর্মের ছাপ দেওয়াই হইয়াছে।'

নরেন্দ্র দেব (১৮৮৯-১৯৭১) ও তাঁহার পত্নী রাধারাণী দেবী (১৯০৪-১৯৮৯) দুই জনেই কল্লোলে লিখিতেন। মেঘদূতের ও ওমর খৈয়ামের ইংরেজী অনুবাদের নরেন্দ্রবাবুর কৃত বাঙ্গালা তর্জমা সমাদৃত হইয়াছিল। ইঁহার মৌলিক কবিতার বই 'বসুধারা'

(১৯২৮)। 'বোঝাপড়া' (১৯২০, দ্বি-স ১৯২৬) ও 'সুহাসিনী' (১৯৩৮ ?) গল্পের বই। 'গরমিল' (১৯২৫) বিয়র্ণসনের (Bjornson) একটি নাটিকার কাহিনী অবলম্বনে লেখা। 'যাদুঘর' (১৯৩০) উপন্যাসটি প্রথমে কল্লোলে (১৩৩৪ সাল) বাহির হইয়াছিল। অপর গল্প-উপন্যাসের বই—'খেলার পুতুল' (১৯২৯), 'পরাগ ও রেণু' (১৯৪৪) ইত্যাদি। 'আকাশ কুসুম' (১৯৩৭) কিশোর পাঠ্য। 'বসুধারা' কাব্যগ্রন্থ হইতে তাঁহার কাব্য রচনার নমুনা দিতেছি।

> কুহেলি-আচ্ছন্ন-ঘন শিশির সন্ধ্যার অন্ধকারে
> কে যেন প্রসারি দীপ আকাশের নীহারিকা পারে
> মেলিয়া সাগ্রহ দৃষ্টি অন্বেষিছে কোথা শূন্য-সীমা
> সন্ধানে ব্যাকুল যেন নিঃশেষিয়া অনন্ত নীলিমা।

রাধারানী দেবী মুখ্যত কবি। ইঁহার স্বনামে কাব্যগ্রন্থ 'লীলাকমল' (১৯৩০), 'বনবিহগী' (১৯৩৭), 'সিঁথিমৌর' (১৯৩২) ইত্যাদি। "অপরাজিতা দেবী" ছদ্মনামে ইনি বাহির করিয়াছিলেন 'কবিতার খাতা' (১৯৩০), 'বুকের বীণা' (১৯৩০), 'আঙিনার ফুল' (১৯৩৪), পুরবাসিনী (১৯৩৫), 'বিচিত্ররূপিণী' (১৯৩৭)। ছদ্মস্বাক্ষরিত এই কবিতাগুলি লঘু এবং উপভোগ্য রচনা। এগুলি কিরণধনের কবিতা স্মরণ করায়। প্রবাসী (?) পত্রিকা হইতে তাঁহার কবিতার একটু নমুনা দিই।

> আজকে আমি তো চা-টা খাব না মা, চা দিতে বারণ করো
> ভাইফোঁটা আজ, তাও ভুলে গেছ ? মা তুমি কেমন তরো।
> বিনু আম্‌লুকে ফোঁটা দেব আমি, উঠেছি তাই তো ভোরে।
> বাগানেতে গিয়ে দুর্বো ও ফুল এনেছি আঁচলে করে।

রাধাচরণ চক্রবর্তী (১৮৯৩-১৯৩৮) কিছুকাল প্রবাসী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার কবিতা প্রবাসী ছাড়া কল্লোল প্রভৃতি অন্যান্য পত্রিকায়ও বাহির হইত। ইঁহার কবিতার বই 'আলেয়া' (১৯৩০), 'দীপা' (১৯৩৩) ইত্যাদি। গল্পের বই 'বুকের ভাষা' (১৯৩৪), 'বৈরাগীর চর' (১৯৩৫) ও 'চক্রপাক' (১৯৩৬)। উপন্যাস 'মৃগয়া' (১৯৩৪), 'সাত তাল' (১৯৩৫), 'কো-এডুকেশন' (১৯৩৫), 'ভাঙ্গন ভাঙ্গা' (১৯৩৫), 'ঘরমুহানী' (১৯৩৫), 'ঝড়' (১৯৩৬) ইত্যাদি।

'আলেয়া' কাব্যগ্রন্থ হইতে ইঁহার কবিতা রচনার একটি নমুনা দিই। কবিতাটির নাম 'মোহ'।

> কে যায় ?—"মানব মনের মৃগ।"
> কোথায় ?—"মৃগ-তৃষ্ণিকায়।"
> হায়রে মূঢ়! সরস-তৃষা
> মরীচিকায় তৃপ্তি পায় ?
>
> "রূপের পথের পথিক আমি
> আগুন দেখে আর কি থামি ?
> পতঙ্গ এই পোড়ার পথে—

দীপের মুখে দীপ্তি ভায় !”

কে যায়—“তোমার চিত্ত চাতক !”
কোথায় ?—“বোশেখ-অম্বরে !”
কই সে বারিদ, কই সে ধারা,
কাজ্‌রী সুর-ছন্দ রে ?

আকাল তাহার দিন-বীণাটির
রোদের তার দিয়েছে মীড়
‘ফটিক-জলে’র দীপক রাগে
এখন যাক্‌ ফেটে মোর কণ্ঠ রে ।

রাধাচরণ চক্রবর্তীর মতো প্যারিমোহন সেনগুপ্তও (১৮৯৩-১৯৪৭) প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক ছিলেন । পরে কলেজে বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক হন । ইঁহার কবিতার বই ‘অরুণিমা’ (১৯২২) ও ‘কোজাগরী’ (১৯৩২) ।

অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৬-১৯৬৬) কবিতা প্রবাসী, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইত । ‘আকাশগঙ্গা’ (১৯২৫) বাহির হইবার সুদীর্ঘকাল পরে ইঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবিতা পুস্তক ‘নূতন কবিতা’ (১৯৩৫) ও ‘চার্বাকের উক্তি’ (১৯৫৫) বাহির হইয়াছিল । ইঁহার কবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । শেষ দুই কবিতা-পুস্তিকা হইল ‘বৈদিকী’ ও ‘শেষ-স্বাক্ষর’ । শেষ গ্রন্থটি কবির তিরোধানের পর প্রকাশিত হইয়াছে । নিম্নে ইঁহার একটি কবিতার কিছু অংশ উল্লেখ করিতেছি ।

আমি শুধু নিশিদিন গেয়ে চলি আমারি সে গান,
দিকে দিকে আমারেই হেরি, আমারেই করি অনুমান,
প্রিয় বলে ভালবাসি, ঢালি প্রেম, যাচি আত্মদান ।...
কালের বন্ধন ছিঁড়ি আমি নিত্য করি অধিষ্ঠান
ধরণীর লীলাঙ্গনে যুগে যুগে মোর অভিযান,
সৃষ্টির সহস্র দলে আমি মধু অমৃতায়মাণ !

হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) ছাত্রাবস্থাতেই সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন । ইঁহার কবিতার বই ‘সাথী’ (১৯৩০), ‘স্বপ্নসাধ’ (১৯২৭, তৃ-স ১৯৫৫) ও ‘অষ্টাদশী’ (১৯৩৮) । ‘নদী ও নারী’ উপন্যাস । ‘ধারাবাহিক’ (১৯৪২) ; প্রবন্ধের বই : দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি আলোচনার গ্রন্থ হইল—‘ইমানুয়েল কান্ট’ (১৯৩৯), ‘বাংলার কাব্য’ (১৯৪২), ‘মোসলেম রাজনীতি’ (১৯৪৩) এবং ‘মার্কসবাদ’ (১৯৫১) ।

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কবিতা-লেখক—‘চারণ’ ইত্যাদির রচয়িতা কনকভূষণ মুখোপাধ্যায় (?— ১৯৪৭) ; টুনটুনির গান (১৯৩০)-এর রচয়িতা গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪) । ইনি চার-পাঁচখানি কবিতাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । “টুনটুনির গান” গ্রন্থ হইতে ইঁহার রচনার একটু নমুনা দিই ।

আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল মানব-নন্দনে,

ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে ঘুমিয়ে আছে মন্তরে
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি পাতার বন্ধনে।...

ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।
অবাধ আলোর আমরা পুত্ নূতন বাণীর অগ্রদূত
কত কী যে করব মোরা নাইকো তাহার অন্ত রে।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭৪) 'সবহারাদের গান'-এর (১৯২৯, দ্বি-স ১৯৩০) লেখক। ইঁহার রচনাশৈলীর নিদর্শন ('নারী স্বর্গের দ্বার', সর্বহারাদের গান) নিম্নরূপ

নারী নরকের দ্বার—
জানি না এ কথা প্রথম ধ্বনিত হইল কণ্ঠে কার।
সে কি কোনদিন জীবনে কখনো পায়নি মায়ের কোল?
কচি তনুখানি কোলে করে তার দেয় নাই কেহ দোল?
কপালে তাহার টিপ দিবে বলে চাঁদেরে সাধেনি কেহ?
চোখে তার কেহ দেয়নি কাজল? বুকে বেঁধে তার দেহ
শোনায়নি তারে কোনো নারী কি গো ঘুম-পাড়ানীর গান?
পড়ে গেলে তারে 'ষাট্' 'ষাট্' বলে করে নাই চুমা দান?...

নিমায়ের প্রেম বিকশিত হল শচীর হিয়ার তলে,
জননী সুনীতি ধ্রুবের হৃদয় ফুটাইল শতদলে,
যুদ্ধ জয়ের মন্ত্র শিখিল অর্জুন-নন্দন
মাতার গর্ভে গোপনে, নরের পিছনে নারীর মন।
পুরুষ প্রথম পাইয়াছে রূপ নারীর রূপের মাঝে,
যা কিছু তাহার কাব্যের মাঝে নারীর ছন্দ বাজে।

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত (১৮৯৩-১৯৬৬) ছিলেন মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট। কবিতা রচনায় তিনি পারদর্শিতা দেখাইয়া ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম হইল 'মন্দিরের চাবি' (১৯৩১)। নিম্নের 'নীলকণ্ঠ' কবিতাটি ('মন্দিরের চাবি' গ্রন্থভুক্ত) হইতে তাঁহার রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যাইবে।

আবার বারিধি মন্থি—মন্থ শেষে উঠিল গরল
মুখ-পদ্মমধু-ভৃঙ্গ দেববৃন্দ পলায় নিলাজ,
অগ্রে যান দেবরাজ স্বর্গবধূ বিরহে চঞ্চল
সোমাসব পান লাগি বাসবের তৃষ্ণা বড় আজ।

মান্দার-মন্থন স্রাত বাসুকির বিশ্বনাশা বিষ
বিশ্ব বুঝি দগ্ধ হয় বিশ্বনাথ কোথা আছ বসি
দ্বন্দ্বহীন সদানন্দ স্বচ্ছন্দে নিমগ্ন অহর্নিশ
সৃষ্টি যার একরেণু কাল যার নিমেষ-বয়সী।

সৃষ্টি কভু নাশ হয় ? সৃষ্টি তার,—মৃত্যু যার দাস
বজ্রাগ্নি প্রলয়-বহ্নি, তাহার ফুৎকারে হয় লয়,
সত্য শিব-সুন্দরের সমাধির স্মিত স্নিগ্ধ হাস
হলাহল কালানল নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে সুধাময় ।

বিশ্বের বৈধুর্য-ব্যথা বৈদূর্যের নীলাভায় নীল
নীলকণ্ঠ-শিরে চন্দ্র সুধাস্যন্দে ভাষায় নিখিল ।

ভারতীয় শব্দতত্ত্ববিদ মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) ছিলেন বসিরহাট নিবাসী । ইনি হইলেন প্রথম বাঙ্গালী যিনি পাশ্চাত্য মতে শব্দবিদ্যার আলোচনা করিয়াছিলেন, অপর জন হইলেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৬) । ইঁহারা কবি ছিলেন না, কিন্তু গদ্য রচনার মধ্য দিয়া কবিত্বের আবহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । ইঁহারা দুইজনেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও অধ্যাপক ছিলেন ।

"লীলায়িতা' (১৯৩৪), 'প্রাক্তনী' (১৯৪১) ইত্যাদির রচয়িতা সুশীলকুমার দে (১৮৮৯-১৯৬৮) এবং 'মোহনা' (১৯৩২)-র রচয়িতা কৃষ্ণদয়াল বসু (১৮৯৭-১৯৭২) হইলেন অপর দুইজন কবিতা-লেখক । (প্রসিদ্ধ সাঁতারু) শান্তি পাল (১৮৯৫-১৯৬৮) কয়েকটি কবিতাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । এইগুলি হইল 'খেয়াপারে' (১৯২৮), 'পথচারী' (১৯৩৬) 'ছন্দবীণা' (১৯৩৭) ইত্যাদি । শান্তিবাবু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পথ অবলম্বন করিয়া ছড়ার স্টাইলে কবিতা রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন । ইঁহার কবিতায় গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার প্রচুর ও লক্ষণীয় ।

'মঞ্জুরী', 'মঞ্জুলা' (১৯৩৩) ইত্যাদির রচয়িতা রামেন্দু দত্ত (১৯০০-১৯৬০) ; 'ছন্দের টুংটাং' (১৯৩০) ইত্যাদি শিশুপাঠ্য ছড়া ও কবিতাগ্রন্থের রচয়িতা সুনির্মল বসু (১৯০২-১৯৫৭) ; 'নক্সী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯), 'রাখালী' (১৯২৭), 'বালুচর' (১৯৩০), 'ধান খেত' (১৯৩২) ইত্যাদির রচয়িতা জসিমউদ্দীন (জন্ম ১৯০৩-১৯৭৩) ; 'মরাল' (১৯৩৪) রচয়িতা কাদের নওয়াজ (জন্ম ১৯০২) ; 'রিক্তা' (১৯১৫) রচয়িতা ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; 'কুটীরের গান' (১৯৩৪) ইত্যাদি রচয়িতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৫) ; 'ময়নামতীর চর' (১৯৩২) ও 'অনুরাগ' (১৯৩২) কবিতাগ্রন্থের ও 'ঘূর্ণিহাওয়া' (১৯৩০) 'অস্তাচল' (১৯৩৩) প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক বন্দে আলী মিয়া (জন্ম ১৯০৭) ; 'দীপায়ন' (১৯৩২), 'মধুছন্দা' (১৯৩৪), 'নীরাজন' (১৯৩৮) ও 'সায়ন্তনী' (১৯৪০) রচয়িতা অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৯০৪-১৯৬৪) ; 'পদ্মরাগ' (১৯৩০), 'ছন্দা', 'নির্মাল্য' 'মন্দাকিনী' ইত্যাদির রচয়িতা শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (?-১৯৫৯) ; 'ব্যথার পরাগ' রচয়িতা কৃষ্ণধন দে ; 'মোহানা' রচয়িতা কৃষ্ণদয়াল বসু (১৮৯৭-১৯৭২) ; 'হিঙ্গুল নদীর কূলে' (১৯৩৫) ও 'কাঁশবনের কন্যা' (১৯৩৮) রচয়িতা ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় (১৯০৫-১৯৭৫) ; 'মুক্তিপথে' (১৯৩১) ও অল্পবয়স্কের পাঠ্য 'তিন্তিড়ী' প্রভৃতি রচয়িতা শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৪) ; 'দক্ষিণ হাওয়া' (১৩৩৪ সাল) ও 'অসি ও মসী' (১৩৪৭ সাল) ইত্যাদি রচয়িতা প্রভাতকিরণ বসু (জন্ম ১৯০৮) ; 'সুরধনী'র (১৯২৭) রচয়িতা শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার কর ; 'আরতি' (১৯২৮) রচয়িতা ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ; 'উদিতা' (১৯২৯) রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী ; কবিতার বই 'অভিযান' ও

উপন্যাস 'কবিতার জন্মদিন'এর (১৩৪৭ সাল) লেখক "লীলাময় দে" (আসল নাম প্রফুল্লকুমার দে) ; 'প্রেম ও প্রতিমা' (১৯৩৪) ইত্যাদির লেখক রমেশচন্দ্র দাস ইত্যাদি ॥

টীকা

১ তুলনীয় সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাঠকোঠায়' (পৌষ ১৩২৮)।

২ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নারায়ণের বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ইঁহারই মাধ্যমে ঢাকার তরুণ ছাত্র ও ভাব-শিষ্য বুদ্ধদেব বসুর কৈশোব কবিতা ('যাত্রী',) নারায়ণে বাহির হইয়াছিল (ফাল্গুন ১৩২৮)।

৩ কল্লোল (কার্তিক ১৩৩৬), প্রথম রচনা।

৪ কালি-কলম ভাদ্র ১৩৩৪।

৫ 'পত্র। আধুনিক সাহিত্যের আর এক দিক' (১০ কার্তিক ১৩৩৪), কালি-কলম কার্তিক ১৩৩৪।

৬ 'শনিবাবেব চিঠি'। প্রথম প্রকাশ সাপ্তাহিক (শ্রাবণ ১৩৩১) পরে মাসিক রূপে। নবপর্যায় ১৩৩৪ সাল হইতে।

৭ "বাংলা কাব্যের নবতম সম্ভাবনার প্রতি যিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন, রবীন্দ্রনাথের (ও সত্যেন্দ্রনাথের) অনুকরণে তিনিও প্রথমে স্বপ্ন ফিরি করে' বেড়াতেন, কিন্তু সেই কবিরই পরিণত বয়সের রচনায় বর্তমান অতি আধুনিকতার বীজ লুকিয়ে আছে।" (প্রগতি, আষাঢ় ১৩৩৬)।

৮ 'আধুনিকতম সাহিত্য', শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত (বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৩৪)।

৯ 'সাহিত্যরূপ' (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৫)।

১০ আধুনিকেরা একথার জবাব দিতে পারেন নাই। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তবুও বলিলেন, "উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছি নব নব জন্ম-সম্ভাবনা" ('আবিষ্কার', কল্লোল, কার্তিক ১৩৩৬)।

১১ বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৫।

১২ ঐ ভাদ্র।

১৩ ঐ, আশ্বিন।

১৪ ঐ, অগ্রহায়ণ।

১৫ রচনাকাল জুন ১৯২৮। প্রথম প্রকাশ প্রবাসী, ভাদ্র চৈত্র ১৩৩৫।

১৬ দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠি (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৪)।

১৭ ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা হইতে এই ব্যাপক অভিযানের আরম্ভ।

১৮ শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৩৫।

১৯ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন সুধীরচন্দ্র কর, শান্তিনিকেতন হইতে। মনে হয় এই পত্র প্রেরণে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি ছিল।

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ পৃ ৫২৩।

২১ নূতন-খাতার দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের দুই-একটি কবিতা বর্জিত এবং নূতন তিনটি কবিতা গৃহীত হইয়াছিল। তৃতীয় সংস্করণে (১৯৫২) কয়েকটি অসঙ্কলিতপূর্ব কবিতা যোগ করা হইয়াছে।

২২ মানসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।

২৩ ঐ, আষাঢ়।

২৪ প্রথম প্রকাশ মানসী, ১৩২০ সাল।

২৫ প্রথম প্রকাশ (অংশত) মানসী, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩২১। মোহিতলালের কবিতার অভিনব বৈষ্ণব-শক্তিবাদের উৎস-সন্ধান এই রচনাটিতে মিলিবে। "তবেই বেদান্তবেদ্য চরম তত্ত্বটি, একান্ত এক অক্ষয় নারীতত্ত্বই হইল নাকি ? শ্রীরাধাই কি মূলা আদ্যাপ্রকৃতি শক্তি ?

২৬ কার্তিক ১৩১৩।

২৭ তের পৃষ্ঠার ক্ষীণকায় পুস্তিকা।

২৮ প্রকাশের উদ্যোক্তা দেবেন্দ্রনাথই।

২৯ দ্বিতীয়-সংস্করণে (১৯৪১) সাতটি কবিতা বেশি আছে। প্রথম সংস্করণে কবিতা-সংখ্যা তেতাল্লিশ।

৩০ যেমন 'বসন্ত-আগমনী', 'আবির্ভাব', 'ইরাণী' ইত্যাদি।

৩১ 'দিলদার', 'হাফিজের অনুসরণে', 'বেদুইন্' ইত্যাদি।

৩২ 'গজল্ গান' (প্রথম প্রকাশ ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৮)।

৩৩ মানসী, ফাল্গুন ১৩২৭ পৃ ৩৮-৩৯।
৩৪ ভারতী, ফাল্গুন ১৩৩০।
৩৫ স্মর-গরলে সঙ্কলিত।
৩৬ বিস্মরণীতে সঙ্কলিত 'শব-সঙ্গীত', 'অগ্নি-বৈশ্বানর', 'বাদল-রাতের গান', 'ঘুঘুর ডাক' দ্রষ্টব্য।
৩৭ 'ইরাণী' (স্বপন-পসারী)।
৩৮ 'রূপ-মোহ' (স্মর-গরল)।
৩৯ 'চাঁদের বাসর' (ঐ)।
৪০ প্রথম প্রকাশ ভারতী, ১৩২৬ সাল।
৪১ 'ব্যথার আরতি' (বিস্মরণী)।
৪২ 'স্পর্শ-রসিক' (ঐ)।
৪৩ 'স্মর-গরল' (স্মর-গরল)
৪৪ 'বুদ্ধ' (ঐ)।
৪৫ প্রথম প্রকাশ ভারতী, পৌষ ১৩২৬।
৪৬ 'কেতকী'।
৪৭ 'আঁধারের লেখা'।
৪৮ 'মাসকাবারি', ভারতী, অগ্রহায়ণ ও মাঘ ১৩২৬ দ্রষ্টব্য।
৪৯ 'মণিলালের আসর' দ্রষ্টব্য (পৃ ১৫৪)।
৫০ ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৮। নিশ্চয়ই কবিতাটিতে ১৩২৮ সালে ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র সংবর্ধনার প্রতি ইঙ্গিত আছে।
৫১ মোহিতলালের 'পান্থ' প্রভৃতি বিশিষ্ট কবিতা কল্লোলে বাহির হইয়াছিল।
৫২ 'রবির প্রতি' (হেমন্ত-গোধূলি)।
৫৩ পূর্বে দ্রষ্টব্য।
৫৪ 'পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে'।
৫৫ 'আমি' (মানসী, পৌষ ১২৩১)।
৫৬ ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬।
৫৭ ঐ পৌষ।
৫৮ প্রবাসী, মাঘ ১৩১৭। প্রথম প্রকাশিত কবিতাটির শেষ স্তবকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের 'তপোভঙ্গ'এর (১৩৩০ সাল) সূচনা আছে। এগুলি 'মরীচিকা'র সঙ্কলিত রূপে বর্জিত হইয়াছে। বর্জিত স্তবকগুলি কি তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের সংজোযন ?
৫৯ প্রথম প্রকাশ মানসী, আষাঢ় ১৩২২। মরীচিকায় সঙ্কলিত, সংশোধন ও সংযোজন সহ। উদ্ধৃতপাঠ মানসী হইতে।
৬০ অতঃপর মরীচিকায় এই চারি লাইন সংযোজিত,

যাব নিরুপায় রূপের শিলায় নিয়ত ঝরে
ঘর্মের নির্ঝর,
সহ্য-অদ্রি সমান যে সহে বক্ষপরে
লক্ষ দুঃখ ঝড়,

৬১ মরীচিকার পাঠে "কামনা" লক্ষণীয়।
৬২ তুলনীয়

ধূ ধূ করে মরুভূমি, যত চলি জীবনে,
মরীচিকা পিছাইয়া যায়,
শুধু দাহ, শুধু তাপ এ মানব
কোথা প্রেম নিত্য রস পায় ? 'প্রেমের স্পর্দ্ধা' (মরীচিকা)

৬৩ 'দুখবাদী'। কবিবন্ধু যতীন্দ্রমোহন বাগচী (যাঁহাকে 'মরীচিকা' ও 'মরুমায়া' উপহৃত) এই কবিতাটির উত্তরে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন।
৬৪ 'কবির কাব্য'।
৬৫ 'দেশোদ্ধার'।
৬৬ 'ক্ষণিকের জাগরণ'।

৬৭ যতীন্দ্রনাথের কবিতাটি মরুমায়ায়, মোহিতলালের কবিতাটি স্বপন-পসারীতে সঙ্কলিত।

৬৮ যতীন্দ্রনাথের কবিতা মরুমায়ায়, মোহিতলালের কবিতা হেমন্ত-গোধূলিতে সঙ্কলিত।

৬৯ বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ছেলেরা সাধারণত স্কুলে ফারসীর বদলে সংস্কৃত শিখত।

৭০ 'আশায়' (প্রবাসী, পৌষ ১৩২৬)।

৭১ এইসব অপরিপক্ক রচনা প্রবাসীতে (১৩২৭ সাল) এবং 'মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র (১৩২৭-২৮ সাল) প্রকাশিত।

৭২ 'হুগলীতে কাজী নজরুল', শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ভট্টাচার্য (দেশ, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১) দ্রষ্টব্য।

৭৩ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৭৪ 'প্রলয়োল্লাস' (প্রথম প্রকাশ 'মোসলেম ভারত' ১৩২৮ সাল) এবং 'বিদ্রোহী' (প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯)।

৭৫ 'দুরন্ত আশা' (মানসী) এবং 'বিজয়ী' (প্রথম প্রকাশ পূরবী, চৈত্র ১৩২৪)।

৭৬ 'প্রলয়োল্লাস'।

৭৭ 'অনামিকা' (কালি-কলম, আশ্বিন ১৩৩৩)।

৭৮ অগ্নিবীণার পূর্বে প্রকাশিত।

৭৮ক দুইটি ছোট নাট্যরচনা আছে।

৭৯ পল্লীবাথার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই নূতন উদ্যমের দিক্‌নির্ণয় করিয়াছেন। "শ্রমজীবীই ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী, শ্রমের জয়গান করা ভবিষ্যৎ সাহিত্যের নিকট বর্তমান যুগ দায়-স্বরূপ অর্পণ করিয়াছে।"

এক বৎসর (১৩৩১-৩২ সাল) সাবিত্রীপ্রসন্ন রাধাকমলের সহযোগিতায় 'উপাসনা' পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৩৩৫-৩৬ সাল হইতে এ কাজ তিনি একক করিতে থাকেন।

৮০ সনেট শতক।

৮১ গদ্য কবিতার বই।

৮২ অনুবাদ কবিতা।

৮৩ গল্পগুলি ছোট ছোট। কয়েকটি খুব ভালো। যেমন, 'অবচনা', 'কাবুলিবিড়াল'।

৮৪ "কবিতাগুলির বেশীর ১৩২৭ হইতে ১৩৩৩ সালের মধ্যে লেখা। ১৩২৭ সালের আগে লেখা একটি এবং ১৩৩৩ সালের পরেরকার রচনা কয়েকটি এই সংগ্রহে আছে।"

৮৫ 'যে কান্না কাঁদিতে ভুলি' (জলের লিখন)।

৮৬ বঙ্গবাণীতে প্রথম প্রকাশিত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
একধ্বনিতে প্রত্যাবর্তন

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপরের পরিচ্ছেদে যে কবিতাকার গল্প ও প্রবন্ধ লেখকদের পরিচয় দিয়াছি তাঁহাদের রচনার সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই সঞ্জাত। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিস্থল রবীন্দ্রনাথের জীবন মধ্যাহ্ন। এই সময়ে তাঁহার দীপ্তি ও প্রভাবশালিতার কথা তাঁহার উক্তিতেই বিবৃত করিতেছি। এই উক্তি আছে 'বঙ্গবাণী' কার্যালয় হইতে প্রকাশিত (১৩১১ সাল) হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের রচিত ও সঙ্কলিত "বঙ্গভাষার লেখক" বইটিতে (পৃ. ৯৬৫-৯৮৬)। এই পুস্তকটিতে আদ্যন্ত বাঙ্গালার কবি ও গল্প উপন্যাসকারদের সম্পূর্ণ পরিচয় দিবার চেষ্টা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিচয় নিজেই লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই রচনার উৎকলিত অংশ হইতে আমার বক্তব্য বোঝা যাইবে। রচনাটি প্রবন্ধাকারে। শিরোনাম "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"।

প্রবন্ধের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

> আমার সুদীর্ঘকালের কবিতালেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।...

কাব্য রচনার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন

> বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই দেখিতেছি যে, যেটা আসন্ন, যেটা উপস্থিত, তাহাকে সে খর্ব্ব করিতে দেয় না।...
>
> কাব্যরচনাসম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই—অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম, তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এই জন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই যে তাহা লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে সকল লেখা উপলক্ষ্যমাত্র ;—তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকার আছেন, যাঁহার

সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য্য প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান। ফুৎকার বাঁশীর এক-একটা ছিদ্রের মধ্যে দিয়া এক-একটী সুর জাগাইয়া তুলিতেছে...কিন্তু ফুঁ ত বাঁশী বাজাইতেছে না ?...

প্রবন্ধের শেষ হইয়াছে এইভাবে

জগতের মধ্যে যাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে—সেই অনির্ব্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে ;—জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ, তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে ; যাহা চোখের সম্মুখে মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে ; যাহা অশরীর-ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে, তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিয়া থাকে ;—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।

ইহার পর সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন ॥

২ প্রমথনাথ বিশী

প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫) আবাল্য শান্তিনিকেতনে শিক্ষিত। স্কুলবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্যে অধিকারপ্রাপ্ত এবং প্রথম হইতেই কবিতা-রচনায় স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী। ইঁহার প্রথম কবিতার বই 'দেয়ালি' ১৩৩০ সালের শেষের দিকে বাহির হইয়াছিল। রচনায় প্রৌঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেল ১৩৩৮-৩৯ সাল হইতে। অতঃপর 'বসন্তসেনা' (১৯২৭), 'প্রাচীন আসামী হইতে' (১৯৩৪), 'বিদ্যা-সুন্দর' (১৯৩৫), 'প্রাচীন গীতিকা হইতে' (১৯৩৭), 'হংসমিথুন' (১৯৫১), 'অকুন্তলা' (১৩৫৩ সাল), 'যুক্তবেণী' (১৯৪৮) ও 'উত্তরমেঘ' (১৯৫৩)।

প্রমথবাবুর কবিতায় দেশি-বিদেশি ঐতিহ্য অস্বীকৃতির কোন চেষ্টা নাই। প্রেম ও প্রকৃতি কবিচিত্তে যে ছায়াপাত করিতেছে তাহারই আলিম্পন কবিতায় অঙ্কিত। গোড়ার দিকে সনেটগুলির মধ্যে অনেক চমৎকার পংক্তি আছে। যেমন

মিলিয়াছে তব অঙ্গে দিবস শর্বরী,
দেখা না দেখার প্রান্তে তব মূর্তি জাগে।[১]

যতটুকু দেখি নাই আছে ততখানি
দ্বিতীয়ার চন্দ্র বলে পূর্ণিমার বাণী ![২]

মাঠ-শালিকেরা কাঁদে ধূসর-ডানায়
দধি-পাণ্ডু শশী দোলে আকাশের কোলে—
স্বপ্নে পাওয়া বায়ু ফেরে শাল-বনে হায়
প্রবালের রসে ভেজা পূবের অঞ্চল।
নিজ মনে ভয়, তাই এমন নিশীথে
তোমারে বলিতে নারি নিকটে আসিতে।[১]

'প্রাচীন আসামী হইতে'র দুই একটি কবিতায় (যেমন ৪৪, ৫২) যেন অক্ষয়কুমার বড়ালের

প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 'বিদ্যা-সুন্দর' আগেকার রচনা (১৩৩৬ সাল)। লেখক তখনো মাইকেলের মুদ্রাদোষ (নামধাতু ও "আহা" ইত্যাদি) পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শেষের দিকের কবিতাগুলি দীর্ঘতর ; রচনায় স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়াছে। একটু উদাহরণ দিই।

হঠাৎ মনে হ'ল ওই চৌকাঠের ফ্রেমে
এখনি সন্নদ্ধ হবে তোমার মূর্তি,
পূর্বাশার পটে রহস্যময়ী ঊষা।
মনে হ'ল এখনি তোমার স্বপ্ন-নাড়া-দেওয়া কণ্ঠস্বর
ধ্বনিত হবে—হ'ল না,
মনে হ'ল জননান্তর-সৌহৃদানি জাগানো তোমার আঁচলের সুগন্ধ
প্রবাহিত হবে—হ'ল না,
মনে হ'ল কোন্ দৈব মৃগয়ায়
বিভ্রান্ত কৃষ্ণসার চন্দ্রকলার মতো
হঠাৎ প্রবেশ করলে তুমি পুরূরবার অগম্য আমার মনের গহন অরণ্যে,
মনে হ'ল—কিন্তু বৃথা মনে হওয়ার
তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই,
তুমি ছিলে না,
তাই এলে না।[৪]

গল্প-উপন্যাস ও সাহিত্যিক-সংবাদপত্রীয় সরস-প্রবন্ধ রচনায় ইনি অশ্রান্ত ও কৃতকার্য। জর্জ বার্নার্ড শ-এর (G.G.S.) অনুকরণে ইনি একদা "প্র-না-বি" ছদ্মনাম আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইনি সংবাদপত্রের রচনায় নিজেকে "কমলাকান্ত" বলিয়াছেন। (মনে মনে ইনি "বঙ্কিম-মধুসূদন" কাল্টে বিশ্বাসী।) প্রমথবাবুর উপন্যাসের বই—'দেশের শত্রু' (১৯২৫, ঢাকা হইতে প্রকাশিত), 'পদ্মা' (১৩৪২ সাল), 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' (১৯৩৭), 'ডাকিনী' (১৩৫২ সাল), 'চলনবিল', 'অশরীরী' (১৯৫১), 'গল্পের মত' (১৩৫২ সাল), 'গালি ও গল্প' (১৩৫১ সাল) 'ধনেপাতা' (১৯৫২) ইত্যাদি। গল্পের বই—'অশ্বত্থের অভিশাপ' (১৩৫৪ সাল), 'ব্রহ্মার হাসি' (১৩৫৫ সাল) ইত্যাদি। নাটকের বই—'ঋণং কৃত্বা' (১৯৩৫), 'ঘৃতং পিবেৎ' (১৯৩৬), 'মৌচাকে ঢিল' (১৯৩৮), 'পরিহাসবিজল্পিতম' (১৯৪৯), ডিনামাইট (১৯৪২) ইত্যাদি। আত্মস্মৃতিমূলক 'শান্তিনিকেতন' (১৯৪৪) অত্যন্ত উপাদেয় রচনা॥

৩ শিবরাম চক্রবর্তী

শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৫-১৯৮০) সাহিত্যজীবনের পরবর্তী পর্যায়ে প্রধানত গল্প রচনাতেই—বিশেষ করিয়া অল্পবয়সীদের জন্য গল্প-রচনাতে—নিয়ত ছিলেন। একদা ইঁহার নিষ্ঠা ছিল অ-লঘু কবিতা রচনায়। তাহার পরিচয় রহিয়াছে একসঙ্গে প্রকাশিত (১৯২৯) দুইখানি সুমুদ্রিত বইয়ে—'মানুষ' ও 'চুম্বন'। এ কবিতাগুলি ১৯২৪ হইতে ১৯২৯-এর মধ্যে লেখা এবং ভারতবর্ষ, উত্তরা, আত্মশক্তি, নবশক্তি প্রভৃতি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।

কবিতাগুলিকে সাময়িক ফ্যাশনের আদর্শ কবিতা বলিয়া লইতে হয়। মানুষের কয়েকটি কবিতায় শ্রমিকের ও দরিদ্র-বঞ্চিতের বেদনার প্রকাশ, চুম্বনে কামরতির জয়োচ্ছ্বাস। রবীন্দ্রনাথের একধরনের কবিতারীতির অনুকরণ ঘনিষ্ঠ ও স্পষ্ট। রচনায় স্বাচ্ছন্দ্য আছে।

মানুষের প্রারম্ভ-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পূর্বপক্ষ পরিকল্পিত।

কে যেন ডাকিল—"ওরে যাত্রী,
পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল এল নবীন প্রভাত !"
শুনিয়া জাগিনু অকস্মাৎ।

জাগিয়া উঠিয়া কবি বুঝিলেন

এ শুধু নূতন পাতা খুলিয়াছে প্রাচীন পঞ্জিকা!

আরো বুঝিলেন

কালও গেছে এইরূপ, আজিকার নবীন প্রভাত
আনে নাই একটু তফাৎ।

মানুষের একটি বিশিষ্ট কবিতা 'বিধাতার চেয়ে বড়ো'।

—মানুষ যখন পথ চলে
তার মনে, জীবনে, সৃজনে, চিত্ততলে—
দুঃখে-সুখে, শোকে-প্রেমে, আসক্তি-আঘাতে,
ব্যর্থতা-ব্যাঘাতে,
বিধাতা, দাঁড়ায়ে রহে ব্যগ্র কুতূহলে,
প্রাণে প্রাণে কহে তার হাত রাখি হাতে—
"এই পথ-সমাপ্তি-উৎসবে
আমি পূর্ণ হবো, বন্ধু, তুমি পূর্ণ হবে।
এই সাধ জাগে মোর সব স্বপ্ন ছেয়ে—
আমি বড়ো হই, যদি তুমি বড়ো হও মোর চেয়ে।"

চুম্বনের একটি বিশিষ্ট কবিতা 'আমি যে তোমারে ভালবাসি'। পৃথিবীর সর্বত্র রমণীর মধ্যে কবি ক্ষণে ক্ষণে চকিতে জীবনের সার্থকতার আভাস দেখিয়াছেন। তবে তিনি ইহাও জানেন যে এ আলোকলতা কখনো জীবনে ধরা দিবে না, তবুও তাহারি জন্য আকুল আকিঞ্চন। কবি যখন পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবেন

—তখনো সে আসিবে সুন্দর
তার লাগি রেখে গেনু মোর কণ্ঠস্বর
আমার এ কবিতার সনে।...
সে দিন সে যেন নাহি মনে করে
অরূপ-সুন্দর তরে আমার এ গান।—
যে-অরূপ বন্দী হোলো সুন্দর তনুতে
তারে আমি বেসেছিনু, চেয়েছিনু ছুঁতে,

চুমিতে চেয়েছি ;

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণব-কবিতাকেও উড়াইয়া দেওয়া হইল।

বৈষ্ণবের গান শুধু বৈষ্ণবীর তরে ;—
নাই তার প্রয়োজন অর্মত্য-জগতে।

৪ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-১৯৭৬) কয়েকটি কবিতা ১৩২৮-২৯ সালের প্রবাসীতে বাহির হয়।[৫] সেগুলিতে রচয়িতার স্বাক্ষর ছিল "শ্রীনীহারিকা দেবী"। (নারী-শিক্ষা-প্রগতির সমর্থক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রিকায় নূতন লেখকের অপেক্ষা নূতন লেখিকার রচনা প্রকাশ অনেক সহজ ছিল।) অচিন্ত্যবাবুর স্বনামে একটি কবিতা ('প্রতিপদের চাঁদ') ১৩২৯ সালের চৈত্র সংখ্যা ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। কাঁচা লেখা হইলেও এই গোড়ার রচনার কোন কোনটিতে লেখকের পরবর্তী কালের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ আছে।

ঘরের কোণে দুয়ার এঁটে বন্দী কেন রহিস্ নারী,
পরিস[৬] কেন যুগল পায়ে অধীনতার শিকল ভারী ?
স্যাঁৎসেতে তোর ঘরের মেঝে হাঁপিয়ে তোলা ধোঁয়ার কালো
দাসত্বেরই পঙ্কিলতা—সেই কি তোমার লাগবে ভালো ?
অত্যাচারের বিক্ষত যে সুধায়-উচ্ছল তোমার বুক,
ঘোমটা খুলি দেখাও তোমার অশ্রু-সজল মলিন মুখ।
বুদ্ধ সায়র শুদ্ধ কর, সত্য তোমার ন্যায়ের দাবী,
পশ্চাতে আজ থাকবে কেন—এই কথাটা দাঁড়াও ভাবি'।[৭]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব আরও কিছুদিন ছিল। এই প্রভাব শুধু ছন্দে আর চলিত শব্দের দ্বারা চিত্র-অঙ্কনেই ক্ষান্ত নয়, চলিত শব্দের রূপ ও অর্থ-পরিবর্তনের চেষ্টা করিয়া লেখক সত্যেন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। এ চেষ্টা অচিন্ত্যবাবুর গদ্য লেখাতে বেশি পাওয়া যায়। তাঁহার রচনার এক প্রধান দুর্বলতাও এইখানে।

বাদল-প্রিয়া, মেঘলা মেয়ে,
শাঙন-সাকী, আয়লো আয়,
কাজল-দেশের স্বপন সখী
আয়লো মৃদুল দোদুল পায়।
হাতছানি দেয় ঝাউয়ের শাখা
চাতক মেলে তাতল পাখা,
মাছরাঙারা কাতর চোখে
আকাশ পানে ঝিমিয়ে চায়,
আয়লো বাদল, ঘুম-কিশোরী,
আয়লো শীতল আদুল গায়।[৮]

এইসঙ্গে চলিয়াছে রবীন্দ্র-অনুসরণ।[৯]

কল্লোলের দ্বিতীয় বর্ষ হইতে অচিন্ত্যবাবু পত্রিকাটির এক মুখ্য লেখক হইয়াছিলেন। অচিন্ত্যকুমারের প্রথম এবং সবচেয়ে বিশিষ্ট কবিতা 'অমাবস্যা' ১৯৩০ অব্দে (দ্বি-স ১৯৪১, তৃ-স ১৯৫৩) পুস্তিকাকারে বাহির হয়। প্রেমের কবিতা, বিচিত্র রসের মিশ্রণে স্বাদু এবং প্রেমের উত্তাপে কবোষ্ণ। সেকালের নবীন কবিদের প্রিয় বিশ অক্ষরের ছন্দ একটানা, ভাঙ্গা ছত্রের যতি নিয়মিত। সুর ও ছন্দের অনুসারী, মৃদুগুঞ্জিত করুণ অনুযোগের—বিরহের—কখনো বর্তমান বেদনার, কখনো অতীত সুখস্মৃতির, কখনো খিন্ন বিতৃষ্ণার, কখনো লুব্ধ ঈর্ষার। কবির ভাব কিন্তু মেঘদূতের যক্ষের মতো নয়। বাদল দিন ভালোই লাগিতেছে স্মৃতিরোমন্থনে।

আজ দিনটিতে কোন কাজ নাই, বসে' আছি নিরালায়,
বাদলের বেলা থেমে থেমে চলে যেন ধিমে তেতালায়।
অন্তরো মন্থর,
বলিতে কি পারো এ দিন কাটিলে কি করি অতঃপর।

ক্ষণলব্ধ, প্রবঞ্চিত প্রেমের চরিতার্থতা মিলিল কবিতায়।

গৃহ নাই, গৃহদীপ নহ তুমি, অবকাশরঞ্জিনী ;
বাহুবন্ধনে নহ গো, ছন্দে করিলাম বন্দিনী। [১০]
লভিলে অমর কায়া,
এই কবিতার প্রতিটি আখরে পড়েছে তোমার ছায়া।

গোড়ার দিকে নজরুলের (এবং যতীন্দ্রনাথের) একটু প্রভাব লক্ষিত হয়। যেমন

বেবাক বুকেতে কাদা পড়িয়াছে, পড়েছে চাকার দাগ,
কামনার কূপে বন্দী মাগিছে সুন্দর অনুরাগ!
লইয়ো অধরে তুলি'
হৃদয় ত আর ভালো লাগিল না, মরিলে মাথার খুলি॥

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আমরা' (১৯৩৩), তৃতীয় 'প্রিয়া ও পৃথিবী' (১৯৩৬)। দুইটিই ছোট বই। মোট সতেরোটি কবিতা। রবীন্দ্রনাথের দিকে ঝোঁক স্পষ্টতর। রোমান্টিকতা গাঢ়তর। রচনা সুষম ও স্বচ্ছন্দ। যেমন

অকস্মাৎ কোথা হতে একদিন আসে সে সময়
শ্মশানের কূল হ'তে সদ্যোজাত ফুলের আঘ্রাণ ;
আকাশে দেখিনা সীমা, তারস্বরে তারারা কী কয়
বুঝি না তাহারো ভাষা, তবু দেহ গীতদীপ্যমান।
সৃষ্টিব উড্ডীন পক্ষে আমি আছি—আমি এক তিল
একদিন,—তার পরে দিন নাই দিনের মিছিল। [১১]

চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'নীল আকাশ' (১৩৫৬ সাল)। কবিতাগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য।

সমসাময়িকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার মুখ্য কবি,—এই অর্থে যে তাঁহার কবিতাকর্ম স্বভাবসিদ্ধ, অল্পায়াসসুন্দর এবং তাঁহার কবিতায় কোন রকম তাৎপর্য বা মোচড় দিবার চেষ্টা নাই।

অচিন্ত্যকুমার গদ্য রচনা শুরু করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের কথিকার অনুসরণ করিয়া। তাঁহার এই ধরনের কয়েকটি রচনা ১৩৩০ সালের শেষের দিকে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। গদ্যরচনার বাহুল্যে ইনি সমগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রথম গদ্য রচনা নরওয়েজীয় ঔপন্যাসিক হাম্‌সুনের 'প্যান'-এর অনুবাদ (১৯৩০)। ইঁহার প্রথম মৌলিক উপন্যাস 'বেদে'-ও (চতুর্থ বর্ষ কল্লোলে, ১৩৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত, পুস্তকাকারে ১৩৩৫ সালে) এই বিদেশি লেখকের প্রভাব-চিহ্নিত। অচিন্ত্যকুমারের লেখায় "আধুনিকতা" অত্যন্ত প্রবল এবং প্রায় কন্‌ভেন্‌শনের মতো। গোড়ার দিকের রচনায় যৌন বিষয়ে যে উৎকট বে-আব্রু মনোভাব দেখা যায় তাহা এই কন্‌ভেন্‌শনের দায়ে। এ বিষয়ে ইঁহার সহযোগী বুদ্ধদেব বসুও অনুৎসাহী ছিলেন না। অচিন্ত্যকুমারের 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' (১৯৩১) ও 'প্রাচীর প্রান্তর' (১৯৩৩) উপন্যাস দুইটি এবং বুদ্ধদেবের গল্পের বই 'এরা ওরা এবং আরও অনেকে' (১৯৩২) অশ্লীলতার ইঙ্গিতবহ্‌ বলিয়া বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল (১৯৩৩)। "আধুনিক" সাহিত্যের ইতিহাসে এই ঘটনা অনুপেক্ষণীয় নয়। অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব শক্তিশালী লেখক, তাই সহজেই ইঁহারা সাহিত্যের এই শক-ট্রিটমেন্ট ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

অচিন্ত্যবাবুর প্রথম গল্পের বই 'টুটা-ফুটা'র (১৯২৮) গল্পগুলি চার পাঁচ বছর আগে লেখা এবং কল্লোল, প্রবাসী ও উত্তরা পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। দ্বিতীয় গল্পের বই 'ইতি'তে (১৯৩২) রচনায় কিছু পাক ধরিয়াছে। ছোটগল্পে ইঁহার যে দক্ষতা পরে প্রকাশিত তাহার পরিচয় ইহাতে আছে। পরবর্তী কালে অচিন্ত্যবাবু দুঃখ-বিলাসের মোহ ত্যাগ করিয়া নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়াছেন। হাকিমী কর্ম সূত্রে ইঁহাকে বাঙ্গালা দেশেব নানা স্থানে ঘুরিতে হইয়াছে এবং অনেক পাঁচপাঁচি মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় মিলিয়াছে। সেগুলি ইনি সার্থকভাবে গল্পে রূপ দিয়াছেন। ইঁহার অপর গল্পের বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অকাল বসন্ত' (১৩৩৯ সাল), 'অধিবাস' (১৩৩৯ সাল), 'ডবল ডেকার' (১৩৪৫ সাল), 'পলাযন' (১৩৪৭ সাল), 'যতনবিবি' (১৩৫১ সাল), 'সারেঙ' (১৩৫৪ সাল), 'হাড়ি মুচি ডোম' (১৩৫৫ সাল) ইত্যাদি। উপন্যাসের মধ্যে এইগুলিও উল্লেখযোগ্য—'আকস্মিক' (১৯৩০, প্রথম প্রকাশ প্রগতিতে), 'কাকজ্যোৎস্না' (১৩৩৮ সাল), 'ইন্দ্রাণী' (১৩৪০ সাল), 'ঊর্ণনাভ' (১৩৪০ সাল), 'নবনীতা' (১৩৪৩ সাল) ইত্যাদি।

একদিক দিয়া অচিন্ত্যকুমার সহগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে একক। ইনি গোড়া থেকেই ভাষার দিকে অতিমাত্রায় নজর দিয়া আসিয়াছেন। তাহার ফলে অচিন্ত্যকুমারের ভাষা কখনো দুর্বল এবং কখনো উৎকট হইয়াছে। পাঠকের চিত্ত চমৎকৃত করিবার জন্য অচিন্ত্যকুমার যেন নানা উপায় ধরিয়াছেন। কবিওয়ালাদের মতো অনুপ্রাসের বুকনি, চলিত ভাষায় সিদ্ধ বাক্যরীতির বিপর্যাস এবং অযথা ও অনুচিত শব্দসৃষ্টি—এই সব এবং সর্বোপরি অতিভাষণ অচিন্ত্যকুমারের লেখনীর মুদ্রাদোষ। ইংরেজীর অনুবাদ এবং চলিত ভাষার বিকৃতিও একটি বড় দোষ। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

...কপালে বসকলি আঁকিয়া খোঁপায় জুঁই ফুল গুঁজিয়া ও হাতে তানপুরা নিয়া যে সব বৈষ্ণব বাউরি হয় তাহাদের চরিত্র... আকস্মিক পৃ ৪। সাধারণ পাঠক বাউরি ব্রজবুলি শব্দ বলিয়া

লইবেন।

ঝড় আসিবে বলিয়া সন্ধ্যাসন্ধিতে সবাই বাড়ী গিয়াছে...ঐ পৃ ২৫। সন্ধ্যাসন্ধি, বেলাবেলির সাদৃশ্যে।

ঘরের উত্তপ্ত নিঃশব্দতার উপর সে যেন একটা ভিজে কম্বল ছুঁড়ে দিল নবনীতা, সিগনেট সংস্করণ ১৯৫৪, পৃ ১৭=threw a damp blanket।

আশ্চর্য, তুমি এখনো কিনা কাব্যের রোদে দিব্যি পিঠ পেতে আছো। ঐ পৃ ৪১।

গাড়িটা তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়ে বেরিয়ে গেল। স্বনির্বাচিত গল্প, ১৯৫৪, পৃ ১৪৫ ;=took a sharp turn ।

গায়ের কাঁথা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গৌরহরি উঠে বসল ঘাই মেরে।...বুড়ো বয়সের নামলা ছেলে ভোলানাথের। ঐ, পৃ ১৪৩।

৫ প্রেমেন্দ্র মিত্র

একদা "আধুনিক কবি" বলিতে যে তিনজনকে বুঝাইত তাঁহাদের মধ্যে প্রথম হইতেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)। গদ্যে ও পদ্যে সমান স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় বহন করিয়া ইঁহার রচনা বাহির হইতে থাকে তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি। ইঁহার প্রথম কবিতার বই 'প্রথমা' বাহির হয় ১৯৩২ অব্দে, তবে ইঁহার বিশিষ্ট কবিতাগুলি সবই প্রায় ১৯২৪-২৮ অব্দের মধ্যে "আধুনিক" সাহিত্যের পরিবেশক একাধিক সাময়িক-পত্রে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।[১২] তাহার পর বাহির হইয়াছে 'সম্রাট' (১৯৪০), 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৪৮) ও 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬)।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা সংখ্যায় বেশি নয়। এগুলির গুণ—সরল, মিতভাষী এবং স্পষ্ট। ইঁহার পদ্যের এবং গদ্যের ইহাই সাধারণ গুণ। অন্তরে ভাবাবেগ যথেষ্ট, কিন্তু তাহা বাগ্‌-বাহুল্যে, অথবা বাষ্পোচ্ছ্বাসে অসংযত নয়। কালের গতিকে যতটা না হোক ফ্যাশনের খাতিরে অনেকটা প্রেমেন্দ্রবাবুকে কবিজীবনের প্রথমে দরিদ্র, নিপীড়িত, শ্রমার্ত, অজ্ঞাত, দুঃস্থদের দিকে নজর দিতে হইয়াছিল। অপরিণত হইলেও সে দৃষ্টিতে একটু স্বতন্ত্রতা আছে। তাহাতে সহবেদনার অনুভূতি, অনুকম্পার নয়। 'জগন্নাথের রথে' সত্যেন্দ্রনাথ ধনীকে দায়ী করিয়াছিলেন, এখন প্রেমেন্দ্রবাবু দরিদ্রকে লইয়া গর্ববোধ করিতেছেন।

> আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
> মুটে মজুরের,
> —আমি কবি যত ইতরের!

এই যে হীনতার ও দীনতার পাশে আসিয়া দাঁড়ানো ইহার মধ্যে আতিশয্য অবশ্য আছে, কিন্তু ঠাট বা পোজ উগ্র নয়। তরুণ কবির অস্ফুট বাসনা জগতে ও জীবনে সর্বত্রগামী ও সর্বভোগী হইবার। তাহারই একটু আবেগময় প্রকাশ ইহাতে।

> উত্তর মেরু মোরে ডাকে ভাই, দক্ষিণ মেরু টানে
> [illegible],
> গৃহ-বেষ্টনে বসি,
> কখন প্রিয়ার কণ্ঠ বেড়িয়া হেরি পূর্ণিমা-শশী!

প্রেমেন্দ্রবাবুর বড় গদ্যরচনা 'পাঁক' এই সময়েই লেখা হয়। ইহাতে শহরবাসী বস্তিজীবনের চিত্র, মোটা রঙ দিয়া আঁকা। মানবসমাজের ও মানবজীবনের এই যে দীনতা-বেদনার পঙ্ক ইহা—প্রেমেন্দ্রবাবুর মতে—বাহ্যঘটনার সংঘাতমাত্র নহে। আদিমতম জীব প্রোটোপ্লাজ্‌মের উদ্ভব যে পাঁকের মধ্যে সেই "জননী" পঙ্কের আলেপন (বা টীকা) প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মের উত্তরপুরুষেরা আজ অবধি বহন করিয়া আসিতেছে। (ইহাকে বাস্তবতা মনে করিলে ভুল হইবে, ইহা অতি রোমান্টিক।)

লক্ষ্যভ্রষ্ট পৃথিবীর ভাই সে আদিম অভিশাপ
বহি মোরা চিরদিন ;
আকাশের আলো যত করি জয়, মিটিবে না কভু ভাই
আদি পঙ্কের ঋণ। [১৩]

অভিমানহত কবি প্রণাম করিয়া সেই পঙ্ক অর্ঘ্যরূপে জীবনবিধাতাকে প্রত্যর্পণ কবিতেছেন

নশ্বর মৃত্তিকা গেহে,
জর্জব তৃষিত দীন, যত নরনারী,
ধূলির মলিন অঙ্কে ধূলিসম শেষে,
বিদায় লইয়া গেল
গোপনে ফেলিযা অশ্রু-বারি ,
তাহাদেব সব ব্যথা, সব গ্লানি, জ্বালা, অভিশাপ.
পাপ, তাপ, লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা, ক্রন্দন,
প্রতি ক্ষুদ্র দিবস-রাত্রিব ঘৃণিত জীবন-যাত্রা,—
কলঙ্ক হতাশা আব কদর্য কলুষ,
সযতনে কবিযা চয়ন,
এ মোর প্রণামখানি কবিনু বয়ন।
সেই নমস্কার,
তোমাবে অর্পিনু আজি হে জীবন-বিধাতা আমার ! [১৪]

যতীন্দ্রনাথ জীবন-বিধাতাকে উদাসীন নিষ্ঠুর বন্ধু বলিয়া চাপা বিদ্রূপ করিয়া অবশেষে তাঁহার দুঃখমূর্তি দেখিয়াছিলেন। [১৫] প্রেমেন্দ্রবাবু জীবন-বিধাতাকে দুঃখমূর্তিকে খেলার-বুড়ি রূপে কল্পনা করেন নাই, তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁহাকে দুঃখখেলার খেলুড়িরূপে সঙ্গে লইয়াছেন। তবে এখানে অবশ্যই আতিশয্য আছে এবং তাহা প্রবল।

নিখিল ভুবন ভরি' খেলিতেছ কাঁদিবার খেলা
অনাদি অতীত কাল ধরি'।
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি,
সে খেলায় মাতি
কোথায় নেমেছ তুমি মোর সাথে—
জঘন্য পাপের মাঝে, বীভৎস ক্ষুধায়,
অসহ্য গ্লানির পঙ্কে,
পূতি-গন্ধভরা অচিন্ত্য কলুষে হীনতায়।...

বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, আর বসে রই
স্তব্ধ হয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে—
তোমার কান্নার খেলা অপরূপ, অদ্ভুত, ভীষণ, বুদ্ধির অতীত।
যত কান্না ধরণীতে ;
তার মাঝে তুমি কাঁদ এই শুধু জানি—
আব ধন্য আপনারে মানি ![১৬]

সমাজদৃষ্টিতে নবজাগরণের বন্দনা গাহিয়াছেন কবি পথের পাঁচালী রূপে।

পাল্‌কি চড়ে চড়ে কার পা পঙ্গু হয়ে গেছে,—
আজ ওই নগ্ন সকল পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চল।
মাথায় পা দিয়ে দিয়ে কার পা ভারি হ'ল
পাপের ভারে,—
ওই পুণ্যপথের ধূলায় নামাও সে ভার।
আজ পাঁওদল্, চলে নবজাগ্রত ভয়মুক্ত মানবের দল,
তার সাথে পাঁওদল্, চলেছেন মানবের দেবতা।
আজ যদি চোখে জল আসে
ওই কালিমাখা শ্রম-কঠোর ঘর্মাক্ত দেহখানি
সে কি দুর্বলতা ?
আলিঙ্গনের লোভে
বাহু যদি আপনা হ'তে প্রসারিত হয়
সে কি লজ্জার কথা ?[১৭]

পরবর্তী কালে কবিমানসে সমাজ-জীবনের অন্বীক্ষা কমিয়া গিয়াছে, কবিচিন্তা ব্যক্তিজীবনের দিকে মুখ ফিরাইয়াছে। তবে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক আগ্রহ কমে নাই। কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতায় জীবনপ্রবাহ কবিচিন্তাকে এই ভাবনায়ই পরিচালিত করিয়াছে।

হিমালয় নাম মাত্র,
আমাদের সমুদ্র কোথায় ?
টিমটিম করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা ;
—তাম্রলিপ্তি সকরুণ স্মৃতি ![১৮]

ইউরোপীয় সাহিত্যে আধুনিক কবিতায় যেমন প্রেমেন্দ্রবাবুর কবিতায়ও তেমনি স্রষ্টা, মানুষ ও প্রকৃতির স্থান লইয়াছে যথাক্রমে কবি, নগরের পথঘাটের লোক (man in the street) এবং নগরের পথ। তবে স্রষ্টা একেবারে বাদ পড়েন নাই।

নাম তার জানিনাকো ;
শুধু জানি ধরণীর ধূলিম্লান আশার প্রতীক,
আছে এক করুণ পথিক,
—যুগে যুগে সব যুদ্ধে হেরে-ফিরে-আসা
ক্লান্ত পদাতিক।...

ইতিহাস নিরুত্তর
চিহ্নহীন তার পদধ্বনি
বেজে বেজে চলে,
বিপ্লব-আবর্ত ছন্দে
কভু দ্রুত কভু বা মন্থর
দুর্বিষহ জীবনের ভারে। ..
তারই সাথে সেদিন সহসা
দেখা হয়ে গেল যেন পথের কিনারে। · ·
ম্লান কণ্ঠে শুধায়েছে
ঠিকানা কোন সে বুঝি অখ্যাত গলির ,
—সেথায় সে যেতে চায়, জানেনাকো পথ। [১৯]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প তাঁহার কবিতার মতোই উগ্রতাবর্জিত এবং কমনীয়। ইঁহার রচনায় সেই কাব্যরসবাহী রোমান্টিক গল্পধারারই এক পরিণতি যাহা লিপিকার দ্বারা প্রবাহিত। জীবনের সঙ্গে যুদ্ধে যাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও জিতিতে পারিতেছে না তাহাদের ব্যর্থতাকে প্রেমেন্দ্রবাবু গল্পে দীপ্তিমান্ করিয়াছেন অথচ কোন আড়ম্বর অথবা ভাবুকতা নাই। ভাব গভীর এবং অচঞ্চল, ভাষা সহজ এবং ধীরগতি। প্রেমেন্দ্রবাবুর ছোটগল্পের মর্মকথা তাঁহাব গল্পের বই 'বেনামী বন্দর' (১৯৩০)[২০] নামটিতে উহ্য এবং 'প্রথমা'র একটি কবিতায় অভিব্যক্ত। যথা

মহাসাগরেব নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভীড়!
মাল বয়ে বয়ে ঘাল হ'ল যারা
আর যাদের মাস্তুল চৌচিব,
আব যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়।

প্রেমেন্দ্রবাবুব প্রথম কথিকা ও গল্পগুলি ১৩৩০-১৩৩১ সালের প্রবাসীতে[২১] ও বিজলীতে বাহির হইয়াছিল। কালি-কলমের প্রথম দুই বছরে প্রেমেন্দ্রবাবু অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় তাঁহার অনেক গল্প বাহির হইয়াছিল।

প্রেমেন্দ্রবাবুর প্রথম কাহিনী 'পাঁক' (১৯২৬)[২২] তাঁহাকে "আধুনিক" সাহিত্যিকদের উচ্চ শ্রেণীতে তুলিয়া দিয়াছিল। দরিদ্র গৃহস্থ ও বস্তিবাসীর হীন ও কুৎসিত সংসারযাত্রার চিত্রাবলী এই উপন্যাস। 'মিছিল' (১৯৩৩)[২৩] নারীনির্যাতনের একটি নিষ্ঠুর ও বাস্তব কাহিনী।

প্রেমেন্দ্রবাবুর গল্পের বই—'পঞ্চশর' (১৩৩৬ সাল), 'বেনামী বন্দর' (১৩৩৭ সাল), 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৩৩৯ সাল), 'মৃত্তিকা' (১৯৩২), 'অফুরন্ত' (১৩৪২ সাল) ইত্যাদি। বড় গল্প ও উপন্যাস 'বাঁকা লেখা' (১৩৩৪ সাল), 'উপনায়ন', 'আগামী কাল' (১৩৪১

সাল), 'প্রতিশোধ' (১৩৪৮ সাল) ইত্যাদি। ইনি অনেকগুলি সুপাঠ্য ডিটেক্‌টিভ কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। (দ্র. মদীয় ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি)॥

৬ বুদ্ধদেব বসু

বন্ধুত্রয়ীর[২৪] মধ্যে কনিষ্ঠতম বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) কবিতাকর্মে সর্বাধিক পরিনিষ্ঠিত এবং মনোযোগী। বন্ধুদের মতো—এমন কি তাঁহাদের চেয়ে বেশি—গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছেন, এবং তাহাদের বাড়া—বিবিধ প্রবন্ধ বিশেষ করিয়া সাহিত্য-সমালোচনা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ কোন মাসিকপত্রে প্রকাশিত বুদ্ধদেববাবুর প্রথম কবিতা বোধ করি 'যাত্রী'।[২৫] রবীন্দ্র-ভাবিত কবিতাটি যে রবীন্দ্র-বিরোধী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কারণ বোধ হয় তখন ঢাকায় ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের অবস্থান। বুদ্ধদেববাবু আগাগোড়া ঢাকার ছাত্র ছিলেন।

বুদ্ধদেববাবুর সাহিত্যসৃষ্টি রবীন্দ্র-ভাবিত (তবে তাহার মধ্যে ডি. এইচ. লরেন্‌সের ও মাইকেল আর্লেনের মতো ইংরেজী লেখকের প্রভাব বেশ আছে), এবং রবীন্দ্র-ভাষাশিল্পকে বুদ্ধদেববাবু যতটা ব্যবহার করিয়াছেন এমন বোধহয় আর কেহই করেন নাই। মনে হয় পারিপার্শ্বিকের আবহাওয়া কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়াই ইনি (—রবীন্দ্রনাথের বিরোধ করিয়া বলিব না—) রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চাপা অভিমান লইয়া লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন। শুধু বুদ্ধদেববাবুর নয় এ অভিমান তাঁহার বন্ধুদের এবং সহযোগীদের অনেকেরই ছিল। সে অভিমানের প্রধান কারণ নিজেদের শক্তির উপর অগাধ আস্থা এবং সেইসঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশালতা-বিচিত্রতা-উত্তুঙ্গতার জন্য অস্বস্তি।

তুমি আর আমি

বিধাতার নির্বাচিত দেবকুলবংশোদভূত মোরা—
… মোরা কবি, কাব্য-সরস্বতী
আমাদের চির-প্রিয়তমা। …
তুমি আর আমি জানি—তার চেয়ে ভাল কেবা জানে ?—
রবীন্দ্র ঠাকুর শুধু আজি হ'তে শতবর্ষ পরে
কবি-রূপে রহিবেন কুমারীর প্রথম প্রেমিক,
প্রথম ঈশ্বর বালকের, বৃদ্ধের যৌবন-ঋতু,
সকল শোকের শ্রান্তি, সব আনন্দের সার্থকতা,
শক্তির অশেষ উৎস জীবনের চিরাবলম্বন।[২৬]

বুদ্ধদেববাবুর প্রথম কবিতার বই 'মর্মবাণী' (১৯২৫) এখন বিস্মৃত।[২৭] কবিরূপে বুদ্ধদেবের আসল আত্মপ্রকাশ 'বন্দীর বন্দনা'য় (১৯৩০, দ্বি-স ১৯৪০)।[২৮] মোট দশটি কবিতা। একটি ছাড়া সবই "১৯২৬ থেকে '২৯-এর মধ্যে লেখা"। দুইটি কবিতা কল্লোলে আর ছয়টি কবিতা প্রগতিতে প্রথম বাহির হইয়াছিল। 'বন্দীর বন্দনা' নামটি কাজী নজরুল ইসলামের 'বন্দী-বন্দনা'[২৯] থেকে নেওয়া। বন্দীর-বন্দনায় বিশিষ্ট কয়েকটি কবিতায় যৌবনোন্মেষোচিত যৌন-আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার অভিব্যক্তি। লরেন্‌সের

সাহিত্য-ভাবনায় যাহা সৃষ্টির মৌলিক আবেগ বলিয়া স্বীকৃত তাহা বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় "বিধাতার দেনা" বলিয়া অভিশপ্ত। সে দেনার দায়ে

> ক্ষণ-তরে নাহি মুক্তি ; কর্ম-মাঝে, মর্ম-মাঝে মোর
> প্রতি স্বপ্নে প্রতি জাগরণে,
> প্রতি দিবসের লক্ষ বাসনা-আশায়
> আমারে রেখেছো বেঁধে অভিশপ্ত, তপ্ত নাগপাশে
> সৃজন-উষার আদি হ'তে—
> উদাসীন স্রষ্টা মোর।[৩০]

নারীর ভালোবাসার আলোকে বঞ্চিত কবিমানস শেষ-কৈশোরে আপনার যৌবনসুন্দর রূপখানি প্রত্যক্ষ করিতে ব্যাকুল। কবিমানস আত্মরত, ভালোবাসে শুধু আপনাকে, এবং সেই আত্মরতিকে উদ্ভাসিত করিতে চায় কামনার প্রিয়ায় আত্মসমর্পণের বহ্নিতে।

> আর কিছু নহে। শুধু তুমি মোরে ভালোবাসো—
> এই কথা ভাবিবার
> অধিকার দাও মোরে!
> কী আছে তোমার মনে করিবো না বৃথা অন্বেষণ ;[৩১]
>
> আর আমি ভালোবাসি নতুন ননীর মতো তনুলতা তব
> (ও গো কঙ্কাবতী!)
> আর আমি ভালোবাসি তোমার বাসনা মোরে ভালোবাসিবার,
> (ও গো কঙ্কাবতী!)
> (ও গো কঙ্কাবতী!)
> যার সাথে সঙ্গোপনে প্রণয়-গুঞ্জন,
> যার স্পর্শে ক্ষণে-ক্ষণে হৃদয়ের বেদনার মেঘে
> চমকিয়া খেলি' যায় হর্ষের বিজলী ;—
> নেত্রের মুকুরে তার দেখেছি আপন প্রতিচ্ছবি,...
> তখন বুঝেছি প্রাণে, আমি চিরন্তন পুণ্যচ্ছবি,
> নিষ্কলঙ্ক রবি।[৩২]

'অপর্ণার শত্রু' রবীন্দ্রনাথের 'রাহুর প্রেম'-এর আধুনিক ব্যাখ্যা। 'অমিতার প্রেম'[৩৩] তাহার প্রস্তাবনা, 'মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান'[৩৪] তাহার উপসংহার। 'মোহমুক্ত' কবিতায় মোহিতলাল মজুমদারের প্রভাব সুস্পষ্ট।

> এসো কাছে, পৃথিবীর সকল সুন্দরী,
> বিষতৃষ্ণা নিবারিবো তোমাদের তীব্র দেহ-মদ্য পান করি।

বন্দীর-বন্দনার পর বুদ্ধদেববাবুর কাব্যকলা ভাব জমাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া নির্মাণশিল্পের দিকে ঝোঁক দিল। তাহার এক পরিচয় 'কঙ্কাবতী' কবিতায়।[৩৫] কবিতাটির ইঙ্গিত মিলিয়াছিল বোধ করি প্রমথ চৌধুরীর কবিতা হইতে (এবং কঙ্কাবতী নাম ইতিপূর্বে 'প্রেমিক' কবিতায়ও মিলিয়াছে)।

মিলনের অহঙ্কারে সালঙ্কারা কঙ্কা,
নূপুরে কঙ্কনে তোলে বীণার ঝঙ্কার,
বসনায় দেয় মুহু বিজয় টঙ্কার,—[৩৬]

বুদ্ধদেববাবুর দ্বিতীয় কবিতাপুস্তক 'পৃথিবীর প্রতি' (১৯৩৩)। সবই প্রেমের এবং ১৯২৬-২৮ অব্দের মধ্যে লেখা বলিয়া উল্লিখিত। 'তথাপি বাঁচিয়া র'বে ?' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'তপোভঙ্গ'-এর অনুসরণ স্পষ্ট। এই কবিতার ছন্দোরূপ পরেকার আরও দুই-তিনটি কবিতায় প্রকট। এখনও স্থায়ী কবি-যশের আকাঙ্ক্ষা লুপ্ত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথেব প্রতি ঈক্ষণ এখনো সম্পূর্ণ সরল নয়।

একবিংশ শতাব্দীর কোনো সপ্তদশী
লীলাচ্ছলে—
মনে জানি—পড়িবে না আমার কবিতাখানি জ্যোৎস্না-স্নাত
বাতায়ন-তলে ;
সতীর্থের হৃদ্-পদ্মে গন্ধ-রূপে ক্ষণিকের স্মৃতি-স্বপ্ন—
জানি, তা-ও ঝুট।[৩৭]

'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭, দ্বি-স ১৯৪৩) তৃতীয় কবিতার বই। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯২৯-৩৪। কঙ্কাবতী নামটির ঝঙ্কারে গুঞ্জরিত কবিতাগুলিই ('আরশি', 'সেরিনাড', 'কঙ্কাবতী' ও 'শেষের রাত্রি') বিশিষ্ট রচনা।

১৯৩৫ সাল হইতে বুদ্ধদেববাবু কবিতার ভাষায় সাধুভাষার ক্রিয়াপদ এবং যে-সব শব্দ ও পদ শুধু কাব্যেই প্রচলিত সে-সব বাদ দিতে লাগিলেন। তাঁহার কবিতার ভাষা চলিত ভাষার সঙ্গে এক হইল, তবে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে বাধা রহিল না। সমকালীন কোন কোন কবির—যেমন জীবনানন্দ দাশের—রচনার প্রভাবও স্বীকৃত হইল। যেমন

ঝাঁকে-ঝাঁকে প্ল্যাকার্ডের শকুনের পাখা
আমাদের দিনেষ মুখেরে ঢেকে দেয়।
আমাদের দিনগুলো গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে ভেঙে যায়
ট্র্যাফিকের চাকায়-চাকায়।[৩৮]

কয়েকটি কবিতায় পদ ও বাক্যাংশের যে পুনরাবৃত্তি আছে সে টেকনিক সরাসরি ইংরেজী থেকে নেওয়া নয়, জীবনানন্দ দাশের কাছে পাওয়া। যেমন

ছোটো ঘরখানি মনে কি পড়ে,
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে ? মনে কি পড়ে ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারা দিনরাত হাওয়ায় ঝরে
সাগর-দোলা[৩৯]

'দময়ন্তী'র কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৩৫-৪২। তবে বইয়ে সঙ্কলনের সময়ে কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে লেখক কবিতাগুলির বিশিষ্ট রীতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। এই ছয়টি নিয়মসূত্র তিনি অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,—(১)

কথ্যভাষার বাক্‌রীতি উল্লঙ্ঘিত হইবে না ; (২) সাধু-ভাষার ক্রিয়াপদ চলিবে না ; (৩) কাব্যে প্রচলিত ক্রিয়াপদ (যেমন "ফুটি", "হতেছে", "চলিছে") যথাসাধ্য বর্জনীয় ; (৪) কাব্যে ব্যবহৃত নাম ও অব্যয় পদ (যেমন "মম", "মোদের", "তব", "আঁধার", "পরাণ", "মাঝে" (!), "যবে", "যেথা", "সনে", "সাথে") এবং প্রাচীন পদ (যেমন "দেখিবারে", "দেহ") সর্বথা পরিত্যজ্য ; (৫) চলিত বাঙ্গালা শব্দের তৎসম প্রতিশব্দ (যেমন "হস্ত", "তরু", "পুষ্প", "পবন",—"হাত", "গাছ", "ফুল", "হাওয়া" স্থলে) অচল ধরিতে হইবে ; (৬) উপভাষার পদ (যেমন "এনু", "ঘরেতে", "নারি") অচল ; (৭) "অথচ এরই সঙ্গে ভাষা হবে সুগম্ভীর সংস্কৃতিক ; সংস্কৃত শব্দ বেশি করে নিলে রচনায় যে দৃঢ়তা ও সংহতি আসে সেটা ছাড়বো কেন ?" বুদ্ধদেববাবু অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন, "তালিকাভুক্ত নিয়মগুলি সম্পূর্ণ মেনে চলা সম্ভব হয়নি। বিচ্যুতি ঘটেছে।"

'দ্রৌপদীর শাড়ি'র (১৯৪৮) কবিতাগুলি ১৯৪৪-৪৭ সালের মধ্যে লেখা। মিলহীন সমাক্ষরিক ছন্দে লেখা নাম-কবিতাটি দেবেন্দ্রনাথ সেনের পারিজাতগুচ্ছে সঙ্কলিত 'প্রিয়তমার প্রতি' সনেটের দ্বারা অনুপ্রাণিত।[৪০] দেবেন্দ্রনাথের কবিতার শেষ চরণ

দ্রৌপদীর সাড়ি সম সচন্দ্র যামিনী।

'শীতের প্রার্থনা · বসন্তের উত্তর'-এর (১৯৫৫) কবিতাগুলি তিন অংশে বিভক্ত। ছড়ার ছন্দ লইয়া বুদ্ধদেববাবু দময়ন্তীতে যে এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করিয়াছিলেন তাহারই পরিণতি কয়েকটি কবিতায় পাই। যেমন

> আমার পরাণ যা চায় তুমি যে তা-ই, তুমি তা-ই. তোমারে কি
> আমি করবো যাচাই
> প্রাত্যহিকের বাধ্য-বাঁচায়, বন্দী দেহের ক্ষুদ্র খাঁচায়, করবো বাছাই
> মানুষের ভিড়ে ? তাও কি হয় ?
> তুমি যে নও
> আর কারো মত, সেটা কি জানবো মুখের রেখায়, মুখের কথায়,
> চোখের ক্ষণিক দেখায়, কিংবা দেহের অনেক আবশ্যিকের
> বদভ্যাসে, মুদ্রাদোষে ?[৪০ক]

ইহার সঙ্গে হাপু-গানের ছন্দের পার্থক্য সামান্যই।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতাভাবনার মিল আছে এই যে দুইজনেই বিশেষভাবে প্রেমভাবিত। তবে পার্থক্যই বেশি। বুদ্ধদেব আত্মকেন্দ্রিক আত্মসর্বস্ব, অচিন্ত্যকুমার তেমন নহে। বুদ্ধদেব আপনার ভাবনায় নিমগ্ন এবং নিবদ্ধ, অচিন্ত্যকুমার আপনার ভাবনার পাশ কাটাইয়া স্বাধীন হইবার জন্য চেষ্টিত।

বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সমর সেনের সহযোগিতায় ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন (আশ্বিন ১৩৪২)। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝের দিকে ঢাকায় হরিশ্চন্দ্র মিত্র বাঙ্গালায় কবিতাময় পত্রিকার পথ দেখাইয়াছিলেন, এবং শতাব্দীর শেষের দিকে রাজকৃষ্ণ রায় সে পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। তবে বর্তমান শতাব্দীতে ইহাই প্রথম। উদ্দেশ্য শুধুই যে শুধু "আধুনিক" কবিতা প্রকাশ করা তাহাই নয়, সেই সঙ্গে "আধুনিক" কবিতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং "আধুনিক" কবিতালেখকদের পক্ষ সমর্থন করা।

বুদ্ধদেব বসু "আধুনিক" সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী লেখক। প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখিয়া এবং 'কবিতা' পত্রিকা চালাইয়া ইনি আধুনিক সাহিত্যকে পরিচিত ও প্রচারিত করিতে বরাবর প্রচেষ্টিত। ইঁহার তিন প্রধান সহযোগী—গদ্য রচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং 'কবিতা' সম্পাদনায় অজিত দত্ত। বসু, মিত্র ও সেনগুপ্ত তিনজনে মিলিয়া দুইখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন—'বিসর্পিল' (১৩৪১ সাল) ও 'বনশ্রী'। ইংরেজী সাহিত্যের রসপিপাসু বুদ্ধদেববাবু পাঠ্যাবস্থা হইতে। কোন একটি বইয়ের সমালোচনায় বুদ্ধদেববাবু লিখিয়াছিলেন, 'আমি ভারতীয় অধ্যাত্ম ঐতিহ্যের প্রসাদবঞ্চিত"।[৪১] এ কথা খুবই সত্য। তবে ভারতীয় সাহিত্যের এবং সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতির অভাবে ইঁহার প্রথম অবস্থার রচনা যে উৎকট বিজাতীয়তার কণ্টকে আকীর্ণ ছিল তাহা পরে রবীন্দ্র-অনুগতির মধ্য দিয়া আসিয়া ঝরিয়া গিয়াছে।

বুদ্ধদেববাবু গল্প-উপন্যাসের বই লিখিয়াছেন পঞ্চাশের কাছাকাছি, বোধ করি অচিন্ত্যকুমারের চেয়ে দুই-চারখানা কম। এই গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়া বুদ্ধদেববাবুর সাহিত্যসাধনার গতি অনুসরণ করা যায়, এবং এরকম সমসাময়িক আর কোন লেখকের সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে করা যায় না। বুদ্ধদেববাবু উপস্থাপনায় এবং স্বাদে গল্প-উপন্যাসে নূতনত্ব আনিয়াছেন। ইঁহার গল্পবস্তু বহির্ঘটনাসাপেক্ষ নয়, প্রতিদিনের পারিবারিক জীবনের যে সাধারণ ও সামান্য ব্যাপার তাহারই ভূমিকায় লেখকের (নায়কের) মন যে কামনা-ভাবনার সাদা-কালো নক্শা বুনিয়া চলিত তাহাই কাহিনীতে রূপ পাইয়াছে। তবে এ ধরনের রচনার বহুলতা ঘটিলে যাহা হয় বুদ্ধদেববাবুর অনেক রচনায় তাহাই ঘটিয়াছে, অর্থাৎ বস্তুভারের অভাবে কাহিনী রূপে স্পষ্টতা পায় নাই। বুদ্ধদেববাবুর সব গল্প-উপন্যাসে তাঁহার নিজেরই যেন আত্মবিস্তার। অধিকাংশ রচনা আত্মস্মৃতিমূলক, অথবা তেমনই মনে হয়। তবে লেখকের অভিজ্ঞতার বারো আনাই আত্মচিন্তানির্ভর কল্পনা, এবং সে বারো আনার পরিধি মধ্যে যেসব নরনারীর আনাগোনা তাঁহারা লেখকেরই সমান স্তরের অথবা উচ্চস্তরের লোক ; নিম্নস্তরের লোক—পাড়াগাঁয়ের লোকের কথা দূরে থাক্, শহরের বাড়ির দাসদাসীও সে পরিধির মধ্যে দেখা দেয় নাই। সুতরাং বুদ্ধদেববাবুর রচনায় লোকের ভিড় নাই, মানুষের বিবিধ বৈচিত্র্যও নাই। আছে ঘুরিয়া ফিরিয়া একই ধরনের নরনারী যাঁহারা কোন না কোন সময়ে লেখকের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়াছিল অথবা তাঁহার কল্পনায় উদিত হইয়াছিল। আর প্রায় সব গল্পেরই নায়ক লেখক নিজেই, তবে বিভিন্ন বয়সে অবস্থায় ও মেজাজে। প্রধানত এই আত্মকেন্দ্রিকতার জন্যই বুদ্ধদেববাবুর গল্প-উপন্যাসের রস প্রায়ই ফিকা লাগে।

নবীন লেখকদের মধ্যে বুদ্ধদেববাবু বাঙ্গালী সাহিত্যিকের পক্ষে একটু নূতনতর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ভূমিকা হইতেছে প্রবলবেগে আত্মসমর্থনের। বুদ্ধদেববাবু নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে যেন গোড়া থেকেই সংশয়হীন। এই সংশয়হীনতা তাঁহার পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনাতেই পরিস্ফুট। ১৯৩৫ অব্দে প্রকাশিত 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র মলাটের পিছনে 'অভিনয় অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' বইটির সম্বন্ধে যে মন্তব্য আছে তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির যোগ্য।

এই বইয়ের অন্তর্গত বুদ্ধদেব বসুর ছোট গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের ল্যাণ্ডমার্ক। রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের প্রভাবে যে লেখকগোষ্ঠী ঝুড়ি ঝুড়ি রঙিন স্বপ্ন বেচতে আরম্ভ করেন ; এবং মণীন্দ্রলাল বসুর রচনায় যে ভাববিলাসিতার চূড়ান্ত নিদর্শন—বুদ্ধদেব বসু সেই লেখকদের সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থী। এই গল্পগুলি সেই ভাববিলাসিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। বঙ্কিম থেকে আরম্ভ করে' মণীন্দ্রলাল পর্যন্ত বাঙলাদেশে রোমান্টিসিজম্-এর ভরা জোয়ার গেলো, এতদিনে বোধহয় রিয়ালিজম্-এর দিন এসেছে। এই নূতন দিন যাঁরা আনবেন, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু একজন ; এবং এ-বইয়ে তিনি নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন।

বুদ্ধদেববাবু রবীন্দ্রনাথের দ্বারা যে কতটা প্রভাবিত তাহা তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম হইতেও বোঝা যায়। 'রডোড্রেন্ডন্‌গুচ্ছ' (১৩৩৯ সাল), 'হে বিজয়ী বীর' (১৩৪০ সাল), 'ধূসর গোধূলি' (১৩৪০ সাল), 'যেদিন ফুটল কমল' (১৩৪০ সাল), 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' (১৩৪২ সাল), 'তিথিডোর' (১৩৪৯ সাল), 'একদা তুমি প্রিয়ে' (১৩৪১ সাল), 'অন্য কোনখানে' (১৩৫৭ সাল), 'আমি চঞ্চল হে', 'ঘরেতে ভ্রমর এল' (১৩৪২ সাল), 'মন দেয়া নেয়া' (১৩৩৯ সাল), 'সব পেয়েছির দেশে', 'কালের পুতুল'।[৪২] 'কালের পুতুল' নামটির জন্য রবীন্দ্রনাথের 'সময়হারা' কবিতা দ্রষ্টব্য।

'সাড়া' (১৯৩০), 'আমার বন্ধু' (১৯৩৩), 'সূর্যমুখী' (১৯৩৪), 'পরস্পর' (১৯৩৪), এই চারটি উপন্যাস যেন লেখকের আত্মভাবনা-সূত্রে গাঁথা। বুদ্ধদেববাবুর প্রথম উপন্যাস 'সাড়া'য় তাঁহার উপন্যাস রচনার বিশেষত্বগুলি দোষগুণ লইয়া পরিস্ফুট। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪৭) পরিবর্জনের ফলে শরৎচন্দ্রের দেবদাসের ক্ষীণ ভাবানুসরণটুকু মুছিয়া গিয়াছে। 'অকর্মণ্য' বা 'একটি বাঙালী রুডিন' (১৯৩১) 'সাড়া'র সঙ্গে সঙ্গেই লেখা হইয়াছিল।

বুদ্ধদেববাবুর উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। তাহার মধ্যে 'সাড়া' ছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—'যেদিন ফুটল কমল' (১৯৩৩), 'ধূসর গোধূলি' (১৯৩৩), 'লাল মেঘ' (১৯৩৪), 'তিথিডোর' (১৯৪৯), 'কালো হাওয়া' (১৯৪২), 'নির্জন স্বাক্ষর' (১৯৫১), 'মৌলিনাথ' (১৯৫২) ইত্যাদি।

গল্পের বই প্রায় বছরে একখানি করিয়া বাহির হইত। যেমন, 'অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩০), 'রেখাচিত্র ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩১), 'এরা ওরা এবং আরো অনেক' (১৯৩২), 'অদৃশ্য শত্রু' (১৯৩৩), 'প্রেমের বিচিত্র গতি' (১৯৩৪), 'মিসেস গুপ্ত (১৯৩৪), 'ঘরেতে ভ্রমর এল' (১৯৩৫), 'নতুন লেখা' (১৯৩৬), 'ফেরিওলা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৪১), 'খাতার শেষ পাতা' (১৯৪৩) ইত্যাদি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সময় হইতে যাহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি তাহার ব্যতিক্রম বুদ্ধদেব বসুতেও পাই না। অর্থাৎ যাঁহারা গল্প ও উপন্যাস দুই-ই লিখিয়াছেন তাঁহাদের গল্প-রচনাতেই অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বৈচিত্র্য ও নিপুণতা দেখা দিয়াছে।

বুদ্ধদেববাবু কয়েকখানি নাটকও রচনা করিয়াছেন—'অসামান্য মেয়ে' (১৯৩৪) ও 'মায়া মালঞ্চ' (১৯৪৪)। 'মায়া মালঞ্চ' লেখকের 'কালো হাওয়া' উপন্যাসের বস্তু লইয়া লেখা। 'অনেক রকম' (১৯৩২, সংক্ষিপ্ত তৃ-স ১৯৪৮) রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভার মতো নাট্যোপন্যাস।

প্রবন্ধ রচনায় এবং সাহিত্য-সমালোচনায় বুদ্ধদেববাবুর নিপুণতা ও প্রবীণতা পরিস্ফুট। আত্মকথামূলক ভ্রমণকথা 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' (১৯৩৫), 'আমি চঞ্চল হে' (১৯৩৬),

'সমুদ্রতীর' (১৯৩৭) ও 'সব পেয়েছির দেশে' (১৯৪১) উপভোগ্য। 'উত্তর তিরিশ' (১৯৪৫) প্রবন্ধের বই ; 'কালের পুতুল' (১৯৪৬), 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য' (১৯৫৪) ও সাহিত্যচর্চা (১৯৫৪) সাহিত্য সমালোচনার। বুদ্ধদেববাবু ইংরেজীর অনুসরণে ও অনুকরণে কিছু সুপাঠ্য ডিটেক্‌টিভ কাহিনী লিখিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেববাবুর গদ্যরীতি সযত্নরচিত, সুমিত, পরিপাটি। তবে গোড়ার দিকে ইঁহার গদ্য অনাবশ্যকভাবে ইংরেজীর অনুবাদে ও অনুসরণে কণ্টকিত ছিল। (সাধুভাষায় লেখা বলিয়াই কি 'সাড়া' এ দোষ হইতে অনেকটা নির্মুক্ত ?) যেমন,

অবশ্যি কবিতা সে ছোঁয় না—বাদে কোলরিজ। অকর্মণ্য পৃ ৩২। "বাদে"=except।
নিচু ইজিচেয়ারের গভীরতা থেকে বাবা মুখ তুলে তাকালেন ; তাঁর ভ্রূ জিজ্ঞাসায় কুঞ্চিত হ'লো। পরস্পর পৃ ২৪। "নিচু···থেকে"=from the depth of; জিজ্ঞাসায়=in-interrogation.
সে দূরে সরে' রইলো—ঠাণ্ডা সাদা বিচ্ছিন্নতায়। সূর্যমুখী পৃ ২২। "ঠাণ্ডা সাদা বিচ্ছিন্নতায়"=in cold blank separation)।

৭ অজিতকুমার দত্ত

বুদ্ধদেববাবুর সতীর্থ এবং 'প্রগতি'-সম্পাদনে সহযোগী অজিতকুমার দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯) গোড়া থেকে গদ্যে পদচারণ করেন নাই। কবিতাতেই তাঁহার মন মশগুল ছিল। কবিতারচনায় স্বাচ্ছন্দ্য ও অনায়াসসারল্য অজিতবাবুর কবিতার সাধারণ গুণ। তাঁহার কবিপ্রেরণার পিছনে বিশেষ কোন ফ্যাশনের তাগিদ নাই এবং তাহা কোন তাত্ত্বিক খাতেও পরিবাহিত নয়।

অজিতবাবুর প্রথম কবিতার বই 'কুসুমের মাস' (১৯৩০, দ্বি-স ১৯৪৭)। চল্লিশটি কবিতা আছে। তাহার মধ্যে আঠারোটি আঠারো-অক্ষরাত্মক চতুর্দশপদী কবিতা। কবিতাগুলিতে প্রেমের মৃদু সৌরভ পরিব্যাপ্ত। মাঝে মাঝে দেবেন্দ্রনাথ সেনের বাচন স্মরণ করায় (যেমন 'গুরুজনদের মাঝে')। (দেবেন্দ্রনাথ সেনের মতো অজিতবাবুও কুসুমপ্রিয়)। প্রেমতন্ময়তার উজ্জ্বল প্রকাশ 'বার্তা'য়।

তুমি ছাড়া এ জীবনে দুঃখের নাহিক মোর পার।
এ-কথা কহিবো আমি লক্ষবার আকাশের কানে,
এ-কথা ছড়ায়ে দিবো আজ রাত্রে প্রত্যেক তারায়,
বাতাসে ভাসাবো আমি এই সত্য সমস্ত ধরায় ;
এ-কথা পাঠাবো দূর স্বর্গ আর পাতালের পানে
পৃথিবী নক্ষত্র স্বর্গ আজ রাত্রে সবে যেন জানে
যে-কথা নিভৃতে বসি' তোমারে বলিতে প্রাণ চায়।

'মালতী ঘুমায়' ও 'মালতী' অজিতবাবুর সবচেয়ে পরিচিত কবিতা। অজিতবাবুর নায়িকার নাম মালতী, যেমন বুদ্ধদেববাবুর কঙ্কাবতী আর জীবনানন্দের বনলতা সেন। মালতী রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর আধুনিক সংস্করণ বটে তবে উলটা পিঠ ; বিশ্ব তাহাকে কামনা করে কি করে না সে কথা অবান্তর, বিশ্বকে সে অশান্তচিত্তে কামনা করিতেছে—কতকটা যেন পুরাণের উর্বশীর মতো, অনেকটা যেন আধুনিক রূপোপজীবিনীর মতো।

সৌন্দর্য-কামনা যার, তারি তরে রূপসী মালতী
আপনার দেহ-গেহে সব রূপ করেছে আহ্বান,
যোড়শ বসন্তে যদি নাই নামে পূর্ণিমার জ্যোতি,
আজি রাত্রে তনু-সুরা নিঃশেষে করিতে হবে পান।
রূপসী মালতী আজ আপনারে করিবে প্রদান
রূপহীন পুরুষেরে,—আজি রাত্রে তথাপি—তথাপি
ধরণীর শ্রেষ্ঠ রূপ ব্যর্থতায় নাহি হবে ম্লান। [৪৩]

দ্বিতীয় বই 'পাতালকন্যা' (১৯৩৮)। সবশুদ্ধ ছাব্বিশটি কবিতা, তিনটি অনুবাদ। নাম কবিতায় মালতীর আর একদিক,—রূপকথার রাজকন্যা পাতালপুরীতে বন্দিনী, নাগবেষ্টিত, বিষমূর্ছিত। দুর্লভতম সে।

কন্যার সোনার দেহে হাজার ময়ূরকণ্ঠী সাপ,
কন্যার বুকের পরে নাগিনীর সোনার কাঁচুলী
সাপেরা মেলিয়া ফণা দূর করে গরলের তাপ,
কাঁপিলে কন্যার চোখ দশলাখ ফণা ওঠে দুলি ;—
কুমারের উদাসীন মন
সে-দেশে গিয়াছে উড়ে ; তাহারে ফিরাবে কোন জন ? [৪৪]

দুই একটি কবিতা হালকা ভাবের। একটিতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা মনে পড়ায়।

পুরুষের ভাগ্যলিপি জানিতে পারেনা দেবতায় ;—
তুমি সাহিত্যিক হবে সৃষ্টিকর্তা তা' যদি জানিতো,
তাহলে বস্তুত কিছু বস্তু দিতো তোমার মাথায়,··
প্রাচীন লেখকদের আধুনিক হে হুঁকোবর্দার,
তুমিও বিখ্যাত হলে সেই দুঃখে লিখিনা কবিতা। [৪৫]

তৃতীয় বই 'নষ্টচাঁদ'-এর (১৯৪৫) কবিতাগুলি মহাযুদ্ধের সময়ে লেখা। কবিতাসংখ্যা একুশ। কয়েকটি হালকা ছাঁদের। নষ্টচাঁদের কবিতায় রচনারীতি আরো লঘু ও স্বচ্ছন্দ হইয়াছে এবং বিষয়ের বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে। প্রেমে বিশ্বস্ততার বদলে সংশয় জাগিতেছে।

হয়তো তারারা জোনাকির চেয়ে বড় নয়,
মনে হয়,
মনে হয়,
হয়তো আকাশ পৃথিবীর চেয়ে বড়ো নয়। [৪৬]

চতুর্থ বই 'পুনর্ণবা'[৪৭] (১৩৫৪ সাল)। মোট আটাশটি কবিতা, ১৯৩৪-৪৬ সালের মধ্যে লেখা। কয়েকটি কবিতা আঠারো-অক্ষরের চতুর্দশপদী। অল্প কয়েকটি হালকা রচনা। কবিচিত্তে সংশয় কাটিবার ইশারা আছে কয়েকটি কবিতায়।

প্রেম যদি সত্য হয় মানুষের আত্মা যদি থাকে,
এ-পঙ্কতিলক মুছে অবশ্যই আছে জয়মালা,
সে-আশ্বাসে রচি কাব্য, লভি আজো জীবনের স্বাদ। [৪৮]

একদিন এ-জীবনে সত্য ছিল মিথ্যার বেসাতি—
স্মৃতির ঐশ্বর্য—তবু, বাধা আজ স্বচ্ছন্দ গতির,
নিঃশঙ্ক গৌরবে তাই ছিন্ন করি পূর্ব অঙ্গীকার।
প্রাণের স্রোতের সাথে গতি যার সেই শুধু-সাথী,
তুচ্ছ তাই দুঃখ শোক অতীতের সমস্ত ক্ষতির,
সমুদ্র ডেকেছে যারে সম্মুখই শাশ্বত মাত্র তার। [৪৯]

পঞ্চম বই 'ছায়ার আলপনা' (১৯৫১)। মোট আটাশটি কবিতা। কবিচিত্ত উপস্থিতকালের বিষয় নিঃসংশয়।

আমি আজো ভালোবাসি, আজো ভালোবাসি ভালোবাসা,
দুর্নিবার উপভোগ বাসনার অক্ষুণ্ণ পিপাসা
আয়ুর মুহূর্তগুলি গেঁথে রাখে মালার মতন,
নিবন্তর মনে মনে কথা শুনি জীবনের আমন্ত্রণ ![৫০]
ভালো লাগে ভালো লাগে—এই কথা গুনগুন করে'
আসে মন ভরে'। [৫১]

'খাণ্ডব দাহন'-এর শেষ কয় ছত্রে দেবেন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

অজিতবাবু গদ্য লেখা আরম্ভ করিয়াছেন অনেক পরে। 'জনান্তিকে' (১৯৪৯) হালকা ও বিশ্রদ্ধ প্রবন্ধের বই। 'মন পবনের নাও' (১৯৫১) 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রথম বাহির হইয়াছিল। লেখক "রৈবত" এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন। "সাহিত্যাদি নানা বিষয়ে' লেখক তাঁহার "মত সোজাসুজি প্রকাশ" করিয়াছেন॥

টীকা

১ 'প্রাচীন আসামী হইতে'।

২ ঐ ২৫।

৩ ঐ ৪১।

৪ 'ভাঙা পেয়ালা' ('উত্তরমেঘ')।

৫ যেমন 'প্রভাতে' (আশ্বিন ১৩২৮), 'বাংলা মেয়ে' (বৈশাখ ১৩২৯), 'তরুণী' (ভাদ্র ১৩২৯), 'দুঃখসুখ' (মাঘ ১৩২৯)।

৬ পাঠ 'পড়িস'।

৭ 'বাংলা মেয়ে' ("মহিলা মজলিস" অংশে প্রকাশিত)।

৮ 'বাদল প্রিয়া' (প্রবাসী চৈত্র ১৩৩১)।

৯ যেমন 'রাত্রি' (বিজলী ২৪ মাঘ ১৩৩১)।

১০ তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ, "চিরসুন্দরে কর গো তোমার রেখাবন্ধনে বন্দী"।

১১ 'একদিন'।

১২ 'বিজলী', 'কল্লোল', 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি'। প্রেমেন্দ্রবাবু কালি-কলমের সম্পাদক-ত্রয়ীর অন্যতম ছিলেন।

১৩ প্রথমার প্রথম কবিতা। প্রথম প্রকাশ 'অন্তরের কথা' নামে (বিজলী ২৫ পৌষ ১৩৩১)।

১৪ 'নমস্কার' নামে প্রথম প্রকাশিত (বিজলী ২৪ মাঘ ১৩৩১)।

১৫ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

১৬ প্রথম প্রকাশ 'ছায়া পড়ে চিত্তের মুকুরে' (বিজলী ১ ফাল্গুন ১৩৩১)।

১৭ প্রথম প্রকাশ 'পাঁওদল্' নামে (বিজলী ১ শ্রাবণ ১৩৩২)।

১৮ 'ভৌগোলিক' (ফেরারী ফৌজ)।

১৯ 'জনৈক' (ঐ)।

২০ প্রথম-বছরে (১৩৩৩ সাল) "বেনামী বন্দর" শীর্ষকে দুইটি গল্প বাহির হইয়াছিল, 'দিদিমণি' (বৈশাখ) ও 'শুঁটকি ও থুপি' (ভাদ্র)। লেখকের ছদ্মনাম ছিল "লেখরাজ সামন্ত"।

২১ 'শুধু কেরাণী' (প্রবাসী চৈত্র ১৩৩০), 'গোপন-চারিণী' (প্রবাসী বৈশাখ ১৩৩১), 'বাড়ী বদল' (বিজলী ৪ পৌষ ১৩৩১) ইত্যাদি।

২২ প্রথম পর্ব বিজলীতে (১৮ বৈশাখ হইতে ১২ ভাদ্র ১৩৩২), দ্বিতীয় পর্ব কালি-কলমে (১৩৩৩ সাল) প্রথম প্রকাশিত।

২৩ প্রথম প্রকাশ কল্লোলে (১৩৩৫-৩৬ সাল)।

২৪ অচিন্ত্যবাবু, প্রেমেন্দ্রবাবু ও বুদ্ধদেববাবু তিনজনে মিলিয়া উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। পরে দ্রষ্টব্য।

২৫ ১৩২৮ ফাল্গুন সংখ্যা নারায়ণে প্রকাশিত।

২৬ 'কোনো বন্ধুর প্রতি' (বন্দীর বন্দনা)। অজিতকুমার দত্তের সহযোগিতায় সম্পাদিত এবং ঢাকা হইতে প্রকাশিত। প্রগতি'তে প্রথম প্রকাশিত।

২৭ বইটির সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বিজলীর (২৭ কার্তিক ১৩৩২) এই সমালোচনায় সীমাবদ্ধ,—"মর্মবাণী" কবিতার বই। কিশোর কবি বুদ্ধদেব বসু প্রণীত। ২৬নং বাঙ্গালা বাজার, ঢাকা হইতে শ্রীগঙ্গাচরণ দাস কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা মাত্র। বাঙলা মাসিক সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহাদের কাছে বুদ্ধদেববাবুর পরিচয় অনাবশ্যক। তাঁহার হাত বেশ মধুর—ছন্দোজ্ঞানও আছে।—আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্যে 'অরূপ' 'পরিণত' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা বেশ ভাল লাগিয়াছে।"

২৮ 'বন্দীর বন্দনা' (প্রথম প্রকাশ কল্লোলে)।

২৯ নজরুলের কবিতাটি ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রথম বাহির হইয়াছিল।

৩০ 'অমিতার প্রেম'। রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব প্রেম' তুলনীয়।

৩১ 'প্রেমিক'।

৩২ 'শাপভ্রষ্ট' (কল্লোলে প্রথম প্রকাশিত)।

৩৩ প্রগতিতে প্রথম প্রকাশিত।

৩৪ দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত।

৩৫ দ্বিতীয় সংস্করণে পুরা নাম 'কঙ্কাবতী কাল ও কখনো ও অন্যান্য কবিতা'।

৩৬ 'স্বপ্ন লঙ্কা' (সনেট-পঞ্চাশৎ)।

৩৭ 'আর কিছু নাহি সাধ'।

৩৮ 'এখন বিকেল' (দময়ন্তী)।

৩৯ 'সাগর দোলা'।

৪০ রবীন্দ্রনাথের 'ছায়াছবি' কবিতার (বীথিকায় সঙ্কলিত) প্রভাবও আছে।

৪০ক 'নেপথ্য নাটক' (রচনাকাল ১৯৪৭)।

৪১ কবিতা কার্তিক ১৩৪৮ পৃ ৩২।

৪২ 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', 'আমি চঞ্চল হে' এবং 'সব পেয়েছির দেশে' ভ্রমণ ও আত্মকথামূলক, 'কাঠের পুতুল' প্রবন্ধ। বাকিগুলি গল্প উপন্যাস।

৪৩ 'মালতী'।

৪৪ 'পাতালকন্যা'।

৪৫ 'পুরুষসা ভাগ্যম্'।

৪৬ 'সংশয়'।

৪৭ ছাপায় 'পুনর্ণবা'।

৪৮ 'প্রত্যয়'। (রচনাকাল সেপটেম্বর ১৯৪৫)।

৪৯ 'পশ্চাতের আমি' (রচনাকাল জানুয়ারি ১৯৪৬)।

৫০ 'পাখী আর তারা'।

৫১ 'ভালো লাগে'।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
পাঠ্য ও নাট্য

১ প্রবন্ধাবলী

আলোচ্য সময়ে নবীন প্রবন্ধ-লেখকেরা প্রধানত সবুজপত্র-গোষ্ঠীর অন্তর্গত অথবা প্রমথ চৌধুরী প্রভাবিত ছিলেন। ইঁহাদের চিন্তায় স্বকীয়তা, রচনায় পরিচ্ছন্নতা এবং বিষয়ের উপস্থাপনে ঋজুতা প্রকট। এমন লেখক যাঁহারা পরবর্তী কালে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা প্রস্তুত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মুখ্য—অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬০), নলিনীকান্ত গুপ্ত (১৮৮৯-১৯৮৪), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৬), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬২) ইত্যাদি।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত খুব অল্পই লিখিয়াছেন, কিন্তু যাহা লিখিয়াছেন তাহার স্থায়ী মূল্য আছে। ইঁহার 'কাব্যজিজ্ঞাসা'য় (১৯২৮)[১] ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদের জটিল সিদ্ধান্ত আধুনিক কালের পাঠকের উপযোগী করিয়া সহজ ও সরলভাবে উপস্থাপিত। ছোট বই 'নদীপথে' (১৯৩৭) কয়েকটি পত্রের সঙ্কলন। ইহাতে সুন্দরবন দিয়া আসাম পর্যন্ত নদীপথ ভ্রমণের শান্ত ও সুন্দর বর্ণনা আছে। ইঁহার অপর প্রবন্ধের বই 'ইতিহাসের মুক্তি' (১৩৬৪ সাল)।

সাহিত্য ও শিল্প চিন্তাবিষয়ক প্রবন্ধ-রচনায় নলিনীকান্ত গুপ্ত উচ্চ স্থানের অধিকারী। ইহার প্রবন্ধে বহুশ্রুততার ও মনীষার পরিচয় সহজলভ্য। সমসাময়িক ইউরোপীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনার ইনি অন্যতম প্রথম পথপ্রদর্শক। নলিনীকান্তের রচনা গাঢ়বন্ধ, সেইজন্য সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছু গুরুপাক। শেষের দিকের কোন কোন রচনায় অরবিন্দের অধ্যাত্মচিন্তার প্রভাব প্রস্ফুট। নলিনীকান্তের প্রবন্ধপুস্তকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'সাহিত্যিকা' (১৯২০), 'রূপ ও রস' (১৯২৮), 'শিক্ষা ও দীক্ষা' (১৯২৮), 'আধুনিকী' (১৯৩২), 'শিল্পকথা' (১৯৪৮) ইত্যাদি।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাবিজ্ঞানী ও ভারততত্ত্ববিদ্ বলিয়া বিশ্ববিশ্রুত।

রবীন্দ্রনাথ ইঁহাকে "ভাষাচার্য" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার "ভাষা-পরিচয়' উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা লেখক হিসাবে সুনীতিবাবুকে দুই গুরুর শিষ্য বলিয়া ধরিতে পারি,—বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এবং চিন্তার পরিচ্ছন্নতায় প্রমথ চৌধুরীর। তবে স্টাইল ইঁহার নিজস্ব। মানুষের বিষয়ে সুনীতিবাবুর গভীর আগ্রহ ও সার্বভৌম অনুসন্ধিৎসা। গ্রীক দর্শন হইতে নিগ্রো আর্ট এবং নৃতত্ত্ব হইতে তানসেন-সঙ্গীত—সর্বত্র ইঁহার কৌতূহল সদা-জাগ্রত। সুনীতিবাবুর অকপট জীবনরস-পিপাসার পরিচয় সবচেয়ে পরিস্ফুট আছে ভ্রমণ-বৃত্তান্তগুলিতে—'দ্বীপময় ভারত' (১৯৪০), 'ইউরোপ ১৯৩৮' দুই খণ্ড (১৯৪৫) ইত্যাদিতে। সুনীতিবাবুর ভ্রমণকাহিনী পড়িলে একসঙ্গে পথ পথ্য পাথেয় এবং পথিকসঙ্গসুখের বিচিত্র আস্বাদ পাওয়া যায়। সুনীতিবাবু বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেগুলির অধিকাংশ এখনও সঙ্কলিত হয় নাই। সঙ্কলিত প্রবন্ধপুস্তক—'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' (১৯৩৮) ইত্যাদি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গল্প এবং উপন্যাসও লিখিয়াছেন। ইঁহার উপন্যাসে প্রবন্ধোচিত মননশীলতার পরিচয়ই বেশি। প্রথম বই 'রিয়লিষ্ট' (১৯৩৩) গল্পের বই। পাঁচটি গল্প আছে। স্টাইলে প্রমথ চৌধুরীর অনুসরণ স্পষ্ট। ধূর্জটিবাবুর সবচেয়ে বিশিষ্ট রচনা হইল উপন্যাস-ত্রয়ী—'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' (১৯৩৭) ও 'মোহানা' (১৯৪৩)।[২] পোলিটিক্যাল ও সামাজিক আবেষ্টনে দুই সমসাময়িক নরনারীর আত্মজিজ্ঞাসার ও প্রেম-উপলব্ধির ইতিহাস ইহাতে বর্ণিত। বাঙ্গালা উপন্যাসের টেকনিকে এ বস্তু আনকোরা না হইলেও অপরিচিত বটে। 'আমরা ও তাঁহারা' (১৯৩১), 'চিন্তয়সি' (১৯৩৩) এবং 'কথা ও সুর' (১৯৩৮) প্রবন্ধের বই।

সবুজপত্রের কয়েকজন তরুণ লেখক গল্পের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কথা আগে বলিয়াছি। ইনি গল্প ছাড়া কবিতাও লিখিয়াছিলেন। কিরণশঙ্কর রায়ের (১৮৯১-১৯৪৯) ছোটগল্পের সঙ্কলন 'সপ্তপর্ণ' উল্লেখযোগ্য বই।

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) রবীন্দ্র-সাহিত্যসমালোচনার পথপ্রদর্শক। বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির অভিযোগ ছিল যে রবীন্দ্র-সাহিত্য মায়িক এবং কল্পনাসর্বস্ব।[৩] এই অভিযোগের জবাবে অজিতকুমার যে দীর্ঘ প্রবন্ধগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহাই 'রবীন্দ্রনাথ' এ (১৯১২) ও 'কাব্যপরিক্রমা'য় (১৯১৪) সঙ্কলিত। এই প্রবন্ধগুলির রচনায় লেখক রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। অজিতকুমার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী লিখিয়াছিলেন (১৯২৬)। অপর প্রবন্ধপুস্তক—'বাতায়ন'। 'খৃষ্ট' যীশুখ্রীস্টের সম্বন্ধে বালক-পাঠ্য রচনা। রবীন্দ্রনাথ ইহাতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯) স্বদেশি যুগে মানিকতলা বোমার মামলায় নির্বাসনদণ্ডভোগীদের অন্যতম। মনোমোহন, অরবিন্দ এবং বারীন্দ্রকুমার—তিন ভাই-ই মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর সাহিত্যপ্রীতি যেন উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের সুবিখ্যাত অধ্যাপক মনোমোহন অক্সফোর্ডে পাঠ্যাবস্থায় ইংরেজী কবিতা লিখিয়া প্রশংসিত হইয়াছিলেন। অরবিন্দের ইংরেজী কবিতা

ও অন্যান্য রচনা সুবিদিত। বারীন্দ্রকুমার অল্পবয়সেই বাঙ্গালা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আন্দামান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বারীন্দ্রকুমার আবার বাঙ্গালা লেখায় মন দেন। কিছুকাল ইনি পাক্ষিক 'বিজলী' (এবং পরে অন্য কাগজ) সম্পাদন করিয়াছিলেন।[৪]

শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার পর নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন মনস্বী সেখানে যোগদান করেন। কিছুকাল পরে যাঁহারা পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) একজন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র এবং তাঁহার সুকণ্ঠ ও সাহিত্য-সঙ্গীত-প্রীতির উত্তরাধিকারী দিলীপকুমার অল্পবয়সেই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যগুরুর প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। পিতার আরব্ধ ভারতবর্ষ পত্রিকায় দিলীপকুমারের লেখকরূপে আবির্ভাব। ইনি কবিতা গান গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি প্রচুর লিখিয়াছেন। ইঁহার গ্রন্থাবলী—'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা' (১৩৩৩ সাল), 'মনের পরশ' (১৯২৬, উপন্যাস), 'বহুবল্লভ' ও 'দুধারা' (১৯২৭, উপন্যাস), 'অনামী' (১৯৩৩, প্রধানত কবিতা), 'রঙের পরশ' (১৯৩৪, উপন্যাস), 'তীর্থঙ্কর', 'দোলা' দুই খণ্ডে (১৯৩৫-৩৬, উপন্যাস), দুইখণ্ডে 'তরঙ্গ রোধিবে কে' (১৯৩৮, উপন্যাস), 'সূর্যমুখী' (১৯৩৬, কবিতা), 'আপদ ও জলাতঙ্ক' (১৯২৬, নাটক), 'শাদা কালো' (১৯৪৪, নাটক), 'আবার ভ্রাম্যমাণ' (১৯৪৪) ইত্যাদি।

মন্মথনাথ ঘোষ (১৮৮৪-১৯৫৯) সাহিত্যিক ও মনীষীদের জীবনবৃত্তান্ত লইয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্পকায় সচিত্র, জীবনীগ্রন্থমালা রচনা করিয়াছিলেন। যেমন 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' (১৯১৫), 'রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়' (১৯১৮), 'হেমচন্দ্র' (তিন খণ্ড, ১৮১৯-২৩), 'সেকালের লোক' (১৯২৩), 'কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র' (১৯২৬), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' (১৯২৭), 'রঙ্গলাল' (১৯২৯), 'মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়' (১৯৩৩), ও 'মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র' (১৯৩৪)। ইঁহার প্রথম গ্রন্থ 'জাপান ভ্রমণ' (১৯১০)।

শরৎকুমার রায়ের (১৮৭৮-১৯৩৫) গ্রন্থগুলি সরল ও সুখপাঠ্য—'শিবাজী ও মারাঠা জাতি' (১৯০৯), 'শিখ গুরু ও শিখ জাতি' (১৯১০), 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী', (১৯১৪, দ্বি-স ১৯২৪), 'ভারতীয় সাধক' (১৯১৪), 'পঞ্চকন্যা' (১৯২২), 'বৌদ্ধ ভারত' (১৯২৩), এবং 'মহাত্মা অশ্বিনীকুমার' (১৯২৬)। প্রথম, দ্বিতীয়, সপ্তম গ্রন্থগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা আছে।

জীবনী জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে এইগুলিও উল্লেখযোগ্য; স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' (পাঁচ খণ্ড, ১৯১১-১৬); নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের (১৮৮৬(?)-১৯৪০) 'কান্তকবি রজনীকান্ত' (১৯২১); বিপিনবিহারী গুপ্তের (১৮৭৫-১৯৩৬) 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (দুইখণ্ড, ১৯১৩-২৩), 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৯১৪-২৭); যদুনাথ সরকারের (১৮৭০-১৯৫৮), 'শিবাজী' (১৯২৯) ও 'মারাঠার জাতীয় বিকাশ' (১৯৩৬); প্রমথনাথ বসুর (১৮৫৫-১৯৩৪) 'স্বামী বিবেকানন্দ' (চার খণ্ড ১৯২৪-২৯; প্রথম প্রকাশ এক খণ্ডে ১৯১৯); আবদুল কাদেরের 'মরুসভ্যতা' (১৯৩৬) ও 'তুরস্কের ইতিহাস' (১৯৩৮); প্রবোধচন্দ্র বাগচীর (১৮৯৮- ১৯৫৬) 'ভারত ও ইন্দোচীন' এবং 'ভারত ও মধ্যএসিয়া'; ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮০-১৯৬১) 'আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা' (দুই খণ্ড ১৯২৬), 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' (১৯২৬, দ্বি-স ১৯৪৯) ও

'তরুণের অভিযান' (১৯২৯)। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের (১৮৯১-১৯৫৪) 'বিবেকানন্দ চরিত' (১৯২০, সপ্তম-স ১৯৪৯); সরলাবালা দাসীর (১৮৭৫-১৯৬১) 'নিবেদিতা' (১৯১২), 'মায়ের কথা' (১৯২৬) ইত্যাদি ; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯২-১৯৮৫) 'রবীন্দ্রজীবনী' (দুই খণ্ডে ১৯৩৩-৩৬ ; পরে চার) ; ইত্যাদি ॥

২ নাট্য-নিবন্ধ

গল্প-উপন্যাসের তুলনায় নাটকে লেখকেরা বিশেষ বৈচিত্র্য অথবা শক্তি দেখাইতে পারেন নাই। এটা বাঙ্গালা সাহিত্যেরই বিশেষত্ব নয়, প্রায় সব আধুনিক সাহিত্যেই দেখা গিয়াছে। সাহিত্যের একটি প্রধান ফর্ম হিসাবে নাটক গল্প-উপন্যাসের চেয়ে অনেক প্রাচীন, এমন কি কাব্যের চেয়েও প্রাচীন বলা যায়। নাটক অর্থাৎ নাট্যাভিনয় বহুলোকের একসঙ্গে চিত্তবিনোদন করে। ছাপা বইয়ের প্রচলন হইবার পরে এবং পাঠ্য গল্প-উপন্যাসের রস পাইবার ফলে শ্রব্য রচনার অপেক্ষা পাঠ্য রচনার প্রতি লোকের অনুরাগ বাড়িয়াছে। সুতরাং সাহিত্যরস-যোগানে হিসাবে নাটকের আদর ও কদর কমিয়াছে। তাহার উপর সিনেমা আসিয়া পড়ায় নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্র দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এইসব কারণে নাটক-রচনায় সাহিত্যিকদের উৎসাহ নাই।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশ বছরে প্রধানত গিরিশচন্দ্র ঘোষেরই (১৮৪৮-১৯১১) প্রভাব চলিয়াছে। স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব নাটকে এবং নাট্যাভিনয়ে বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মির কাশিম' (১৯০৬) প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক নাট্যামোদী জনসাধারণের চিত্তে দেশপ্রেমের যত না হোক ইংরেজ-বিদ্বেষের ঢেউ তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটকশিল্প গিরিশচন্দ্রকে প্রভাবিত করে নাই, তবে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে (১৮৬৩-১৯২৭) করিয়াছিল। দ্বিতীয় দশকের নাট্যকারদের মধ্যে ইনি এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই (১৮৬৯-১৯১৩) প্রধান। ক্ষীরোদপ্রসাদ গিরিশচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়াছিলেন প্রধানত পৌরাণিক-আধ্যাত্মিক নাটক-বস্তুতে। দেশপ্রেমবাহী ঐতিহাসিক নাটক-বস্তুতে অনুসরণকারী ছিলেন অনেকে। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—নিশিকান্ত বসু রায়।[৫] ইনি পৌরাণিক বস্তুতে কিঞ্চিৎ নবীনত্ব দিয়া সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পরিবেশন করিয়া সাফল্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৭-১৯৩৪) বাঙ্গালা নাটকের পুরানো ধারার শেষ উল্লেখযোগ্য লেখক।[৬] ইহার 'কর্ণার্জ্জুন' (১৯২৩) সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯৩৮) বহু প্রহসন লিখিয়াছিলেন। তাঁহার 'কেলোর কীর্তি' (১৯২১), 'পেলারামের স্বাদেশিকতা' (১৯২২), 'ডারবি টিকিট' (১৯২৭) ইত্যাদি বই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সমাদৃত হইয়াছিল। বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্তও অনেকগুলি নাটক লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 'মিসরকুমারী' (১৯১৯) জনপ্রিয়তায় উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-সমাজে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে তাঁহারই অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনের অভিনয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষীয় অভিনয়-শিল্পে দিক্‌দর্শন করাইয়াছিল। ইহার প্রভাব সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সঙ্গে সঙ্গে অনুভূত হয় নাই। তবে কলেজীয় ছাত্রদলের অভিনয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত

নাটকের প্রযোজনা যে অভিনবত্ব দেখাইয়াছিল তাহাতে সঙ্গীত-সমাজের অভিনয়ের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। এই ছাত্রদলের মুখ্য অভিনেতা দুইজনকে পরবর্তী কালে রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রূপে পাইয়াছি। একজন নরেশচন্দ্র মিত্র (১৮৮৮-১৯৬৮) আর একজন শিশিরকুমাব ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৬০)। তৃতীয় দশকে বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে যে অভিনবতা প্রদর্শিত হইল তাহা প্রধানত শিশিরকুমারেরই কৃতিত্ব। কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিয়া শিশিরকুমার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রযোজক-অভিনেতা রূপে দেখা দিলেন ম্যাডান কোম্পানি পরিচালিত 'দি বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানি'তে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদেব 'আলমগীর' নাটকের নাম-ভূমিকা লইয়া (ডিসেম্বর ১৯২১)। তাহার পর নট ও নটগুরুরূপে তাঁহার যশ প্রতিষ্ঠিত হইল যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর (১৮৮৯-১৯৪১) 'সীতা' নাটকেব অভিনয়ে (১৯২৪)। এই নাটকের প্রযোজনায় তিনি তাঁহার যে কয়জন বন্ধুর সহযোগিতা পাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। ১৯১৭ অব্দে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফাল্গুনীর অভিনয় করিয়াছিলেন। সেই অভিনয় আমাদের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা বলা যাইতে পারে। এই অভিনয় হইতে শিশিরকুমার তাঁহার প্রযোজনার সূত্র পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথেব 'শোধবোধ', 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতিব অভিনয়ে শিশিরকুমারের কৃতিত্ব স্মরণীয়। বাঙ্গালা সিনেমা চিত্রের ব্যাপাবেও শিশিরকুমার অগ্রণী হইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় করিবার মূলে শিশিরবাবুর প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও উপন্যাসের নাট্যরূপ সম্বন্ধেও তাই।

শিশিরকুমার ভাদুডী ও নরেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ উচ্চশিক্ষিত অভিনেতা রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের রুচির মান বাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইলেন। প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ যখন স্থাপিত হয় তখন থিয়েটার-দর্শকদের ঝোঁক ধর্ম ও পুবাণ কাহিনীর দিকে ছিল না, ছিল তখনকাব সাহিত্যের বস্তুর দিকে। মাইকেলের মহাকাব্য ও বঙ্কিম-রমেশের উপন্যাসই তখন নাট্যরূপ পাইয়া থিয়েটার জমাইত। এখনও যেন ঠিক তেমনি হইল। শরৎচন্দ্র চট্টেপাধ্যায় এবং অনুরূপা দেবীর জনপ্রিয় উপন্যাস নাট্যাকারে সাফল্যের সহিত অভিনীত হইতে লাগিল। শরৎচন্দ্র নিজের চারখানি উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়াছিলেন,—দেনাপাওনা অবলম্বনে 'ষোড়শী' (১৯২০), পল্লীসমাজ অবলম্বনে 'রমা' (১৯২৮), 'বিরাজবৌ' (১৯৩৪) এবং দত্তা অবলম্বনে 'বিজয়া' (১৯৩৪)। পরে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী 'পরিণীতা'কে নাটকে পরিণত কবেন (১৯৪০)। আরও পরে শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত শরৎচন্দ্রের গল্প লইয়া চারটি নাটক লিখিলেন,—'অনুপমার প্রেম' (দ্বি-স, ১৯৪৫), 'বিন্দুর ছেলে' (চ-স ১৯৫৩), 'নিষ্কৃতি' (১৯৫২) ও 'রামের সুমতি'। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখিয়াছিলেন 'দেবদাস' (১৯৫৩) ও 'পথেব দাবী' (১৯৫৩)।

অনুরূপা দেবীর তিনটি উপন্যাসকে নাটক-রূপ দিয়াছিলেন প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—'মন্ত্রশক্তি' (১৯৩০), 'পোষ্যপুত্র' (১৯৩২) ও 'মা' (১৯৩৩)। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী 'মহানিশা'কে নাট্যরূপ দিয়াছিলেন (১৯৩৩)।

প্রবীণ নাট্যকারদের কেহ কেহ নূতন রুচির উপযোগী করিয়া নাটক লিখিলেন। এমন রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের

(১৮৬৩-১৯২৭) 'আলমগীর' (১৯২১), 'রত্নেশ্বরের মন্দিরে' (১৯২২) ও 'নরনারায়ণ' (১৯২৬)। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন 'কর্ণার্জুন' (১৯২৩) ও 'চণ্ডীদাস' (১৯২৬) ইত্যাদি।

আরও দুই-একজন প্রবীণ নাট্যকার আলোচ্য সময়েও নাটক লিখিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯৩৮ ; রচনা—'জোরবরাত' ১৯২৭ ; 'বাঙালী' ১৯২৬ ; 'দেশের ডাক' ১৯৩১ ; 'ধরপাকড়' ১৯৩১ ইত্যাদি) ; বরদাচরণ দাশগুপ্ত (রচনা—'মতির মালা' ১৯১৭ ; 'মিসরকুমারী' ১৯১৯ ; 'নাদিরশাহ' ১৯২২ ; 'শ্রীদুর্গা' ১৯২৬ ; 'সুভদ্রা' ১৯২৯ ; 'দেবযানী' ১৯৩২ ; ইত্যাদি) ; নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৪৪ ; রচনা—'বীর রাজা' ১৯১৫ ; 'বাহাদুর' ১৯১৮ ; 'রাতকাণা' দ্বাদশ স ১৯৪১) ; 'ভুলের খেলা' ১৯২১ ইত্যাদি), মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৬- ? ; রচনা—'জাহাঙ্গীর' ১৯২৯ ; 'মহামানব' ১৯৩৪ ; 'ঝান্‌সীর রানী' ১৯৪২) ; নিশিকান্ত বসু রায় রচনা—'ললিতাদিত্য' ১৯২৬ ; 'পথের শেষে' ১৯২৮ ; 'ধর্ষিতা' ১৯৩৫) ; সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রচনা—'লাখ টাকা' ১৯২৬ ; 'হারানো রতন' ১৯২৯ ; মতিলাল রায় (১৮৮২- ? রচনা—'উদ্‌বোধন' ১৯১৯ ; 'চণ্ডীদাস' ১৯২৪ ; পাতিব্রতা ১৯২৬) ইত্যাদি।

আলোচ্য সময়ে কোন কোন কবি ও উপন্যাস-লেখক নাটক লিখিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম নাম করিতে হয় ডক্‌টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের। ইনি লিখিয়াছিলেন 'আনন্দমন্দির' (১৯২৩), 'ঠকের মেলা' (১৯২৫), 'ঋষির মেয়ে' (১৯২৬) এবং 'নারায়ণী' (১৯২৯)। অনুরূপা দেবী দুইখানি বড়[৭] ও চারখানি ছোট[৮] নাটক লিখিয়াছিলেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[৯], মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়[১০], সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত[১১] ও শৈলবালা ঘোষজায়া[১২] একখানি করিয়া আর হেমেন্দ্রকুমার রায়[১৩] দুইখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের উপন্যাস গল্প কবিতা লেখকেরাও কেহ কেহ নাট্যরচনার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক লিখিয়াছিলেন 'দ্বারাবতী'।

পোলিটিক্যাল্ (যেমন নন-কো-অপারেশন) ও সামাজিক (অস্পৃশ্যতা) আন্দোলন অনেক বিশিষ্ট রচনার বিষয় ছিল।

নাট্যকাররূপে যাঁহারা এই সময়ে দেখা দিয়াছিলেন এখন তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছি। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য পূর্বে উল্লেখিত 'সীতা' নাটকের (১৯২৪) রচয়িতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (১৮৮৯-১৯৪৮)। ইহার অপর রচনা—'দিগ্‌বিজয়ী' (১৯২৮), "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' (১৯৩১), 'বাংলার মেয়ে' (১৯৩৪), 'পতিব্রতা' (১৯৩৪), 'পথের সাথী' (১৯৩৫), 'নন্দরাণীর সংসার' (১৯৩৬), 'মাকড়সার জাল' (১৯৩৯) ও 'মহামায়ার চর' (১৯৪০)। 'মহানিশা' ও পরিণীতা' আগে উল্লিখিত হইয়াছে।

জলধর চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৬(?)-১৯৬৮) অনেকটা যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর অনুসারী নট-নাট্যকার। ইনি বিশ-পঁচিশখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। যেমন 'অহিংসা' (১৯২৭)[১৪], 'সত্যের সন্ধান' (১৯২৮)[১৪], 'রাঙারাখী' (১৯৩০), 'রামচন্দ্র' (১৯৩০), 'অসবর্ণা' (১৯৩২)[১৪], 'আঁধারে আলো' (১৯৩২)[১৪], 'মন্দির প্রবেশ' (১৯৩৩), 'শক্তির মন্ত্র'

(১৯৩৩), 'রীতিমত নাটক' (১৯৩৫)[১৩], 'নারীধর্ম' (১৯৩৮), 'পি ডাবলিউ ডি' (১৯৪০), 'হাউসফুল' (১৯৪১) ইত্যাদি।

জলধরবাবুর একটি গল্পের বই ও কয়েকখানি উপন্যাসও আছে। গল্পের বই—'টিকটিকি ও চড়াই' (১৯৪৭)। উপন্যাস—'পরের বৌ' (১৯২৭)[১৪], 'প্রাণের দাবী' (১৯২৯)[১৪], 'কন্‌ট্রোলের শাড়ী' (১৯৪৫), 'তাসের ঘব' (১৯৪৫), 'লেডিজ ওনলি' (১৯৪৬) এবং 'তরুণের স্বপ্ন' (১৯৪৬)।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১) প্রায় তিরিশখানি নাটক লিখিয়াছিলেন।[১৬] ইঁহাব কোন কোন নাটকের বস্তুতে পোলিটিক্যাল্ রঙ একটু বেশি জ্বলজ্বলে। ইঁহার নাট্যরচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'রক্তকমল' (১৯২৯), 'প্রলয়' (১৯৩৭), 'গৈরিক পতাকা' (১৯৩০), 'ঝড়ের রাতে' (১৯৩১), 'নার্সিং হোম' (১৯৩৩), 'দেশের দাবী' (১৯৩৪)[১৭], 'স্বামীস্ত্রী' (১৯৩৭), 'তটিনীর বিচার' (১৯৩৯), 'রাষ্ট্রবিপ্লব' (১৯৪৪) ইত্যাদি। শচীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের দেবদাস ও পথেব দাবী নাট্যাকাবে পরিণত করিয়াছিলেন।

মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে সমসাময়িক পোলিটিক্যাল্ চিন্তা জড়াইয়া নাটক রচনা শুরু করেন। ইঁহার রচনা—'কারাগার' (১৯২৩), 'মুক্তির ডাক' (১৯২৪), 'সমাজবীব' (১৯২৫), 'চাঁদ সদাগর' (১৯২৭)[১৮], 'দেবাসুর' (১৯২৮), 'সাবিত্রী' (১৯৩১) ইত্যাদি ইত্যাদি। মন্মথবাবু অনেকগুলি ভালো একাঙ্ক নাটক লিখিয়াছেন। সেগুলির প্রথম সঙ্কলন 'একাঙ্কিকা' (১৯৩১)।

অতঃপর উল্লেখযোগ্য—'মহারাষ্ট্র' (১৯২৪),[১৯] 'সমুদ্রগুপ্ত' (১৯২৯), 'মানসী' (১৯৩০)[১৯] ইত্যাদি বিশ-পঁচিশখানি প্রধানত ঐতিহাসিক নাটকের লেখক সুধীন্দ্র রাহা (জন্ম ১৮৯৬); 'ডাক্তার মিস্ কুমুদ' (১৯৩৭), 'রিহার্সেল' (১৯৪১) ইত্যাদির লেখক অয়স্কান্ত বক্সী (১৯০১-১৯৬৬), 'মেঘমুক্তি' (১৯৩৮), 'মাটির ঘর' (১৯৩৯), ইত্যাদিব লেখক বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯১০-১৯৮৬); 'গয়াতীর্থ' (১৯৩৭) ইত্যাদি প্রায় চল্লিশখানি নাটকের লেখক মহেন্দ্র গুপ্ত (১৯১০-১৯৮৪); 'শুভযাত্রা' (১৯৩৩) ও 'জন্মতিথি' (১৯৩৫)[২০] রচয়িতা প্রবোধকুমার মজুমদার (১৮৯৯-১৯৭০), 'তরঙ্গ' (১৯৩৬) ইত্যাদির লেখক দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৯০); 'অতিথি' (১৯৩২), 'কলেবর' (১৯৩৭) ইত্যাদি প্রণেতা ঔপন্যাসিক সুবোধ বসু (১৯০৮-১৯৮৩)।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের (১৮৯৬-১৯৩২) 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' (১৯৩২) হাস্যশুচি প্রহসনে নূতন আদর্শ উপস্থিত করিল। ইঁহার অনুসরণ করিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (১৯০৫-১৯৯১) (ছদ্মনাম "বিরূপাক্ষ")[২১]। রোমান্টিক ও রোমাঞ্চকর গল্প অবলম্বনে সহজ সরল ও হাল্‌কা এবং চলচ্চিত্রের উপযোগী নাটক রচনায় কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০)। ইঁহার রচনা—'বন্ধু' (১৯৩৭), 'ডিটেক্‌টিভ' (১৯৩৭), 'লালপাঞ্জা' (১৯৩৮), 'পথ বেঁধে দিল' (১৯৪১) ইত্যাদি।

নাটক রচনায় আর একটি বিশেষ রীতি প্রবর্তন করিলেন ঔপন্যাসিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (ছদ্মনাম "বনফুল")। ইঁহার 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৯) ও 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪১) নাটক দুইটিতে প্রায় সমসাময়িক মহৎ ব্যক্তির জীবনী বস্তুরূপে অবলম্বিত হইয়াছে।

মার্কসের দৃষ্টি লইয়া নাট্যরচনায় সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন সুদক্ষ নট তুলসীদাস লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯)[২২] ও বিজন ভট্টাচার্য (১৯০৬-)।[২৩] ইঁহার 'নবান্ন' নাট্যরচনায় ও অভিনয়ে নূতন পথ দেখাইয়াছে ॥

টীকা

১ প্রথম প্রকাশ সবুজপত্রে।
২ মোহানাব প্রথম প্রকাশ পাবিচয়ে (১৩৪৮-৪৯ সাল।)
৩ ১৩১৮ সা লব চৈত্রসংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
৪ পূর্বে দ্রষ্টব্য।
৫ বচনা 'গাঙ্গাবাও (১৯-৫), 'দেবলা দেবী' (১৯১৮), 'বঙ্গে বর্গী' (১৯২৯), পথেব শেষে' (১৯২৮) ইত্যাদি।
৬ ইঁনি বহু নাটক লিখিয়াছিলেন। যথা 'আহুতি' (১৯১৪), 'রাখী বন্ধন' (১৯২০) 'অযোধ্যার বেগম' (১৯২১), বিদ্রোহিনী' (১৯৩২) ইত্যাদি।
৭ 'বিদ্যাবত্ন' (১৯১৯) ও 'কুমাবিল ভট্ট, (১৯১১)।
৮ 'নাট্যচতুষ্টয' (১৯৩৩)।
৯ 'জয়শ্রী' (১৯২৬) ছোট বই।
১০ 'মুক্তাব মুক্তি' (১৯২২)।
১১ 'মহাপ্রস্থান' (১৯৩০)।
১২ 'মোহেব প্রায়শ্চিত্ত (১৯২১)।
১৩ 'ধ্রুবতাবা' (যতীন্দ্রমোহন সিংহেব উপন্যাসেব নাট্যরূপ), 'প্রেমের প্রেমারা' (১৯২০)।
১৪ যশোব হইতে প্রকাশিত।
১৫ শিশিবকুমাব ভাদুড়ী বইটির অভিনয় করিয়াছিলেন। লেখকও সে অভিনযে নামিয়াছিলেন।
১৬ নাটক রচনায় হাত দিবাব আগে ইনি দুইটি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন—'মরণমহল' (১৯২৩) ও 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'।
১৭ চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।
১৮ ইহাব আগে বসন্তবিহারী চন্দ্র এই নামে নাটক বচনা কবিয়াছিলেন।
১৯ খুলনা হইতে প্রকাশিত।
২০ বই দুইটি নাট্যনিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল।
২১ বচনা- 'ঝঞ্ঝা' (১৯৩৪), 'ব্ল্যাক আর্ট' (১৯৪১) ইত্যাদি। ইঁনি বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামকে নাটকে পরিণত করিয়াছেন। (১৯৪৬)।
২২ বচনা- 'মায়েব দাবী' (১৯৪১), 'দুঃখীব ইমান' (১৯৪৭), 'ছেঁড়া তার' (১৯৫০) ও 'পথিক' (১৯৫১)। মাযেব দাবী ইংবেজী সিনেমা চিত্রের কাহিনী অবলম্বনে পরিকল্পিত এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।
২৩ বচনা- 'নবান্ন' (১৯৪৪), 'জনপদ' (১৯৪৫), 'অবরোধ' (১৯৪৭)।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
গল্প-উপন্যাস

১ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

গল্প-উপন্যাসের বিষয়ে "বাস্তবতা" অর্থাৎ নরনারীর প্রেমের সম্পর্কে দৃষ্টিপ্রসার ভারতীব লেখকগোষ্ঠীব রচনায় প্রথম দেখা দিয়াছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[১] হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ভূপতি চৌধুরী— ইত্যাদি লেখকের গল্পে উপন্যাসে তাহার পরিচয় পরিলক্ষিত। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আবির্ভূত হইয়া সাধারণ পাঠকের মনে একশ্রেণীর সমাজনিন্দিতা ও পতিতার প্রতি সমবেদনা জাগাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে উদীয়মান বাস্তবতার কাঁটাটুকু নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ভারতীর আসর ভাঙ্গিয়া যাইবার আগেই নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), পরে প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী, গল্প-উপন্যাসে নূতনতর বাস্তবতার পথ খুলিয়া দিলেন। ইঁহার প্রথম গল্প 'ঠান্‌দিদি' নারায়ণে বাহির হইয়াছিল (১৯১৮)।[২] গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়ের প্রভাব আছে, এবং রচনা জোরালো। 'শুভা' (১৯২০) ও 'শাস্তি' (১৯২১) উপন্যাস দুইটিতে নরেশচন্দ্র সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। আরও সাহসের পরিচয় পাওয়া গেল 'পাপের ছাপ'এ (১৯২২)।[৩] যৌনভাবাশ্রিত ক্রিমিনাল মনোবৃত্তির চিত্রণ বাঙ্গালা উপন্যাসে এই প্রথম। নরেশচন্দ্রের পিছনে যে ভাঙ্গিয়া পড়া ভারতী-গোষ্ঠীর সমর্থন ছিল তাহা শুভার ও পাপের-ছাপের অকুণ্ঠ প্রশংসা হইতে বোঝা যায়।[৪]

নরেশচন্দ্র বহু সুপাঠ্য গল্প এবং উপন্যাস লিখিয়াছেন।[৫] তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এইগুলি— 'অগ্নি-সংস্কার' (১৯২০), 'দত্তগিন্নী'[৬] 'কাঁটার ফুল'[৬ক], 'দ্বিতীয় পক্ষ' (১৯২০), 'পিতাপুত্র' (১৯২৫), 'রাজগী' (১৯২৫), 'ব্যবধান', 'মিলন পূর্ণিমা' (১৯২৩), 'দূরের আলো' ইত্যাদি। কয়েকখানি নাটকও ইনি লিখিয়াছেন। তাহা আগে উল্লেখ করিয়াছি।

আইনে কৃতবিদ্য হইয়া নরেশচন্দ্র কিছুদিনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের প্রধান অধ্যাপকের পদ স্বীকার করিয়াছিলেন, সে কথা আগে বলিয়াছি। ঢাকায় থাকিবার সময় নরেশচন্দ্র কয়েকটি কাহিনী লিখিয়াছিলেন পূর্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর লোকের জীবনচিত্র

দিয়া। (পরে এমন অনেক গল্প অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও লিখিয়াছেন।) নরেশচন্দ্রের এই ধরনের লেখার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'রূপের অভিশাপ' (১৯৩০)। এটি একটি মুসলমান তরুণীর জীবনের ব্যর্থতার জীবন্ত নিষ্ঠুর কাহিনী।

প্রমথ চৌধুরীর 'চার-ইয়ারী কথা' ছোটগল্পের শিল্পে একটা নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছিল এবং খানিকটা নূতন ফ্যাশনেরও সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু তাহার অপেক্ষাও অধিক প্রভাব বিস্তার করিল রবীন্দ্রনাথের লিপিকার কথিকাগুলি। কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের মাধ্যমে এবং প্রথমবিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বিশেষ আমদানি হ্যাভলক্ এলিস, ক্রাফট্ এবিং প্রভৃতি পণ্ডিতের যৌন মনস্তাত্ত্বিক গ্রন্থ অধীত হইতে লাগিল।[৭] এদিকে জীবনে জটিলতা বাড়িতেছে। নিম্ন মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতির সঙ্গে তাহার সামাজিক জীবনে সঙ্কট সমুপস্থিত এবং পারিবারিক জীবনেও ফাটল ধরিতেছে। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র ক্রমশই ক্ষীণতর হইতেছে। তাই এখন নানাদিকে পলায়নী মনোবৃত্তি বিবর-অন্বেষী। এখন যেন কবি-ভাবনা বসন্ত-প্রকৃতির কল্পনা আঁকা-বাঁকা পাশের গলির অতি সাধারণ মানুষের দুঃখসুখের প্রতি ধাবিত। জীবনের আদর্শের স্থানে দেখা দিতে লাগিল সাধারণ লোকের নিতান্ত সাধারণ কামনা। অবশ্য এ ব্যাপার ধীরে ধীরে শুরু হইয়াছে এবং তাহাও বিস্তারিত ভাবে নহে। পরবর্তী দশকে এ প্রবণতা স্পষ্টতর ॥

২ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সরস গল্পরচনার পরিপূর্ণ দক্ষতার চিহ্ন লইয়া ভারতবর্ষ পত্রিকায় দুইজন অতরুণ লেখক এইসময়ে প্রাদুর্ভূত হইলেন। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) সাধারণ ভদ্র বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবন ও ব্যবহার লইয়া সরল ও সরস উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখিলেন। ইনি অল্প বয়সেই কলম ধরিয়াছিলেন তবে তাহা নিয়মিতভাবে নয়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' প্রবন্ধের সঙ্গে ইঁহারও একটি চিঠি-প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল (১৮৮৫)। তাহার অনেককাল পরে ইঁহার দ্বিতীয় রচনা ও প্রথম ছাপা বইয়ের সাক্ষাৎ পাই। 'কাশীর কিঞ্চিৎ' (১৯১৫) পদ্যে লেখা।[৮] লেখকের নাম ছিল "নন্দী শর্মা"। নামেই বোঝা যায় যে ইহাতে কাশীর ও কাশীবাসীর সরল পরিচয় আছে।

ইহার পরে দীর্ঘকাল তাঁহার কোন রচনার সন্ধান নাই। অবশেষে সরকারি চাকরি হইতে পেনসন লইয়া কেদারনাথ লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। উত্তরা ও ভারতবর্ষ পত্রিকায় তাঁহার গল্প ও উপন্যাস বাহির হইতে লাগিল। তাহার পূর্ব হইতেই কাশী হইতে প্রকাশিত সুরেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'উত্তরা'র বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। অনেক বিষয়ে উত্তরা ছিল কল্লোলের সহযোগী। সেই সূত্রে কল্লোলেও কেদারনাথের গল্প বাহির হইয়াছিল। কেদারনাথের উপন্যাসে সরস সংলাপের অতিরিক্ত বেশি কিছু নাই, কিন্তু তাঁহার ছোটগল্প সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। 'আমরা কি ও কে' (১৯২৭), 'কবুলতি' (১৯২৮), 'পাথেয়' (১৯৩০), 'দুঃখের দেওয়ালী' (১৯৩১), 'মা ফলেষু' (১৯৩৬), 'নমস্কারী' (১৯৪৪) এবং 'শেষ খেয়া' বইগুলির গল্প বেশ উপভোগ্য। উপন্যাস হইল

'কোষ্ঠীর ফলাফল' (১৯২৯), 'ভাদুড়ী মশাই' (১৯৩১), 'আই হ্যাজ' (১৯৩৫), 'পাওনা' (১৯৩৬) ও 'সন্ধ্যা শঙ্খ' (১৯৪০)। অপর উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা— 'চীনযাত্রী' (১৯২৫) ও 'স্মৃতিকথা' (১৯২৫)।

কর্মসূত্রে কেদারনাথ উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য-ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়াছিলেন। একবার চীনেও গিয়াছিলেন।[৯] এই দেশাভিজ্ঞতা তাঁহার অঙ্কিত প্রবাসী বাঙ্গালীর চরিত্রে সমধিক পরিস্ফুট। কাশীতে তিনি বেশিদিন কাটাইয়াছিলেন তাই কাশীর দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। তিনি আদিতে কলিকাতার উত্তর অঞ্চলের লোক। এই অঞ্চলের কথার ভঙ্গি *(patois)* তাঁহার রচনারীতিকে বিশিষ্টতা দিয়াছে ॥

৩ রাজশেখর বসু

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) ছিলেন বিজ্ঞানে পণ্ডিত এবং কর্মসূত্রে বৈজ্ঞানিক শিল্পশালার পরিচালক। পিতা চন্দ্রশেখর বসু বিগত শতাব্দীতে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর বসুর পুত্রেরা সবাই কৃতী। জ্যেষ্ঠ শশিশেখর সাংবাদিক রূপে যশস্বী হইয়াছিলেন। ইংরেজী লেখায় ইঁহার দক্ষতা ছিল। কনিষ্ঠ গিরীন্দ্রশেখর এদেশে মনস্তত্ত্বের গবেষণার পথপ্রদর্শক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রথম প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহারও বাঙ্গালা রচনায় দক্ষতা ছিল।

লেখকরূপে রাজশেখর বাবুর প্রথম আবির্ভাব ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় (১৯২২) 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্প লইয়া। এই সরল ব্যঙ্গ গল্পটি প্রকাশিত হইবামাত্রই সর্ববিধ পাঠকের মন হরণ করিয়াছিল। তাহার পর এই ধরণের গল্প রাজশেখরবাবু অনেক লিখিয়াছেন। সেসব রচনার উচ্চ মান প্রথম রচনার গৌরব বজায় রাখিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এ-রকম কৃতিত্ব খুব কম লেখক দেখাইতে পারিয়াছেন। অধিকাংশ লেখকই প্রথম রচনার উজ্জ্বলতা পরবর্তী রচনাতে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই। রাজশেখরবাবুর গল্পগ্রন্থ— 'গড্ডালিকা' (১৯২৪), 'কজ্জলী' (১৯২৭), 'হনুমানের স্বপ্ন' (১৯৩৭) ইত্যাদি।

গোড়া হইতেই একটি বিশেষ অলঙ্কার রাজশেখরবাবুর গল্পের রস গাঢ়তর করিয়াছিল। তাহা হইতেছে যতীন্দ্রকুমার সেনের রেখাচিত্র। আসলে যতীন্দ্রকুমারের এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬৭-১৯৩৮) ব্যঙ্গচিত্র হইতেই প্রধানত রাজশেখরবাবু তাঁহার সরস-ব্যঙ্গ রচনার প্রথম প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রকুমারের ব্যঙ্গচিত্র 'মানসী ও মর্মবাণী'তে বাহির হইত। তাহা ছাড়া রাজশেখরবাবুর রচনার মূলে আরও দুইজনের কমবেশি প্রভাব আছে। কম প্রভাব প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের, বেশি প্রভাব ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের। বিরিঞ্চি বাবার সঙ্গে প্রভাতকুমারের নবীন-সন্ন্যাসীর সেই সন্ন্যাসীটির বাহ্যিক মিল নাই কিন্তু একটি চরিত্র অপর চরিত্রকে অবশ্যই স্মরণ করাইয়া দেয়। ত্রৈলোক্যনাথের প্রভাব স্পষ্ট বোঝা যায় 'দক্ষিণরায়'-এর মতো গল্পে। এ গল্পের সঙ্গে ডমরু-চরিত্রের ছালছাড়ানো বাঘের গল্পের মূলগত মিল আছে।

রাজশেখরবাবুর স্টাইল সহজ সরল স্পষ্ট ও লক্ষ্যভেদী। প্রধানত চরিত্রসৃষ্টির দ্বারাই

তাঁহার সরসতার সৃষ্টি। কথায় মন ভোলাইবার প্রয়াস নাই। প্রবন্ধ-রচনাতেও রাজশেখরবাবুর অনন্যতা পরিস্ফুট। এ অনন্যতা শুধু রচনারীতিতে নয় দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় ও স্বচ্ছতায়ও। লেখকের মিতভাষিতা প্রবন্ধগুলির আকর্ষণ বাড়াইয়াছে। ইঁহার প্রবন্ধ-গ্রন্থ—'লঘুগুরু' (১৯৩৯) ও 'বিচিন্তা' (১৯৫৫)। রাজশেখরবাবু বাল্মীকি রামায়ণের ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছেন, মেঘদূতেরও অনুবাদ করিয়াছেন। এগুলিও পাঠকের অকুণ্ঠ সমাদর পাইয়াছে।

এই সঙ্গে চারুচন্দ্র দত্তের (১৮৭৬-১৯৫২) প্রসঙ্গ আসে। চারুচন্দ্র আই-সি-এস ছিলেন। অবসর লইবার অনেকদিন পরে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। 'পরিচয়'-এর ইনি বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। সেই পত্রিকাতেই ইঁহার উপভোগ্য আত্মকাহিনী 'পুরানো কথা'(১৩৪৩ সাল) প্রথম বাহির হইয়াছিল। চারুচন্দ্রের রচনারীতি তাঁহার নিজস্ব—সরল, সহজ, সরস ও সংযত। প্রধানত লেখার গুণেই ইঁহার গল্প ও অন্যান্য রচনা সুখপাঠ্য। গল্পের বই— 'কৃষ্ণরাও' (১৯৩৩), 'দুনিয়াদারী' (১৯৩৪) ও 'দেবারু'। 'মায়া'য় আছে একটি বড় গল্প ও একটি নাট্যরচনা।

৪ গোকুলচন্দ্র নাগ ও দীনেশরঞ্জন দাশ

তৃতীয় দশক শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা প্রায় আনুষ্ঠানিকভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে "আধুনিকতা"র পত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫)। ইনি ছিলেন ডঃ কালিদাস নাগের ছোটভাই। গোকুলচন্দ্র আর্টস্কুলের ছাত্র ছিলেন। দৃশ্যচিত্র আঁকায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, তবে পাঠ শেষ করেন নাই। নিউ-মার্কেটে তাঁহার ফুলের স্টল ছিল।[১০] এই যে সৌন্দর্য-শিক্ষা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা ইহা তাঁহার রচনায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। ১৩৩০ সালে গোকুলচন্দ্র দীনেশরঞ্জন দাশের সহযোগী হইয়া 'কল্লোল' পত্রিকা বাহির করেন। সাত বৎসর ধরিয়া পত্রিকাটি "আধুনিক" সাহিত্যের ঘাঁটি আগলাইয়া ছিল। গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পরে পত্রিকার ভার দীনেশরঞ্জনের উপরে পড়ে। কল্লোলের অগ্রদূত রূপে ১৯২২ সালে 'ঝড়ের দোলা' বাহির হয়। প্রকাশক 'Four Arts Club', অর্থাৎ, শিল্প চতুরঙ্গ গোষ্ঠী। ঝড়ের-দোলায় চারটি গল্পের লেখক চারজন— গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, সুনীতি দেবী ও মণীন্দ্রলাল বসু।

গোকুলচন্দ্রের প্রথম রচনা ছোট ছোট গল্প বা কথিকা। এগুলি প্রথমে প্রবাসী[১১], ভারতী, ভারতবর্ষ ও নব্যভারত প্রভৃতিতে বাহির হইয়াছিল, পরে 'রূপরেখা'য় (১৯২২) সঙ্কলিত হয়। ছোটগল্প লেখায় গোকুলচন্দ্রের অনায়াসদক্ষতা ছিল। বর্ণনায় একটু স্বপ্নালসতা আছে, কিন্তু সে সময়ের গুণে বা দোষে। কিন্তু রচনার মধ্যে জড়তা নাই, অন্যমনস্কতা অথবা বিক্ষেপও নাই। গোকুলবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁহার কতকগুলি ছোটগল্প 'মায়া-মুকুল' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৯২৭)। গোকুলচন্দ্র কবির মন ও দৃষ্টি লইয়া গল্প লিখিয়া গিয়াছেন।

গোকুলচন্দ্রের মুখ্য রচনা 'পথিক' (১৯২৫)[১২]। উপন্যাসটিতে লেখকের দৃষ্টিতে যেন জীবনপথের চলচ্চিত্র ধরা পড়িয়াছে। সাধারণ উপন্যাসের সংহতি নাই, কিন্তু ভূমিকাগুলির উজ্জ্বলতায় এবং সংসারচিত্রের বাস্তবতায় কাহিনীর সে ত্রুটি ধরাই পড়ে

না। 'পথিক' "আধুনিক" উপন্যাসের পথ দেখাইয়াছে।

'চিত্রে চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি বইয়ের চিত্রাভিনেতা ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে ইন্ডো-ব্রিটিশ-কোম্পানী এবং পরে (১৯২২) শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ও নরেশচন্দ্র মিত্রের উদ্যোগে দমদমায় তাজমহল ফিল্‌ম কোম্পানী খাড়া হয়। তাহার পর বেহালায় ফটো প্লে সিণ্ডিকেট নামে তৃতীয় কোম্পানী গড়া হয়। এই কোম্পানী কর্তৃক অহীন্দ্র চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে 'বাঁদীর প্রাণ' নামে যে ঐতিহাসিক গল্পের ছবি তোলা হইয়াছিল তাহাতে গোকুলচন্দ্র নাগ রাহু সেনের ভূমিকা লইয়াছিলেন।

কল্লোলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশও (১৮৮৮-১৯৪১) কিছু ছোটগল্প লিখিয়াছিলেন। কয়েকটি গল্প ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।[১৩] পাঁচটি গল্প লইয়া ইঁহার 'মাটির নেশা' (১৯১৮) সঙ্কলিত। বইটি "পথিক বন্ধু" গোকুলচন্দ্রকে উপহৃত। 'ভুঁই চাঁপা'য় (১৯২৫) সাতটি গল্প আছে। 'উতঙ্ক' (১৯২১) নাটক ছেলেদের জন্য। ইঁহার 'দীপক' উপন্যাস কল্লোলে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত (১৩৩৪ সাল), গ্রন্থাকারে বাহির হয় নাই। 'রাতের নেশা'ও কল্লোলে (১৩৩৬ সাল) বাহির হইয়াছিল। তবে ইহা শেষ হয় নাই।

দীনেশরঞ্জনেরও নাট্যাভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। কল্লোল সম্পাদনার শেষের দিকে দীনেশরঞ্জন সাপ্তাহিক 'বিজলী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে সে কাজ ছাড়িয়া দেন এবং ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানীতে সিনারিও লিখিতে থাকেন। এই কোম্পানীর প্রথম ছবি 'ক্লেমস্‌ অব্‌ দি ফ্লেশ'-এ একটি ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কল্লোল উঠিয়া গেলে (১৯৩০) পর তিনি সিনেমার কাজেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

৫ মণীন্দ্রলাল বসু

মণীন্দ্রলাল বসুর (১৮৯৭-১৯৮৬) গল্পে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান্‌ তরুণের লোভনীয় কলিকাতার ধনী ফ্যাশনেবল suburbia সমাজের রোমান্টিক কল্পনা প্রতিভাত। ইঁহার 'রমলা' (১৩৩০)[১৪] নবীন রোমান্টিক লেখকদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এই বইটির প্রভাব কোন কোন "আধুনিক" লেখকের রচনায় পড়িয়াছে। মণীন্দ্রবাবুর গল্পে প্রথম হইতেই তাঁহার নিজস্বতার পরিচয় প্রকট।[১৫] লেখক যে অচির-ভবিষ্যতে বাস্তবপন্থা ছাড়িয়া রোমান্‌সপন্থায় পথিক হইবেন তাহাও বোঝা যায়।

> বীণা শান্ত হয়ে বসে আমায় সব কথা বল্লে—বল্লে আমাকে তার চাই। আমি বল্লুম, "বীণা, মুস্কিলে ফেললে।" এক তরুণী তার যৌবনজাগ্রত বিকচোন্মুখ দেহপদ্মকে আমার বুকে সঁপতে চায়,—আমি বীর, আমি তা প্রত্যাখ্যান করলুম।
>
> আমার কথা শুনে সে এক শ্যাওলা-ঘেরা পাথরে বসে পড়লো।[১৬]

মুমূর্ষু নায়কনায়িকা লইয়া ইঁহার কয়েকটি গল্পের প্যাথলজিকাল বা মৃত্যুশঙ্কিত পরিবেশ রচিত। রবীন্দ্রনাথের 'মাসি' এই ধরনের গল্পের মূল আদর্শ। মণীন্দ্রবাবুর 'মর্বিড" গল্প অনেকেই অনুসরণ করিয়াছেন। গোকুলচন্দ্র নাগের মৃত্যুই বোধ করি মণীন্দ্রবাবুর এই ধরনের গল্পকে দীর্ঘজীবী করিয়াছিল। দুই-একটি গল্পে[১৬ক] ভৌতিক বা অতিলৌকিক

পরিবেশ চমৎকার জমিয়াছে।

ইঁহার গল্পের সঙ্কলন হইতেছে 'মায়াপুরী' (১৯২৩), 'রক্তকমল' (১৯২৪), 'সোনার হরিণ' (১৯২৪), 'কল্পলতা' (১৯৩৫), 'ঋতুপর্ণ' (১৯৩৭) ইত্যাদি। পরবর্তী কালের বিশিষ্ট উপন্যাস 'জীবনায়ন'-এ (১৯৩৬) যৌবনোন্মেষের মনোবৃত্তি অত্যন্ত নিপুণতা ও অভিজ্ঞতার সহিত বিশ্লিষ্ট এবং বিবৃত। অপর উপন্যাস— 'সহযাত্রিণী' (১৯৪১), 'এষণা' (১৩৭৬)। 'অজয়কুমার' (১৯৩২) ও 'সোনার কাঠি' (১৯৩৭ ?) কিশোরপাঠ্য।

মণীন্দ্রলালবাবুর গল্প-উপন্যাসের নায়িকারা সুরূপ ও শিক্ষিত এবং ধীর, ছেলেমানুষ ও অপাপবিদ্ধ। নায়কেরাও স্মার্ট, শহুরিয়া, ড্রইংরুম-বিলাসী, দার্জিলিং-পুরী বিহারী। কন্টিনেন্টাল উপন্যাস এবং ফারসী কবিতা দুই-ই তাহাদের উপভোগের বস্তু। তাহারা পিয়ানোয় বীটোফোনের মুনলাইট সোনাটা অনর্গল বাজাইতে পারে, চমৎকার বাঙ্গালা কবিতা লিখিতে পারে, ছবি আঁকাও বেশ আসে। তাহারা অত্যন্ত ভাববিলাসী ও প্রণয়কাতর। মোটকথা তাহারা মূর্তিমান্ কলেজ-বয় রোমান্স।

লেখার নৈপুণ্যে ও চরিত্রাঙ্কণে সহৃদয়তায় মণীন্দ্রলালবাবুর গল্প-উপন্যাস বেশ সুখপাঠ্য ॥

৬ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মণীন্দ্রলাল বসুর রচনার সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) রচনার স্পষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও ভাবগত ঐক্য আছে। দুইজনেই সমান ভাবুক এবং অন্তর্মুখ। দুইজনের গল্প-উপন্যাসের পাত্রপাত্রী যেন একই জগতের জীব। তফাৎ এই যে মণীন্দ্রবাবুর পাত্রপাত্রী শহরবাসী ধনী ও সংস্কৃতিমান্, আর বিভূতিবাবুর পাত্রপাত্রী পল্লীবাসী দরিদ্র ও সাধারণ শিক্ষা (বা অশিক্ষা) প্রাপ্ত। মণীন্দ্রবাবুর নায়কের ঠিক বিপরীত বিভূতিবাবুর নায়কেরা। তাহারা সাধারণ গাড়াগাঁয়ের লাজুক ছেলে, গাঁয়ের ইস্কুলেই তাহাদের শিক্ষা ; পোড়ো ভিটায় কালকাসুন্দার জঙ্গলে ঢাকা কুটীরবাসী সর্বংসহ নারীহৃদয়ের ব্যাকুলতা তাহাদের হৃদয়কে টানে। তবে দুইজনেই উদ্ভিদ্ভক্ত। মণীন্দ্রলালবাবুর রচনায় শহরের ভিলায় সযত্নরোপিত মূল্যবান্ বিলাতি লতাগুল্ম মৌসুমী ফুলের বাহার, আর বিভূতিবাবুর রচনায় পাড়াগাঁয়ের পল্লীপথের বাঁকে বাঁকে নাম না-জানা গাছ আগাছার ঝোপ। মণীন্দ্রলালের নায়ক ভাবে

> তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। বিগোনিয়া ফুলের মত রাঙা মুখ ঘেরিয়া কালো কেশের রাশি ; তাহার উপর ফিউসিয়া ফুলগুলি নত হইয়া পড়িয়াছে। গায়ে পিটুনিয়া ফুলের রং-এর এক জামার ওপর এষ্টার ফুলের রং-এর একখানি সাড়ি। মোজাবিহীন পায়ে ক্যাক্টাসের মত লাল ভেলভেটের চটিজুতো। [১৭]

বিভূতিভূষণের নায়ক দেখে

> পথের ধারের এক জায়গায় খানিকটা মাটি কারা বর্ষাকালে তুলে নিয়েছিল, সেখানটায় এখন বনকচু কালকাসুন্দা ধুতুরা কুঁচকাঁটা আর ঝুমকো লতার দল পরস্পর জড়াজড়ি ক'রে একটুখানি ছোট ঝোপ-মত তৈরী করেছে। শীতল হেমন্ত-অপরাহ্লের ছায়া সবুজ ঝোপটির ওপর নেমে এসেছে। এমন একটা মিষ্ট নির্মলগন্ধ গাছগুলো থেকে উঠেছে, এমন শ্যামল

> শ্রী হয়েছে ঝোপটির, সমস্ত ঝোপটি যেন বনলক্ষ্মীর শ্যামল শাড়ীর একটা অঞ্চলপ্রান্তের মত।[১৮]

ছোটগল্পগুলিতে বিভূতিভূষণের কৃতিত্বের পূর্ণ-পরিচয় নিহিত।[১৯] মণীন্দ্রলালবাবুর প্রভাব সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' সার্থক রচনা। 'পুঁইমাচা' গল্পটিতে বিভূতিভূষণের সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস পথের-পাঁচালীর বীজ নিহিত। এই গল্পে এবং পথের-পাঁচালীতে বিভূতিবাবুর রসকল্পনার স্বকীয়তা পরিস্ফুট। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালার ধ্বংসপথবাহী পল্লীজীবনের অরণ্যাক্রান্ত পরিবেশে দারিদ্র্যজর্জর ম্রিয়মাণ নরনারীর ক্রম-বর্ধমান অভিভব। প্রতিকূল আরণ্য লতাগুল্মের বেড়াজালে পড়িয়া মানবজীবন যেন শ্বাসরুদ্ধ হইতেছে। বোধ হয় যেন জঙ্গলাকীর্ণ পোড়ো ভিটার নিঃসঙ্গ বিভীষিকা মরণের ছায়া ফেলিয়া শনৈঃশনৈঃ অগ্রসর হইতেছে বাকি বসতিগুলি দখল করিতে। এই ধ্বংসপথযাত্রার ছবি বিভূতিবাবুর রচনায় রোমান্টিক দূরত্বের প্রক্ষেপে প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং বিভূতিভূষণের বস্তু অভিজ্ঞতালব্ধ হইলেও বাস্তব নয়, তাঁহার দৃষ্টি স্বচ্ছ নয় বলিয়া তাহা রোমান্টিক। সে দৃষ্টিতে প্রকৃতি মানবজীবনের খেলাঘর অথবা পটভূমিকা নয়, মানবজীবনই প্রকৃতির খেলাঘর অথবা পটভূমিকা হইয়া প্রতিভাত।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার 'কল্যাণী'র মতো বৃক্ষলতাগুল্মের ছায়াঢাকা-কুটীরবাসিনী পল্লীবধূ— "নিখুঁত মেয়েলি ধরণের মেয়ে"— বিভূতিবাবুর কবিদৃষ্টি অধিকার করিয়াছিল। একথা বিভূতিবাবুরই মনের

> আমার ভারি ভাল লাগছিল— এই সব অজানা ক্ষুদ্র গ্রামে ঘরে ঘরে অবনীর বৌয়ের মত কত গৃহবধূ ভারবাহী পশুর মত উদয়াস্ত খাট্‌চে— পাড়া-গাঁয়ের ডোবার ধারের বাঁশ বাগানের ছায়ায় তাদের জীবন, তাদের সকল সুখ-দুঃখ, আনন্দ, আশা-নিরাশার পরিসমাপ্তিও ঐখানে।[২০]

'পথের-পাঁচালী' (১৯২৯)[২১] লেখকের বাল্যস্মৃতিমূলক উপন্যাস-চিত্র। বিভূতিবাবুর প্রগাঢ় অনুভূতি ও ভাবুকতা বইটির আখ্যায়িকাগুলিকে রমণীয় করিয়াছে। 'অপরাজিত' (১৯৩১)[২২] পথের-পাঁচালীরই পরের কথা। ইহাতে কৈশোর-যৌবনের মধ্য দিয়া নায়কের ভাবজীবনের অনুসরণ চলিয়াছে। বিভূতিভূষণের খ্যাতি অনেকটা পথের-পাঁচালীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পরে ইনি অনেক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। সেগুলির রচনা অনাড়ম্বর ও সুপাঠ্য, তবে বাঙ্গালা উপন্যাসের কোন বিশেষ পরিণতির অথবা রূপান্তরের পরিচয় তাহাতে নাই।

বিভূতিভূষণ আরও অনেক গল্প-উপন্যাসের বই লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এইগুলি— 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫), 'আরণ্যক' (১৯৩৮), 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০), 'দেবযান' (১৯৪৪), 'অনুবর্তন' (১৯৪২), 'ইচ্ছামতী' (১৩৫৬ সাল) ইত্যাদি উপন্যাস। 'মেঘমল্লার' (১৯৩১), 'মৌরী ফুল' (১৯৩২), 'যাত্রা বদল' (১৯৩৪), 'জন্ম ও মৃত্যু' (১৯৩৭), 'কিন্নর দল' (১৯৩৮), 'বেনীগির ফুলবাড়ী' (১৯৪১), 'বিধু মাষ্টার' (১৩৫২ সাল), 'অসাধারণ' (১৩৫৩ সাল) ইত্যাদি গল্পের বই। 'তৃণাঙ্কুর' (১৩৫০ সাল) আত্মজীবনীমূলক।

বিভূতিভূষণ পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিশ্বাস তাঁহার কোন কোন রচনায় প্রতিফলিত এবং অনেক রচনাকে প্রভাবিত করিয়াছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের গল্প-উপন্যাস লেখকদের সম্বন্ধে দুইটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। ইঁহারা গল্প ও উপন্যাস দুই লিখিলেও গল্পেই ইঁহাদের দক্ষতা বেশি পরিস্ফুট। এই এককথা— এ কথা সকলের পক্ষেই সত্য। প্রথম দিকের রচনাতেই[২৩] ইঁহাদের শিল্পের যে রূপ প্রস্ফুটিত দেখা যায় পরবর্তী রচনায় তাহার অতিক্রমণ নাই। অর্থাৎ ইঁহাদের রচনায় লেখকের মনের অনুকরণ নাই শিল্পেরও ক্রমপরিণতির নির্দেশ নাই। এই দ্বিতীয় কথা। —এ কথা অবশ্য অনেক লেখকের পক্ষেই খাটে ॥

৭ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৭৫) গোড়ার দিকে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও গোকুলচন্দ্র নাগ প্রমুখ ভাবুক রোমান্টিক লেখকদের অনুসরণে গল্প লিখিতেন। এই লেখাগুলি প্রধানত সতীর্থ কাজী নজরুল ইসলামের রচনার সঙ্গে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় বাহির হইয়াছিল (১৩২৮ সাল)। পরে গল্পগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল 'আমের মঞ্জরি' নামে (১৩৩০ সাল)। (আমের মঞ্জরির দুইটি গল্পে[২৩ক] মুসলমান ঘরের ছবি আছে। গল্পগুলির ভাষা কথ্য। কতকটা কাঁচা লেখা।) পরিপক্কতা লইয়া শৈলজানন্দের গল্প ১৩২৯ সালের ফাল্গুন মাসে প্রবাসীতে বাহির হইল— নাম 'রেজিং রিপোর্ট'।[২৪] রানীগঞ্জ-উখড়া-দিশেরগড় অঞ্চলের কয়লাখাদের সাঁওতাল-বাউড়ী কুলি-কামিনদের ধাওড়াব অজ্ঞাত জীবন লইয়া শৈলজানন্দ যে গল্পস্রোত বহাইয়া দিয়া সাহিত্যজগৎ প্রায় চমকিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সূত্রপাত এই গল্পে এবং 'বলিদান' গল্পে।[২৫] তাহার পর অনেকগুলি গল্প বাহির হইল কল্লোলে (১৩৩০-৩১ সাল) ও কালি-কলমে (১৩৩৩-৩৪ সাল)।[২৬] প্রবাসীতে ও কল্লোলে গল্প বাহির হইবার সময় লেখক নামের "আনন্দ" অংশটুকু বর্জন করিয়াছিলেন। কারণ অনুমান করা দুরূহ নয়। তখনকার দিনে প্রবাসীতে ও অন্য ভালো সাময়িক পত্রে নারীর রচনা প্রকাশ করা অনায়াস সাধ্য ছিল। লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করিবার পর "শৈলজা" নাম লইয়া লেখককে নিশ্চয়ই বিব্রত হইতে হইয়াছিল। সুতরাং আবার "আনন্দ" সংযোগ হইয়াছিল (১৩৩১ সাল)।

বড গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে শৈলজানন্দের প্রথম রচনা হইল 'মাটির ঘর' (১৯৩১)। এটি প্রথমে 'বাঙ্গালী ভাইয়া' নামে 'সংহতি' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল (১৩৩০ সাল)। রচনাকাল ১৩২৬ সাল। বইটির মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা হইতে কিছু উদ্ধৃতি আছে। কাহিনীতে জাতীয় সংগঠন চেষ্টার সমর্থন আছে। 'হাসি' ও 'লক্ষ্মী' ১৩৩০ সালের মাঝামাঝি কল্লোল পাবলিশিং কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকের অভিজ্ঞতা লক্ষ্মীর কাহিনীতে উপাদান যোগাইয়াছে। কিছু কিছু কবিতা-উদ্ধৃতি আছে, তাহার "কতক্ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এবং কতক্ আমার বাল্যসখা প্রিয়তম কাজী নজরুল ইস্‌লামের।" পরে শৈলজানন্দ আরও অনেক উপন্যাস লিখিয়াছেন। সেগুলি আসলে বড় গল্প, এবং সেগুলিতে লেখকের শিল্পের উৎকৃষ্ট পরিচয় নাই। ছোটগল্পগুলিতেই শৈলজানন্দের

নিজস্ব উৎকর্ষের পরিচয় নিহিত।

শৈলজানন্দের গল্প "বাস্তব" (রিয়ালিস্টিক) বলিতে যাহা বোঝায় শুধু তাহাই নয়, "বাস্তবিক"ও। তীব্র অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ অনুভব শৈলজানন্দের সাহিত্য-সাধনাকে পরিচিত সরণি হইতে ভুলাইয়া উপেক্ষিত-অবজ্ঞাত মানুষের অপরিচিত জীবনের অনাবিষ্কৃত গহনের দিকে পরিচালিত করিয়াছিল। শৈলজানন্দের গল্পে কাহিনী আয়োজন ব্যতিরেকে যেন আপনার বেগেই পথ কাটিয়া চলিয়াছে। লেখক সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছেন, কখনও তিনি নিজের হৃদয়াংশ যোগ অথবা বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বিশ্লেষণগভীরতা অথবা বর্ণদীপ্তি আনিতে চেষ্টা করেন নাই। স্থান-কাল-ভাষা-পরিবেশের সৌষ্ঠব, যাহাকে ইংরাজীতে বলে "লোক্যাল কালার", তাহা শৈলজানন্দের গল্পে পরিপূর্ণভাবে দেখা গেল। অথচ কাহিনীর অত্যন্ত জৈবিক মানুষগুলি স্থান-কাল-পরিবেশের মধ্যে কোথাও খর্ব হইয়া হারাইয়া যায় নাই। বিষয় সর্বদা জীবন্ত, অনেক সময় নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত। ইহাও বাঙ্গালা সাহিত্যে কিছু নূতন।

শৈলজানন্দের বড় গল্প (বা উপন্যাস) সাধারণ পরিচিত সংসার লইয়াই লেখা। ছোটগল্পগুলিও দুই ভাগে পড়ে, সাঁওতালি ও সাধারণ। সাঁওতালি গল্পগুলির দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিষয়-পরিধি প্রসারিত হইল।

কয়লাকুঠি-গল্পধারার প্রথম দিকের রচনা 'নারীর মন'[২৭] আর শেষ দিকের রচনা 'জোহানের বিহা'[২৮] এই ধরনের গল্পের দুইটি টাইপ ধরা যাইতে পারে। নারীর-মনে ভালোবাসার অপমান, প্রেমাস্পদের নিষ্ঠুর বিশ্বাসহীনতা, ভগিনীর সপত্নীভাব, নারীর স্বাভাবিক অভিমান,— নারীচিত্তের মৌলিক বাম্য ও বক্রতা সমস্ত ছাপাইয়া জয়ী হইয়া উৎসারিত হইয়াছে তাহার পাথর-চাপা-ভগিনী-স্নেহ। বোন টুর্‌নী ভুলির স্বামী পীরু-মাঝিকে ভুলাইয়াছে। বাধা দিতে গিয়া ভুলি স্বামীর কাছে লাঞ্ছিত হইয়াছে, মারও খাইয়াছে। ভোলাকে সে পীরুর বিরুদ্ধে লাগাইয়াছে, কিন্তু পীরুর কাছে ভোলার পবাজয়ে তাহার দুঃখ হয় নাই। এমন সময় তাহার কানে গেল যে আড়কাটি টুর্‌নীকে খুঁজিতেছে।

> ভুলি তাড়াতাড়ি আড়কাঠির নিকট গিয়া বলিল,— কাখে খুঁজ্‌ছিস্ হে ? লোকটা তখন ষ্টেশনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, বলিল,—টুর্‌নী মেঝেন্‌কে। কোথায় আছে বল্‌তে পারিস্ ?
>
> ভুলি তাহার হাত ধরিয়া আর একটু সরাইয়া লইয়া গিয়া বলিল,—টুর্‌নী আমারই বোন্, সে যাবেক্ নাই। চল্ আমি যাব।
>
> লোকটা বলিল,— বাঃ তাকে যে পঁচিশ টাকা দিয়েছি।
>
> —আমাকেও দিথিস্ ? আমি লিব নাই, চল্..
>
> ট্রেনখানা আসিয়া দাঁড়াইল। ভুলির মনে হইতেছিল, কতক্ষণে সে ট্রেনে চড়িয়া চলিয়া যাইবে ! সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। সকলের আগে ট্রেনে গিয়া বসিল।
>
> ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ভুলির চোখ দুইটা এতক্ষণে ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। দূরে পলাশবনের ভিতর দিয়া টুর্‌নী ছুটিতে ছুটিতে ষ্টেশনের দিকে আসিতেছিল। ভগিনীকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া ভুলি জানালার পাশে সরিয়া বসিল।
>
> ভুলির চোখে জল দেখিয়া একটা সাঁওতালের মেয়ে বলিল— কাঁদছিস্ কেনে ?
>
> ভুলি চোখের জল মুছিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—দ্যুৎ কাঁদ্‌ব কেনে লো ?

জোহানের-বিহা-র নায়িকা সুখী নারীর-মনের ভুলির মতো নয়। খোঁড়া জোহানের সঙ্গে তাহার বিবাহ সামাজিক আবরু-রক্ষার জন্য। বিবাহের পরেও সে স্বামীর মর্যাদা রাখিয়া চলে নাই, তাহাকে ভালোবাসা তো দূরের কথা। তবুও জোহানের অপমৃত্যুতে তাহার শোক যুক্তিসঙ্গত না হইয়াও তাহার অন্তরের নারীপ্রকৃতিকে, তাহার মৌলিক মানবতাকে অনপেক্ষিতভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে।

অবান্তর ভূমিকাগুলি সমান উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। জোহানের "মেজ-ভাই বোহান খাদের নীচে কয়লা কাটে। ছোট ভাই মোহান তখন গাড়ি ঠেলে। ছুটি পায় সন্ধ্যাবেলা, পূবের সূর্য্য পছিতে,—বেলা তখন 'লিছি-লিছি'।" "দু'নম্বর ধাওড়ার সুমুখে প্রকাণ্ড একটা দেশী কুলের গাছ; ...সকালে সেই ন্যাড়া কুলগাছের আপন মনেই গান করে—"। ছোট-ভাইদের রোজগারের ময়সায় পঙ্গু বড়-ভাই মৌজ করিয়া যদি তাহার উপর আবার বিবাহ করিতে চায় তবে অন্যায় কথা বটে। উপরন্তু মেজো-ভাই বোহানের মেজাজ ছিল একটু চড়া, এবং জোহানের মনেও নিজের অঙ্গহীনতার জন্য লজ্জা ছিল; তাই তাহার বিবাহপ্রসঙ্গে ভাইয়ের ঠাট্টা সে প্রসন্ন মনে লইতে পারিত না। সে ভাবিত,

> 'আমার বিয়া হবেক্ শুনে' শালার হিয়া গেল ফেটে! বাদেই মর্‌ল শালা...ভাই না—আমার ইয়ে! হবেক্ নাই? আমার হবেক্ এগুতে,—আমি বড় ভাই। তাবাদে তুদের। হয় হবেক্ না হয় না হবেক্। তাতে আমার কি? তাই বলে' আমার বৌটি ত আর তুখে দিছি নাই রে শালা হারামজাদা বেটা খচ্চর!'...'মুংরা মাঝির মিছা কথা? মাইরি আর কি! তুর কথাতেই! অত অত মদের দাম লাগে না? ছাগলটো দিলম্ তবে অম্‌নি-অম্‌নি?' যাক্, এতদিনে বুঝা গেল। এই তিন-ভেইয়াদের বড় ছাগলটা...তাহা হইলে হারায় নাই।

জোহান্ চলিয়াছে সিদ্ধেশ্বরী ধাওড়ায় মুংরা মাঝির কাছে বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি করিতে। "সাইডিং-লাইনের ওপারে গাদা-করা কতকগুলা কয়লার পাশে ছোট ভাই মোহানের সঙ্গে দেখা। হাতে দুইটা মোটা-মোটা রূপার বালা,—অন্ধকারে মন্দ দেখায় না। শিকে-ঝোলা কেরোসিনের মগ্-বাতিটার মুখে ভর্‌ভর্ করিয়া বিস্তর ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। দাদাকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'ওকাতেম্ চালাঃ আ?—অর্থাৎ যাস্ কোথা? জোহান্ বলিল, 'ছাগল খুঁজতে।' মোহান্ বলিল, 'আঁধারে যাস্ না: তুঁই ঘরকে চল্।' 'না, দেখে আসি।' 'ছাগল এসেছে। তুঁই জানিস না দাদা।' 'জানি, জানি—'।—বলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে জোহান্ আগাইয়া গেল।" অনেকক্ষণ পরে জোহান্ ফিরিল। দাদার জন্য মোহানের তখনো ঘুম আসে নাই; "ধাওড়ার চালায় মোহানের লাঠির শব্দ হইতেই ঘরের ভিতর হইতে ছোট ভাই মোহান্ বলিয়া উঠিল, 'কেনে গেলি আঁধারে আঁধারে? ছাগল ত এখন এসেছিল।" জোহানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, বলিল, 'হুঁ! ছাগল খুঁজতে যেছে নয় আরও-কিছু করতে..."।

বিবাহের পর মেজ-ভাই দাদাকে বলিল, "হেথা আর রইবি কিস্‌কে? বিয়া কর্‌লি, বেশ করলি; ইবারে লে মেয়েঁ লিয়ে—চল্ ঘরকে।" জোহান্ উত্তর দিল, "হঁ রে হঁ,—তুঁই চুপ্ কর! বিদ্যেটা খুব ভাল্ল তুর্।" জোহান কনের বাড়িতেই রহিয়া গেল, কেননা তাহার শ্বশুরের ঘরকন্না দেখে কে। বিদায়ের সময়

> মোহান্‌ অনেকক্ষণ হইতে বলি-বলি করিয়া এইবার একটা ঢোক্‌ গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি আবার কখন আস্‌ব বায়হা ?' বলিতে বলিতে ডাগর-ডাগর চোখ দুইটা তাহার ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল।
> জোহান্‌ বলিল, 'হুঁ আস্‌বি,—এই আমি...বলে' পাঠাব।'
> মোহান্‌ নীরবে ঘাড় নাড়িল্‌।
> জোহান্‌ বলিল, 'হুঁ, বলে' পাঠাবেক্‌ উ, তবেই হঁইছে। দেলা আ !' জোর করিয়া মোহানের হাতে ধরিয়া সে তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। চলিতে চলিতে মোহান্‌ দু'তিনবার ফিরিয়া তাকাইল। 'আসি তা হ'লে বাইহা ?'
> জোহানের কাছ হইতে কোনও জবাব পাওয়া গেল না।

সাঁওতালি গল্পগুলিই শৈলজানন্দবাবুকে সাধারণ পাঠকের কাছে সর্বপ্রথম পরিচিত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ফল নিছক ভালো হয় নাই। তাঁহার অন্য গল্পগুলি প্রায়ই উপেক্ষিত হইয়াছে।

'অতসী'র প্রথম গল্পটি[২৯] প্রেমেন্দ্রবাবুর 'পাঁক' ও অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে'র সমকালীন ও সমপর্যায়ের, অথচ শিল্পরূপে অনেকটাই পৃথক। শৈলজানন্দবাবুর গল্পটির সঙ্গতি ও সৌষ্ঠব অপর দুইটি রচনায় নাই। 'নারীমেধ'এর (১৩৩৫ সাল) গল্প তিনটিতে পরিচিত সমাজ-সংসারের পাথর-চাপা বঞ্চিত নারীহৃদয়ের মর্মান্তিক শোচনীয়তা পরিপূর্ণ বাস্তবতায় ও নিরতিশয় তীব্রতায় প্রকাশিত। প্রথম গল্প 'নারীমেধ'এর অনতিশয়িত নিষ্ঠুর বাস্তবিকতা আমাদের সাহিত্যে অভিনব। দ্বিতীয় গল্প 'যখের ধন' বাঙ্গালা ভাষায় শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে একটি।

আর একটি বিশিষ্ট গল্প 'বধূবরণ'।[৩০] কাহিনীর পরিকল্পনায় এবং নারীবিদ্বেষী ননীমাধবের মনোবৃত্তির অনুসরণে লেখকের অভিজ্ঞতার সচেতনতার ও সহৃদয়তার পরিচয় নিহিত। তাহার স্বার্থপর খামখেয়াল ও নিষ্ঠুরতার পিছনে যে নিগূঢ় ও নিরুদ্ধ মানবিকতা সক্রিয় ছিল উপসংহারে তাহা অনাবৃত হইয়াছে। গৌরীর অনুক্ত ট্রাজেডি গল্পের শেষ দৃশ্যে নির্মমভাবে অকস্মাৎ প্রকাশিত।

> স্বল্পালোকিত সেই নির্জন কক্ষের বাতায়ন-পথে মুখ বাড়াইয়া ননীমাধব একবার ষ্টেশনের দিকে তাকাইল। কেরোসিন-বাতির একটুখানি আলো গৌরীর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বাক্সের উপর সবুজ রঙের শালখানি গায়ে দিয়া তখনও সে ঠিক তেমনিভাবে পাষাণ মূর্তির মত বসিয়া। স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় অন্ধকারের দিকে ব্যাকুল একাগ্র দৃষ্টি তাহার তখনও নিবদ্ধ।
>
> এই বয়ঃসন্ধিগতা কিশোরীর— এবং শুধু এই কিশোরীর কেন, সমগ্র নারীজাতির নিষ্ঠা ও ভালবাসার উপর আস্থা তাহার অনেকদিন হইতেই নাই। আজও তাই সে তাহার দৈনন্দিন ঘটনার মতই অত্যন্ত সহজভাবে গৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত নীরবে গহনার বাক্সটি কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু মজা এই যে গৌরীর মুখখানি তাহার চোখের সুমুখ হইতে যতই ঝাপসা হইয়া আসে ননীমাধবও জানালার বাহিরে তত বেশি করিয়া তাহার গলা বাহির করিয়া দেয়।
>
> কিন্তু সে আর কতক্ষণ !
>
> গাড়ীর বেগ ক্রমশ দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে লাগিল। ননীমাধবের চোখের সুমুখ হইতে গৌরীর সেই একাগ্র উন্মুখ দুটি চক্ষু অদৃশ্য হইল, মুখখানি অদৃশ্য হইল, দেহ অদৃশ্য হইল, সবুজরঙের শাল, শালের নীচে গৌরীর দুটি অলক্তকরঞ্জিত সুকোমল শুভ্র পা, টিনের

তোরঙ্গ, কেরোসিনের আলো— দেখিতে দেখিতে পশ্চাতের অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

শৈলজানন্দের উপন্যাস বা বড়-গল্পগুলিতে তাঁহার ছোটগল্পের শিল্পরূপ ও সৌষ্ঠব নাই। তবে যেগুলি রোমান্‌স নহে সংসার অথবা সমাজ-চিত্র সেগুলি উপভোগ্য। এই ধরনের বোধ করি শ্রেষ্ঠ রচনা 'ষোল আনা'।[৩১] ইহাতে উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ের জীবনচিত্র নিজস্ব পরিবেশে ও নিখুঁত সংলাপে লেখকের অভিজ্ঞতা-সহৃদয়তা-সংযমের আলোকপাতে উদ্‌ভাসিত হইয়াছে। কাহিনীক্ষীণ গল্পটিতে যেন প্রতিদিনের গ্রাম্যজীবনের শোভাযাত্রা চলিয়াছে।

শৈলজানন্দবাবুর গ্রন্থসংখ্যা প্রায় পৌনে শতাবধি। প্রধান প্রধান গল্পগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি। বড় গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে এইগুলির নাম করিতে পারি— 'ঝড়ো হাওয়া' (১৩৩০ সাল), 'রাঙা শাড়ী', 'বাংলার মেয়ে' (১৩৩২ সাল), 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' (১৩৩৩ সাল), 'জোয়ার ভাঁটা' (১৩৩৩ সাল), 'পূর্ণচ্ছেদ' (১৩৩৬ সাল), 'অনাহূত' (১৩৩৯ সাল), 'অনিবার্য্য' (১৩৩৯ সাল), 'লহ প্রণাম' (১৩৩৯ সাল), 'খরস্রোতা' (১৩৩৯ সাল), 'অপরাধী' (১৩৪০ সাল), 'অরুণোদয়' (১৩৪০ সাল), 'রূপবতী' (১৩৪০ সাল), 'গঙ্গা-যমুনা' (১৩৪০ সাল), 'আকাশ কুসুম' (১৩৪১ সাল), 'উদয়াস্ত' (১৩৪১ সাল), 'হোমানল' (১৩৪২ সাল), 'কাঁকনতলার মেয়ে' (১৩৪২ সাল), 'শুভদিন' (১৩৪২ সাল), 'বন্ধুপ্রিয়া' (১৩৪৫ সাল), 'শোভাযাত্রা' (১৩৪৬ সাল), 'বিজয়া' (১৩৪৯ সাল) ইত্যাদি॥[৩২]

৮ জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) শৈলজানন্দের মতোই জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী এবং ইঁহার গল্পেও প্রকৃতিকতাই[৩৩] পরিস্ফুট। ভাবিকতা[৩৩] শৈলজানন্দের গল্পে কিছু অধিক আছে। জগদীশচন্দ্রের গল্পে ভাবিকতার মাত্রা খুবই কম, বড গল্পে হয়ত একটু আধটু আছে। জগদীশচন্দ্রের ভাবিকতার প্রকাশ হইয়াছে তাঁহার কবিতায়।[৩৪] জগদীশচন্দ্রের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কাহিনীর কঠোর দুঃখময়তায় এবং রচনারীতির বিদ্রূপ ইঙ্গিতপূর্ণ সংক্ষিপ্ত স্পষ্টতায়। অসহায় মানুষের জীবনচক্র ঘুরিতেছে নির্মম নিষ্ঠুর হিংস্র অদৃষ্টের হাতে— ইহাই জগদীশচন্দ্রের গল্পের অমোঘ নির্দেশ। মানুষের দৈন্য-কুশ্রীতা-নোংরামির জন্য জগদীশচন্দ্র সমসাময়িক "আধুনিক" লেখকদের মতো সমাজের বা ব্যক্তির ঔদাসীন্য, ঘৃণা বা লুব্ধতা দায়ী বলিয়া দেখান নাই, শৈলজানন্দের মতো নির্লিপ্তভাবে ছবি আঁকিয়াই যান নাই, তিনি কিছুকে ও কাহাকে হেতুভূত না করিয়া যে হিংস্র অন্ধ অদৃষ্ট শক্তি মানুষের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলে তাহার দিকে ইশারা করিয়াছেন। শক্তিশালী এবং অসাধারণ লেখক বলিয়াই জগদীশচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে শাখাপতিও হইতে পারেন নাই। তাঁহার রচনায় "আধুনিক" সাহিত্যিকের ভীরুতা নাই, যাঁহাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন

> এরা সুন্দরকে ভয় করে পাছে কেউ গাল দিয়ে বসে এসব মন ভোলাবার ছল, ভালোকে সরিয়ে ফেলে পাছে সেটাতে গুরুগিরির অপবাদ লাগে। এমনি করে এরা কিছুতেই অসঙ্কোচে সহজ হতে পারে না। সাহিত্যে ভালোটা মন্দের চেয়ে ভালো এমন কথা যদিবা

> অশ্রদ্ধেয় হয় তবু সাহিত্যে ভালোমন্দ একই দর অন্তত এও তো মান্‌তে হবে। কিন্তু এমন ব্যবহার করলে তো চলবে না যে মন্দটার দর ভালোর চেয়ে বেশি— যেহেতু মন্দটাই রিয়ল্। সাহিত্যে এরা এমন একটা জাল পাততে চায়, যে জালে চুনোপুঁটিই পড়ে, এড়িয়ে যায় রুই কাৎলা। রুই কাৎলাকে গাল দিয়ে বলে ওগুলো উঁচকপালে সৌখীনদের মাছ। কোনো কারণে কোনো ভোজে বা কোনো তরকারীতে চুনোপুঁটির যদি বিশেষ ফরমাস থাকে তাহলে আপত্তি করব না কিন্তু কুলবন্ধনের নতুন নিয়মে বড়ো মাছকে যদি একঘরে করা হয় তাহলে বলতেই হবে খাঁটি রিয়ালিজম্ এ নয়, এটা বিশেষ দলের ঘরোয়া রীতি অর্থাৎ কন্‌ভেন্‌শন্, নীচতাকেই কৌলীন্যের একমাত্র মর্য্যাদা দেওয়া। এটাকে বাইরে দেখতে মনে হয় সাহসিকতা কিন্তু বস্তুতই এটা ভীরুতা। এটা বাঁধারাস্তার আধুনিকতাগিরি।[৩৫]

জগদীশচন্দ্রের প্রথম গল্প 'পেয়িং গেষ্ট' বাহির হয় বিজলীতে।[৩৬] এ গল্পটি কাঁচা হাতের। তবে পরের গল্পটিতে দেখি হাত কিছু পাকিয়াছে। এটিও বিজলীতে প্রথম প্রকাশিত।[৩৭]প্রথম বর্ষের কালি-কলমে (১৩৩৩ সাল) ইঁহার নয়টি গল্প বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে দুইটি ইংরেজীর অনুসরণে। পরে কল্লোলে ও বঙ্গবাণীতে জগদীশচন্দ্রের অনেকগুলি গল্প ছাপা হইয়াছিল। নয়টি গল্প লইয়া বাহির হইল প্রথম গল্পের বই 'বিনোদিনী' (পৌষ ১৩৩৪), বইখানির আকৃতি সাধারণ গল্পের বইয়ের মতো নয়, এবং গল্পগুলিতে যেরূপ রস পরিবেশিত হইল তাহাও অভিনব। সাধারণ সুস্থ মানুষের অবচেতনায় পাগলামির বীজ লুক্কায়িত থাকিতে পারে। তাহা ঘটনার ও পারিপার্শ্বিকের চাপে কখনো কখনো চেতনার উপরতলাতে ভাসিয়া উঠে। তখন তাহার কর্মচিন্তার উপর বুদ্ধির ব্রেক কাজ করে না। এমন মনোবিকৃতির (abnormality) ঘটনা জগদীশচন্দ্রের বিশিষ্ট গল্পগুলির অ-সাধারণ বিশেষত্ব। পরবর্তী গল্পগুলিতেও জগদীশচন্দ্রের শিল্পদক্ষতা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ আছে।

জগদীশচন্দ্রের বড় গল্প বা উপন্যাসের প্লট কতকটা উদ্দেশ্যমূলক, এবং বেশ উপন্যাসোচিত নয়। 'দুলালের দোলা'র (১৯৩১) ভূমিকায় লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

> উপন্যাসসুলভ গল্পের বস্তুসংস্থান বা পরিপুষ্টতা ইহাতে নাই। "রোমন্থন" লেখাটিতে তিনটি ব্যক্তির এবং এখানে একজনের আনন্দের উদ্ভব এবং লয় দেখানো হইয়াছে। ঘটনাপরম্পরার সাহায্যে উহা দেখাইতে হইয়াছে। ঘটনাগুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একস্থানে যাইয়া ফল প্রসব করিতেছে। ঘটনার কল্পনায় গভীরতা থাক্ আর নাই থাক্ পল্লীর সঙ্গে মনের নিবিড় আত্মীয়তা জন্মিবার পক্ষে তাহা সুদূরাগত বা প্রত্যক্ষ অন্তরায় হইতে পারে কিনা তাহাই বিবেচ্য।
>
> উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞার অধীনে আনিয়া ইহাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদের বিচার করেন তবে আমি বিস্মিত হইব না।

জগদীশচন্দ্রের অপর গল্পের বই— 'রূপের বাহিরে' (১৯২৯), 'পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক' (১৯২৯), 'শ্রীমতী' (১৯৩০), 'উপায়ন' (১৯৩৪), 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' (১৯৩৫), 'গতিহারা জাহ্নবী' (১৯৩৫), 'মেঘাবৃত অশনি' (১৯৪১), 'নন্দা আর কৃষ্ণা' (১৯৪৭)। বড়গল্প ও উপন্যাস— 'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯), 'মহিষী' (১৯২৯),

'লঘুগুরু' (১৯৩১), 'দুলালের দোলা' (১৯৩১), 'রোমন্থন' (১৯৩১), 'উদয়লেখা' (১৯৩২), 'তাতল সৈকতে' (১৯৩৩), 'সুতিনী' (১৯৩৩), 'রতিবিরতি' (১৯৩৪), 'যথাক্রমে' (১৯৩৫), 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' (১৯৩৯), 'নিষেধের পটভূমিকায়' (১৯৫২)।

৯ "যুবনাশ্ব", জগৎ(বন্ধু) মিত্র ও অন্যান্য

কল্লোলের গল্পলেখকদের মধ্যে এমন কয়জন ছিলেন যাঁহারা পরে আর গল্প লিখেন নাই এবং এমনও কয়েকজন ছিলেন যাঁহারা বেশ কিছুকাল ফাঁক দিয়া পরে আবার সাহিত্যকর্মে নিবিষ্ট হন। প্রথম দলে দুইটি লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য—"যুবনাশ্ব" ও জগৎ(বন্ধু) মিত্র।

"যুবনাশ্ব" মণীশ ঘটকের (১৯০১-১৯৭৯) ছদ্মনাম। কল্লোলে প্রকাশিত ইঁহার 'গোষ্পদ', 'পটলডাঙার পাঁচালী' ইত্যাদি "বাস্তব" গল্প-চিত্রগুলি দীর্ঘকাল পরে 'পটলডাঙার পাঁচালী' নামে বাহির হইয়াছে (১৯৫৬)। এ রচনাগুলি প্রেমেন্দ্রবাবুর পাঁকের মতো।

জগৎ(বন্ধু) মিত্র গোকুলচন্দ্র নাগের ভাগিনেয়। কল্লোলে ইঁহার গল্প, প্রবন্ধ[৩৮] এবং কাবিতা কিছু বাহির হইয়াছিল। ইঁহার দুইখানি বই আছে। প্রথম বই 'আঠারো বছর' (১৩৩৪ সাল) বড়মামা কালিদাস নাগকে উৎসর্গিত। ইহাতে পাঁচটি গল্প আছে। তাহার মধ্যে কেবল একটি ('স্বপ্নের বিড়ম্বনা') কল্লোলে ছাপা হইয়াছিল। বাকিগুলি প্রবাসী ভারতবর্ষ বিচিত্রা ও বিজলী প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় বই 'এরা শুধু মানুষ' (১৩৪২ সাল) উপন্যাস, ছোটমামার নামে উৎসর্গিত। কাহিনী নারী ও যৌন সমস্যাঘটিত। রচনা ভালো।

জগৎবাবু গল্প-রচনায় ছোট মাতুলের পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহার "বাস্তবতা" ঢের বেশি। শরৎচন্দ্রের প্রভাবও বেশ আছে। বই দুইটিতে লেখকের ক্ষমতার যে ইঙ্গিত আছে, তাহা অনুশীলিত হইলে ভালো হইত।

দ্বিতীয় দলের মধ্যে ইঁহাদের নাম করিতে পারি— অবনীনাথ রায় (১৮৯৫-১৯৬৩)[৩৯], পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়[৪০], অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৯০৬ ১৯৬২) ইত্যাদির।

কল্লোলের প্রবীণ নবীন লেখকদের মধ্যে আরও কয়েকজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪) ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫-১৯৬৪) অনুবাদে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। পবিত্রবাবুর 'নীলপাখী' (১৯২৪) ও 'বুভুক্ষা' (১৯২৮, দ্বি-স ১৯৪১) যথাক্রমে মেটারলিঙ্কের নাটিকার ও হামসুনের উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ। নৃপেন্দ্রবাবুর 'শেলী' (১৯২৮ ?) আঁদ্রে মোরোয়ার গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে লেখা। প্রবন্ধ রচনায় মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, "আনন্দসুন্দর ঠাকুর" (প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়) ; কবিতায় সুকুমার সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (কবিতার বই 'আরতি' ১৯২৮), মৈত্রেয়ী দেবী (কবিতার বই 'উদিতা ১৯২৯) ; কবিতায় ও গল্পে ভবানী ভট্টাচার্য ; গল্পে ভবানী মুখোপাধ্যায়, সুকুমার ভাদুড়ী (—১৩৩১ সালের ভারতীতে ইঁহার গল্প বাহির হইয়াছিল—) ; প্রবন্ধ ও গল্পে পরিমল রায় (প্রবন্ধের বই 'ইদানীং' ১৯৪৯) এবং (কল্লোলের লেখক না হইলেও) প্রভু গুহঠাকুরতা (প্রবন্ধের বই 'এ ও তা'

১৯৩৬),—ইঁহারাও উল্লেখযোগ্য ॥

১০ রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

প্রথম হইতেই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠক গল্পখোর। অবশ্য সব দেশেই গল্পপাঠকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি! কিন্তু বাঙ্গালায় সাধারণ পাঠক স্বেচ্ছায় গল্প ছাড়া আর কিছু পড়িতে চায় না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখাইলেন যে মনের মতো গল্প উপন্যাস লিখিলে শুধু তাহার আয়ের উপর নির্ভর করিয়া ভদ্রভাবে সংসার চালানো সম্ভব। এই হইতে বাঙ্গালা গল্প-উপন্যাসের ব্যাপক উৎপাদনের—ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের—শুরু। এইজন্য আলোচ্য সময়ে (অর্থাৎ তৃতীয় দশকে ও চতুর্থ দশকের গোড়ায়) যত লেখক দেখা দিয়াছেন ও যত গল্প উপন্যাস লেখা হইয়াছে তাহার সংখ্যা যেমন প্রচুর, শক্তির ও বৈচিত্র্যের পরিচয় সে অনুপাতে অত্যন্ত অপ্রচুর। ব্যাপক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে খরিদদারের চাহিদার উপর। গল্প-উপন্যাসের বাঙ্গালী খরিদ্‌দারের রুচি ইতিমধ্যে বেশি বদলায় নাই, কেবল সাধারণ জীবনের প্রতি তাহার ঔৎসুক্য একটু একটু বাড়িতেছে। সেইজন্য অপঠিত অথবা বিস্মৃত গল্প-উপন্যাসের কাহিনীকে একটু-আধটু কালোপযোগী রঙচঙ দিয়া নূতনভাবে উপস্থাপিত করা অলাভেব হইল না। সুতরাং এই সময়ে নূতন লেখকদের অনেক নূতন লেখা আসলে রঙ-ফেরানো পুরানো বস্তু। বাঙ্গালীর জীবনেব প্রসার বাড়ে নাই সুতরাং বিষয়ে বৈচিত্র্য আনযন সাধারণ লেখকের ক্ষমতাতীত। আর একটা কথা স্মরণীয়। খবরের কাগজেও সাহিত্য পরিবেশন চলিয়াছে। (এ কাজ আগে মাসিকপত্রের একচেটে ছিল।) সেইজন্য রচনায় বাগ্‌বাহুল্য এবং বিষয়ে একঘেয়েমি প্রশ্রয় পাইয়াছে।

যাঁহারা সত্যকার নূতন লেখার লেখক তাঁহারা রোমান্‌সের দৃষ্টি যথাসম্ভব খাটো করিয়া অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তির জীবন (যাহা কালের গতিকে ক্রমশ নজবে পড়িতেছে) সম্বন্ধে কৌতূহলী হইলেন। এ কৌতূহল অবশ্যই নিঃস্পৃহ শিল্পীর অথবা বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসুর নয়। ইহার মধ্যে সমবেদনা আছে, কিঞ্চিৎ অনুকম্পাও আছে। এই দৃষ্টি লইয়া যাঁহারা চিত্র-গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের (১৮৯৬-১৯৩৫) নাম। নন্‌-কোঅপারেশন আন্দোলনের প্রথমেই ইনি বিশ্ববিদ্যালযে অধ্যয়ন ছাড়িয়া দিয়া উত্তরবঙ্গে সাধারণ লোকের, বিশেষ করিয়া সাঁওতাল মজুরদের মধ্যে উন্নয়ন কার্যে ব্রতী হন এবং প্রায় আমরণ তাহাতে নিযুক্ত থাকেন। পথে ঘাটে অখ্যাত অজ্ঞাত জনস্রোতের "শেহলি"ব বিচিত্র অবস্থায় ক্ষণোদ্‌ভাসিত রূপ ইনি গল্পচিত্রে আঁকিয়াছিলেন। রোমান্‌স-রসহীন এই গল্পচিত্রগুলিতে "মাটির কাছাকাছি' থাকে যে মানুষ সে মানুষের পরিচয় ধরা পড়িয়াছে।

রবীন্দ্রবাবুর উপভোগ্য প্রহসন 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল'-এর (১৩৩৯ সাল) উল্লেখ আগে করিয়াছি। প্রথমে ইনিও কবিতা লিখিতেন। তাহার সাক্ষ্য 'সিন্ধুসরিৎ' (১৩৩৩ সাল)। ইঁহার গল্প-চিত্রের বই— 'থার্ড ক্লাস' (১৩৩৫ সাল), 'বাস্তবিক' (১৯৩২), 'দিবাকরী' (১৩৩৮ সাল), 'উদাসীর মাঠ' (১৩৩৮ সাল), 'মায়াজাল' (১৯৩৩, দ্বি-স ১৯৪৮), 'পরাজয়', 'ত্রিলোচন কবিরাজ' (১৯৩৩, তৃ-স ১৯৪৭), 'নিরঞ্জন' (১৯৪৮) ॥

১১ প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রবোধকুমার সান্যালের (১৯০৭-১৯৮৩) একটি গল্প প্রথম বর্ষের কল্লোলে বাহির হইয়াছিল।[৪১] এই প্রথম রচনাটিতেই লেখকের বিশিষ্টতা দেখা দিয়াছিল। প্রবোধকুমার গল্প-উপন্যাস ভ্রমণকাহিনী স্মৃতিকথা সবই লিখিয়াছেন। দুইটি-একটি চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ চিত্রণের অপেক্ষা বহু চরিত্রের ক্ষণিক নিরূপণে ও ঘাতপ্রতিঘাতের বর্ণনাতেই ইঁহার দক্ষতার বিশেষ পরিচয়। অর্থাৎ ইঁহার দৃষ্টি পথিকের। এইজন্য ভ্রমণকাহিনীতে প্রবোধবাবুর লেখনীর সর্বাধিক স্বচ্ছন্দগতি। প্রথম গ্রন্থ কয়েকটির নামেও এই দৃষ্টির ছাপ আছে— 'যাযাবর', 'কলরব' ইত্যাদি। পরিচয়ে চারুচন্দ্র দত্তের 'কৃষ্ণরাও'-এর সমালোচনায় প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা প্রবোধ-রচনার ন্যায্য প্রশংসা।[৪২]

> প্রবোধ সান্যালের 'কলরব' পড়লুম। পড়ে তাঁর রচনা ও কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হলো। এই বইয়ের নানা চরিত্র ও নানা ঘটনার ভিড়; কোনটাই মনে হয় না যে বেঠিক। এতোগুলো মেয়েপুরুষকে স্পষ্ট করে গড়ে তুলতে ক্ষমতার দরকার। সে ক্ষমতা আছে লেখকের। লেখক ইচ্ছে করেই এই বইয়ে দেখাতে চেয়েছেন একটা বাড়িতে অত্যন্ত সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার একটা ঘোলা আবর্ত।[৪৩]

প্রবোধকুমার বিস্তর বই লিখিয়াছেন। ইঁহার গল্পের বই— 'চেনা ও জানা' (১৯৩১), 'নিশিপদ্ম' (১৯৩৩), 'অবিকল' (১৯৩৩), 'দিবা-স্বপ্ন' (১৯৩৬), 'অন্তরাগ' (১৯৩৭), 'কয়েক ঘণ্টা মাত্র' (১৯৩৯) ইত্যাদি। বড় গল্প উপন্যাস— 'যাযাবর' (১৯২৮), 'দুই আর দুয়ে চার' (১৯৩১), 'বাতাস দিল দোল' (১৯৩১), 'কাজললতা' (১৯৩১), 'কলরব' (১৯৩২), 'প্রিয়বান্ধবী' (১৯৩৩), 'আলো আর আগুন' (১৯৩৭), 'আঁকাবাঁকা' (১৯৩৮), 'নদ ও নদী' (১৯৪০) ইত্যাদি। প্রথম ভ্রমণ-গল্প 'মহাপ্রস্থানের পথে' (১৩৪৪ সাল) প্রবোধবাবুর সবচেয়ে সমাদৃত বই।

প্রবোধবাবুর স্টাইল সহজ সরল ও হৃদয়গ্রাহী। লেখকের সহানুভূতির দৃষ্টি প্রবল। গল্পকাহিনী সর্বত্র পুষ্ট না হইলেও রোমান্টিক এবং কবিতারসবাহী। প্লট রচনা আত্মকেন্দ্রিক এবং অভিজ্ঞতানির্ভর ॥

১২ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) প্রথম গল্প 'রসকলি' চতুর্থ বর্ষ কল্লোলে প্রকাশিত হইয়াছিল।[৪৪] সে সময়ে ইনি কবিতাও লিখিতেন।[৪৫] সাহিত্যকর্মে এই প্রথম ঝোঁক কিছুদিন পরে মন্দীভূত হইয়া যায়। তাহার পরে ১৯৪০ সালের দিকে তারাশঙ্করবাবু বঙ্গশ্রী ও প্রবাসী পত্রিকায় গল্পরচনায় প্রবীণতার পরিচয় লইয়া দেখা দেন। সেই হইতে তাঁহার লেখনী অস্তব্ধ গতিতে প্রথমে গল্প এবং পরে গল্প-উপন্যাস-নাটক রচনা করিয়া চলিয়াছে। তারাশঙ্করকে শৈলজানন্দের সহযাত্রী বলিতে পারি। শৈলজানন্দ কয়লাকুঠির সাঁওতাল জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাহিনী রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর লইলেন তাঁহার দেশ দক্ষিণপূর্ব বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন— পুরানো গ্রামের জমিদার-ঘর হইতে নদীচরের মাল-বেদে পাড়া পর্যন্ত। অনতিপ্রাচীন স্থানীয় ঐতিহ্য গল্প-কাহিনী ও কিংবদন্তী ইনি ভালো করিয়াই কাজে

লাগাইয়াছেন। এবং এইখানেই তারাশঙ্করবাবুর রচনার প্রধান বিশিষ্টতা। তারাশঙ্করবাবুর দৃষ্টি শৈলজানন্দের মতো উদাসীন ও নিরাবিল নয়। সে দৃষ্টিতে হৃদয়াংশ যুক্ত আছে এবং তাহাতে অতীতের প্রতি টান অননুভূত নয়। সেইসঙ্গে হৃদয়াবেগের প্রশ্রয় দিয়া সাধারণ পাঠকের মনতুষ্টির চেষ্টাও আছে। এ বিষয়ে তারাশঙ্করবাবুর রচনা শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গে, যৌন আবেদনটুকু বাদ দিয়া, তুলনা করিতে পারি। তারাশঙ্করবাবুর গল্প-উপন্যাসে কল্পনার প্রাচুর্য নাই, বিষয়বস্তুর অর্থাৎ আধেয়ের ক্ষীণতা নাই, আধারের অর্থাৎ স্টাইলের শ্লথতা ও প্রগল্‌ভতা আছে। (তবে এ দোষ হইতে অধিকাংশ লেখকই মুক্ত নন।) প্রধানত এই কারণে ইঁহার গল্প যতটা জমাট, উপন্যাস ততটা নয়। (একথাও প্রায় সকল লেখকের সম্বন্ধে কমবেশি খাটে।)

তারাশঙ্করবাবুর গ্রন্থসংখ্যা কম নয়। গল্পের বই এইগুলি— 'ছলনাময়ী' (১৯৩৬), 'জলসাঘর' (১৯৩৭), 'রসকলি' (১৯৩৮), 'বেদিনী' (১৯৪০), 'যাদুকরী' (১৯৪৩) ইত্যাদি। 'রাইকমল' (১৯৩৫) বড় গল্প এবং ভালো গল্প, ভিখারী বৈষ্ণবদের জীবনকথা। রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী'তে এ জীবনের ইঙ্গিত এবং শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই'-এ ও 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে এ জীবনের মোহন চিত্র। তবে তারাশঙ্করের চিত্র বাস্তবতর।

প্রথমদিকের উপন্যাসগুলি বড় গল্প ছাড়া আর কিছু নয়,—'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯৩১), 'পাষাণপুরী' (১৯৩৩), 'নীলকণ্ঠ' (১৯৩৪), 'প্রেম ও প্রয়োজন (১৯৩৫), 'আগুন' (১৩৪৪)। 'ধাত্রীদেবতা' ইঁহার প্রথম পাকা উপন্যাস, অবশ্য রাইকমলের কথা বাদ দিলে। 'ধাত্রীদেবতা'(১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'গণদেবতা' (১৯৪২)[৪৬], 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) ইত্যাদিতে উপন্যাস-লেখকরূপে তারাশঙ্করবাবুর যশ পাঠকসমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। মনে করিয়া দিই, তারাশঙ্করের এই পাকা রচনাগুলির কাহিনীর কোন-কোনটির বীজ তাঁহার ছোটগল্পগুলিতে আছে এবং এসব কাহিনী লেখকের পরিচিত স্থান-কাল-পাত্র-ঘটনা অবলম্বনে পরিকল্পিত। বিষয়ের পরিকল্পনায় তারাশঙ্করবাবুর অনটন নাই, কাহিনীর নির্বাচনে ও গঠনে নূতনত্ব আমদানির চেষ্টা নাই, এবং ঘটনার গতি পাঠকের অনপেক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত নয়। হৃদয়াবেগের প্রত্যাখ্যান নাই এবং অতিভাষণও বর্জিত নয়। এইসব কারণে তারাশঙ্করবাবুর উপন্যাসের জনপ্রিয়তা অধিক।

তারাশঙ্করবাবু তাঁহার কয়েকটি গদ্যকাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র নাটকও রচনা করিয়াছেন। এগুলির অভিনয় রঙ্গমঞ্চে সমাদৃত হইয়াছে। ইঁহার নাট্যরচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— 'কবি' (১৩৪৮ সাল), 'কালিন্দী' (১৩৪৮ সাল), 'দুই পুরুষ' (১৩৪৯ সাল), 'দ্বীপান্তর' (১৩৫০ সাল), 'বিংশ শতাব্দী' (১৩৫১ সাল), 'যুগবিপ্লব' (১৩৫৮ সাল) ইত্যাদি।

আরও একজন উপন্যাস-লেখক আছেন, শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯১৩)। ইঁহার বই— 'শ্রীময়ী' (১৯৩৯), 'অমানিতা মানবী' (১৯৪১) ও 'প্রান্তিক' (১৯৪৬) ॥

১৩ সরোজকুমার রায়চৌধুরী

সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০২-১৯৭২) কতকটা তারাশঙ্করবাবুর সমানধর্মা। ইঁহারও এক-আধটি গল্প কল্লোলে বাহির হইয়াছিল। তারাশঙ্করবাবুর উপন্যাসকাহিনীর ভূগোল বীরভূম জেলার চৌহদ্দিবদ্ধ, সরোজবাবুর রচনার মানচিত্র তাহারই সংলগ্নভূমি, পশ্চিম মুর্শিদাবাদ। তবে সরোজবাবুর কাহিনী ততটা স্থানসীমাবদ্ধ (regional) নয় যতটা তারাশঙ্করবাবুর কাহিনী। রোমান্‌সপ্রখরতা এবং বহুভাষণও সরোজবাবুর লেখায় কম। ইঁহার গ্রন্থের সংখ্যাও বেশি নয়।

সরোজবাবুর উপন্যাস— 'বন্ধনী' (১৯৩১), 'শৃঙ্খল' (১৯৩২), 'আকাশ ও মৃত্তিকা' (১৩৪০ সাল), 'পান্থনিবাস' (১৯৩৫), 'ঘরের ঠিকানা' (১৯৩৬), 'ময়ূরাক্ষী' (১৩৪৩ সাল), 'গৃহকপোতী' (১৯৩৭), 'সোমলতা' (১৯৩৮)[৪৭], 'অভিশাপ' (১৯৩৮), 'হংসবলাকা' (১৩৪৪ সাল), 'শতাব্দীর অভিশাপ', (১৩৪৮ সাল), 'কালো ঘোড়া' (১৩৫৩ সাল) ইত্যাদি। গল্পের বই— 'দেহ-যমুনা' (১৯৩৬), 'মনের গহনে' (১৯৩৬), 'ক্ষুধা' (১৩৫১ সাল) ইত্যাদি। নাটক— 'হালদার সাহেব' (১৩৫৪ সাল) ॥

১৪ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) তাঁহার "বনফুল" এই সাহিত্যিক ছদ্মনামেই সমধিক পরিচিত। রীতিমত গল্প-উপন্যাস লিখিবার অনেককাল আগে হইতে ইঁহার এই ছদ্মনামে লেখা কবিতা ও কথিকা প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইত।[৪৮] 'শনিবারের চিঠি'র দলে যোগ দিবার পর হইতে ইনি ব্যঙ্গ-কবিতা ও প্যারডি লিখিতে থাকেন। সে রচনায় অনায়াস-দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় আছে।[৪৯] বলাইবাবু মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট। ইঁহার ডাক্তারি-ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে লেখা 'তৃণখণ্ড' (১৩৪২ সাল) ও 'বৈতরণীর তীরে' (১৩৪৩ সাল) গল্প-রচনায় নূতন পথের সন্ধান দিয়াছিল। আগে হইতেই বলাইবাবু কতকগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্রকায় ছোটগল্প লিখিতেছিলেন, যাহাকে বলে ইংরেজীতে five minute short story আর আমেরিকান সাহিত্যিক গ্রাম্যভাষায় shortshort। এগুলিও নূতন জিনিস। গল্পে ও উপন্যাসে বলাইবাবুর বিশেষত্ব— বিষয়-অবিচলতা, অপ্রগল্‌ভতা ও প্রযত্ন। লেখায় শৈথিল্যের প্রশ্রয় নাই, চরিত্রচিত্রণে ভাবাবেগ-উৎসরণ নাই। বিষয়ের জন্য লেখক পরিচিত স্থান-কাল-পাত্রের বাহিরে যান না। সংসারের অভিজ্ঞতা ও জীবনের অনুধাবন যথেষ্ট। জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিয়া বলাইবাবু গল্প-উপন্যাসের বিচিত্র উপাদান সংগ্রহ করেন।

বলাইবাবু অনেক উপন্যাস লিখিয়াছেন কিন্তু তাহা সব এক ছাঁচে ঢালা নয়। উপন্যাসের টেকনিকে ইনি নানাভাবে পরিবর্তন আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। একটিতে ইঁহার কৃতকার্যতা সকলেই স্বীকার করিবেন, তাহা হইল উপন্যাসের সঙ্গে কাব্যের ও নাট্যের শৈলী মেশানো। এই টেকনিক বলাইবাবু দেখাইয়াছেন 'মৃগয়া' (১৯৪০, দ্বি-স ১৯৪২, তৃ-স ১৯৪৫) বইটিতে। বিজ্ঞানকে উপন্যাসের ও কাব্যের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছেন 'ডানা'য় (১৯৪৮)। 'স্থাবর'এ (১৯৫১) আদিম মানবের মনস্তত্ত্ব অনুশীলিত।

বলাইবাবুর গ্রন্থসংখ্যা পঞ্চাশের কম নয়। কবিতার বই— 'বনফুলের কবিতা'

(১৯২৯), 'অঙ্গারপর্ণী' (১৩৪৭ সাল), 'চতুর্দশী' (১৩৪৭ সাল), 'আবহনীয়' (১৩৫০ সাল) এবং 'করকমলেষু' (১৯৪৯)। গল্পের বই— 'বৈতরণী-তীরে' (১৩৪৩ সাল), 'বনফুলের গল্প' (১৩৪৩ সাল), 'বনফুলের আরো গল্প' (১৩৪৫ সাল), 'বাহুল্য' (১৩৫০ সাল), 'বিন্দুবিসর্গ' (১৩৫১ সাল), 'অদৃশ্য-লোকে' ইত্যাদি। বড় গল্প ও উপন্যাস— 'তৃণখণ্ড' (১৩৪২ সাল), 'দ্বৈরথ' (১৩৪৪ সাল), 'কিছুক্ষণ' (১৩৪৫ সাল), 'নির্মোক' (১৩৪৭ সাল), 'রাত্রি' (১৩৪৮, দ্বি-স ১৩৫৭ সাল), 'স্থাবর' (১৩৫৮ সাল), 'পঞ্চপর্ব' (১৩৬১ সাল) ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলাইবাবুর দুইখানি জীবনী-নাটকের কথা আগে বলিয়াছি। 'শ্রীমধুসূদন' (১৩৪৬ সাল) ও 'বিদ্যাসাগর' (১৩৪৮ সাল) নাট্যরচনায় নূতন পথ দেখাইয়াছে। ইঁহার অপর নাট্যগ্রন্থ— 'রূপান্তর' (১৩৪৪ সাল), 'মন্ত্রমুগ্ধ' (১৩৪৫ সাল), 'মধ্যবিত্ত' (দ্বি-স ১৩৬৩ সাল), 'কঞ্চি' (১৩৫২ সাল), 'বন্ধন-মোচন' (১৩৫৫ সাল) ইত্যাদি ॥

১৫ শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের (জন্ম ১৯০৪) কবিতার কথা পরে বলিতেছি। ইঁহার প্রথম গ্রন্থ প্রবন্ধের বই— 'তারুণ্য' (১৯২৮, দ্বি-স ১৯৪৭)[৪১ক]। তাহার পর এই ধরনের বইগুলি— 'আমরা' (১৯৩৭, দ্বি-স ১৯৪৭), 'জীবনশিল্পী' (১৯৪১, দ্বি-স ১৯৪৫), 'ইশারা' (১৯৪৩, দ্বি-স ১৯৫৪), 'বিনুর বই' (১৯৪৪, দ্বি-স ১৯৫২), 'জীয়নকাটি' (১৯৪৯), 'দেশকালপাত্র' (১৯৪৯), 'প্রত্যয়' (১৯৫১), 'নতুন করে বাঁচা' (১৯৫৩), 'আধুনিকতা' (১৯৫৩) ইত্যাদি। বিচিত্রায় প্রথম প্রকাশিত ইউরোপ-ভ্রমণকাহিনী 'পথে প্রবাসে' (১৯৩১, দ্বি-স ১৯৫৩) গদ্যশিল্পীরূপে অন্নদাশঙ্করবাবুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইঁহার ছোটগল্পগুলিও বিশিষ্টতাপূর্ণ। ছোটগল্পের বই— 'প্রকৃতির পরিহাস' (১৯৩৪, দ্বি-স ১৯৪৭), 'মন পবন' (১৯৪৬), 'যৌবনজ্বালা' (১৯৫০), 'কামিনীকাঞ্চন' (১৯৫৪) ইত্যাদি।

অন্নদাশঙ্করবাবু উপন্যাস-রচনাতেই সমধিক মনোযোগী। উপন্যাসের মধ্য দিয়া ইনি নানারকমে অভিনবত্বের প্রয়াস পাইয়াছেন। (এ বিষয়ে বলাইবাবুর সহিত ইঁহার কিছু মিল আছে। তবে বলাইবাবুর শিল্প চোখের যোগে, অন্নদাশঙ্করবাবুর শিল্প মনের যোগে।) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা 'সত্যাসত্য' শীর্ষক উপন্যাস-ষট্ক— 'যার যেথা দেশ' (১৯৩২, তৃ-স ?), 'অজ্ঞাতবাস' (১৯৩৩, তৃ-স ১৯৫৩), 'কলঙ্কবতী' (১৯৩৪, তৃ-স ১৯৫৩), 'দুঃখমোচন' (১৯৩৬, তৃ.-স ১৯৫৩), 'মর্তের স্বর্গ' (১৯৪০, দ্বি-স ?) ও 'অপসরণ' (১৯৪২, তৃ-স ১৯৫৩)। নায়ক বাদলের মনের খেয়াল ও ভাবনার জটিলতা এবং সেই সঙ্গে নায়িকা উজ্জয়িনীর অসহায় নির্ভরতা কাহিনীর মূলসূত্র। পাত্রপাত্রী খুব বেশি নয়। কাহিনীর স্থান ভারতবর্ষ ও ইউরোপ দুই মহাদেশ ব্যাপিয়া। নায়িকা ও ছোটখাট ভূমিকাগুলি উজ্জ্বল। নায়ক চরিত্র অত্যন্ত ধোঁয়াটে, চিন্তারুগ্ণ বলিলেও হয়। নায়কের অভিভাবকস্থানীয় পার্শ্বচর সুধীর ভূমিকায় লেখকের ভাবাদর্শ প্রকটিত হইয়াছে।

অন্নদাশঙ্করবাবুর অপর উপন্যাস— 'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০, চ-স ১৯৫১), 'অসমাপিকা' (১৯৩৯, তৃ-স ১৯৫৪), 'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৩, তৃ-স ১৯৪৯), 'না' (১৯৫১, দ্বি-স ১৯৫২), 'কন্যা' (১৯৫৩, দ্বি-স ১৯৫৪) ইত্যাদি।

অন্নদাশঙ্করবাবুর লেখার বিশিষ্ট গুণ মনস্বিতা। তাঁহার সব গদ্য রচনাতেই এই গুণ প্রকট, বিশেষ করিয়া প্রবন্ধে।

অন্নদাশঙ্করবাবুর জন্ম উড়িষ্যায়, সুতরাং উড়িয়া তাঁহার দ্বিতীয় মাতৃভাষা। গোড়ার দিকে ইনি বাঙ্গালা ও উড়িয়া দুই ভাষাতেই গদ্য পদ্য লিখিতেন, তার বরাবরই প্রধান ঝোঁক বাঙ্গালার দিকে। অন্নদাশঙ্করের প্রথম কবিতার বই 'রাখী' (১৯২৯, দ্বি-স ১৯৩০)। তাহার পর বাহির হইয়াছে 'বসন্ত' (১৯৩২), 'কালের শাসন' (১৯৩৩), 'কামনা পঞ্চবিংশতি' (১৯৩৪) ও 'নূতনা রাধা' (১৯৪৩)। অতঃপর দুইখানি ছড়ার বই বাহির হইয়াছিল— 'উড়কি ধানের মুড়কি' (১৯৪২, তৃ.-স ১৯৫৩) ও 'রাঙা ধানের খৈ' (১৯৫০)। পরবর্তী কালে ছড়ার ছাঁদে ও ছড়ার ভাবে কবিতা রচনায় অন্নদাশঙ্করবাবু অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন।

'রাখী'র কবিতাসংখ্যা তেত্রিশ। "এই কবিতাগুলির, রচনাকাল ১৯২৭-২৯, রচনাস্থল ইউরোপ। পরে এগুলি রবীন্দ্রনাথের সংকেত অনুসারে স্থানে স্থানে পরিবর্তিত হয়।" আশেপাশের প্রকৃতি আর নারীপ্রেম কবিতাগুলির প্রেরণা যোগাইয়াছে। অধিকাংশ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মক্‌শ, বিশেষ করিয়া ছন্দে। ক্ষণিকার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। পথের প্রেমই কবিকে পাইয়া বসিয়াছে।

> আকাশে আকাশে পাশাপাশি
> এই ঢের ভালোবাসাবাসি।

প্রথম কবিতাতেই পাই নূতন পারিপার্শ্বিকে নূতন জীবনে পুরাতন প্রেমের বিসর্জন ও নূতন প্রেমের আবাহন। এ নূতন প্রেম বন্ধনহীন। পথিক কোথাও হৃদয় বাঁধা রাখিতে প্রস্তুত নয়, সবই সমসাময়িক রাখীবন্ধন।

> ওই যে প্রপাত
> বাঁধিয়াছে আকাশের অবনীর হাত
> সেও মোর প্রিয়।
> আঁখিতে বাঁধিয়া দিল কিসের রাখী ও?

প্রকৃতির টান নাড়ীর নয়।

> এবার এসেছি নরলোকে। এও ভাল।
> প্রকৃতি ভুলায়েছিল মানব ভুলালো
> আমি মানবের কবি। এই তো আমার
> আপনার দেশ।

কিন্তু মানবও কবির মনগড়া বস্তু।

'নূতনা-রাধা'য় অর্ধেক কবিতা পুরাতন অর্থাৎ পূর্বপ্রকাশিত, অর্ধেক নূতন অর্থাৎ অপ্রকাশিত। কবিতাগুলি এই নয় শীর্ষকে সাজানো— 'প্রথম স্বাক্ষর' (তিনটি কবিতা, রচনাকাল ১৯২৫-২৭), 'রাখী' (পনেরোটি কবিতা, রচনাকাল ১৯২৭-২৯), 'একটি বসন্ত' ("জয়স্‌কে", বারোটি কবিতা, রচনাকাল ১৯২৯), 'কামনা পঞ্চবিংশতি' (সাতটি কবিতা, রচনাকাল ১৯২৯), 'কালের শাসন' ("জয়স্‌কে", বারোটি কবিতা, রচনাকাল ১৯২৯-৩০),

'লিপি', (দশটি কবিতা, রচনাকাল ১৯৩০-৩১), 'নীড়' (দশটি কবিতা, রচনাকাল ১৯৩১-৩৩), 'জার্নাল' (বাইশটি খুব ছোট কবিতা, রচনাকাল ১৯৩৩ ?) এবং 'ক্রীড়ো' (ছয়টি কবিতা, রচনাকাল ১৯৩০-৩৪)। শেষ চার শীর্ষকের কবিতাগুলি ভারতবর্ষে ফিরিবার পরে লেখা ॥

১৬ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬)[৫০] আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সে নাম একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইঁহার প্রথম রচনা 'অতসী মামী' গল্পটি ১৩৩৫ সালের পৌষ সংখ্যা বিচিত্রায় বাহির হইয়াছিল। তখন হইতেই এই ছদ্মনাম। লেখকরূপে মাণিকবাবুর রীতিমত আবির্ভাব 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায়। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' এই পত্রিকায়ই প্রথম বাহির হইয়াছিল (১৩৪১ সাল)। মাণিকবাবুর রচনার সমস্ত দোষগুণের ইঙ্গিত তাঁহার এই প্রথম উপন্যাসটিতে পাওয়া যায়।

মাণিকবাবুর বইয়ের সংখ্যা ষাটের কাছাকাছি। গল্পের বই— 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮), 'সরীসৃপ' (১৯৩৯), 'বৌ' (১৯৪০), 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩), 'ভেজাল' (১৯৪৪), 'হলুদপোড়া' (১৯৪৫), 'আজ কাল পরশুর গল্প' (১৯৪৬), 'পরিস্থিতি' (১৯৪৬), 'খতিয়ান' (১৯৪৭), 'ছোটবড়' (১৯৪৮), 'মাটির মাশুল' (১৯৪৮), 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' (১৯৪৯), 'ফেরিওয়ালা' (১৯৫৩) ইত্যাদি। বড় গল্প ও উপন্যাস— 'জননী' (১৯৩৫), 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), দুইপর্ব 'সহরতলী' (১৯৪০, ১৯৪১), 'সহরবাসের ইতিকথা' (১৯৪৬, দ্বি-স ১৯৫৩), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮), 'অহিংসা' (১৯৪৮), দুইখণ্ড 'সোনার চেয়ে দামী' (প্রথম খণ্ড 'বেকার' ১৯৫১, দ্বিতীয় খণ্ড 'আপোষ' ১৯৫২), 'হরফ' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাণিকবাবুর গল্প-উপন্যাসে ব্যক্তি ও ব্যষ্টিকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হইয়াছে তাহা অভিনব ও নিজস্ব। ঝোঁক প্রথম হইতেই সেক্সের দিকে পরে ফ্রয়েডীয় ভাবনায় পরিণত। ক্ষুধা এবং রিরংসা মানুষের আদিমতম দুইটি প্রবৃত্তি। তাহার মধ্যে ফ্রয়েডের মতে, রিরংসাই প্রগাঢ়তর। মানুষের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি যৌন-প্রবৃত্তির গৌণ বৃত্তির পথেই সাধিত হইয়াছে। ব্যক্তি-মানুষের অনবরুদ্ধ প্রবণতা যাহা তাহার চরিত্রের মেরুদণ্ড তাহারই উপর তাহার জীবনের সুস্থতা-অসুস্থতা এবং সফলতা-বিফলতা নির্ভর করে। মাণিকবাবু এই দিক দিয়াই জীবনের তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একদর্শিতা অবশ্যই আছে তবে সেটা কৃত্রিম কোন মতবাদ-আশ্রিত নয়। বাল্যকাল হইতে মাণিকবাবুর জীবন সমস্যাসঙ্কুল ছিল এবং তথাকথিত "ছোটলোক"দের সঙ্গে তাঁহার খোলাখুলি মেলামিশি ছিল। এই সহজাত সিম্প্যাথির সঙ্গে তাঁহার সংসার-সমাজ ভাবনার সংঘর্ষ হইয়াছিল, সেই সংঘর্ষের ফলে তাঁহার বিশিষ্ট মানসিকতা, তাঁহার বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি উদ্ভূত। কমিউনিজমের দিকে তাঁহার ঢলিয়া পড়া এইসূত্রে স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

দরিদ্রের ক্ষুধা এবং দরিদ্র-অদরিদ্রের অবচেতন যৌনবিকার মাণিকবাবুর সৃষ্ট চরিত্রের

নিয়তি। প্রথমটি পরিহার্য, অপরটি অপরিহার্য। যৌনবিকার প্রকটিত পাড়াগাঁয়ের সংসার-সমাজে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য়, সহরের সংসার-সমাজে 'সহরবাসের ইতিকথা'য়, সাধুর আশ্রমে 'অহিংসা'য়। তবে একথাও বলিতে হইবে যে বৈজ্ঞানিক[৫১]-সাহিত্যিকের নিরাসক্ত অথচ প্রাণস্পন্দিত দৃষ্টি মাণিকবাবু সর্বত্র স্বচ্ছ রাখিতে পারেন নাই। (অত লিখিলে তাহা পারা সম্ভবও নয়।) সেখানে সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার ব্যর্থতা। যেমন 'চতুষ্কোণ'।

মাণিকবাবুর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' ভালো লেখা তবে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা নয়। ইহার মধ্যে প্রোপাগ্যান্ডা আছে রোমান্‌স-রসের আমেজও আছে। ছোটগল্পগুলিতেই শিল্পী মাণিকবাবুর শ্রেষ্ঠ পরিচয় নিহিত ॥

১৭ পঞ্চজনা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৮৭) প্রধানত গল্পই লিখিয়াছেন। ইঁহার গল্পে যে নূতন সুরটুকু পাওয়া যায় তাহা বাৎসল্যের এবং ঘরোয়া হালকা পরিবেশের ও হাসিঠাট্টার। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ইঁহার লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ। বিভূতিবাবুর গল্পের বই সংখ্যায় তিরিশের কাছাকাছি— 'রাণুর প্রথম ভাগ (১৩৪৪ সাল), 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' (১৩৪৫ সাল), 'রাণুর তৃতীয় ভাগ' (১৩৪৭ সাল), 'রাণুর কথামালা' (১৩৪৮ সাল), 'অতঃকিম্‌' (১৩৫০ সাল), 'কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার' (১৩৫৪ সাল), 'বরযাত্রী' (১৩৫৬ সাল) ইত্যাদি। উপন্যাসও বেশ কয়েকখানি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে 'নীলাঙ্গুরীয়' (১৯৪২) সর্বাধিক পরিচিত। নাট্যরচনা— 'বিশেষ রজনী' (১৩৫১ সাল) ও 'গণ্‌শার বিয়ে' (১৩৫৯ সাল)।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) নাট্য-লেখকদের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। একদা ইনি কবিতাও লিখিতেন। তাহার নিদর্শন 'যৌবনস্মৃতি' (১৯২২)। শনিবারের-চিঠিতে ইঁহার অনেক ভালো ব্যঙ্গ কবিতা বাহির হইয়াছিল। সেগুলিতে লেখকের ছদ্মনাম— "চন্দ্রহাস"—ছিল। ইতিহাস হইতে কাহিনী এবং সাধারণ জীবন হইতে ঘটনা লইয়া শরদিন্দুবাবু কতকগুলি ভালো ছোটগল্প লিখিয়াছেন। ভূতের গল্প, ডিটেক্‌টিভ গল্প, ঐতিহাসিক গল্প এবং নাট্যচিত্র লেখায়ও ইনি অসাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য ও দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বিশেষ করিয়া ভৌতিক এবং ডিটেক্‌টিভ গল্পে ইঁহার দক্ষতা ইংরেজী গল্পের প্রায় সমতুল্য। শরদিন্দুবাবুর স্টাইল অনায়াস-সুন্দর সহজ ও স্বচ্ছ রচনারীতির মনোহর আদর্শ। যে গুণ থাকিলে অনাড়ম্বর রচনা কালের সম্মার্জনীর স্পর্শ এড়াইতে পারে সে গুণ শরদিন্দুবাবুর অনেক গল্পে বিদ্যমান।

শরদিন্দুবাবুর গল্পের বই— 'জাতিস্মর' (১৯৩৩), 'ডিটেকটিভ' (১৯৩৭), 'চুয়াচন্দন' (১৯৪২), 'কাঁচামিঠে' (১৯৪২), 'কালকূট' (১৯৪৫), 'গোপন কথা' (১৩৫২ সাল), 'দন্তরুচি' (১৩৫২ সাল), 'পঞ্চভূত' (১৩৫২ সাল), 'ছায়া পথিক' (১৩৫৬ সাল), 'কানু কহে রাই' (১৯৫৪) ইত্যাদি। নাট্যরচনা— 'বন্ধু' (১৯৩৭), 'পথ বেঁধে দিল' (১৯৪১), 'কালিদাস' (১৯৪৩), 'বিজয়লক্ষ্মী' (১৯৪৭), 'কানামাছি' (১৯৫২) ইত্যাদি।

'ব্যোমকেশের ডায়েরী' (১৯৩৪) প্রভৃতি ডিটেক্‌টিভ গল্প অত্যন্ত সুখপাঠ্য।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় (১৮৮২-১৯৬৭) বিগতদিনের লেখকদের মধ্যে পড়েন। ইঁহার গল্পে-উপন্যাসে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার স্বাদ কিছু কিছু মিলে। ইনি অনেক গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছেন এবং ইঁহার রচনা একদা সাধারণ পাঠকের রুচিকর ছিল।[৫২]

পরিমল গোস্বামী (১৮৯৯-১৯৭৬) কিছুকাল 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইঁহার লিপিদক্ষতা ছোট ছোট সরস কৌতুকপূর্ণ গল্পচিত্র ও নাট্যরচনায়। পরিমলবাবুর বিশিষ্টতা স্টাইলের নির্মল কৌতুকের প্রচ্ছন্ন প্রবাহ। পরিমলবাবুর রচনাবলী— 'বুদ্বুদ' (১৯৩৬), 'ট্রামের সেই লোকটি' (১৯৪৪, দ্বি-স ১৯৪৬), 'ব্ল্যাক মার্কেট' (১৩৫২ সাল), 'মারকে লেঙ্গে' (১৩৫৭ সাল) ইত্যাদি। নাট্যরচনা— 'দুষ্যন্তের বিচার' (১৯৪৩, দ্বি-স ১৯৪৪) ও 'ঘুঘু' (১৯৪৪)।

মনোজ বসুর (১৯০১-১৯৮৭) রচনা সংখ্যায় প্রচুর। ইঁহার লেখনী বহু রুচিকর গল্প-উপন্যাস সৃষ্টি করিয়াছে। ইঁহার গল্পের বই— 'বনমর্মর' (১৯৩২), 'নরবাঁধ' (১৯৩৩), 'দেবী কিশোরী' (১৯৩৪), 'পৃথিবী কাদের' (১৯৪০), 'একদা নিশীথ কালে' (১৯৪২) ইত্যাদি। মনোজবাবুর উপন্যাস অধিকাংশ আকারে বড় গল্পের মতো। যেমন 'ভুলি নাই' (১৯৪২), 'সৈনিক' (১৯৪৬) ইত্যাদি। মনোজবাবুর লেখা সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও দ্রুতগতি ॥

১৮ প্রকীর্ণ

বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে জানার সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছিল। সে বৃদ্ধির অনুপাতে উপন্যাসের পাঠকসংখ্যাও বাড়িতেছিল। সেইসঙ্গে উপন্যাসের কাটতিও বাড়িতেছিল, কিন্তু তাহার কারণ অন্য। দ্বিতীয় দশকের শেষের দিক হইতে, অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, বিবাহে নবদম্পতিকে বই উপহার দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়। এই চাহিদার ফলে অল্পমূল্যের অথচ ভালো ছাপা ও বাঁধাই, দুই একটি ছবিওয়ালা, উপযোগী নামযুক্ত উপন্যাসের উৎপাদন ও বিক্রয় বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। ভালো, মাঝারি, নিরেস— সব রকমের লেখকই প্রীতি-উপহার দেওয়ার উপযোগী উপন্যাস রচনায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কোন কোন লেখক বছরে চার-পাঁচখানি করিয়া উপন্যাস অথবা গল্পের বই বাহির করিতেন। সাময়িক প্রয়োজনের ফসল হইলেও এই রচনা সবই একেবারে নির্গুণ নয়। (বিশেষত উপস্থিত সময়ের ফোলানো-ফাঁপানো দুই-তিন-হাত-ফেরতা উপন্যাসের তুলনায় উপহার-উপন্যাসাবলীর মূল্য বেশি বলিয়া মনে হইতেছে।)

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ দশকের গল্প-উপন্যাস লেখকদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা স্বতন্ত্র গ্রন্থ সাপেক্ষ। ইঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রস্তুত গ্রন্থের পরিধিতে কুলাইবে না, তাই এখানে তাঁহাদের একত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

শ্রীপতিমোহন ঘোষ[৫৩], মুনীন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী[৫৪], আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)[৫৫],

বিজয়রত্ন মজুমদার (১৮৯৪-১৯৫৫)[৫৬], প্রফুল্লকুমার মণ্ডল (১৮৯৮- ?)[৫৭], রাসবিহারী মণ্ডল (১৮৯৫- ?)[৫৮], উপেন্দ্রনাথ ঘোষ[৫৯], কেশবচন্দ্র গুপ্ত[৬০], মহম্মদ হেদায়েতুল্লা[৬১], মুজিবর রহমান (মৃত্যু ১৯৪০)[৬২], ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় [৬৩], রাধাচরণ চক্রবর্তী (১৮৯৩-১৯৩৮)[৬৪], যতীন্দ্রনাথ পাল[৬৫], লীলা দেবী[৬৬], আশালতা দেবী[৬৭], মণীন্দ্রনাথ ঘোষ[৬৮], প্রফুল্লকুমার সরকার (১৮৮৩-১৯৪৪)[৬৯], অরবিন্দ দত্ত[৭০], হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৬)[৭১], পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়[৭২], রামপদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৬৭)[৭৩], শচীন সেন (জন্ম ১০২)[৭৪], তারাপদ রাহা (জন্ম ১৯০১)[৭৫], রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৬-৪৬)[৭৬], আশীষ গুপ্ত[৭৭], প্রবোধ সরকার (জন্ম ১৯০৮)[৭৮], রামেন্দু দত্ত (১৯০০-১৯৬২)[৭৯], শিবরাম চক্রবর্তী[৮০], সুবোধ বসু (জন্ম ১৯০৮)[৮১], জীবনময় রায় (১৮৯০-১৯৭১)[৮২], অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল (১৮৯৫ ?-১৯৬৬)[৮৩], নবগোপাল দাস (জন্ম ১৯১০)[৮৪], সুশীল রায় (১৯১৫-১৯৮৫)[৮৫], নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (১৯১৬-১৯৮৮)[৮৬], আশালতা সিংহ (জন্ম ১৯১১)[৮৭], ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়[৮৮], প্রিয়কুমার গোস্বামী[৮৯], অশোক চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০২)[৯০], জ্যোতির্মালা দেবী[৯১], পুষ্পলতা দেবী[৯২], সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯১৯)[৯৩], কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯১৭)[৯৪], ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় (১৯০৫-১৯৭৫)[৯৫], গোপাল হালদার (জন্ম ১৯০২)[৯৬], আশাপূর্ণা দেবী (জন্ম ১৯৮৮)[৯৭], জ্যোতির্ময় ঘোষ (১৮৯৬- ?)[৯৮], ভবানী মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৯)[৯৯], ইলা দেবী[১০০], গৌতম সেন[১০১], সুধাংশু কুমার হালদার (জন্ম ১৯০০)[১০২], "শ্রীঅমলা দেবী"--আসল নাম ললিতানন্দ গুপ্ত— (১৯০২-১৯৬৯)[১০৩], অমলেন্দু দাশগুপ্ত (১৯০৪ ৫৫)[১০৪], জ্যোতির্ময় রায় (জন্ম ১৯০৮)[১০৫], "সম্বুদ্ধ"—আসল নাম অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯৭৩)[১০৬], সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৬৯)[১০৭], হাসিরাশি দেবী[১০৮], গজেন্দ্রকুমার মিত্র (জন্ম ১৯০৯)[১০৯], সুমথনাথ ঘোষ (জন্ম ১৯১০-১৯৮৪)[১১০], সুবোধ ঘোষ (১৯১০-১৯৮০)[১১১], রাখালচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৩৪)[১১২], পশুপতি ভট্টাচার্য (জন্ম ১৮৯৮)[১১৩], কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য[১১৪], স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (১৯০৮ ৬৪)[১১৫], প্রসাদ ভট্টাচার্য[১১৬], পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য (১৯০৮)[১১৭], চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[১১৮] ইত্যাদি ॥

টীকা

১ জন্ম ১৮৮২। রচনা—'বনস্পতির অভিশাপ' (১৯২২), 'চিত্রবহা' (দ্বিতীয় বর্ষ কালি-কলমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।) ইঁহার প্রথম বই 'জাপান' (১৯১০) ভ্রমণকাহিনী। অপর গ্রন্থ 'জীবনপ্রবাহ' আত্মকথা।

২ 'দ্বিতীয় পক্ষ'এ সঙ্কলিত।

৩ ভারতবর্ষ পত্রিকায় 'মেঘনাদ' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কার্তিক ১৩২৭ হইতে।

৪ ভারতী জ্যৈষ্ঠ ও অগ্রহায়ণ ১৩২৯ দ্রষ্টব্য।

৫ সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশ।

৬ ভারতী বৈশাখ ১৩৩০ হইতে।

৬ক পল্লীশ্রী পত্রিকায় বৈশাখ-চৈত্র (১৩২৯) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

৭ তুলনীয় সন্দীপের উক্তি, "আমি কিছুদিন আগে আজকালকার দিনের একখানি ইংরেজি বই পড়ছিলুম, তাতে

স্ত্রীপুরুষের মিলনরীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে।'

মণীন্দ্রলাল বসুব গল্পের নায়কেরা বলেন, "কিন্তু তখন আমার মনোজগতে নীট্‌সে সোপেনহাওয়ারের যুগ, হ্যাভলক এলিস পড়ে মেজাজ গরম রয়েছে।" ('অরুণ' ১৯১৯)। "আমার যুবক বন্ধুরা জানেন আমি এক গরীব কবি, এক সাহিত্যরসজ্ঞ পণ্ডিত, খুব উপন্যাস পড়ি, শুধু অর্থাভাবে প্রতিভা বিকশিত হইল না। বেদ হইতে নীটসে, কালিদাস হোমার হইতে শেলী গতিয়ে, বাৎস্যায়ন হইতে ফ্রয়েড, সবই আমি পড়িয়াছি। কিছুদিন পূর্বেই বার্টনের একাধিক সহস্র রজনী তৃতীয়বাব পাঠ শেষ করিয়াছিলাম।" ('ভূতের গল্প', ১৯২)।

৮ অপর উল্লেখযোগ্য বই 'উড়ো খই' (১৯৩৫)।

৯ চীনযাত্রায় তাঁহাব জাহাজে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহাই কেদারনাথের প্রথম গদ্য গ্রন্থ 'চীনযাত্রী'র (১৯২৫) বিষয়।

১০ গোকুলচন্দ্রের ও কল্লোলেব দলের সম্বন্ধে ভূপতি চৌধুরীব প্রবন্ধ 'কল্লোলের দিন' (অজিত দত্ত সম্পাদিত 'দিগন্ত' প্রথম বর্ষ) মূল্যবান্ ও উপাদেয় উপাদান যোগাইয়াছে।

১১ যেমন 'শিশির' (আষাঢ় ১৩২৬), 'বাতায়ন' (মাঘ ১৩২৬), 'দুই সন্ধ্যা' (চৈত্র ১৩২৬)।

১২ কল্লোলে (প্রথম সংখ্যা হইতে) প্রথম প্রকাশিত।

১৩ 'রামগতি' (অগ্রহায়ণ ১৩৩০), 'পার্বতী' (ফাল্গুন ১৩৩০)।

১৪ প্রথম প্রকাশ প্রবাসী (১৩২৯)।

১৫ প্রথম গল্পগুলিও প্রধানত প্রবাসীতে (১৩২৯ ৩০ সাল) প্রথম বাহির হইয়াছিল।

১৬ 'অরুণ'।

১৬ক যেমন 'ভূতের গল্প' প্রথম প্রকাশ প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, 'রেবতী' নামে সংক্ষিপ্তভাবে 'রক্তকমল'এ সঙ্কলিত।

১৭ 'দার্জ্জিলিং এ, প্রথম প্রকাশ ভাবতবর্ষ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৮। 'সোনার হরিণে' সঙ্কলিত।

১৮ উপেক্ষিতা' (মেঘমল্লাব)।

১৯ 'উপেক্ষিতা' (প্রবাসী মাঘ ১৩২৮), 'উমাবাণী' (শ্রাবণ ১৩২৯), 'মৌরীফুল' (অগ্রহায়ণ ১৩৩০) ও 'পুঁইমাচা' (মাঘ ১৩৩১)। 'নব-বৃন্দাবন'এ (মেঘমল্লার) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ প্রভাব আছে।

২০ 'যাত্রা বদল' (১৩৪১ সাল)।

২১ প্রথম প্রকাশ বিচিত্রা ১৩৩৫-৩৬ সাল।

২২ প্রথম প্রকাশ প্রবাসী ১৩৩৬ ৩৮ সাল।

২৩ বাংলা রচনার কথা এখানে ধরিতেছি না।

২৩ক একটি—'ভিখারী (কথিকা)'—তুর্গেনিভের রচনার অনুবাদ (মাঘ সংখ্যা)।

২৪ 'বিচার' নামে 'দিন-মজুর'এ সঙ্কলিত (১৯৩২)।

২৫ প্রবাসী বৈশাখ ১৩৩০।

২৬ প্রথম বৎসরে শৈলজানন্দ কালি-কলমের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। আরও দুই জন সম্পাদক ছিলেন, মুরলীধর বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র।

২৭ প্রথম প্রকাশ কল্লোল জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০। 'বিজয়িনী' নামে দিন-মজুরে সঙ্কলিত।

২৮ প্রথম প্রকাশ কালি-কলম বৈশাখ ১৩৩৩। 'সাঁওতালি' নামে পুস্তিকাকারে (১৯৩১), বিবাহ' নামে সংক্ষিপ্ত আকাবে দিন-মজুবে সঙ্কলিত। সংক্ষেপ করায় গল্পটি উন্নত হয় নাই। পাত্রপাত্রীব নাম-পরিবর্তন সুসঙ্গত হয় নাই। বর্তমান আলোচনায় গল্পটির আদি রূপই গ্রহণ করিয়াছি।

২৯ 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' (প্রবাসী কার্তিক ১৩৩১)।

৩০ 'বধূবরণ'এ সঙ্কলিত।

৩১ প্রথম প্রকাশ বিজলী ফাল্গুন ১৩৩১--বৈশাখ ১৩৩২।

৩২ প্রবোধকুমার সান্যালেব সহযোগিতায় শৈলজানন্দ 'নন্দিতা' উপন্যাস লিখিয়াছেন (১৯৪৫)।

৩৩ 'রিয়ালিজম ও আইডিয়ালিজম বুঝাইতে প্রকৃতিকতা ও ভাবিকতা এই দুইটি কথা রবীন্দ্রনাথ একদা ব্যবহার করিয়াছিলেন (পরিচয় বৈশাখ ১৩৩০)।

৩৪ কৈশোরে জগদীশচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র দাসের অনুসরণে প্রেমের কবিতা লিখিতেন। কবিতা লেখা তিনি কখনও ছাড়েন নাই। 'অক্ষরা' (১৯৩২) তাঁহার কবিতার বই।

৩৫ পরিচয় বৈশাখ ১৩৪০ পৃ ৬২৪-৬২৫।

৩৬ ২৯ ফাল্গুন ১৩৩১। ১৩১৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা ভারতীতে 'মির্জার স্বপ্নদর্শন' (অনুবাদ) ইহার প্রথম গদ্য রচনা বলিয়া মনে হয়।

৩৭ পল্লী শ্মশান' (২০ কার্তিক ১৩৩২)।

৩৮ 'শরৎসাহিত্যে প্রেম' ১৩৩৪ সালে বাহির হইয়াছিল।

৩৯ 'অপৌরুষেয়' (১৯৩৯) ভূতের গল্পের বই। অন্যান্য—'অনুচ্চারিত', 'অতীশ দি গ্রেট' ও স্মৃতিকথা 'পাঁচমিশেলী' (১৯৩১)।

৪০ 'ভোরের আলো' (১৩৩৮), 'অপরূপ' (১৩৩৯), 'তনুতীর্থ' (১৩৪২), 'মদনভস্মের পর' (১৩৪৫), 'মিলন লগ্ন' (১৩৪৬) ইত্যাদি উপন্যাস।

৪১ 'মার্জ্জনা' (মাঘ ১৩৩০)।

৪২ বৈশাখ ১৩৪০।

৪৩ রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রেমেন্দ্রবাবুর 'পাঁক' বইটির সম্বন্ধেও খাটে।

৪৪ ফাল্গুন ১৩৪৪।

৪৫ কবিতার বই 'ত্রিপত্র' (১৩৩৩ সাল) ইহার প্রথম গ্রন্থ।

৪৬ 'গণদেবতা' পরে 'পঞ্চগ্রাম'এর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (১৯৪৪)।

৪৭ এই তিনটি উপন্যাস "ট্রিলজি", অর্থাৎ একই কাহিনীর অনুবৃত্তি, নাম 'নতুন ফসল'।

৪৮ যেমন ১৩২৯ সালের প্রবাসীতে 'পাখী' (ভাদ্র), 'চোখ গেল' (আশ্বিন), 'আত্মপর' (পৌষ) ইত্যাদি।

৪৯ 'বনফুলের কবিতা'য় (১৯২৯) সঙ্কলিত।

৪৯ক যতদূর জানি ইহার প্রথম গদ্য রচনা শরৎচন্দ্রের নারীর-মূল্যের প্রশংসাময় আলোচনা। ইহা ১৯৩১ অব্দের আশ্বিন সংখ্যা ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।

৫০ সরোজমোহন মিত্রের 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য' (১৯৭০) দ্রষ্টব্য।

৫১ মাণিকবাবু বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন।

৫২ ইহার গল্পের বই—'স্ত্রী' (১৩৩৩ সাল), 'জমা খরচ' (১৩৩৫ সাল), 'ধাঁধার উত্তর' (১৩৩৯ সাল), 'সকলি গরল ভেল' (১৩৫১ সাল), 'মিস মায়া বোর্ডিং হাউস' (১৩৪৮ সাল) ইত্যাদি। উপন্যাস—'পথের স্মৃতি' (১৩৩৭ সাল), 'মাটির স্বর্গ' (১৩৩৮ সাল), 'প্রিয়তমাসু' (১৩৩৪ সাল) ইত্যাদি। নাটক—'দিগজারি' (১৩৪০ সাল)।

৫৩ 'মায়ার খেলা' (১৯১৪), 'স্বর্ণমরু' (১৯১৭), 'মদনমোহন' (১৯১৯) ও 'বিজয়িনী' (১৯২৪)।

৫৪ 'জলপ্লাবন' (১৯২৬), 'হালদার বাড়ী' (১৯১৭), 'দেশের বড়দা' (১৯১৮), 'জাতিরক্ষা' (১৯৪০ ; গল্পের বই) ইত্যাদি।

৫৫ গল্পের বই—'মীর পরিবার' (১৯১৭) ও 'তরুণ' (১৯৪৯)। উপন্যাস—'নদীবক্ষে' (১৯১৮)।

৫৬ ত্রিরিশের বেশি গ্রন্থের রচয়িতা। যেমন, 'স্বপ্নপরিণীতা' (১৯২০), 'গৃহদেবী' (১৯২০), 'সীতার ভাগ্য' (১৯২০), 'দিশাহারা' (১৯২১), 'নূতন বধূ' (১৯২২), 'প্রেমময়ী' (১৯২৩), 'প্রণয়মিলন' (১৯২৪) ইত্যাদি।

৫৭ 'গৃহকল্যাণী' (১৯২০), 'ঝড়ের আলো' (১৯২৪), 'বুকের আগুন' (১৯৩১), 'ঘূর্ণি' (১৯৩২)।

৫৮ 'আগাছা' (১৯৩১), 'দিদির বর' (১৯৩২) ইত্যাদি।

৫৯ 'নাচওয়ালী' (১৯২০), 'দিগভ্রষ্ট' (১৯৩৫), 'সাগরিকার নির্যাতন' (১৯৩৮), 'নিশিকান্তের প্রতিশোধ' (১৯৪০) ইত্যাদি।

৬০ গল্পের বই—'আসমানের ফুল' (১৯২০), 'কটাক্ষ' (১৯২২), 'অতি বোগাস' (১৯৩৪), 'সখের শ্রমিক' (১৯৩৫) ইত্যাদি। উপন্যাস—'হিসাবনিকাশ' (১৯১৮), 'গণ্ডগোল' (১৯৩৯) ইত্যাদি।

৬১ 'প্রদীপ ও চেরাগ' (১৯১৭)।

৬২ 'স্পানোয়ারা' ও 'প্রেমের সমাধি'।

৬৩ প্রায় পঞ্চাশখানি বইয়ের লেখক। যেমন 'সাহসী' (১৯২৩, দ্বি-স ১৯২৫), 'শিথিল কবরী'।

৬৪ গল্পের বই—'বুকের ভাষা' (১৯৩০, দ্বি-স ১৯৩৪), 'বৈরাগীর চর' (১৯৩৫), 'চক্রপাক' (১৯৩৬)। উপন্যাস—'মৃগয়া' (১৯৩৪), 'ভাঙনডাঙা' (১৯৩৫), 'ঘরমুহানী' (১৯৩৫), 'কোএডুকেশন' (১৯৩৫), 'সাতভাল' (১৯৩৫), 'ঝড়' (১৯৩৬), 'তপ ও তাপ'। ইহার কবিতার আলোচনা আগে করিয়াছি।

৬৫ ত্রিরিশখানিরও বেশি বই লিখিয়াছিলেন। তাহার প্রায় সবই ১৯১৪ থেকে ১৯২১ মধ্যে লেখা। যেমন, 'দেশের মেয়ে' (১৯১৪), 'কালের কোলে' (১৯১৭) ইত্যাদি।

৬৬ 'ধ্রুব' (১৯২৩) ও 'নবঘন' (১৯২৭)।

৬৭ 'অন্ধকারের অন্তরেতে' (১৯২৫, দ্বি-স ১৯৩৪), 'জীবনের যাত্রাপথে' (১৯৩০), 'হে বন্ধু বিদায়' (১৯৩৪), 'বিরহের অন্তরালে' (১৯৩৪), 'মন নিয়ে খেলা' (১৯৩৫), 'যৌবনের সিন্ধুতটে' (১৯৩৭), 'কালের কপোলতলে' (১৯৩৮), 'দুরন্ত যৌবন' (১৯৩৯), 'নূতন পথের যাত্রী' (১৯৪০) ইত্যাদি।

৬৮ অন্তত দশখানা বই লিখিয়াছেন। যেমন, 'বঙ্গবধূ' (১৯২৩), 'বিয়ের বাঁধন' (১৯২৩), 'নারীর দাবী' (১৯২৫), 'পল্লীপ্রেম' (১৯২৬) ইত্যাদি।

৬৯ 'অনাগত' (১৯২৭), 'বিদ্যুৎলেখা' (১৯৩০), 'লোকারণ্য' (১৯৩১) ইত্যাদি।

৭০ 'বামুন-বাগদী' (১৯২৫), 'রক্তের টান' (১৯৩১), 'পিপাসা' (১৯৩৬), 'কামিখ্যের ঠাকুর' (১৯৩৭, গল্পের বই)।

৭১ 'অস্তাচল' (১৯৩০), 'এগারই ফাল্গুন' (১৯৩৪), 'মণিকুণ্ডল' (১৯৩৬, গল্পের বই) ইত্যাদি। 'মাটির পরশ' (১৯৩৮, গল্পের বই)। পরে ইনি দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছেন,—'পলাশী' (১৯৪৩) ও 'অঙ্গনা' (১৯৪৪)।

৭২ 'মাধবীলতা' (১৯২৮), 'ভোরের আলো' (১৯৩১), 'অপরূপ' (১৯৩২), 'মিলনলগ্ন' (১৯৩৯) ইত্যাদি।

৭৩ প্রায় বিশখানা বই লিখিয়াছেন। যেমন, 'অম্লমধুর' (১৯৩১, গল্পের বই), 'রতন দীঘির জমিদার বধূ' (১৯৩৬), 'প্রেম ও পৃথিবী' (১৯৪১) ইত্যাদি।

৭৪ 'যোগবিয়োগ (১৯৩৩), 'এই ত জীবন' (১৯৩৭)।

৭৫ উপন্যাস—'যে শাখে ফুল ফোটে না' (১৯৩৪), 'গোধূলিবাগ' (১৯৩৫), 'সর্বমঙ্গলা বিদ্যাপীঠ' (১৯৪৫) ইত্যাদি। গল্পের বই—'তৃষ্ণা' (১৯৩৪), 'যোগিনীর মাঠ' (১৯৪১), 'রহস্যময়ী' (১৯৪৫) 'কৃষ্ণকলি' (১৯৫৬) ইত্যাদি।

৭৬ 'বিস্ময' (১৯৩৫), 'কলঙ্কিনীব খাল' (১৯৪১), 'সবিনয় নিবেদন' (১৯৪৫, গল্পের বই), 'বেদিয়া ছন্দ' (১৯৪৫, ঐ)।

৭৭ সবই গল্পের বই। 'ইহাই নিয়ম' (১৯৩২), 'আঁধারে রহ গো', 'বন্দিনী সুভদ্রা' (১৯৩৭), 'নবনবরূপে' (১৯৩৯), 'স্বপ্ন দেখা মেয়ে' (১৯৪২)।

৭৮ প্রায় পনের ষোলখানা বই লিখিয়াছেন। যেমন, 'ছাত্রী' (১৯৩৫), 'নাবী প্রগতি' (১৯৩৯) ইত্যাদি।

৭৯ ইনি কবিতাও লিখিতেন (পূর্বে দ্রষ্টব্য)। ইহার রচিত গল্পের বই এই তিনটি,—'দুলালী' 'ভুলের ফুল' (১৯৩২) ও 'রসায়ন' (১৯৩২)।

৮০ ইহার কবিতার কথা আগে বলিয়াছি। গল্পের বই—'আজ এবং আগামী কাল' (১৯২৯), 'মেয়েদেব মন (১৯৪০) ইত্যাদি। উপন্যাস—'প্রেমেব পথ ঘোরালো' (১৯৪৬) ইত্যাদি।

৮১ 'মানবের শত্রু নারী' (১৯৩৪), 'বন্দিনী' (১৯৩৫), 'নব মেঘদূত' (১৯৩৬), 'নটি' (১৯৩৭), 'পদ্মা প্রমত্তা নদী' (১৯৩৯), 'বিগত বসন্ত' (১৯৪০, গল্পের বই) ইত্যাদি। ইহার নাট্যরচনার উল্লেখ আগে দ্রষ্টব্য।

৮২ একটি মাত্র বই—উপন্যাস, 'মানুষের মন' (১৯৩৭)।

৮৩ 'ঝড়ের পরে' (১৯২৯), 'সব মেয়েই সমান' (১৯৩৩) ও 'তচনচ' (১৯৩০)।

৮৪ গল্পের বই—'ছিন্ন পাপড়ি' (১৯৩৩), 'অসমাপ্ত' (১৯৩৮), 'তারা দুজন' (১৯৪০), 'তারা একদিন ভালবেসেছিল' (১৯৪০)। উপন্যাস—'সাগর দোলায় ঢেউ' (১৯৩৫), 'হে আত্মবিস্মৃত' (১৯৪২), 'নিঃসহ যৌবন' (১৯৪৫) ইত্যাদি।

৮৫ 'একদা' (১৯৩৪), 'শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু' (১৯৪১) ইত্যাদি।

৮৬ 'অদৃশ্য সংকেত' (১৯৩৪), 'দু নৌকায়' (১৯৩৬), 'প্রেম ও পাদুকা' (১৯৩৬, গল্পের বই), 'ছন্দপতন' (১৯৩৮, ঐ) ইত্যাদি।

৮৭ 'অমিতার প্রেম' (১৯৩৪), 'অভিমান' (১৯৩৪, গল্পের বই), 'অন্তর্যামী' (১৯৩৫, ঐ), 'মধুচন্দ্রিকা' (গল্পেব বই), 'দুইনারী' (১৯৩৪), 'কলেজেব মেয়ে' (১৯৩৯), 'বিয়ের পবে' (১৯৩৫), 'সমর্পণ (১৯৩৫), 'সহবের মোহ' (১৯৩৬), 'একাকী' (১৯৪০), 'ক্রন্দসী' (১৯৪০), 'বাস্তব ও কল্পনা' (১৯৪২) ইত্যাদি। নাটক—'সুরের উৎস' (প্রবাসী ১৩৫৪)। প্রবন্ধের বই—'শমী ও দীপ্তি' (১৯৩৯)।

৮৮ 'স্পর্শের প্রভাব' (১৯৩৪), 'চিরন্তনীর জয়' (১৯৩৬) ইত্যাদি।

৮৯ 'কবে তুমি আসবে' (১৯৩৮, দ্বি-স ১৯৪৮)।

৯০ 'আনন্দবাজার' (১৯৩৬, সরস গল্পচিত্র)।

৯১ 'বিলাত দেশটা মাটির' (১৯৩৬, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা), 'রক্তগোলাপ' 'ছোট গল্প' (১৯৪৪ পুস্তিকা)। সবই গল্পের বই।

৯২ 'পুষ্পচয়ন' (১৯৩৭), 'বিনিময়' (১৯৪০) ইত্যাদি।

৯৩ 'সূর্যোদয়' (১৯৩৮, গল্পের বই), 'রাহু' (১৯৪৪), ইত্যাদি। নাটক—'অধিনায়ক' (১৯৪১)।

৯৪ গল্পের বই—'শ্মশানে বসন্ত' (১৯৩৯), 'দ্বিতীয়া' (১৯৪৩), 'পারুলদি' (১৯৫০)।

৯৫ পঁচিশ-তিরিশখানি বইয়ের লেখক। যেমন, 'হিঙ্গুলনদীর কূলে' (১৯৩৫, কবিতা পুস্তিকা) 'কাশবনেব কন্যা' (১৯৩৭, ঐ), 'তুই মম জীবন' (১৯৩৯, উপন্যাস), 'ধূলারাঙা পথ' ইত্যাদি।

৯৬ 'একদা' (১৯৩৯), 'পঞ্চশরের পথ' (১৯৪৪), 'ভাঙন' (১৯৪৭), 'ধূলিকণা' (১৯৪৮, গল্পের বই), 'তেরশ পঞ্চাশ' (১৯৪৫, দ্বি-স ১৯৪৬), 'অনাদিন' (১৯৫০), 'আর একদিন' (১৯৫১) ইত্যাদি।

৯৭ 'জল আর আগুন' (১৯৩৯, গল্পের বই), 'হাফ-হলিডে' (১৯৪১) ইত্যাদি।

৯৮ ছদ্মনাম "ভাস্কর"। গণিতবিদ্ অধ্যাপক ইনি, সরস প্রবন্ধও অনেক লিখিয়াছেন। গল্পের বই—'লেখা'

(১৯৪০), 'মজলিস' (১৯৪১), 'শুভশ্রী' (১৯৪১) ইত্যাদি।

৯৯ 'স্বর্গ হইতে বিদায়' (১৯৪০), 'নির্জন গৃহকোণে' (১৯৪১, গল্পের বই), 'একাকিনী নায়িকা' (১৯৪৫), 'কালো রাত (১৯৪৬) ইত্যাদি।

১০০ 'ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া' (১৯৩৪, গল্পের বই), 'যে ঘরে হল না খেলা' (১৯৩৯)।

১০১ 'প্রিয়া ও মানসী' (১৯৩৯), 'প্রিয়া ও জননী' (১৯৪৫), 'ধূসর ধরণী' (১৯৪১) ইত্যাদি।

১০২ 'প্রত্যাখ্যান' (১৯৪৫)।

১০৩ 'মনোরমা' (১৯৩৯), 'সুধার প্রেম' (১৯৪০), 'সরোজিনী' (১৯৪২), 'সমাপ্তি' (১৯৪৯) ইত্যাদি।

১০৪ 'ডেটিনিউ' (১৯৩১), 'বন্দীর প্রশ্ন' (১৯৪৭)।

১০৫ 'পদ্মনাভ' (১৯৪১, গল্পের বই), 'তমসা' (১৯৪৪, ঐ), 'উদয়ের পথে' (১৯৪৪), 'সমাপ্তি' (১৯৪৯) ইত্যাদি।

১০৬ 'ডায়ালেকটিক' (১৯৪১, গল্পের বই)।

১০৭ 'ফসল' (১৯৪১, গল্পের বই), 'বৃত্ত' (১৯৪২), 'দিনান্ত' (১৯৪৩), 'কষ্টে দেবায়' (১৯৪৪), 'মরা মাটি' (১৯৪২, দ্বি-স ১৯৪৮), 'রাত্রি' (১৯৪৫), 'ঋণ' (১৯৪৩, গল্পের বই), 'নতুন দিনের কাহিনী' (১৯৪৬, ঐ) ইত্যাদি।

১০৮ 'মানুষের মন' (১৯৪১) ইত্যাদি।

১০৯ 'মনে ছিল আশা' (১৯৪১), 'রজনীগন্ধা' (১৯৪১, গল্পের বই), 'বহুবিচিত্র' (১৯৪৫), 'মিলনান্ত' (১৯৪৯) ইত্যাদি।

১১০ 'সুদূরের পিয়াসী' (১৯৪১), 'প্রহরী' (১৯৪১, গল্পের বই), 'বাঁকা স্রোত' (১৯৪৩), 'সর্বংসহা' (১৯৪৫, দ্বি-স ১৯৪৬)।

১১১ 'পরশুরামের কুঠার' (১৯৪২, গল্পের বই), 'ফসিল' (১৯৪৪, ঐ), 'শুক্লাভিসার' (১৯৫৪, ঐ) ইত্যাদি।

১১২ গল্পের বই, 'সপ্তপর্ণ' (১৯১৭)।

১১৩ 'অবশ্যম্ভাবী' (১৯৩৯) ইত্যাদির লেখক।

১১৪ 'বাসর জ্যোৎস্না' (১৯৩৬) প্রভৃতি ছয় সাতখানি উপন্যাসের লেখক।

১১৫ 'সবার সাথে' (১৯৩৯) ইত্যাদির লেখক।

১১৬ 'বাস্তবের দু পৃষ্ঠা' (১৯৩৪) ইত্যাদির লেখক।

১১৭ 'কার্টুন (১৯৩৯) ইত্যাদির লেখক।

১১৮ রাজশেখর বসুর অনুসরণে লঘুরসের গল্পের বই 'চঞ্চরীকা'র (১৯৩১) লেখক।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
চতুর্থ দশকে কবিতা

১ উপক্রম

রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা ও মার্কসপন্থার নীতি আগে কোন কোন চিন্তাশীল লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যত দিন যাইতে লাগিল দেশে পোলিটিক্যাল অবস্থার অনিশ্চয়তা বাড়িয়াই চলিল। তাই মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণে কমিউনিস্ট ব্যবস্থার প্রতি তরুণ লেখকদের কেহ কেহ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া ইংরেজের মিত্র হইল, তাই যুদ্ধের সময়ে কমিউনিজম্-প্রিয়তার একটা বাজারদর দাঁড়াইয়া গেল। চতুর্থ দশকের সাহিত্যের আলোচনায় এই কথা প্রথমে স্মর্তব্য।

প্রগতিবাদীদের উগ্রতা প্রায় ক্ষান্ত হইয়া আসিয়াছে। এখন নতুন করিয়া ঢালিয়া সাজিয়া এক কাব্যশিল্প প্রবর্তনের দিকে ঝোঁক পড়িল কয়েকজন ইংরেজীনবীশ লেখকের। ইঁহাদের একজন, রবীন্দ্রনাথের একদা স্নেহভাজন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'পরিচয়' নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন (১৯৩১)। উদ্দেশ্য— বাঙ্গালী পাঠকের কাছে নূতন ইংরেজী কবিতার এবং নূতন ইংরেজী কবিদের গুরুস্থানীয় ফরাসী ও জার্মান কবিদের রচনার পরিচয় দেওয়া এবং নূতন নূতন বিদেশি গ্রন্থের সংবাদ টাটকা টাটকা যোগানো। (বলা বাহুল্য এই পাঠকের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল।) সেই সঙ্গে নূতন ইংরেজী কবিতার অনুকরণে নূতন বাঙ্গালা কবিতার পরিচয় দেওয়াও আর এক মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের সাময়িক-পত্রের ইতিহাসে 'পরিচয়' পত্রিকার স্থান সবুজপত্রের পরেই। তবুও সবুজপত্রের আদর্শের সঙ্গে পরিচয়ের আদর্শের তফাৎ অনেকখানি। সবুজপত্র চাহিয়াছিল চিন্তাশক্তি জাগাইতে, বাক্‌শিল্পকে পরিমিত ও কার্যোপযুক্ত করিতে, অর্থাৎ যেন দেশীয় সাহিত্যশিল্পকে সমুন্নত এবং কালোপযুক্ত করিতে। পরিচয় চাহিল বিদেশি চশমা চোখে লাগাইয়া আমাদের ক্ষীণায়মান (—অবশ্য উদ্যোক্তাদের মতে—) সাহিত্যশিল্পদৃষ্টিকে প্রসারিত করিতে।

তবে পরিচয়ে আর যাই থাক প্রবল প্রোপাগ্যাণ্ডা ছিল না এবং যাহাকে বলে প্রকাশ্য

দলাদলি তাহাও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ হইতে কনিষ্ঠতম লেখক পর্যন্ত সকলেরই জন্য পরিচয়ের পাতা পাড়া থাকিত। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্যেই পরিচয়ের পরিসর প্রশস্ত হইয়াছিল।

পরিচয়ে অনেকগুলি শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এমন প্রবীণ নূতন লেখকদের মধ্যে প্রথমেই মনে আসে চারুচন্দ্র দত্তের নাম।[১] পরিচয়ে (১৩৩৮ সাল) 'পুরানো কথা' নামে চারুচন্দ্রের স্মৃতিকথা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। চারুচন্দ্রও একেবারে, মধুসূদনেব ভাষায় pucca fist লইয়া দেখা দিয়াছিলেন।

নূতন বিশিষ্ট লেখকদের অনেকেই কবিতার পথ ধরিয়াছিলেন। এ কবিতার পথ নূতন। ইঁহাদের লেখার আলোচনার পূর্বে ইঁহাদের প্রেরণাব মূল উৎস যে "আধুনিক" ইংরেজী (ও ফবাসী) কবিতা তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

"আধুনিক" ইংরেজী কবিতা প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের বস্তু। তবে ইহার সূত্রপাত অনেক আগেই হইযাছিল। বিজ্ঞানচিন্তা ইউরোপীয় সভ্য মানুষের যুক্তিমননেব যে পথ নির্দেশ করিল তাহাতে অধ্যাত্মচিন্তার স্থান দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল এবং জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ কবিতে লাগিল যন্ত্রস্রষ্টা বিজ্ঞানী অথবা সাহিত্যস্রষ্টা মনীষী। পুরানো কবিদের কাছে মানবেব (humanity) যে মর্যাদা ছিল "আধুনিক" কবিব কাছে এখন "ইতর" বা সাধাবণ লোক (man in the street) সেই মর্যাদা পাইতে লাগিল। আর বিশ্বপ্রকৃতির স্থান লইল শহবেব জনাকীর্ণ বাস্তা। আধুনিক কবি-সাহিত্যিকের সৃষ্টি-চিন্তা এই ত্রয়ী-বিশ্বে পবিসীমিত—স্বয়ং, 'ইতর' লোক এবং জনাকীর্ণ শহরবাজার।

বিজ্ঞানবিদ্যাব অপ্রতিহত প্রভাব ছাড়া আরও দুইটি উৎস আছে যুদ্ধোত্তর ইংরেজী কবিতাব মূলে। একটি হইল মনোবিকলন-পন্থার (psycho-analysis) অনির্বিচার অনুসবণ, অপবটি হইল যুদ্ধোত্তর কালে মানুষেব জীবনযাত্রায় সঙ্কট ও জীবনভাবনায় বিপর্যয়। মনোবিকলন আশ্রয় করিলে প্রচলিত নীতি আদর্শে আস্থা বাখা যায় না। সাহিত্যিকও তাই পুথিগত আদর্শে আস্থা হাবাইয়া বাহিরেব উপাদান গ্রাহ্য না করিয়া মনেব আবর্তে জাল ফেলিতে শুরু কবিলেন। তাঁহাবা বুঝিলেন সাহিত্যেব পরিচিত সরণি পরিত্যাগ না করিলে এদিকে কিছু পাওয়া অসম্ভব। যুদ্ধের পর দেখা গেল অভিজাত-জীবনেব ভঙ্গুরতা। ধনীরা ক্ষয়িষ্ণু, মধ্যবিত্তেবা অসচ্ছল ও অস্বচ্ছন্দ। ধর্মের আদর্শ চুবমার, সভ্যতার পালিশ অনুজ্জ্বল। সর্বোপরি রাশিয়ায় বোলশেভিক বিদ্রোহ। এইসব কারণ মিলিযা ইউবোপীয় শিক্ষিত মানুষের সুদৃঢ় সমাজ আস্থায় আঘাত হানিতে লাগিল।

আধুনিক ইউবোপীয় কবিতায় সাহিত্যচিন্তার এই যে মৌলিক দৃক্‌পরিবর্তন সংঘটিত হইল তাহা আকস্মিক নয়। ইহার আয়োজন শুরু হইয়াছিল আগে হইতেই। কবি ম্যালার্মেকে (Mallarme) এই সাহিত্যিকদের আদিগুরু এবং কবি-ঔপন্যাসিক প্রুস্তকে (Proust) এই সাহিত্যিকদের মহাগুরু বলা হয়। এই দলে ইংবেজ কবি ডি এইচ লরেন্‌স্‌কেও ধরা যায়। তাহার পর আমেরিকান এজরা পাউন্ড। সর্বশেষে টি এস্‌ এলিয়ট, জেমস্‌ জয়েস, উইন্ডহ্যাম্‌ লুইস ইত্যাদি।

যুদ্ধোত্তর "নবীন" কবিতার প্রথম বিশিষ্টতম রচনা এলিয়টের *The Waste Land*

(১৯২২)। এই কবিতায় এলিয়ট নূতন দৃক্‌ভঙ্গি লইয়া নূতন টেক্‌নিক অবলম্বন করিলেন। এলিয়টের মতে কাব্যকৃতিতে প্রবৃত্ত হইতে গেলে ঐতিহাসিক অনুভূতি ও স্মৃতি থাকা আবশ্যক। শিক্ষাও যথাসম্ভব গভীর ও ব্যাপক হওয়া চাই। প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত সাহিত্যকে সমকালীন ও সমভূমিক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। এইসব কারণে নূতন কবিতা লেখা সাধারণ শিক্ষিতের এবং তরুণবয়স্কের পক্ষে দুর্ঘট। নূতন কবিতার সমজদার পাঠকেরও এইরকম যোগ্যতা থাকা চাই নতুবা সে কবিতার আবেদন ব্যর্থ হইবে। সুতরাং নূতন কবিতার পাঠকেব সংখ্যাও সেই অনুপাতে কম হইতে বাধ্য।

এই নূতনতর কবিতাকারেরা ধরিয়া লইলেন যে তাঁহাদের কবিতার উদ্দেশ্য কবির ইমোশনের অভিব্যক্তির দ্বারা ততটা নয় যতটা অননুভূতপূর্ব নূতন ইমোশনেব উদবোধনের দ্বারা রস সৃষ্টি করা। পরিচিত কবিতার বহু-অনুসৃত সরণিতে নূতন ইমোশনের—যে ইমোশনের পথ অননুভূত ও অভাবিত—তাহার ইঙ্গিত জাগানো সম্ভব নয়। বহুলালিত কাব্যশিল্পে পুবাতন ব্যঞ্জনার রেশ থাকিয়াই যায়। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক স্থিতিভূমিহীন আধুনিক সভ্যমানবের কথা ভাবিলে কবিব মনে স্বাভাবিকভাবেই তখন জঞ্জালভূমিতে পরিত্যক্ত খালি টিনের কৌটাব কথা মনে আসিবে। এ নবীন অনুভূতি পরিচিত ভাষায় "অন্তঃসারশূন্য, শূন্যগর্ভ" বলিলে জাগিবে না। তাই কবি বলিলেন—"ফাঁপা মানুষ" (The Hollow Men)। অর্থাৎ, ভিতবে ধারকতা নাই, অথচ বাহিরের সাজপোষাক ঠিক আছে এবং আঘাত করিলে বাজেও। নূতন কবি চাহিলেন কাব্যশিল্পে এমন বাক্‌বীতি এমন অলঙ্কার ব্যবহার করিতে যাহার সর্বস্বীকৃত অর্থ ও রূপ গ্রহণীয় নয় কিন্তু যাহা বীজগণিতের অক্ষরসংখ্যার মতো কবির উদ্দিষ্ট বিশেষ বাঞ্জনা দিযা বিশেষ অত্যন্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ইমোশন নির্ব্যক্তিকভাবে জাগাইবে। এলিয়টের মতে নূতন কবিতা ইমোশনের ঝরনা খুলিয়া দেয় না ইমোশন হইতে তফাৎ রাখে, নূতন কবিতায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নাই, আছে ব্যক্তিত্ব হইতে অপসরণ।

নূতন কবিতার এক বিশেষ টেক্‌নিক হইল কবিতায় বিভিন্ন ভাবরূপচিত্রগুলি (images) অখণ্ড একটি চিত্রে মিলাইয়া না দিযা তাহা অসংলগ্নভাবে জুড়িয়া দেওয়া। এইজন্য এই ধরনের কবিদের বলা হয় 'ইমেজিস্ট'। অসংশ্লিষ্ট ভাবরূপগুলি পাঠকের মনে পর্যাযবদ্ধ ও শ্লথসংশ্লিষ্ট হইয়া অথবা বিশ্লিষ্ট থাকিয়াই, ইউরোপীয সঙ্গীতের সিম্‌ফনির মতো, অনির্বচনীয অখণ্ড রস সৃষ্টি করিবে। স্থূল উপমা দিয়া বলিতে গেলে ইমেজিস্ট কবি যেন সেই ময়রা যে ছানা চিনি ভিয়ান না করিয়া ছানা ও চিনি একসঙ্গে রাখিয়া অভিনব কাঁচাগোল্লা পরিবেশন করে। ভোক্তার রসনায় এ সন্দেশের স্বাদ নিশ্চয়ই ভিয়ান করা সন্দেশ হইতে একেবারে অন্যরকম। আরও একটি উপমা দিতে পারা যায়। ইমেজিস্ট কবিতা যেন jigsaw puzzle জোড়াতালি ছবি-সমস্যা এবং সে সমস্যার সমাধান কবির মনে। পাঠক যদি কবির মনে মন মিলাইয়া বুঝিতে পারেন তবেই তিনি সে কবিতাব রসজ্ঞ।

ইংরেজীতে প্রথম এবং প্রধান ইমেজিস্ট কবি হইতেছেন (দুইজনেই আসলে আমেরিকান) এজরা পাউন্ড (Ezra Loomis Pound, ১৮৮৫-১৯৭২) ও টি এস এলিয়ট (Thomas Stearns Eliot, ১৮৮৮-১৯৬৫)। ইঁহাদের কাব্যশিল্পের মূলসূত্র হইল

তিনটি। প্রথমত, কাব্যের বিষয় ও বস্তু যাহাই হোক তাহাকে কবিমানসের ভাবরসে না জারাইয়া অথবা কবিপ্রসিদ্ধির (কন্‌ভেন্‌সনের) পোষাক না পরাইয়া সোজাসুজি ব্যক্ত অথবা প্রতিফলিত করিতে হইবে। অর্থাৎ কবির অন্তরের অবোধপূর্ব জ্ঞাতসারতা বাহিরের অনুভূতির উত্তেজনায় যে প্রতীকচিত্ররূপ পায় তাহাই অব্যাপন্নভাবে যথাযথ পাঠকের মনে জাগাইয়া দেওয়াই নূতন কবিতার কাজ। দ্বিতীয়ত, ভাবরূপচিত্রের প্রতিফলন যাহাতে যথাযথ হইতে পারে সেইজন্য শব্দের ব্যবহারে সংযত ও সতর্ক হইতে হইবে। অতএব ইমেজিস্ট কবিকে খুব সন্তর্পণে মুখের ও লেখার ভাষা হইতে শব্দ নির্বাচন করিতে হইবে এবং সে শব্দ এমনভাবে বাছিয়া লইতে হইবে যাহাতে কবি যাহা বলিতে চাহেন তাহার অতিরিক্ত কিছুমাত্র না বোঝায়। এইজন্য প্রচলিত কাব্যের শব্দ ও প্রয়োগ কবিকে বর্জন করিতে হইবে কেননা সে সব শব্দ ও প্রয়োগ বহু কবির দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া অনেক রকম তাৎপর্য (nuance) আত্মসাৎ করিয়াছে। ছন্দোমাধুর্যের মোহও এই কারণে পরিত্যাজ্য। আমাদের কান গতানুগতিক ছন্দে অভ্যস্ত বলিয়া সেই ছন্দের রেশ কবির ঈপ্সিত অর্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া দেয়। তৃতীয়ত, সুললিত সুছাঁদ ছন্দ ছাড়িয়া দিয়া অসম ও তালকাটা অছন্দ অবলম্বন করিতে হইবে। ইমেজিস্ট কবির ছন্দের মান মাত্রা অথবা অক্ষর ধরিয়া নয়, বাক্যাংশ ধরিয়া। অর্থাৎ তাহা গদ্যের ছন্দের সঙ্গে তুলনীয়।

অতএব নূতন কবিতা সকলের জন্য নয়, অধিকাংশের জন্যও নয়, অতি অল্পসংখ্যকের জন্য। নূতন কবিরাও বোধ করি তাহাই চান। এ কবিতা টেক্‌নিকাল সুতরাং সে কবিতার টেক্‌নিক বোঝে এমন পাঠকের সংখ্যাও অল্প হইতে বাধ্য। এমন কবিতা-কোডের চাবি যাঁহার কাছে আছে তিনি ছাড়া কেহই মর্মজ্ঞ নন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাবি কবির হাতেই রহিয়া যায়।

নূতন ইংরেজী কবিতার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।[২]

> আধুনিক ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যে আমার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত। আমার এ কথার যদি কোনো ব্যাপক মূল্য থাকে তবে এই প্রমাণ হবে যে এই সাহিত্যের অন্য নানা গুণ থাক্‌তে পারে, কিন্তু একটা গুণের অভাব আছে যাকে বলা যায় সার্বভৌমিকতা, যাতে ক'রে বিদেশ থেকে আমিও এ'কে অকুণ্ঠিতচিত্তে মেনে নিতে পারি। ইংরেজের প্রাক্তন সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার থেকে কেবল যে রস পেয়েছি তা নয়, জীবনের যাত্রাপথে আলো পেয়েছি। তার প্রভাব আজও তো মন থেকে দূর হয় নি। আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করছি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার ব'লে ঠেকে, বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি, তার মধ্যে এমন উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্ছে না, ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ ক'রে নিয়েছে, যার কাছে এমন বাণী পাইনে যা শুনে মনে করিতে পারি যেন আমারি বাণী পাওয়া গেল চিরকালীন দৈববাণী রূপে। দুই একটি ব্যতিক্রম যে নেই তা বল্‌লে অন্যায় হবে। ... তাই বারে বারে এই কথা আমার মনে হয়েছে বর্তমান ইংরেজি কাব্য উদ্ধতভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাবে নূতন ; যে তরুণের মন কালাপাহাড়ি সে এর নব্যতার মদিররসে মত্ত, কিন্তু এই নব্যতাই এর ক্ষণিকতার লক্ষণ।

নূতন কবিতায় ক্ষণিকতার লক্ষণ অত্যন্ত পরিস্ফুট। এ কবিতার সমর্থকেরাও ইহাকে transitional poetry বলিয়া স্বীকার করেন ॥

২ জীবনানন্দ দাশ

নূতন ইংরেজী কবিতার অনুসরণে যাঁহারা বাঙ্গালায় কবিতাকর্ম অবলম্বন করিলেন তাঁহাদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) প্রধান। জীবনানন্দের শিক্ষালাভ প্রথমে বরিশালে শেষে কলিকাতায়। ইংরেজীতে এম-এ পাস করিয়া জীবনানন্দ কলিকাতার একটি বড় বেসরকারি কলেজে (সিটি কলেজ) অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৯২২)। কলেজ কর্তৃপক্ষের মতে তাঁহার কোন কোন কবিতার ভাব সুরুচির গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করার অজুহাতে তাঁহার কর্মচ্যুতি হয় (১৯২৮)। অতঃপর দিল্লীতে এক বছর এবং বরিশালে কয়েক বছর (১৯৩৪-৪৮) অধ্যাপনা করেন। তাহার পর কলিকাতায় চলিয়া আসেন। এক বছর খড়্গপুর কলেজে (১৯৫১-৫২), কিছুদিন বড়িশা কলেজে (১৯৫৩), তাহার পর মৃত্যুকাল পর্যন্ত হাওড়া গার্লস কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপনা করেন।

জীবনানন্দ ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মঘরের ছেলে। তাঁহার পিতামাতার প্রভাব তাঁহার জীবনের গতি অনেক অংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। মাতা কুসুমকুমারীর কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল। তাঁহার কয়েকটি কবিতা কলিকাতার 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় এবং বরিশালের 'ব্রহ্মবাদী'তে বাহির হইয়াছিল। সাহিত্যপ্রীতি এবং কবিতারচনার প্রেরণা প্রথমত তিনি মায়ের কাছেই পাইয়াছিলেন। কখন হইতে জীবনানন্দ কবিতা লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন তাহা জানি না তবে ১৯২৫ হইতে তাঁহার কবিতা প্রবাসী, বঙ্গবাণী, কল্লোল, কালি-কলম, বিজলী, ধূপছায়া, প্রগতি প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইতে থাকে।'[৩] ১৯২৭ সালে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' বাহির হয়। ইহাতে পঁয়ত্রিশটি কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল। ঝরা-পালকের অধিকাংশ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অস্বীকার করিবার কোন প্রয়াস নাই, এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ও কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব অনেক কবিতায় অত্যন্ত প্রকট। কিছু উদাহরণ দিই।

> ওরে কিশোর, বেঘোর ঘুমের বেহুঁস হাওয়া ঠেলে'
> পাত্‌লা পাখা দিলি রে তোর দূর-দুরাশায় মেলে'!
> ফেনার বৌয়ের নোন্‌তা মৌয়ের—মদের গেলাস লুটে'
> ভোর সাগরের শরাবখানায়—মুসল্লাতে জুটে'
> হিমের ঘুণে বেড়াস্ খুনের আগুনদানা জ্বেলে![৪]

> মরুভূর প্রেত চমকিয়া তার চক্ষের পানে চায়,—
> সুরার তালাসে চুমুক দিল কে গরলের পেয়ালায়![৫]

> এ কোন্ বাঁশী সার্সি বাজায়
> এ কোন হাওয়া ফর্দা
> দেয় কাঁপিয়ে পর্দা![৬]

> সে কোন ছুড়ির চুড়ি আকাশ-শুড়িখানায় বাজে![৭]

ইন্দ্রপ্রস্থ ভেঙেছি আমরা,—আর্যাবর্ত ভাঙি'
গড়েছি নিখিল নতুন ভারত নতুন স্বপনে রাঙি' ।
নবীন প্রাণের সাড়া
আকাশে তুলিয়া ছুটিছে মুক্ত যুক্তবেণীর ধারা ।[৮]

ঝরা-পালকের একটি কবিতায়[৯] (নাম 'পলাতক') দ্বিতীয়-তৃতীয় দশাব্দীসুলভ পল্লী-রোমান্‌সের—অর্থাৎ করুণানিধান-যতীন্দ্রমোহন-কুমুদরঞ্জন-কালিদাস-শরৎচন্দ্র প্রভৃতি কবি ও গল্পলেখকের অনুশীলিত—ছবি পাই। ইতিহাসের খাতিরে কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম।

পাড়ার মাঝারে সবচেয়ে সেই কুঁদুলি মেয়েটি কই !
কতদিন পরে পল্লীর পথে ফিরিয়া এসেছি ফের,—
সারাদিনমান মুখখানি জুড়ে ফুটিত যাহার খই
কই কই বালা আজিকে তোমার পাই না কেন গো টের ।

তোমার নখের আঁচড় আজিকে লুকিয়ে যায়নি বুকে,
কাঁকন-কাঁদানো কণ্ঠ তোমার আজও বাজিছে কানে !
যেই গান তুমি শিখায়ে দিছিলে মনের সারিকা-শুকে
তাহারি ললিত লহরী আজিও বহিয়া যেতেছে প্রাণে !

কই বালা কই !—প্রণাম দিলে না !—মাথায় নিলে না ধূলি !
—বহুদিন পরে এসেছি আবার বনতুলসীর দেশে !
কুটীরের পথে ফুটিয়া রয়েছে রাঙা রাঙা জবাগুলি,—
উজান নদীতে কোথায় আমার জবাটি গিয়েছে ভেসে ।

ঝরা-পালকের কয়েকটি কবিতায় জীবনানন্দের বিশিষ্ট ভাবনার আভাস (অর্থাৎ ঈষৎপ্রকাশ) আছে।[১০] সে নিজস্বতা পরবর্তী কালের কবিতায় প্রস্ফুট হইয়াছে। এই বিশেষত্বের একটা দিক সুদূর ইতিহাস-অভিসার। নজরুলের মতো তাঁহাকেও মিশর-তাতার টানিয়াছে।[১১]

দুশ্চর দেউল কোন্—কোন্ যক্ষপ্রাসাদের তটে,
দূর উর—ব্যাবিলন্—মিশরের মরুভূ-সঙ্কটে,
কোথা পিরামিড-তলে,—ঈসিসের বেদিকার মূলে,
কেউটের মত নীলা যেইখানে ফণা তুলে' উঠিয়াছে ফুলে,
কোন্ মন-ভুলানিয়া পথচাওয়া দুলালীর সনে
আমারে দেখেছে জ্যোৎস্না—ঘোর চোখে অলসনয়নে ![১২]

বেবিলোন্ কোথা হারিয়ে গিয়েছে—মিশর-'অসুর' কুয়াশা কালে [১৩]

অস্তচাঁদের মায়ায় কবিকল্পনায় রোমান্‌সের দেশে অতীত স্মৃতি ঘুরিয়া ফিরে। অবশেষে যাহার দেখা মেলে সে "সেই মধুমুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুখভরা আঁখি"

জীবনদেবতা নয়, সে কবিহৃদয়ের হতাশা—মৃত্যুপিশাচী।

মোর জানলার পাশে তারে, দেখিয়াছি রাতের দুপুরে,—
তখন শকুনবধূ যেতেছিল শ্মশানের পানে উড়ে' উড়ে' !
মেঘের বুরুজ ভেঙে' অস্তচাঁদ দিয়েছিল উঁকি,
সে কোন বালিকা একা অন্তঃপুরে এল অধোমুখী !...
সাপিনীর মত বাঁকা আঙুলে ফুটেছে তার কঙ্কালের রূপ,
ভেঙেছে নাকের ডাঁসা,—হিম স্তন,—হিম রোমকূপ।[১৪]

কবিতাটির নাম রবীন্দ্রনাথের একটি ছত্র। ভাবে 'সিন্ধুপারে'র প্রতিবাদ। জীবনানন্দের কাছে জীবনের তাৎপর্য রবীন্দ্র-ভাবনার বিপরীত। "রবীন্দ্রনাথের কাব্যের থেকে সচেতনভাবে মুক্তির জন্য" তাঁহার প্রয়াসের এই প্রথম অভিব্যক্তি।[১৫]

জীবনানন্দের কবিতায় কয়েকটি বিশিষ্ট এবং উদ্ভট উপমা ঘুরিয়া ফিরিয়া বারবার দেখা যায়। যেমন,—প্রেত চাঁদ, বুনো হাঁস, ভিজে মাঠ, কুয়াশা, ঘাসের বুক। ঝরা-পালকের কয়েকটি কবিতায় এইসব উপমার উপক্রম লক্ষ্য করা যায়। জীবনানন্দের কবিতা পরে যে কোন্ বাঁক লইবে তাহারও ইঙ্গিত কয়েকটি কবিতায় পাই। যেমন

একদিন খুঁজেছিনু যারে
বকের পাখায় ভিড়ে বাদলের গোধূলি-আঁধারে,
মালতীলতার বনে,—কদমের তলে,
নিঝুম ঘুমের ঘাটে,—কেয়াফুল—শেফালীর দলে !
যাহারে খুঁজিয়াছিনু মাঠে মাঠে শরতের ভোরে
হেমন্তের হিম ঘাসে যাহারে খুঁজিয়াছিনু ঝর' ঝর'
কামিনীর ব্যথার শিয়রে,
যার লাগি ছুটে গেছি নির্দয় মসুদ চীনা তাতারের দলে,
আর্ত কোলাহলে
তুলিয়াছে দিকে দিকে ব্যথা বিঘ্ন ভয়,—
আজি মনে হয়
পৃথিবীর সাঁজদীপে তার হাতে কোনো দিন জ্বলে নাই শিখা ![১৬]

—যেন মোর পলাতক প্রিয়া
মেঘের ঘোম্‌টা তুলে' প্রেত-চাঁদে সচকিতে ওঠে শিহরিয়া !
সে যেন দেখেছে মোরে জন্মে জন্মে ফিরে' ফিরে' ফিরে'
মাঠে ঘাটে একা একা,—বুনো হাঁস—জোনাকীর ভিড়ে ![১৭]

সে যেন ঘাসের বুকে,—ঝিল্‌মিল্ শিশিরের জলে,...
হেমন্তের হিম মাঠে, আকাশের আবছায়া ফুঁড়ে'
বকবধূটির মত কুয়াশায় শাদা ডানা যায় তার উড়ে' !...
হলুদ পাতার ভিড়ে শিরশিরে পূবালি হাওয়ায়

হয়ত দেখেছে তারে ভূতুড়ে দীপের চোখে মাঝরাতে দেওয়ালের পরে
নিভে যাওয়া প্রদীপের ধূসর ধোঁয়ায় তার সুর যেন ঝরে !...

বালুঘটিটির বুকে ঝিরিঝিরি গান যবে বাজে
রাতবিরেতের মাঠে হাটে সে যে আলসে,—অকাজে !...

তেঁতুলের শাখে শাখে বাদুড়ের কালো ডানা ভাসে,
মনের হরিণী তার ঘুরে মরে হাহাকারে বনের বাতাসে ![১৮]

জীবনানন্দের প্রথম কবিতাগ্রন্থের নাম 'ঝরা পালক'। নামটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। মারা বা মরা বুনো হাঁসের ঝরা পালক—অনেকটা বাল্মীকির ক্রৌঞ্চমিথুনের ক্রৌঞ্চের মতোই—জীবনানন্দের কাব্যপ্রেরণায় যেন বিশেষ উদ্দীপনা ও উত্তেজনা দিয়াছিল।[১৯] মারা (বা মরা) হাঁসের (বা বকের) ঝরা পালক জীবনানন্দের কাব্যশিল্পের বোধকরি মুখ্যতম সিম্বল। (ইহাকে কবিমানবের অব্‌সেশনও বলা যায়।)

ঝরা-পালকের প্রথম কবিতা 'আমি কবি—সেই কবি'। প্রথমেই পাই

আমি কবি,—সেই কবি,—
আকাশে কাতর আঁখি তুলে' হেরি ঝরা পালকের ছবি !

'সিন্ধু' কবিতায়

মোর বক্ষকপোতের কপোতিনী প্রিয়া
কোথা কবে উড়ে গেছে,—পড়ে আছে আহা
নষ্ট নীড়ে,—ঝরা পাতা,—পুবালির হাহা
কাঁদে বুকে মরা নদী,—শীতের কুয়াশা !

'চাঁদিনীতে'

হয়ত সেদিনও মাণিকজোড়ের মরা পাখিটির ঠিকানা মেগে'
অসীম আকাশে ঘুরেছে পাখিনী ছট্‌ফট্ দুটি পাখার বেগে।

জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র (১৯৩৬)[২০] একটি কবিতা ('পাখিরা') কল্লোলে, একটি কবিতা ('ক্যাম্পে') পরিচয়ে এবং অনেকগুলি কবিতা প্রগতিতে বাহির হইয়াছিল। ধূসর-পাণ্ডুলিপির কবিতায় জীবনানন্দ স্পষ্টভাবে ইমেজিস্ট কাব্যশিল্পের উপর নির্ভর করিয়াছেন, এবং কবিমানসের ব্যর্থতাবোধে (frustration) যেন বেদনাকাতরতায় (morbidity) পরিণত হইতে চলিয়াছে। নিজের মুড়কে কবি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন খণ্ড খণ্ড চিত্ররূপ ও ভাবরূপ দিয়া, এবং এ চিত্র ও ভাবরূপ কবিমানসে যেমন অসংলগ্ন অথচ সমাবস্থায়ী (coexistent) কবিতায়ও তেমনি অসংপৃক্ত রূপে প্রকটিত। এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যঞ্জনার শব্দকে অপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করিয়া কবি আপনার নিগূঢ় অনুভূতিকে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে অবশ্যই ইংরেজীর অনুকরণ আছে, এবং তাহা সর্বদা বিসদৃশ না হইলেও প্রায়ই মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়াছে।

"নরম জলের গন্ধ" ; "বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ" ; "হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ" ; "ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল" ; "চারিদিকে পিরামিড়—কাফনের ঘ্রাণ" ; "শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের" ; "পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ" ; "ম্লান বাঁকা নিস্তব্ধতা" ; "সোনালী চিল" (golden eagle) ইত্যাদি।

একই শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারেও নূতনরীতির ইংরেজী কবিতা হইতে গৃহীত কৌশল অনুকৃত। যেমন

পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে—
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল ; আদিম দেবতারা হো হো করে হেসে উঠল :
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায় ?[২১]

জীবনানন্দের কবিকল্পনার প্রধান রঙ ধূসরতা,—জীবনের অচরিতার্থতার ব্যর্থতার ক্লান্তির অবসন্নতার মৃত্যুর রঙ। মরা চাঁদের আলোর, হিমের কুয়াশা রাতের, পৌষের শস্যরিক্ত মাঠের চিত্ররূপ তাই তাঁহার কবিতায় পুনরাবৃত্ত। 'ধূসর-পাণ্ডুলিপি' নামেও এই ইঙ্গিত।

পাণ্ডুলিপি কাছে রেখে ধূসর দীপের কাছে আমি
নিস্তব্ধ ছিলাম ব'সে ;
শিশির পড়িতেছিল ধীরে ধীরে খ'সে,
নিমের শাখার থেকে একাকীতম কে পাখি নামি
উড়ে গেল কুয়াশায়,—কুয়াশার থেকে দূর কুয়াশায় আরো।

তাহারি পাখার হাওয়া প্রদীপ নিভিয়ে গেল বুঝি ?
অন্ধকার হাতড়িয়ে ধীরে ধীরে দেশ্‌লাই খুঁজি ;

যখন জ্বালিব আলো কার মুখ দেখা যাবে বলিতে কি পার ?
কার মুখ ?—আমলকী শাখার পিছনে
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ একদিন দেখেছিল তাহা,
এ ধূসর পাণ্ডুলিপি একদিন দেখেছিল, আহা ;
সে মুখ ধূসরতম আজ এই পৃথিবীর মনে।[২২]

কোন মিল না থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের "ধূসরজীবনের গোধূলিতে" গানটি এখানে মনে পড়ে।

জীবনানন্দের কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ চিত্ররূপময় বলিয়াছিলেন। চিত্ররূপখণ্ড, এবং ধূসর-পাণ্ডুলিপির তাহাতেই বিশিষ্ট কবিতাগুলি রস জমিয়াছে। যেমন

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা।[২৩]
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা,[২৪]
নির্জন মাছের চোখে ;[২৫] পুকুরের পারে[২৬] হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে

পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ[২৭]—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে' ;

মিনারের মত মেঘ সোনালী চিলেরে তার জানলায় ডাকে,[২৮]
বেতের লতার নীচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,[২৯]
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার বার তীরটিরে মাখে,[৩০]
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে[৩১] ;

(প্রথম প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে ধূসর-পাণ্ডুলিপিতে পরিবর্তিত কোন কোন পাঠ মিলাইয়া লইলে জীবনানন্দের কাব্যকৌশল যে সজ্ঞানভাবে নূতন পদ্ধতির ইংরেজী কবিতার অনুসরণ করিতেছে তাহা সহজে বোঝা যাইবে।) সন্ধ্যার ও রাত্রির অন্ধকারে শীতের দিনে নির্জন পল্লী-পরিবেশের নিজ্‌ঝুম অবসন্নতার অগাধ পরিমণ্ডল ফুটিয়া উঠিয়াছে এই চিত্রপরম্পরায়। এই অবসন্নতার মধ্যেও গোপনে প্রাণের চাঞ্চল্য যে একেবারে অননুভূত নয় তাহার দ্যোতনা রহিয়াছে ইঁদুরের খুদচুরিতে আর নোনার রসপরিণামে।

'ক্যাম্পে'[৩২] ধূসর-পাণ্ডুলিপির বিশিষ্ট কবিতাগুলির অন্যতম। এটি জীবনানন্দের কবিতার মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে notorious অর্থাৎ বহুনিন্দিত।

ধূসর-পাণ্ডুলিপির পর কবির জীবৎকালে আর চারিখানি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল,—'বনলতা সেন' (পরিবর্ধিত দ্বি-স ১৯৫২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) এবং 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৫৪)। 'বনলতা সেন'-এর কবিতাগুলির রচনাকাল ১৩৩২-৪৬ সাল। নাম-কবিতাটি জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। যুগযুগান্তের পথচারীর শ্রান্তি ক্লান্তি ও ক্ষুধাতৃষ্ণা বিনোদনের নীড়বিধায়িনীর সিম্বল বনলতা সেন আরও একটি ছোট কবিতায় দেখা দিয়াছে ('হাজার বছর শুধু খেলা করে')।[৩৩]

শঙ্খমালা'য়[৩৪] অজিত (কুমার) দত্তের 'পাতালকন্যা'র বিপরীত চিত্র। এখানে নারীই অভিসারিণী, এবং সে প্রেতিনী যেন।

কড়ির মত শাদা মুখ তার
দুইখানা হাত তার হিম ;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে-আগুনে হায়।

'আট বছর আগের একদিন'[৩৫] একটি বিশিষ্ট রচনা। বাহির-জীবনে সুখশান্তি থাকিতে পারে কিন্তু অন্তরে যে অশান্তি অব্যক্ত অতৃপ্তি জাগাইতে থাকে তাহার তাড়না এড়ানো দায়।

অর্থ নয়, কীর্তি নয়—স্বচ্ছলতা নয়—
আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে,

জীবন শাশ্বত, অলঙ্ঘনীয় এবং উদাসীন। কবিচিত্তের তিক্ততা সেই জন্য।

> তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
> থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে
> চোখ পাল্টায়ে কয় : 'বুড়ী চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে ?
> চমৎকার !
> ধরা যাক্ দু'একটা ইঁদুর এবার'—

'সাতটি তারার তিমির'-এর কবিতাগুলির রচনাকাল ১৩৩৫-৫০ সাল। শেষকালের কবিতাগুলিতে ভাষায় খানিকটা মুদ্রাদোষের মতো দেখা যায়।

> বৈশালীর থেকে বায়ু—গেৎসিমানি—আলেকজান্দ্রিয়ায়
> মোমের আলোকগুলো রয়েছে পিছনে পড়ে অমায়িক সঙ্কেতের মত ;
> তারাও সৈকত।[৩৬]

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রধানত সঙ্কলন। তবে এমন কতকগুলি কবিতা আছে যাহা আর কোন বইয়ে সঙ্কলিত হয় নাই।

'রূপসী বাংলা' নাম দিয়া কতকগুলি অপ্রকাশিত চতুর্দশপদী কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন (১৯৫৭) কবির ভ্রাতা অশোকানন্দ দাস। ইনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন

> কবিতাগুলি প্রথমবারে যেমন লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনই পাণ্ডুলিপিবদ্ধ আকারে রক্ষিত ছিল ; সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত। পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। এ-সব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।

রূপসী-বাংলার কবিতাগুলিতে শান্তপ্রকৃতির সঙ্গে, অক্ষুব্ধ স্তব্ধ জীবনের সঙ্গে কবিহৃদয়ের সুর মিলিয়া গিয়াছে।

> চারিদিকে শান্ত বাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব ;
> খেয়ানৌকাগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে ;
> পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল ;
> এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

নিজ জীবনের বঞ্চনার ক্ষোভ আজ দেশের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়া গিয়া কবিভাবনায় স্নিগ্ধকরুণ আভা ছড়াইয়াছে।

> কোনো দিন রূপহীন প্রবাসের পথে
> বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন
> কাটাই নি দিন, মাস, বেহুলার লহনার মধুর জগতে
> তাদের পায়ের ধুলো-মাখা পথে বিকায়ে দিয়েছি আমি মন
> বাঙালী নারীর কাছে—চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান-মাখা চুল,
> হাতে তার শাড়ীর কস্তা পাড় ;—ডাঁশা আম কামরাঙা কুল।

জীবনানন্দের কাব্যপ্রেরণার মূলে আছে প্রকৃতিপ্রীতি এবং প্রকৃতিভীতি। যে প্রাকৃতিক

আবেষ্টনে কবি শৈশব ও প্রথম যৌবন কাটাইয়াছিলেন তাহার আলো ও অন্ধকার তাঁহার চিত্তে প্রগাঢ়ভাবে প্রবিষ্ট। কবি প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, এবং সে ভালোবাসায় ভয়ের ছোঁয়া আছে। সে ভয় যেন শিশুচিত্তের অপ্রসন্নতা। গোবিন্দচন্দ্র দাসের পর জীবনানন্দই একমাত্র কবি যাঁহার রচনায় পূর্ববঙ্গের নিজস্ব প্রাকৃতিক আবেষ্টনের রূপ ও রস ধরিয়াছে। তবে জীবনানন্দের অবলম্বিত বিশিষ্ট শিল্পকৌশলে সে প্রাকৃতিক আবেষ্টন শেষ অবধি কতকগুলি যেন সিম্বলে বিধৃত হইয়া হারাইয়া গিয়াছে। "হিজল', 'বেতের ফল", "নোনা", "ঝিরিঝিরি গান করা নদী" শেষে হইল "ধানসিড়ি"।[৩৭] ঝরা পালক ও মরা হাঁসের উল্লেখ আগেই করিয়াছি।

জীবনানন্দের কবিতায় ব্যক্তি-নামের—নায়িকার নামের—ব্যবহারও সিম্বলিক প্রয়োগের মধ্যে পড়ে। (এ যেন পুরানো সাহিত্যের 'রাধা"র স্থানীয়।) শ্রেষ্ঠ উদাহরণ "বনলতা সেন"। অল্প আগে লেখা একটি কবিতায় মিলিয়াছিল "অশ্রুকণা সান্ন্যাল"। (তুলনা করুন রবীন্দ্রনাথের কবিতায়—"হে বন্ধু আছত ভাল ?")

> মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ ;[৩৮]

> 'মনে আছে ?' সুধাল সে—সুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন ?'[৩৯]

পল্লী-পরিবেশ হইতে বিচ্যুত হইয়াই নহে, পূর্ব হইতেই জীবনানন্দের কবিতা শহরের মানুষ-প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। ইহার তিনটি হেতু। প্রথমত কলিকাতা বাস, দ্বিতীয়ত নূতন-রীতির ইংরেজী কবিতার দিকে ঝোঁক, তৃতীয়ত রবীন্দ্র-রীতি হইতে সজ্ঞান ও সচেষ্ট অপসরণ। জীবনানন্দ পরে নিজেই সুস্পষ্টভাবে রবীন্দ্রাপসরণপ্রয়াসের কথা স্বীকাব করিয়াছেন।

> রবীন্দ্রনাথেব কাব্যের থেকে সচেতনভাবে মুক্তির যে বিপ্লব চলেছিল কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে বাংলা কবিতায়—তা' এখন একদল জ্যেষ্ঠ কবিদের ভিতরে অবচেতন লোকে বিদ্রোহের মূর্তি ধরেছে, রবিকাব্যলোকের বিপক্ষে ঠিক নয়, কিন্তু রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের বিরুদ্ধে।[৪০]

নিজের এবং অপরের লেখা বাঙ্গালা "নূতন" কবিতার সম্বন্ধে জীবনানন্দের এই সাফাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার মধ্যে সত্য কতখানি এবং প্রোপাগ্যাণ্ডাই বা কতখানি। মনে রাখিতে হইবে, জীবনানন্দের কবিতার প্রথম এবং প্রধান পোষক যে 'প্রগতি' পত্রিকা তাহার উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ হইতে আগাইয়া যাওয়া অর্থাৎ রবীন্দ্র-রীতি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা। (আশা করি এখানে ভালোমন্দের প্রশ্ন কেহ তুলিবেন না।)

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যস্বভাব সর্বভূমিক, তাঁহার সময়স্বভাব সর্বকালিক অর্থাৎ জগৎ ও জীবনকে সময়ের দৃষ্টিতে দেখিয়াও তাঁহার জগৎ ও জীবন-ভাবনা আপনা-আপনি আনন্দের উপলব্ধিতে সার্বভৌমিকতা ও সার্বকালিকতা পাইয়া শিল্পে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এ সর্বগতি সমকালবিচ্ছিন্ন নয়, মানুষের কোন সাধনা, প্রাণের কোন সিদ্ধিই সমকালবিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু খানিকটা কালনিরপেক্ষ না হইলে কোন সিদ্ধি মৌহূর্তিকতা অতিক্রম করে না।

> আধুনিক অনেক কবির কবিতা—যা উক্তির স্মরণীয়তার জন্য বিখ্যাত তা' কিন্তু [রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত] মহাকালের উৎসঙ্গে লুটিয়ে নেই, তা' বিশেষ করে আজকের জন্যই—এমন প্রগাঢভাবে আজকের জন্য যে সমসাময়িক কালকে যদি অতীত ও আনন্ত্যের থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন ক'রে ঈষৎ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি তা' হলে সেই সময়ের জন্য অন্ততঃ দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার করতে হবে যে আধুনিক যুগের আবশ্যিক বাঙ্গালী-কবি এঁরাই, রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর ঐতিহ্যপথিক শিষ্যেরা নন।

জীবনানন্দ বলিয়াছেন বা এখানে বলিতে চাহিতেছেন যে তাঁহারাই "আধুনিক যুগের আবশ্যিক বাঙ্গালী-কবি", অর্থাৎ তাঁহাদের রচনাতেই আধুনিক যুগের (অর্থাৎ ইংরেজীর নূতন কবিতা-ফ্যাশানের ?) সাহিত্যিক আবেদন এবং পূর্ব (—পূর্বাপর নয়—) রীতি হইতে একেবারে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহা বর্তমান সময়ের "আবশ্যিক" (genuine) কবিতা। কবি এখানে প্রচারকের মূর্তি ধরিয়াছেন, অতএব বিতর্ক নিরর্থক। জীবনানন্দ দাবি করিয়াছেন যে তাঁহাবা "সমসাময়িক কালকে অতীত ও আনন্ত্যের [অতীতের নিরবচ্ছিন্নতাই আনন্ত্য] থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন ক'রে ঈষৎ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে" দেখিয়াছেন। এখানে জীবনানন্দ অস্পষ্টভাবে আধুনিক ইংবেজী কবিতাব সমর্থকদেব দাবিবই পুনরুক্তি কবিযাছেন। ইংবেজী কবি সমসাময়িক কালকে অতীত হইতে বিচ্ছিন্ন কবিযা দেখেন নাই. অতীত ও উপাগতকে দেখিযাছেন যুগপৎ (simultaneously) সমগোচবে। ইহা অতীতকে অস্বীকার নয় অতীতকে বর্তমানের সহযোগী করা, অতীত সাহিত্যকে বর্তমান সাহিত্যেব সমকালে ও সমভূমিতে দেখা।

জীবনানন্দ প্রাণপণে রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটাইতে চেষ্টা করিযাছেন। কিন্তু আসলে তিনি যেন আদান্ত 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'এব ভাবানুপ্রাণিত।[৪১] সত্য কথা বলিতে কি ধূসব-পাণ্ডুলিপিব অনেক কবিতাই যেন সন্ধ্যাসঙ্গীতেব অস্ফুট অনভিব্যক্ত অন্তর্ব্যাপ্ত আবেগ বহন করিতেছে। মনে হয বাল্যে এবং কৈশোরে সন্ধ্যাসঙ্গীত জীবনানন্দকে অত্যন্ত আবিষ্ট করিয়াছিল। সে আবেশ কাটিয়া না গিয়া পরে তাঁহাব কবিতাকে নিজের হৃদযগহনের পথে পরিচালিত করিয়াছে। হযত এই পবিচালনা সম্ভাবিত হইযাছিল কোন নিদারুণ দুর্ঘটনায় অথবা নিষ্ঠুর হতাশায় (ফ্রাস্ট্রেশনে)। তাই রবীন্দ্রনাথেব কবিতার আনন্দের সৌবকরোজ্জ্বলতা জীবনানন্দেব কবিতায় সম্পূর্ণ প্রতিহত। অধিকন্তু তাহা তাহাব কবিচিত্তকে বেদনাভারাতুর করিয়াছিল এবং সেই বেদনাভারাতুরতা তাঁহার কবিতায় প্রচুর প্রতিফলিত। ক্ষয় ও মৃত্যুর প্রায় সব রকম রূপ জীবনানন্দের কবিমানসে বিভীষিকা ও জুগুপসাব সঞ্চাব না কবিযা নিশ্চয়ই খানিকটা আনন্দের ইঙ্গিত দিত। না হইলে তিনি কবিতা লিখিতে পারিতেন না। হয়ত কেন নিশ্চয়ই. ইহার মধ্যে খানিকটা আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্বীক্ষার অনুসরণ ছিল, যে অন্বীক্ষা জগৎ ও জীবনের সমস্ত ফাঁক ও জোড়াতালি বিদীর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া অসূর্য গভীরতায় নামিয়া যাইতে চায়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে জীবনানন্দের কবিতায় ফুল নাই,[৪২] এবং কবিপ্রসিদ্ধ বসন্তের স্থানে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন শরৎশেষ। অবশ্য শেষের ব্যাপার বিলাতি কবিপ্রসিদ্ধির অনুসরণ ছাড়া আর কিছু নয় কেননা আমাদেব দেশে অগ্রহায়ণ মাসে সাধারণত গাছের পাতা হলদে হইয়া ঝরিয়া পড়ে না।

খুব সচেতন ভাবেই জীবনানন্দ তাঁহার কবিতাকর্মে রবীন্দ্রনাথের ঠিক বিপরীত পথে চলিতে চাহিয়াছেন। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সিম্বলের ব্যবহারে। জীবনানন্দের কবিতায় হেমন্তের শস্যরিক্ত শূন্য মাঠে ম্লান বাঁকা চাঁদ যেন মরণাভিসারের প্রেত দূতী। জীবনের তীব্র, গোপন ক্ষুধার প্রতীক ইঁদুর। ঘাসের আদর কোমলতায় ও পশু-খাদ্যত্বের জন্য। পেঁচা মহাকাল।[৪৩] সৌন্দর্যের অন্তরালে সাদা হাড়ের কঙ্কাল। কবিদেহ যেন ফসল, কাস্তের অপেক্ষায়। প্রেমের স্বাদে শুধুই তিক্ততা। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যেখানে পড়ে সেখানে আলো সৌন্দর্য, জীবনানন্দের দৃষ্টিরতি অন্ধকারে কুৎসিতে (—কুঁজ, গলগণ্ড, পচা চালকুমড়া, মরা ঘাস)।[৪৪] রবীন্দ্রনাথের বলাকা অনন্তের যাত্রী, জীবনানন্দের বুনো হাঁস শিকারীর লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের মনের হরিণ নির্বন্ধন আনন্দের উদ্দামতা, জীবনানন্দের বনের হরিণ ঘাই-হরিণীর মোহবদ্ধ বলি। রবীন্দ্রনাথের কাছে ঘাস নবনবায়মান চিরন্তন প্রাণপ্রবাহের প্রতীক জীবনানন্দের কাছে ঘাস পশুদের মতো জীবনের উপভোগের (munching and wallowing) প্রতীক। রবীন্দ্রনাথে চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রধান জীবনানন্দে রসনা ॥

৩ বিষ্ণু দে

জীবনানন্দ দাশ অনেকটা অন্তরের তাগিদেই "নূতন কবিতা"র পথ ধরিয়াছিলেন বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) কিন্তু গোড়া হইতে আটঘাট বাঁধিয়া সে পথে নামিয়াছিলেন। গন্তব্য দিশা এক অভিমুখে হইলেও দুইজনের পদচারণ সমান্তরাল নয়। জীবনানন্দের কবিপ্রকৃতিতে হৃদয়াবেগের উত্তেজনা ও অনুভবের তীক্ষ্ণতা স্বভাবতই প্রবল। বিষ্ণুবাবুর কবিপ্রকৃতি বিদ্যার বন্ধুর পথবাহী বুদ্ধিরই অনুসরণ করিয়াছে। সেইজন্য বিষ্ণুবাবুর কবিতায় এলিয়টের কৌশল স্পষ্টভাবে অনুকৃত। যেমন

> ক্রেসিডা! তোমার থমকানো চোখে চমকিছে বরাভয়।
> আশ্লেষে তব অন্তবিহীন ক্রতোকৃতমের শেষ।
> তোমাতেই কবি মস্তমরণে জয়।
>
> অপাপবিদ্ধ বুদ্ধি আমার অস্নাবির।
> জড় কবন্ধ অন্ধ-কর্মে ফুৎকার মোর নর্মাচার।
> প্রাক্তন পাশ্চাত্য মাগি না। মন তুষার।[৪৫]

ব্রাহ্মণ-উপনিষদের মন্ত্র 'ওঁ ক্রতো স্মর কৃতম্ স্মর" হইতে 'ক্রতোকৃতম্' নেওয়া। 'অপাপবিদ্ধ' এবং 'অস্নাবির' উপনিষদে ব্রহ্মার নেতিবাচক বর্ণনায় আছে।

বিষ্ণুবাবুর প্রথম কবিতার বই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩২)। লেখকের কবিতা ভবিষ্যতের কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে তাহার নির্দেশ ইহাতে আছে। দ্বিতীয় বই 'চোরাবালি' (১৯৩৮), পরিচয়-সম্পাদক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নাতিদীর্ঘ মুখবন্ধ সম্বলিত। ইহাতে একুশটি কবিতা আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রগতিতে এবং একটি বিষ্ণুবাবুর পরিচিততম কবিতা 'ঘোড়সওয়ার' পরিচয়ে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

> জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার,
> হৃদয়ে আমার চড়া।

চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার। ...

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
মেরুচূড়া জনহীন—
হাল্কা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোকনিন্দার দিন।

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার ?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?

তৃতীয় বই 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), চতুর্থ 'সন্দীপের চর' (১৯৪৭), পঞ্চম 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০),ষষ্ঠ 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫০) ইত্যাদি। 'সন্দীপের চর'-এর কবিতাগুলি যুদ্ধমধ্যে ও যুদ্ধোত্তর কালে রচিত। তখন বিষ্ণুবাবু পুরোপুরি মার্ক্‌স্‌-লেনিনবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকগুলি কবিতায় তাহার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত।

'সমুদ্র স্বাধীন' একটি বিশিষ্ট কবিতা। ছন্দঃস্পন্দ কখনো সম কখনো বিষম। ছেদচিহ্নের ব্যবহার-অব্যবহারে বিশেষত্ব আছে। যেমন

চূড়ালা বোঝাও, শেখো রাজা শিখিধ্বজ
রাজত্ববিহীন স্বপ্নেরা সুষুপ্তি নয় জাগর সত্যও নয়
তবু জাগর জীবন সত্য হয় সবাই যে রাজা সেই রাজত্বেই
স্বপ্নাভাসে, স্বপ্নে ও জীবনে, দুই তটে উথলি' উছলি'
নিয়ে চলো জীবনের নিয়ে চলি উত্তাল ঊর্মিল
প্রতিশ্রুত স্বপ্নবীজ অবিশ্রাম ভাঙনের সাগর সঙ্গমে
সহিষ্ণু ঘটনা স্রোতে,

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'—রবীন্দ্রনাথ হইতে নেওয়া। নামটির ইঙ্গিত পাওয়া যায় উপান্ত্য কবিতায় এবং 'বহু বড়বা'য়।

কিম্বা উৎপ্রেক্ষা খুঁজি সুরে গানে
কোমল গান্ধার যথা আপন অস্তিত্ব উৎসর্গে
সপ্তকের বিন্যাসে বিন্যাসে গোষ্ঠীচক্রে প্রাণ যায়
কানাড়া কিম্বা মেঘমল্লারে বা মালকোষের লম্বিত বাহুতে

তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ

চকিতে ক্ষণে ক্ষণে পাব যে তাহারে
ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে

অধিকাংশ কবিতায় লেখকের রাজনীতিক মতের ও তির্যক ব্যঙ্গ-দৃষ্টির প্রকাশ। যেমন, সাহিত্যগুরু এলিয়টের প্রতি কটাক্ষ (লর্ড এলিয়ট অফ দি ওএস্টল্যান্ড')।

পোড়ো জমি চষে শেষে স্বত্ব জমে লাট—কি বেলাট,
সে সন্ন্যাস তবে ছদ্মবেশ ?
পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অন্তিমে কি লর্ড এলিঅট
ওএস্টল্যাণ্ডে চ'ষে নেন আপন স্বদেশ ?
তাইতো বলেছে শাস্ত্রে সদা আছে ভয়
বিড়াল তপস্বী হোক্, নয় মহাশয়।[৪৬]

অনুপরুদ্ধ স্বচ্ছন্দ কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য "২২শে শ্রাবণ', 'ত্রিপদী', 'যম-ও নেয় না', 'অথচ সহজ খুঁজি' ইত্যাদি। শেষ কবিতা '২৫শে বৈশাখ'।

আমরা যে গান শুনি, গান করি আকাশে হাওয়ায়...
আমরা যে ছবি দেখি আঁকি স্তব্ধ ছন্দের মায়ায়...
আমরা যে জীবনের গল্প রচি হাজার কবিতা...
রবীন্দ্র-ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি,...
প্রাত্যহিক ফল্গুস্রোতে লাখে লাখে হাজারে হাজারে
সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারি আনন্দভৈরবী ॥

৪ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পরিচয়ের সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬১) পূর্ব হইতে কবিতা লেখার অভ্যাস কিছু কিছু ছিল। ১৯৩০ অব্দে তাঁহার প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'তন্বী' বাহির হয়। নূতন ধরনের কবিতা লেখায় ইনি প্রবৃত্ত হইলেন 'পরিচয়' বাহির কবিবার পর। ইঁহার মৌলিক কবিতাগ্রন্থ এই কয়খানি—'অর্কেষ্ট্রা' (১৯৩৫, পরিবর্তিত দ্বি.স ১৯৫৪),[৪৭] 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তরফাল্গুনী' (১৯৪০), 'সংবর্ত' (১৯৫৩) ও 'দশমী' (১৯৫৬)।

'সংবর্ত'-এর ভূমিকায় সুধীন্দ্রবাবু লিখিয়াছিলেন

> ম্যালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট ; আমিও মানি কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দ প্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য।

ম্যালার্মের প্রবর্তিত কাব্যাদর্শ সুধীন্দ্রবাবুর রচনায় কতটা প্রতিফলিত তাহা বলিতে পারি না। তবে ম্যালার্মের সহধর্মী ও অনুগামী প্রুস্ত (Proust) সুধীন্দ্রবাবুর প্রত্যক্ষ আদর্শ বলিয়া মনে করি। সুধীন্দ্রবাবুর কবিতার তত্ত্বাংশে প্রুস্তের নীতিরই পুনরুক্তি,—আত্মার আসল অস্তিত্ব অস্বীকার, বুদ্ধির উপর আস্থাহীনতা, প্রেমের অবাস্তবতা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি প্রবলভাবে স্বীকার। তবুও মানুষের জীবনের ইন্দ্রিয়-অনুভূতির ফাঁকে ফাঁকে দৈবাৎ চকিতে এমন প্রতীতি চমক দিয়া যায় যাহাতে "বৈনাশিক কাল" (প্রুস্তের le temps perdu) এবং তৎনির্ভর সমস্ত বোধ লুপ্ত হইয়া অপরিচ্ছিন্ন "দৈব" অনুভব জাগে। আর তখনই আসে আধ্যাত্মিক মুক্তি যখন মানুষ এই মহাকালে (প্রুস্তের le temps retrouve) পৌঁছায়। সুধীন্দ্রবাবুও প্রুস্তের মতো জীবনে ফুটোফাটা জোড়াতালি—(দৈন্য-দারিদ্র্য, পীড়া-বেদনা, পাপ-অপরাধ, ধ্বংস-বিস্মৃতি)—বিদীর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া মহাকালে পৌঁছাইয়া

জীবনের তাৎপর্য খুঁজিয়াছেন এবং ফলে পাইয়াছেন প্রধানত আত্মগ্লানি।

সুধীন্দ্রবাবুর রচনাকৌশলেও প্রুস্তের নীতি অনুসৃত। প্রুস্তের মতে শব্দের প্রকৃতি সুরের মতো, সুরের পরম্পরায় যেমন সঙ্গীত রচিত হয় শব্দের পরম্পরায় তেমনি অর্থ ও ব্যঞ্জনা গড়িয়া উঠে। তবে নূতন ব্যঞ্জনার জন্য নূতন শব্দসৃষ্টি সর্বদা আবশ্যক নয় বাঞ্ছনীয়ও নয়, পুরানো অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিয়া সেই কাজ চলে। সুধীন্দ্রবাবুর কবিতা কখনো কখনো এবং গদ্য সর্বদা অপ্রচলিত কঠিন আভিধানিক শব্দে আকীর্ণ।

এই প্রচেষ্টার মধ্যে প্রকারান্তরে যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয়। একদা আমাদের দেশে কালিদাসের প্রসন্ন কবিতার পরেই "কঠিন' কবিতার দিন আসিয়াছিল। তাহার ফলে ভারবি-মাঘের প্রতিষ্ঠা, যাঁহাদের কবিতায় দুরূহতম কৃচ্ছ্রসাধনার পরিচয় আছে দ্ব্যক্ষর ত্র্যক্ষর বা চতুরক্ষর শ্লোক রচনায়। যেমন

> চারুচুঞ্চুশ্চিরারেচী চঞ্চচ্চীররুচা রুচঃ।
> চচার রুচিরশ্চারু চারৈরাচারচঞ্চুরঃ ॥ [৪৮]

'বিবিধগতিবিৎ, চিরশক্রহন্তা, চঞ্চল চীরশোভায় শোভমান, (সংগ্রামে) ক্ষিপ্রচারী, মনোহর (কিরাত) বিবিধরণগতিতে বিচরণ করিতেছিলেন।'

অনুচ্ছিষ্টপদন্যাসা হইলেও এসব রচনা কবিতা নয়। তবে সুধীন্দ্রবাবুর রচনা কবিতা নিশ্চয়ই।

প্রচণ্ড ব্যর্থতাবোধ সুধীন্দ্রনাথের 'ক্রন্দসী' বিশিষ্ট কবিতাগুলির মূল প্রেরণা। জীবনের উদ্দিষ্ট আনন্দ বিশ্বপ্রকৃতির উদ্দিষ্ট ব্রহ্ম আছে কিনা এ বিষয়ে কবিমানসে সংশয় যথেষ্ট, কিন্তু সে সংশয়ে জীবনের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতীতির দিকে মুখ ফিরিতে চায়।

> এই নিষ্ঠুর অপচয়,
> এর পাছে আছে আছে অভিপ্রায়,
> আছে কি আকুতি ?
> হেথা যারা পরাজিত বৈকুণ্ঠে তাদের হবে জয় ?...
>
> হায় ক্ষেমঙ্কর,
> অজস্র মঙ্গল তব পারিবে কি করিতে সুন্দর
> অবরুদ্ধ যৌবনের জীবন্ত মৃত্যুরে ?[৪৯]

পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়িয়া অবরুদ্ধ যৌবনের হতাশা সাধারণ জীবনের মূঢ় সন্তুষ্টির প্রতি ধিক্কার জাগায়।

> হে বিধাতা,
> অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
> দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস। ...
> রৌদ্র জ্যোতি হতে
> আবার ফিরাও মোরে তমসার প্রত্ন দায়ভাগে।
> ঘুণধরা হাড়ে যেন লাগে

উঞ্ছপুষ্ট জ্যেষ্ঠদের তৈলসিক্ত মেদ ;
মরে যেন উদ্বন্ধনে অপজাত হৃদয়ের খেদ ॥
পিতৃ-পিতামহদের প্রায়
তোমার নামের গুণে তীর্থ হয়ে দশম দশায়
মূঢ়, মূক গড্ডলের দিই যেন বলি
রক্তপিপাসিত যূপে। [৫০]

'উত্তরফাল্গুনী'তে কবিচিত্ত ধাতস্থ হইয়াছে। প্রেম জাগিয়াছে, আশাও। এ পরিবর্তন হইয়াছে আনন্দবাদে,—ঈশ্বর-বিশ্বাসে নয়, কালের বৈনাশিকত্বে (—অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গবাদে—) দৃঢ় আস্থায়। অর্থাৎ কবিচিত্তে যেন রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার মতো স্রোতোবাহিতের স্ফূর্তি জাগিয়াছে। ক্ষণিকার সঙ্গে অত্যন্ত পার্থক্য—চিত্তের প্রশান্তিহীনতায়। ক্ষণিকার মুড ভূতভবিষ্যৎ-নিরাসক্ত বর্তমান-জীবীর, সুধীন্দ্রবাবুর এ মুড ভূত-ভাবনায় জর্জর ভবিষ্যৎ-চিন্তায় ব্যাকুল বর্তমান-ভোগীর।

প্রাক্‌পুরাণিক বিকট পশুর
দায়ভাগ মোর শোণিতে নাচে।
সমুখে মরুর মরীচিকা ডাকে,
প্রলয়পয়োধি গরজে পাছে ॥ [৫১]

তন্ময় আমার চিত্ত, প্রীত বুদ্ধি, তদ্‌গত শরীর,
তথাগত অন্তর্যামী আত্ম-পর সবারে ক্ষমেছে,
ব্যক্তিতার অবরোধ মুহূর্তেকে চূর্ণ হয়ে গেছে,
সার্বভৌম যৌবরাজ্যে প্রত্যাগত যযাতি স্থবির ॥ [৫২]

শেষ কবিতা 'প্রতিপদ' কঠিন শব্দ ও বিষম অন্বয় সঙ্কুল। যেমন

প্রপন্ন অজ্ঞাতবাসে পাশবিক পুরাণপুরুষ .
শিখরীর মন্ত্রগুপ্তি পঙ্গু করে মৃগতৃষ্ণিকাকে ;
উন্মুক্ত গগনে জাগে নিরঞ্জন নিত্য, নিরঙ্কুশ।
নির্বাণ সর্বতোভদ্র ; প্রতিবেশী নীহারিকা যত
পলায় সংসর্গ ছেড়ে। —অকস্মাৎ ত্রিশঙ্কু স্বাগত।

'সংবর্ত'-এর কবিতাগুলির মধ্যে সাতটি পুরানো রচনার (১৯২৪-২৮) পরিমার্জিত রূপ, বাকিগুলির রচনাকাল ১৯৩৮ হইতে ১৯৫৩ অব্দ। যুদ্ধ, রাজনীতি এবং দেশবিদেশের অশান্তি ও অব্যবস্থা কবিচিত্তকে সংশয়ারূঢ় ঈষৎতিক্ত এবং কিঞ্চিৎ নিরাশাচ্ছন্ন করিয়াছে।

নিরর্থক

পূষার একর্ষি নাম, অসূর্যের পুরাণ ঝলক
হিরন্ময় পাত্র ঠেলে ফেলে,
দেয় মেলে
অন্ধতম অতিপ্রজ বল্মীকে বল্মীকে ;
বিমানের ব্যূহ চতুর্দিকে,
মাতরিশ্বা পরিভু কবির কণ্ঠশ্বাস।...

অন্তর্হিত আজ অন্তর্যামী ;
রুষের রহস্যে লুপ্ত লেনিনের মামি,
হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রট্স্কি, হিট্লারের সুহৃদ স্টালিন্,
মৃত স্পেন্, ম্রিয়মাণ চীন,
কবন্ধ ফরাসীদেশ। সে এখনও বেঁচে আছে কিনা
তা সুদ্ধ জানি না। [৫৩]

'যযাতি' কবিতায় লেখক র‍্যাঁবোর (Rimbaud) সঙ্গে নিজেকে তুলনা করিয়া বলিতেছেন

আমি বিংশ শতাব্দীর
সমান বয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে। [৫৪]

যখন 'উন্মার্গ'-এর মতো কবিতা পড়ি তখন মনে হয় যেন উপরি-উক্ত মনুষ্যধর্মে আস্থাহীনতা ইত্যাদি নিতান্ত ক্ষণকালীন ভাবনা।

অনাত্মীয়ের মুখ চেয়ে আছি
সে-দিন থেকে ;
উঞ্ছ কুড়িয়ে অগত্যা বাঁচি
নিরুপার্জন নির্বিবেকে।
দৃষ্টির সীমা মাপে হিমগিরি ;
পর্ণকুটীরে দুর্যোগে ফিরি ;
সৈকতে এসে বসি কদাচিৎ
আমার উপক্রমে ;
মহার্ণবের সামসঙ্গীত
হয়তো বা শুনি শুক্তির মাধ্যমে ॥ [৫৫]

'দশমী'র কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৫৪-৫৬ অব্দ। কবিতার নামগুলি তাৎপর্যপূর্ণ,—'প্রতীক্ষা', 'নৌকাডুবি', 'ভ্রষ্টতরী', 'নষ্ট নীড়' ইত্যাদি। কবি নিজেকে ক্ষণভঙ্গবাদী বলিতেছেন।

আমি ক্ষণবাদী : অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, তথা
তাতে যার জের, সে-সংসারও। অথচ সময় ভূত
থেকে ভবিষ্যতে ধাবমান নয় ; এবং যদি বা
তার সাক্ষ্য থাকে অন্ত্রে কী নাড়ীতে, তবু সে-নিভৃতে
হৃদয়বানের মতো, বুভুক্ষুও নিষিদ্ধপ্রবেশ। [৫৬]

উপস্থিত-ক্ষণের অবস্থা

নৌকা অচল, মাঝি

বিকল, সম্প্রতি তাই ধ্যানে দিগ্বিজয়ী সে, আজ অভিজ্ঞানে
স্বয়ংবরের মাল্য পরায় শকুন্তলা তাকে ; কিংবা ঢাকে
ক্রন্দসী সংবর্তে আবার, ফুরায় কলি আদিম অন্ধকারে,
আগামী কাল বিষাবশেষ ক্ষিপ্ত পারাবারে ভেসে ওঠে।
তাকিয়ে থাকে পঙ্গু নাবিক ; ভুষণ্ডী কাক রক্তপঙ্ক খোঁটে ॥ [৫৭]

তাহা হইলে উপায় ? আগেই বলা হইয়াছে

অবশ্য অপ্রতিকার্য অন্তিম কুম্ভক :
অনুত্তার্য নাস্তির কিনারা;
বৈকল্যের ষড়যন্ত্রে তুল্যমূল্য তুঙ্গী ধ্রুবতারা
ও মগ্ন চুম্বক ॥

অথচ অভাবে যবে তলাবে নাবিক,
তখনই তো স্মৃতির বিদ্যুতে
পাবে সে নিজের দেখা, তার পরে মিশে আদিভূতে
হবে স্বাভাবিক ॥ [৫৮]

(এজরা পাউণ্ডের অনুকরণে সুধীন্দ্রবাবু আধুনিক নতুন কৃত্রিম শব্দ সৃষ্টি করিতে ভালবাসিতেন। যেমন— অতিপ্রজ, অপ্রতিকার্য, অনুত্তার্য ইত্যাদি)।

সুধীন্দ্রবাবুর সাহিত্যিক গদ্য তাঁহার কঠিন পদ্যের অপেক্ষা কম কঠিন নয়। প্রমাণ মিলিবে 'স্বগত'-এর (১৯৩৮)[৫৯] প্রবন্ধগুলিতে। প্রবন্ধগুলিতে এইসব লেখকের আলোচনা আছে—ডি এইচ্ লরেন্স্, ভার্জিনিয়া উল্ফ, উইলিয়ম ফক্নার, গর্কি, বার্নাড শ, লীটন ষ্ট্রাচি, উইণ্ডহ্যাম লুইস, এজরা পাউণ্ড, টি এস এলিয়ট, উইলিয়াম বাট্লার ইয়েট্স, জেরাল্ড্ ম্যান্লি হপ্কিন্স, রবীন্দ্রনাথ। কয়েকটি বাঙ্গালা বইয়ের সমালোচনা এবং অন্য প্রবন্ধও আছে ॥

৫ সমর সেন

সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার[৬০] সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করিয়াছিলেন। এই বয়ঃকনিষ্ঠ কবির রচনা প্রথম হইতে 'কবিতা'য় বহুমানিত হইয়াছিল। নগরজীবনের নোংরামি ও ক্লান্তি সমরবাবুর কবিতায় বারবার প্রতিধ্বনিত, সেই সঙ্গে সাঁওতাল পরগনার শান্ত পরিবেশের মাধুর্যও। সুধীন্দ্রবাবুর মতো ইঁহারও মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা, তবে সমরবাবুর তিক্ততা ঝাঁঝালো এবং তাহার একটা কারণ মার্কস্বাদের দিকে ঝোঁক। (সুধীন্দ্রবাবু মার্ক্সবাদী ছিলেন না।) কবিতাগুলি সাধারণত স্বল্পকায় গদ্যকবিতা। ছন্দঃস্পন্দ ও মিল এড়াইবার চেষ্টা এবং রবীন্দ্রনাথের লিপিকার ছন্দের অনুসরণ সুব্যক্ত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছত্রের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, এলিয়টের ধরনে। (বাঙ্গলা সাহিত্যে একাজের ইঙ্গিত দেখাইয়া গিয়াছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন।[৬১])

সমরবাবুর কবিতার সংখ্যা খুবই পরিমিত। ইঁহার কবিতার বইগুলিও সবই নিতান্ত ক্ষুদ্রকায়,—'কয়েকটি কবিতা' (১৯৩৭), 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৪০), 'নানাকথা'

(১৯৪২) ও 'তিন পুরুষ' (১৯৪৪)।

নিপীড়িত যৌবনের নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বৃথাই কবি 'মুক্তি' খুঁজিতেছেন উজ্জ্বল বসন্তে।

একটি মানুষকে ভুলতে কতদিনই আর লাগে,
কতোদিনই বা লাগে শরীর থেকে মুছে ফেলতে
আর একজনের শরীর-সর্বস্ব আলিঙ্গন ;
মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস,
স্যাকারিনের মতো মিষ্টি
একটি মেয়ের প্রেম !

ডাস্টবিনের সামনে
মরে যাওয়া কুকুরের মুখের যন্ত্রণায়
সময় এখানে কাটে ;
এখানে কি কোনদিন বসন্ত নামবে
সবুজ উদ্দাম বসন্ত !
আর কোনদিন কি মুছে যাবে
স্যাকারিনের মতো মিষ্টি একটি মেয়ের প্রেম !

—উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন
এপ্রিলের বসন্ত আজ। [৬২]

রবীন্দ্রনাথের লেখা উপাদানের মতো ব্যবহার করার একটি ভালো নিদর্শন 'মৃত্যু'। চতুর্থ ও পঞ্চম ছত্র লিপিকা ('সন্ধ্যা ও প্রভাত') অবলম্বনে।

ধূসর পথে অন্ধকার, দীর্ঘ গাড়ী,
মন্দিরের বিবর্ণ দুঃস্বপ্ন,
লজ্জাহীন গণিকার সলজ্জ প্রণয়।

সূর্য অস্ত গেল, সূর্যদেব কোন দেশে—
এখানে সন্ধ্যা নামলো,
শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শূকরের চামড়ার মতো,
গলিতে গলিতে কেরোসিনের তীব্র গন্ধ,

হাওয়ায় ওড়ে শুধু শেষহীন ধুলোর ঝড় ;
এখানে সন্ধ্যা নাম্‌লো শীতের শকুনের মতো। [৬৩]

'গ্রহণ'-এর কতকগুলি কবিতা কিছু দীর্ঘতর। এখানে দৃষ্টি আরো তির্যক্‌। মধ্যবিত্ত সমাজ-সভ্যতা-ধর্মবোধের এস্টিমেট

প্রভু, পৃথিবীতে তোমার লীলা অবিরাম,
এ্যাসেম্‌ব্লি-হলে বিরহছলে মিলন আনো
প্রবীণ কবির মুখে আবার আনো
স্বদেশী গান।

উদ্দাম নদীতে শেষ খেয়া নেই,
শিকারী কীট সোনার ধানে।
তাই বঙ্কিম ব্রহ্ম যীশু পরমহংস
সময় যখন আসে তখন সকলি মানি,
দুর্গম দিন,
নামহীন অশান্তিতে বিচলিত বুদ্ধি,
তবু সরল চরম কথাটি এই বলে মানি
ভারি ট্যাঁক ছাড়া কিছুই টেঁকে না,
সবার উপরে আমিই সত্য,
তাহার উপরে নাই।[৬৪]

'নানাকথা'র একটি বিশিষ্ট কবিতা 'পরিস্থিতি'।

এপ্রিলে যে সংগ্রাম সুরু, এ্যাসেম্ব্লি হলে হবে শেষ,
এ হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি লেগে
ঝল্‌মল্‌ করে অনেক পার্টির চিত্ত।..

যদিচ পৈত্রিক আশ্রয়ে এখনো বসবাস,
যদিচ বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক,
তথাপি বামপন্থী পত্রিকায়
আসন্ন বিপ্লবের গান অবশ্য উচিত।[৬৫]

'তিন পুরুষ'-এর কোন কোন কবিতায় মিল অবলম্বিত হইয়াছে। সমরবাবুর রাজনীতিক মত এখন স্পষ্টতর ভাবে অভিব্যক্ত।

ঘুণধরা আমাদের হাড়,
শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু
আশা আছে বাঁচবার[৬৬]

রবীন্দ্রনাথকে মার্ক্‌স্‌বাদী কবি এইভাবে দেখিয়াছেন

গুরুদেব জানতেন কবি অমৃতের দূত।
তাই তাঁর নাট্যে সঙ্কট সময়ে হঠাৎ অদ্ভুত
বহুরূপী ঠাকুর্দাকে দেখি, কিম্বা কবিকে।
আধ্যাত্মিক মুস্কিল আশান্‌ তারা করে।
তার পরে জল পড়ে, পাতা নড়ে। তার পর
সত্য শিব ও সুন্দর।

সেই তুলনায় নিজেদেরও পরিচয় দিতেছেন

আমি রোমান্টিক কবি নই, মার্ক্‌সিস্ট।
অনেকে জিজ্ঞাসা করে ; গুরুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে
তোমার তফাৎটা কী ? তফাতটা এই :
বেদ উপনিষদের বুলি মুখে তিনি বরাবর,

অক্লান্ত বাউল, একই নৌকায়
একঘেয়ে খেয়া পারাপার করছেন।
কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
ভাগ্যবান এ কবিকে বিপুলা যশোদা
নিশ্চয় দেবেন বলে তাই আমার বিশ্বাস।[৬৭]

সমরবাবু আলোচ্য সময়ের একমাত্র কবি যিনি সাহিত্য সম্বন্ধে গদ্যে পদচারণা করেন নাই ॥

৬ অমিয় চক্রবর্তী

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর (১৯০১-১৯৮৬) ধাত ও রীত পরিপূর্ণভাবে কবির। তাঁহার শিক্ষার এবং অভিজ্ঞতার প্রসার যেমন বিস্তৃত তাঁহার কবিতার বিষয়ও তেমনি বিচিত্র। সাময়িক ইতিহাসকে ইনি কোথাও অস্বীকার করেন নাই এবং কোন পোলিটিক্যাল বা সাহিত্যিক বিশ্বাসের দ্বারাও পরিচালিত হন নাই। অমিয়বাবু বিদ্যাবান্ কস্‌মোপলিটান কবি এবং তাহার মনের শিকড় বাঙ্গালাদেশের মাটির তলায় বিসর্পিত এবং কখনো তাহাতে টান পড়ে নাই।

মধ্য-মার্কিনে আছি মিসিসিপি পারে, চলেছি যে-ঘড়ি হাতে
টিকটিক আয়ু তার আনে চিহ্ন এটা-ওটা ; খুঁজি নিঃসময়
কোন ঘটনার ছবি—বাংলা ভাষায় গাঁথা—চিরক্ষণে যাতে
শাদা বক, ব্যস্ত ট্রেন, বুকে ধরে এই সকালের পরিচয় ॥[৬৮]

গান শুনছি রবীন্দ্রনাথের সকালে
বাতায়নে বাঁশিতে—
বাতাসে পর্দা উড়চে ॥[৬৯]

অমিয়বাবুর কবিতায় জীবনের চলচ্চিত্র চলিয়াছে। সে চলচ্চিত্রে রেলের জানালা দিয়ে দেখার সঙ্গে মনের ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে। তাই আপাত অসংলগ্নতার (inconsequence) ভিতরে ভিতরে নিগূঢ় সংগতি প্রবাহিত। স্টাইলে অনেক সময় ইঁহার কবিতা রীতি-অসমর্থিত (unconventional) বলিয়া মনে হয়। তবে এ ব্যাপারে সঙ্গে ইঁহার সমসাময়িক কোন কোন কবির রীতিব্যত্যয়ের প্রভেদ আছে। অমিয়বাবুর লেখায় বাঙ্গালা শব্দের ও বাক্‌রীতির প্রতিলোম ব্যবহার নাই। যেখানে ইনি শব্দ বা ইডিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন সেখানেও বাঙ্গালা ভাষায় ধাত স্বীকৃত। ছড়ার ছন্দ তাই প্রয়োজনমত আপনিই আসিয়া গিয়াছে।

ভরা সকাল
ঝাঁঝাঁ দুপুর, ঝিঁঝিঁর সন্ধ্যে, ঘুঁটে-পোড়ানো।
সংসারে জড়ানো
মাঠের কাজ, কাজের অনুবর্তী

পূর্ণিমার চাঁদ, নিঝুম রাত, দূরে ডাক্‌চে শেয়াল।
গাঙে স্রোত, ভাটিয়ালি, কীর্তন, দেউল, মুর্সিদ্যার বাড়ি
ওপারে যাব কেমনে ?
(চিরদিন বাইলাম মনে গো)
হাটের ধারে ঘাটের নাও, লণ্ঠন-ঝোলানো গোরুর গাড়ী
ছায়ায় ছায়া আঁকি' চলে।[৭০]

দামী রাজ্যে স্বর্নির্বাসী গরিব বাঙালি
... ...
ছেঁড়া চটি পরে চলে যাই
আত্মীয় যুগের মধ্যগ্রামে,
একেবারে প্রাথমিক প্রণতির।
আহা, ঐ বোষ্টমী ভিখারি
কিছু না জেনেও গায় কত যে পুরানো ধ্বনিভরা
গান,
ছন্দ তার যেন নান্দীপাঠ, একতারা বাজা
ভাঙা ব্যাকরণে মেশা পার্থিব যোগের সংসারতা
হাটের বাটের,[৭১]

সাম্প্রতিক কোন কবিকে যদি রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী বলিতেই হয়—যদিও এমন কথার আসলে কোনই মানে নাই—তবে তিনি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ-সঙ্গলব্ধ অমিয়বাবু।

অমিয়বাবু অনেকদিন হইতে কবিতা লিখিতেছেন, তবে গোড়ার দিকে খুব মন দিয়া নহে। ১৩৩০ সালের চৈত্র সংখ্যা ভারতীতে ইঁহার একটি সনেট ('নেশা') বাহির হইয়াছিল। ইঁহার কবিতার বই এই কয়খানি—'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দোয়াল' (১৯৪২, দ্বি-স ১৯৪৩), 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩)[৭২], 'পারাপার' (১৯৫৩)[৭৩] এবং 'পালা-বদল' (১৯৫৫)[৭৪] ইত্যাদি।

অমিয়বাবুর কবিতার আরো কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

'ঘুমের ঘোরে' কবিতার আরম্ভে বাউলের ঢঙ বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে।

মনরে আমার মন কোন্ সাধনার ধন,
হাড়ের বাক্সে।
তাতে প্রকাণ্ড একখানা গড়ের মাঠ
আস্ত মনুমেন্ট, আজগুবি বাড়িঘর যাদুঘর—থাক্ সে।
অনেক শেল্‌ফ পাঠ্যপুস্তক, নোটসহ
দিগন্তে বন্ধ পরীক্ষা-ঘরের কবাট,
পালানোর ট্রেন-ভরা শিয়ালদহ—[৭৫]

'সংগতি' কবিতাটি যখন সাময়িক-পত্রিকায় প্রথম বাহির হয় তখন এটি লইয়া বহু ভেংচানি ও হাসাহাসি হইয়াছিল (এবং বোধ করি এখনো হয়)। কিন্তু এটি খুব ভালো

কবিতা

মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধূলো,
যারা সরে যায় তারা শুধু—লোকগুলো ;
কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়,
যারা পায়, যারা সবই থেকে নাহি পায়,
যেন কিছু আছে বোঝানো, বোঝা না যায়—
মেলাবেন।
দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা,
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা,
ঝড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন ॥ [৭৬]

'আটপৌরে' "ছেঁড়া উড়ো প্রাণের ইতিহাস"

আকাশ চাদরটা ময়লা জেটির একটানা কালো কয়লা
নুরনবীর মাস পয়লা
অত্যন্ত ঘটা করে নয় ট্যাঁকে পয়সা গোটা ছয়
গড়ের মাঠ পেরিয়ে ঘোরে
ফুটবল দেখে, ডোরা-কাটা গেঞ্জি খেলোয়াড় লাফাচ্চে, জোরে
চানাচুর একপয়সা মুখে পোরে। [৭৬]

'রাত্রিযাপন'এ গভীর ইমোশনের অদ্ভুত প্রকাশ।

বুকে প্রাণটা এম্‌নিই রইল, জানো ভাই,
ঘরে দাঁড়িয়ে মন বল্‌'লে শুধু, যাই
—যাই।
প্রকাণ্ড তামার চাঁদ রাত্রে
গলে হল সোনা। সোনার পাত্রে
পরে আভার ছড়ালে অন্তর্লীন রোদ্দুর।
নৌকা দূরে গেল বেয়ে সেই নীল অভ্রের সমুদ্দুর।
সেদিন রাত্রে যখন আমার কুমুবোন্‌কে হারাই। [৭৬]

'ফ্রাইবুর্গের পথে' কবিতায় মনগোচরতার বাহিরে প্রাণগোচরতার পরিচয়।

তরুণীর চোখে সুখ বিদেশী যাত্রীকে খেতে দিতে,
ভাই যেন এল পৃথিবীতে,
কিসের বাজনা পথে ঘাটে—
এর মানে কিছু বুঝব না।
এতোদিন আছি বেঁচে কিছুই জানিনি, তবু শেষে
প্রাণের নিঃশেষ প্রেমে জেনেছি সমস্ত প্রাণ মেশে ॥ [৭৭]

'চিরদিন' অত্যন্ত সহজ আর অত্যন্ত মধুর কবিতা।

আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো
জীবনে জীবনে তার শেষ নেই কোনো।
দিনের কাহিনী কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি।
ঘাস ফোটে, ধান ওঠে, তারা জ্বলে, রাতে
গ্রাম থেকে পাড়ি ভাঙে জলের আঘাতে।
দুঃখের আবর্তে নৌকো ডোবে, ঝড় নামে,
নূতন প্রাণের বার্তা জাগে গ্রামে গ্রামে—
নীলান্ত আকাশে শেষ পাইনি কখনো
আমি যেন বলি, আর, তুমি যেন শোনো।[৭৭]

৭ অন্যান্য

ভালো কবিতা কমবেশি আরো অনেকে লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি

সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) পদ্যে ব্যঙ্গরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।[৭৮] গম্ভীর কবিতারচনাযও ইনি পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। ইঁহার ব্যঙ্গ কবিতার বই 'পথ চলতে ঘাসেব ফুল' (১৯২৯), 'অঙ্গুষ্ঠ' (১৯৩১), 'বঙ্গরণভূমে' (১৯৩১) ইত্যাদি। গম্ভীর কবিতার বই—'রাজহংস' (১৯৩৫), 'আলো আঁধারি' (১৯৩৬), 'পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৪২) ইত্যাদি। ব্যঙ্গ কবিতাগুলি প্রায় সবই শনিবারের চিঠিতে বাহির হইয়াছিল।

মনীশ ঘটক (১৯০২ ১৯৭৯) 'যুবনাশ্ব' এই ছদ্মনামে লিখিতেন। কল্লোলের একজন উৎসাহী লেখক ছিলেন ইনি।[৭৯] মনীশবাবুর একমাত্র কবিতার বই 'শিলালিপি'র (১৯৩৯) অধিকাংশ কবিতা প্রবাসী পরিচয় কবিতা প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। সবই প্রেমের কবিতা। ভাব একটু উষ্ণ। যেমন

হল পিয়সহি,
জান্তব জিগীষা বক্ষে অতীতের সে নিষাদ নহি আমি নহি।
একদা যে আসঙ্গের ক্রূর আক্রমণ
সবিদ্রূপে উপেক্ষিয়া কুমারীর আত্মরক্ষাপণ
বধির বাসব হস্তচ্যুত বজ্রসম
তোমারে করিলো চূর্ণ, আমারি নির্মম
স্বার্থ-পরমার্থ দ্বন্দ্বে আজি নির্বাপিত
সে অনল।[৮০]

হেমচন্দ্র বাগচী (জন্ম ১৯০৪) তিনখানি কবিতাগ্রন্থের লেখক—'দীপান্বিতা' (১৯২৮), 'তীর্থপথে' (১৯৩২) ও 'মানস-বিরহ' (১৯৩৮)। হেমচন্দ্র অল্পবয়সীদের উপযোগী গল্প-উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন। যেমন 'মায়া-প্রদীপ' ও 'তপনকুমারের অভিযান'। কল্লোল কালি-কলম প্রগতি ইত্যাদি পত্রিকায় ইঁহার কবিতা বাহির হইয়াছিল।

কাব্যরচনার রীতি ছিল এইরূপ

নূতন করিয়া গড়িতে হইবে জানি—
আমাদের এই পুরানো জীবন খানি,
গ্রন্থিল বাস ধূলায় মলিন হল ;
তালিতে ফাঁকিতে কতদিন রবে বলো
ফাঁকে ফাঁকে তার ব্যাধি যে বাঁধিছে বাসা
মুদিত নয়ন ; মুখে নাহি সরে বাণী ;
পরম প্রবীণ পুরানো জীবন খানি।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৪)। কবিতাকর্মে বেশিদিন ব্যাপৃত রহেন নাই। ইঁহার কবিতার বই—'বিপ্লবী নায়িকা ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৩১) ও 'শতাব্দীর সঙ্গীত' (১৯৩১) ইত্যাদি। সর্বসমেত কবিতার সংখ্যা ঊনতিরিশ। রচনাকাল ১৯২৫-৩১। শতাব্দীর-সঙ্গীত "আমার পদ্মাপারের বন্ধুদিগকে" উৎসর্গিত।

প্রবাসী(?) পত্রিকায় তাঁহার নীচের কবিতাটি বাহির হইয়াছিল। তাহারই খানিকটা উল্লেখ করিতেছি। কবিতাটির নাম 'কমরেড'।

যদি আমি পড়ে যাই, তুমি কি ধরিবে হাত ?
ঘুমায়ে যদি বা পড়ি জাগিবে কি সারারাত ?
যে তারার আলো আজি খুঁজিনু জীবন ভরি,
শিখা তার জ্বলিবে কি তোমার নয়ন 'পরি ?

* * *

যদি আমি পড়ে যাই, এসো তুমি আরো কাছে,
তোমার জীবন মাঝে নতুন জীবন আছে।
সে অমৃত লয়ে তুমি ধরিও আমার হাত,
লুকানো যে তরবারি তাই নিয়ে জেগে রাত।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬-১৯৮৯) পদ্য গদ্য দুই বন্ধেই অভ্যস্ত। তবে পদ্যের তুলনায় গদ্যে—বিশেষ করিয়া ব্যক্তিচিন্তাময় প্রবন্ধে—তাঁহার নিপুণতা পরিস্ফুট। ইনি অদ্যাবধি চারখানি ছোট ছোট কবিতার বই বাহির করিয়াছেন—'সংক্রান্তি' (১৯৩৭), 'সঞ্চারী' (১৯৪১), 'চন্দ্রকলা' (১৯৪৩) ও 'সম্ভবা' (১৯৫৩)।

'পলাতক' নামে একটি কবিতা হইতে তাঁহার রচনার কিছু নমুনা দিই।

ঘোড়ার খুরের ধ্বনি বাতাসে মিলায়।
উদাস পথিক হাওয়া আকাশ-কুলায়
নীড়হারা শব্দটিরে
সুদূর নীলের তীরে
বিধূনিত তরঙ্গের স্তরের মাথায়
অসীম মমতা ঘিরে তুলে রেখে যায়।

পণ্ডিচেরী-বাসী এবং শুধু নিশিকান্ত নামে পরিচিত নিশিকান্ত রায়চৌধুরী (১৯০৯-১৯৭০) কিছুকাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন। কবিতা-রচয়িতা-রূপে ইঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল বিচিত্রার পৃষ্ঠায়। বিচিত্রায় (অগ্রহায়ণ মাঘ ও ফাল্গুন ১৩৩৮) 'টুকরি'

নামে যে চমৎকার কবিতাগুলি ইঁহার স্বাক্ষরে বাহির হইয়াছিল তাহা পুনর্মুদ্রিত বা সঙ্কলিত হয় নাই। (রচনায় 'রবীন্দ্রনাথেরও হাত ছিল বলিয়া মনে হয়। সেইজন্যই কি ভাগের দায়ে পড়িয়া কবিতাগুলি মাঠে মারা যাইতেছে!) দুইটি টুকরি উদ্ধৃত করিতেছি।

কর-কমল

রসে ভরা যেন আঙ্গুর তোমার আঙ্গুল কটি।
করতলে কচি গাবের পাতার গোলাপী আভা,
ঐ হাতখানি মোর হাতে তুলে ধ'রে
দিবে কি গণিতে কবকোষ্ঠীর ফল ?

আকাশের চাঁদ

মনেব ভিতব বাখা তো সহজ
স্বপ্ন আসন পেতে।
খড়েব চালাতে রাখ্‌বো কোথায় ও'কে
কলেজের ক্লাসে হয়েছিল দুটো কথা
সে কথাব শেষ গাজনতলার
এঁদো পুকুবেব পাড়ে।

নিশিকান্তেব বড় কবিতা প্রবাসী পবিচয় কবিতা প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। ইঁহাব কবিতার বই তিন-চাবখানি, তাহার মধ্যে প্রথম 'অলকানন্দা' (১৯৩৯)।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যেব (১৯০৯-৬৯) উল্লেখ আগের পবিচ্ছেদে করিয়াছি। গল্প ও উপন্যাস লিখিলেও ইঁহাব মুখ্য পরিচয কবি বলিয়া। ইঁহব কবিতার বই--'সাগর ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৩৬), 'পৃথিবী' (১৯৩৯), 'যৌবনোত্তর' (১৯৪৬), 'সংকলিতা' (১৯৪৭), 'প্রেম ও অপ্রেম', 'প্রাচীন প্রাচী' (১৯৪৮) ইত্যাদি।

সংকলিতা হইতে সঞ্জযবাবুব কাব্য রচনার একটু নমুনা দিতেছি।

হয়তো বা তুমি দেখনি কখনো গভীর বন
যেখানে লুকিয়ে আছে কবেকার বাতেব ছায়া
এলান যেখানে আকাশের হিম-নয়ন নীল
তেমন বন।

* * *

যদি কোনদিন আকাশের তরে তোমার চুল
ভিজে ওঠে কালো নতুন মেঘের শীতল জালে
দেখো ছুঁয়ে যাবে কতদূর হতে তোমার বুক
গভীর বন।

সঞ্জয়বাবুর অগ্রজ অজয় ভট্টাচার্য কয়েকটি ভালো গান লিখিয়াছিলেন।

অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-৯০) ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে সিলেট থেকে একটি কবিতার বই ও একটি কবিতাপুস্তিকা বাহির করিয়াছিলেন—'ডিহাং নদীর বাঁকে' ও রুদ্র বসন্ত'। তাহার

পর বাহির হইয়াছিল চারটি কবিতাপুস্তিকা, 'ভানুমতীর মাঠ' (১৯৪৩), 'জলডম্বরু পাহাড়' (১৯৪৫), 'রক্তসন্ধ্যা' (১৯৪৫) ও 'শেষচূড়া' (১৯৪৫)[৮১]। তাহার পর 'উড়োচিঠির ঝাঁক' (১৯৫১)।

তাঁহার একটি কবিতা 'গলির মোড়ে'। কবিতাটির রচনারীতি নিম্নরূপ।

এখানে গলির মোড়ে একদল তরল তরুণী
জল ঢেউ ছিটাল হঠাৎ
উজ্জ্বল হাসির কাচ ভেঙে গেল সূর্যের আলোকে।

* * *

জানি আজ পৃথিবীতে দিকে দিকে যুগসন্ধ্যা নামে
ধোঁয়া ও কালির ছাপে দুর্ভাগা আকাশ,
তবু এই পড়ন্ত বেলায়
এখানে গলির মোড়ে একদল তরল তরুণী
চকিতে দেখাল সেই নদী ॥

সুশীল রায়ের (১৯১৫-৮৫) উপন্যাসের উল্লেখ আগেই করিয়াছি। ইনি কয়েকখানি কবিতাগ্রন্থেরও রচয়িতা।

সুশীলবাবুর রচনাশৈলী ছিল এইরূপ

কেউ মাতা, কেউ পিতা, বন্ধু কেউ, কেউ ছিল বোন,
অথচ এখন
তারা দলে দলে
ভূতপূর্ব হয়েছে সকলে।
তাদের উদ্দেশ্য আঁকা সংখ্যাহীন স্তুতি
সীসার অক্ষরে লেখা প্রাণের আকুতি—
"তুমি নাই, তাই এ নিখিল আজ ফাঁকা"
—এমনি কান্নায় ভরা সমস্ত এলাকা।

শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯১২) কবিতাকর্ম নিরবধি করেন নাই। ইঁহার প্রথম কবিতাপুস্তক 'অষ্টাদশী' (১৯৩৩) প্রেমের কবিতাগুচ্ছ, সব চতুর্দশপদী। দ্বিতীয় বই 'ক্ষণশাশ্বতী'ও (১৯৪১) প্রেমের কবিতাগুচ্ছ। বইটিতে লেখক "কলেজ-বয়" ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ব্ল্যাকবোর্ড' (১৯৪৯) হাসির কবিতার বই।

'দক্ষিণা নামে একটি কবিতার অংশবিশেষ উল্লেখ করি।

ভিখারীর ভীরুতারে বক্ষোমাঝে ঘিরিয়া ঘিরিয়া
দাক্ষিণ্যের দক্ষিণারে কুড়ায়ে কুড়ায়ে চলি পথে,
স্বপ্নময়ী উড়ে চল শ্লথবল্গ তব মনোরথে—
করুণা-কৃপণা তুমি, নাহি চাও পিছনে ফিরিয়া।

শুভো ঠাকুর (১৯১২-) লিখিয়াছিলেন 'ডিকেন্টার' (১৯৩৪), 'কঙ্কর' (১৯৩৬), 'স্বপ্নশেষ' (১৯৩৬) ইত্যাদি। রচনায় নিজস্বতা আছে। চিত্রণ কর্মেও ইঁহার প্রতিভার প্রকাশ দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পূর্বে কোন কোন তরুণ কবি কবিতা রচনায় যে উদ্যম দেখাইতেছিলেন তাহাতে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কিছু কিছু আভাস আছে। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখনীয় হইলেন বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০-১৯৮২)। ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ হইল 'দ্বিপ্রহর' ইত্যাদি। রচনাশৈলী এইরূপ।

সারাদিন কাজ করি সরকারী দপ্তরে
দারুণ খাটুনি খেটে অঙ্গে ঘাম ঝরে
যদিও মাথায় ঘোরে বৈদ্যুতিক পাখা
বিকেলে মলিন দেহ কালিঝুলি মাখা
ক্লান্ত পদে ঘরে ফিরি।

* * *

মাথায় উনুন জ্বলে
উনুন জ্বালিয়া ওঠে ভীরু মর্মতলে।
গৃহিণী সচিব সখী মিত্রার আদেশে
দোকানের খাতা হাতে ক্লান্ত দীন বেশে
তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে পণ্য বীথিকায়
উনুনের ধূম্রজালে সায়াহ্ন ঘনায়।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯১৪) দুইটি কবিতাপুস্তিকার রচয়িতা—'বর্ষশেষ ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৩৮) এবং 'বসুন্ধরা' (১৯৪২)।

চঞ্চলবাবুর লেখার রীতির খানিকটা উল্লেখ করি।

একথা সবাই জানে দম্ভ আছে মনে,
ওতপ্রোত শিরে শিরে। নিয়তই তাই
আয়োজন প্রহরের বৃথা অন্বেষণে
নির্বীজিত জীবনের ব্যর্থতা জানাই।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (১৯১০-১৯৮৮) আলোচ্য সময়ে একখানি কবিতার বই প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'সেতু ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৩৪)। পরে আর একখানি বাহির হইয়াছিল, 'জীবনদ্বন্দ্ব' (১৯৪৫)।

একটি কবিতা হইতে নন্দগোপালবাবুর রচনার কিছু নমুনা দিই।

আমরা কবিতা লিখি বিধাতার শুভ্র আশীর্বাদ
মোদের লেখনী মুখে অর্পিয়াছে অন্তহীণ প্রাণ,
মর্ত্যের মানুষ মোরা শুনি তাই অমর্ত্য-সংবাদ,
কল্পনায় পাখা মেলে উড়ে যাই উন্মুক্ত অবাধ;
প্রত্যহের ধূলির্লিপ্ত বিষতিক্ত গ্লানি অপমান,
জীবনেরে করে যবে পলে পলে বিকৃত বিস্বাদ,
আমরা বহিয়া আনি ক্ষনিকের আনন্দ সংবাদ
ছন্দোবদ্ধ গান।

দিনেশ দাশ (১৯১৫-১৯৮৫) কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থগুলি

হইল 'কবিতা', 'অহল্যা', 'কাঁচের মানুষ', 'রাম গেছে বনবাসে' ইত্যাদি। দিনেশবাবুর রচনার কিছু নমুনা দিই।

মোটরে ঝড়ের বেগ
ঝড়ের মতোই কালো এলোমেলো রাত,
চকচকে আলো জ্বলে হেড লাইটের
তারি তলে ছুটে চলে যশোহর রোড।

* * *

মোটরে অনেক দূর
অনেক—অনেক দূর
আবার অদূরে কোন গহন জলের ছলোছল।
কপোতাক্ষ ?
কপোতাক্ষ কতদূর
—সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে—
কপোতাক্ষ আর কতদূর !

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫) একখানি কবিতাপুস্তিকার রচয়িতা, 'জোনাকি' (১৯৩৫)। পরে ইনি গল্প লেখায় বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

মৈত্রেয়ী দেবীর (১৯১৪-) রচনা 'উদিতা' (১৯২৯) ও 'চিত্তচ্ছায়া' (১৯৩৬)। শ্রীমতী মমতা মিত্রও দুইখানি কবিতা-গ্রন্থের রচয়িত্রী। তাহার মধ্যে প্রথম হইল 'মৌন ও মুখর' (১৯৩৫)।

হরপ্রসাদ মিত্র (১৯১৭) আলোচ্য সময়ে একটি কবিতাপুস্তিকা বাহির করিয়াছিলেন, 'পৌত্তলিক' (১৯৪১)। তাহার পর 'চুনিপান্নার কান্না' (১৯৪৫)। এটিও পুস্তিকা। তৃতীয় কবিতাপুস্তক 'তিমিরাভিসার' (১৯৫৪)। ইহা হরপ্রসাদবাবুর পুরাতন ও নূতন কবিতাবলীর সঙ্কলন।

হরপ্রসাদবাবুর কবিতার খানিকটা উল্লেখ করিতেছি। এটির নাম 'মফস্বলে'।

জল থই থই মাঠের কিনার,
এখানে আবার স্বপ্ন মিনার।
এখানে তুষার-ফুল-টুপ্-টুপ বর্ষা
সপ্তাহান্তে
পথের প্রান্তে
জল নেমে গেছে, বৃষ্টি নেই।

* * *

বৈকালে একা,
আকাশে অথৈ ফর্সা।
অশ্রু চিকন
দিনের লিখন
সে কার নাম ?
ধবল চাকর পাঁতি পূব দিকে

এ-দিকে বিসোয় নন্দী গ্রাম।

দুইখানি কাব্য পুস্তিকার[৮৩] রচয়িতা গোপেশচন্দ্র দত্তের (জন্ম ১৯১৮) কবিতা সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল।

শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯১৯) প্রথম হইতেই কবিতাকর্মে কমিউনিজমের বাণীবাহক। আলোচ্য সময়ে ইঁহার একটি কবিতাপুস্তিকা বাহির হইয়াছিল, 'পদাতিক' (১৯৪০, তৃ-স ১৯৫১)। পরে বাহির হইয়াছে 'চিবকুট' (১৯৫০) ইত্যাদি।

এই কালের অন্যান্য উল্লেখনীয় কবি হইলেন--- শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (জন্ম ১৯১৬), শ্রীযুক্ত মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯২০), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি।

বর্তমান আলোচনার পক্ষে কালবারিত হইলেও সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-১৯৪৭) উল্লেখ অবশ্যকর্তব্য এই কারণে যে অকাল মৃত্যুতে এই নিতান্ত তরুণ কবির সম্ভাবনা প্রায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। কবির জীবৎকালে কোন কবিতাপুস্তিকা বাহির হয় নাই। পরে বাহির হইয়াছে—'ছাড়পত্র' (১৩৫৫ সাল), 'পূর্বাভাস', 'ঘুম নেই' (১৩৫৫ সাল), 'মিঠে কড়া' (১৩৫৮ সাল) ইত্যাদি। 'অভিযান' (১৩৫৩ সাল) বইটিতে দুইটি ছোট কাব্য-নাট্য আছে।

অতঃপর উল্লেখনীয় হইলেন সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার আবির্ভাব ঘটে 'জাগরী' (১৯৪৫) প্রকাশ করিয়া। এই বইটিতে এবং 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' (দুইখণ্ড ১৯৪৯, ১৯৫১) ও অন্যান্য উপন্যাসে ও গল্পে সতীনাথ নিজস্ব চিন্তার পরিস্ফুট, সহানুভূতির ও কল্পনার সমুজ্জ্বল পরিচয় দিয়াছেন। ইনি কোন কবিতা লিখেন নাই। উপন্যাসে রাজনৈতিক ভাবনাই প্রকট।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৬) গদ্যশিল্পে নিজস্বতা দেখাইয়াছেন—ভ্রমণ-কাহিনীতে, আলাপ-আলোচনায় ও হালকা কাহিনীতে। ইঁহার রচনাভঙ্গি ইঁহার কথাভঙ্গির যথাযথ অনুগত ছিল। মুজতবা আলী অনেক ভাষা জানিতেন। সে জ্ঞান তাঁহার রচনায় প্রতিফলিত আছে।

ভাদুড়ীর ও আলীর প্রতিভাকে স্বীকার করিয়া গ্রন্থ শেষ করিলাম ॥

টীকা

১ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

২ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা, পরিচয়ে (মাঘ ১৩৪১) প্রকাশিত।

৩ মাসিকপত্রে প্রথম প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা, যেমন 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' (শ্রাবণ ১৩৩২), 'বিবেকানন্দ' (অগ্রহায়ণ ১৩৩২), 'হিন্দু মুসলমান' (আষাঢ় ১৩৩৩), 'ভারতবর্ষ' (শ্রাবণ ১৩৩৩), 'রামদাস' (ভাদ্র ১৩৩৩), 'নিবেদন' (কার্তিক ১৩৩৩) ইত্যাদি।

৪ সাগর-বলাকা'।

৫ 'মরীচিকার পিছে'।

৬ 'ছায়া প্রিয়া'।

৭ 'বনের চাতক—মনের চাতক'।

৮ 'হিন্দু মুসলমান'।

৯ প্রবাসী মাঘ ১৩৩৪। রচনাকাল জানা নাই।

১০ যেমন, 'একদিন খুঁজেছিনু যারে', 'আলেয়া', 'অস্তচাঁদে', 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল', 'কবি', 'সেদিন এ ধরণীর' 'সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়' ইত্যাদি।

১১ তুলনীয় 'মিশর', 'পিরামিড' মরুবালু ইত্যাদি।

১২ 'অস্তচাঁদে'।

১৩ চাঁদিনীতে'।

১৪ ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল'।

১৫ 'একদিন খুঁজেছিনু যারে', 'অস্তচাঁদে' ও কবি' দ্রষ্টব্য।

১৬ 'একদিন খুঁজেছিনু যারে'।

১৭ 'অস্তচাঁদে'।

১৮ 'কবি।

১৯ বাল্যকালের কোন ঘটনায় বা দুর্ঘটনায় ইহার জড় থাকিতে পারে।

২০ কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৫৭) পনেরোটি অপ্রকাশিত কবিতা যুক্ত হইয়াছে।

২১ 'আদিম দেবতারা' নামে প্রথম প্রকাশিত (কবিতা আষাঢ় ১৩৪৫)।

২২ 'স্বপ্ন নামে প্রথম প্রকাশিত (কবিতা পৌষ-ফাল্গুন ১৩৪৩)।

২৩ প্রথম প্রকাশিত পাঠ— 'শুকনো গুঁড়ির পারে চৈত্রের দুপুরে রোজ করিয়াছে খেলা'।

২৪ ঐ 'চাল-ধোয়া গন্ধ পেয়ে ঘাটে এসে মাছগুলো ভিড়েছে দু'বেলা'।

২৫ ঐ 'শামুকগুলি ভরা'।

২৬ ঐ 'পাড়'।

২৭ ঐ 'শুনেছে ঘরের ডাক'।

২৮ ঐ 'দেখেছি ভোরের আলো খেজুর গুঁড়ির পাশে দোয়েলের ডাকে'।

২৯ ঐ 'চড়ুয়ের ডিমগুলো মুখ গুঁজে আছে'।

৩০ ঐ 'মাগে'।

৩১ প্রথম প্রকাশ 'মৃত্যুর আগে নামে' (কবিতা আশ্বিন ১৩৪৩)।

৩২ প্রথম প্রকাশ পরিচয়ে (মাঘ ১৩৩৮)।

৩৩ প্রথমে 'মহাপৃথিবী'তে পরে দ্বিতীয় সংস্করণ 'বনলতা সেন' এ সঙ্কলিত।

৩৪ প্রথমে 'মহাপৃথিবী'তে পরে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় সঙ্কলিত।

৩৫ ঐ প্রথম প্রকাশ কবিতা চৈত্র ১৩৪৬।

৩৬ 'নাবিক'।

৩৭ এই নাম বা শব্দটি শেষের দিকের রচনায় বহুব্যবহৃত। উপর আসামে অনেক নদীর নামের শেষাংশ "সিরি" ("সুবনসিরি" ইত্যাদি)। এই সঙ্গে মনে আসে ধানশ্রী রাগিণীর নাম। 'ধান' ও 'শ্রী' শব্দের ব্যঞ্জনা এবং "সিঁড়ি" শব্দের উচ্চাবচতা ও বক্রতা—ইত্যাদি মিলাইয়া বোধ কবি শব্দটির সৃষ্টি।

৩৮ প্রথম প্রকাশ 'বুনো হাঁস' নামে (কবিতা আষাঢ় ১৩৩৪)।

৩৯ প্রথম প্রকাশ 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' নামে (কবিতা আশ্বিন ১৩৪৩)।

৪০ 'উত্তর বৈদিক বাংলা কাব্য' নামে ব্রজমোহন কলেজ ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত এবং 'কবিতার কথা'য় (১৯৫৬) সঙ্কলিত।

৪১ বিশেষভাবে তুলনীয়

"শত শত মৃত তারকার মৃতদেহ রয়েছে শয়ান" ('তারকার আত্মহত্যা' —সন্ধ্যাসঙ্গীত)'

"যে নক্ষত্র ম'রে যায়, তাহার বুকের শীত" ("নির্জন স্বাক্ষর'—ধূসর পাণ্ডুলিপি)।

"পারিনে শুনিতে আর, একই গান। একই গান।" ('হৃদয়ের গীতিধ্বনি (সন্ধ্যাসঙ্গীত)

"সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা একা কথা কয়।" ('বোধ'—ধূসর-পাণ্ডুলিপি)।

এই প্রসঙ্গে সুভদ্রকুমার সেনের 'বনলতা সেন প্রসঙ্গে' (দেশ, ১৯ ১১ ৮৬) দ্রষ্টব্য।

৪২ ধূসর-পাণ্ডুলিপির পরে মাঝে মাঝে কবিচিত্তের কুয়াশা কাটিবার উপক্রম হইয়াছিল। এই সময়ের দৈবাৎ কোন কবিতার ফুল দেখা দিয়াছে। যেমন "সব চেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্র মল্লিকার রাত্রি ভাল" ('সুদর্শনা'—'বনলতা

সেন')।

৪৩ "চিল পুরুষ"ও ('বনলতা সেন' পৃ ১২) মহাকাল, তবে দক্ষিণমুখ।

৪৪ তুলনীয় ফরাসী কবির Fleur du mal "কদর্যের ফুল"।

৪৫ প্রথম প্রকাশ 'মৃত্যু', প্রেম ও মহাকাল নামে (কবিতা আশ্বিন ১৩৪৩)।

৪৬ 'তিনটি ছোট কবিতা'।

৪৭ নাম-কবিতাটিতে সুধীন্দ্রবাবুর বিশিষ্টতার প্রথম প্রকাশ। এটি শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যা পরিচয়ে প্রথম বাহির হইয়াছিল।

৪৮ কিরাতার্জুনীয় ১৫-৩৮।

৪৯ 'প্রশ্ন' ('ক্রন্দসী')।

৫০ 'প্রার্থনা' ('ক্রন্দসী')।

৫১ 'প্রতিদান' (উত্তরফাল্গুনী)।

৫২ 'জাগরণ' (ঐ)।

৫৩ 'সংবর্ত' (সংবর্ত)। রচনাকাল সেপ্টেম্বর ১৯৪০।

৫৪ রচনাকাল ১৮ মার্চ ১৯৪৩।

৫৫ রচনাকাল ১৪ এপ্রিল ১৯৫৩।

৫৬ 'উপস্থাপন'।

৫৭ 'প্রত্যুত্তর'।

৫৮ 'নৌকাডুবি'।

৫৯ দ্বিতীয় সংস্করণে।

৬০ প্রথম সংখ্যা আশ্বিন ১৩৪২।

৬১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড (আনন্দ সংস্করণ) পৃষ্ঠা ৪০৭ দ্রষ্টব্য।

৬২ কয়েকটি কবিতা।

৬৩ ঐ।

৬৪ For Thine is the kingdom'

৬৫ রচনাকাল "জাতীয় প্রার্থনা দিবস, ৫ ৫ '৪০।

৬৬ 'গৃহস্থবিলাপ' (পাঁচ)।

৬৭ 'সাফাই' (চার)।

৬৮ 'সমাবর্ত' (পালা-বদল)।

৬৯ 'একটি গান শোনো' (পারাপার)।

৭০ 'প্রবাসী' (মাটির দেয়াল)।

৭১ 'সংলাপ (পালা-বদল)।

৭২ কবিতাগুলি এই কয় শীর্ষকে বিভক্ত—'প্রাথমিক', 'প্রদক্ষিণ' 'সূর্যখণ্ডিত ছায়া', 'মন মাধ্যাহ্নিক', 'সংসার' ও 'দিনযাপন'।

৭৩ কবিতাগুলি এই চার ভাগে বিভক্ত—'ছড়ানো মার্কিনি', 'ভাবতী', 'য়ুরোপা' ও 'দুই তীর'।

৭৪ কবিতাগুলি তিনভাগে ভাগ করা—'এক', 'দুই', 'তিন'।

৭৫ 'মাটির দেয়াল'।

৭৬ 'অভিজ্ঞান বসন্ত'।

৭৭ 'পারাপার'।

৭৮ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৭৯ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৮০ 'পরমা'।

৮০ক যেমন ১৩৪৪ সালে 'অ-ধরা' 'মৈত্রেয়ী', 'লতাময়ী', 'উর্বশী' ও 'লীলাকমল'। কল্লোলের শেষ সংখ্যায়ও (পৌষ ১৩৩৬) ইহার একটি কবিতা ছিল।

৮১ 'ভানুমতীর মাঠ' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বাকিগুলি সিলেট হইতে।

৮২ আলোচ্য সময়ে ইনি ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র বসু মিলিয়া একটি কবিতা পুস্তিকা বাহির করিয়াছিলেন। নাম 'সুচরিতাসু' (১৯৩৭)। ইহার নয়টি কবিতা সুশীলবাবুর লেখা, তেরোটি মণীন্দ্রবাবুর।

৮৩ 'মধু-মঞ্জরী' (১৯৩৮) ও 'বন-বাঁশরী' (১৯৩৯) ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত।

সংযোজন

পৃ ১৫৩ পংক্তি ১৫ যোজনীয়: সরলাবালা দাসীর কাব্যগ্রন্থ 'প্রবাহ' (১৯০৪) ও 'অর্ঘ্য' (১৯১৫), গল্পের বই 'চিত্রপট' (১৯১৭) ইত্যাদি।

পৃ ১৮৫ পংক্তি ১৫ যোজনীয়: বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম কিশোর উপন্যাস 'ভীমের কপালে'র (সখা জানুয়াবি-অক্টোবর ১৮৮৩) রচয়িতা প্রমদাচরণ সেন (১৮৫৮?-১৮৮৩)। সুনীল দাস সম্পাদিত 'ভীমের কপাল' আনন্দ পাবলিশার্স (১৩৮৭) দ্রষ্টব্য।

পৃ ১৯০ পংক্তি ১ যোজনীয়: 'দাদামশায়ের থলে'র অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত 'ঠানদিদির থলে' (১৯১১) ইঁহার অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

পৃ ৩৫০ পংক্তি ১৯ যোজনীয়: ছেলেদের জন্য লেখা 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইউরোপের চিঠি' (১৯৪২) এবং লেখকের ছেলেবেলার কাহিনী 'পাহাড়ী'ও (১৯৪৭) উল্লেখযোগ্য।

পৃ ৩৬৫ পংক্তি ৩৬ যোজনীয়: 'রূপসী' (১৯২৫), 'বন্ধুর দান' (১৯২৭), 'বাদলধারা' (১৯২৮), 'উদয়াচল' (১৯৩৪, দ্বি-স ১৯৩৬), 'বিপ্রদাসের ডায়েরী' (১৯৩৫) ইত্যাদি।

সংশোধন

পৃ ১৫২ পংক্তি ১৩ পঠনীয়: 'কায়া ও ছায়া' ('কায়া' ও 'ছায়া' স্থানে)।
পৃ ১৫৩ পংক্তি ১ পঠনীয়: যতীন্দ্রমোহন বাগচী ('যতীন্দ্রনাথ বাগচী' স্থানে)।
পৃ ১৯৬ পংক্তি ৬ পঠনীয়: চন্দ্রমুখী ('চন্দ্রসখী' স্থানে)।
পৃ ২৩৫ পংক্তি ১৬ পঠনীয়: 'রেবা' ('রেখা' স্থানে)।
পৃ ২৪০ পংক্তি ২৪ পঠনীয়: 'মীর পরিবার' (১৯১৮) 'নদী বক্ষে' (১৯১৯)...('মীরপরিবার'-এর (১৯১৮) ও 'নদীবক্ষ' (১৯১৯)... স্থানে)।

পৃ ২৪৫ পংক্তি ৭ পঠনীয়: 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' ('শরৎচন্দ্র চিঠিপত্র' স্থানে)।
পৃ ২৭০ পংক্তি ২৮ পঠনীয়: বইগুলি ১৯১৪-১৬ অব্দের... ('বইগুলি অব্দের খ্রীস্টাব্দের...স্থানে)।
পৃ ৩০৬ পংক্তি ৯ পঠনীয়: 'সবহারাদের গান' ('সর্বহারাদের গান' স্থানে)।
পৃ ৩০৭ পংক্তি ১৩ পঠনীয়: 'মোহানা' ('মোহনা' স্থানে)।
ঐ পংক্তি ১৯ পঠনীয়: 'মঞ্জরী' ('মঞ্জুরী' স্থানে)।
ঐ পংক্তি ২২ পঠনীয়: (১৯০৩-১৯৭৩) ('জন্ম ১৯০৩-১৯৭৩) স্থানে)।
পৃ ৩১৩ পংক্তি ১৯ পঠনীয়: G. B. S (G.G.S স্থানে)।
পৃ ৩৫৪ পংক্তি ৩৪ পঠনীয়: 'বাস্তবিকতা' ('বাস্তবিক' স্থানে)।
পৃ ৩৫৫ পংক্তি ১৬ পঠনীয়: 'অঙ্গরাগ' ('অন্তরাগ' স্থানে)।
পৃ ৩৫৮ পংক্তি ১ পঠনীয়: 'আহবনীয়' ('আবহনীয়' স্থানে)।
ঐ পংক্তি ২৭ পঠনীয়: 'মর্ত্যের স্বর্গ' ('মর্তের স্বর্গ' স্থানে)।
পৃ ৩৬২ পংক্তি ৩২ পঠনীয়: মুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী (মুণীন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী স্থানে)।
পৃ ৩৬৫ পংক্তি ৩৬ পঠনীয়: 'সোহাগী' ('সাহাগী')।
পৃ ৩৬৬ পংক্তি ১৬ পঠনীয়: 'দুলালী', ('দুলালী' স্থানে)।
ঐ পংক্তি ১৬ পঠনীয়: 'রক্তগোলাপ', ('রক্তগোলাপ' স্থানে)।

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থনাম

গ্রন্থনাম: টীকা

পত্র-পত্রিকা

পত্র-পত্রিকা: টীকা

ব্যক্তিনাম

ব্যক্তি নাম: টীকা

ইংরেজি ও ইউরোপীয়

গ্রন্থনাম

গ্রন্থনাম: টীকা

ইংরেজি পত্রপত্রিকা

ব্যক্তি নাম

ইংরাজ ও ইউরোপীয়

নির্ঘণ্ট

বিবিধ

সুলতান শাহরিয়ার ও দিনারজাদীকে শাহরজাদী গল্প বলিতেছেন

সাধনা।

সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাধনা।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদিত।

সাধনার প্রচ্ছদপৃষ্ঠা

কুন্তলীন পুরস্কার

১৩০৬ সন।

এইচ বসু, পারফিউমার

৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কুন্তলীন পুরস্কারের নামপৃষ্ঠা

শ্রাবণ, ১৩৩৩।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সবুজপত্রের প্রচ্ছদপৃষ্ঠা

ভূতপতরীর-দেশের একটি ছবি (অবনীন্দ্রনাথের আঁকা)

ভূতপতরীর-দেশের একটি ছবি (অবনীন্দ্রনাথের আঁকা)
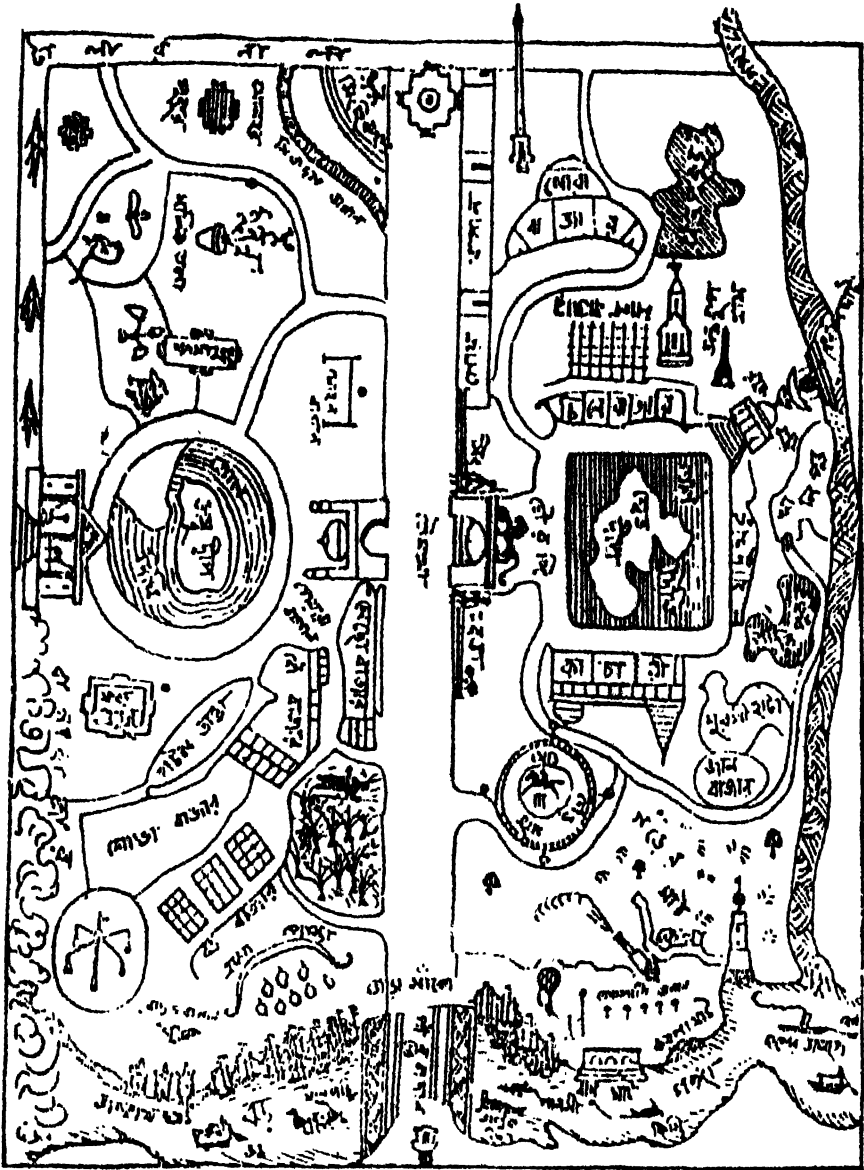
খাতাঞ্চির-খাতার একটি ছবি (অবনীন্দ্রনাথের আঁকা)

ছবিতা

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির ব্যঙ্গচিত্র (শনিবারের-চিঠি হইতে)

'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'
'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না'
'যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন'

বধূবরণ-এর প্রচ্ছদপট

বিনোদিনীর প্রচ্ছদপট (দীনেশরঞ্জন দাশের আঁকা)